খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের উপর অভিযোগের পর্যালোচনা

জাস্টিস মালিক গোলাম আলী

খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের ওপর অভিযোগের পর্যালোচনা

মূল
জাস্টিস মালিক গোলাম আলী

অনুবাদ
আবদুল আযীয
মুহাম্মদ মূসা

অনুবাদ সম্পাদনা
জুলফিকার আহমদ কিসমতী
আবু আশরাফ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৮১

স্বত্ব ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

১ম প্রকাশ

রবিউল আউয়াল	১৪২৩
জ্যৈষ্ঠ	১৪০৯
জুন	২০০২

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৯৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

خلافت وملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ -এর বাংলা অনুবাদ

KHELAFAT-O-RAJTANTRO GRONTHER OPOR OVIJOGAR PORJALOCONA by Justice Malik Gholam Ali. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Net Price : Taka. 195.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

o আমাদের কথা XV
o গ্রন্থকারের ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় ঃ মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হওয়া প্রসংগ ১৫
এক ঃ খেলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য ১৫
o কুরআন ও হাদীসের দলীল ১৭
o সুন্নাত ও বিদআত ১৯
o প্রথম যুগের আলেমদের উক্তিসমূহ ২১
দুই ঃ বিদআতের অপবাদ ২৩
o প্রথম ও দ্বিতীয় সুন্নাত ২৬
o সাহাবায়ে কিরাম ও ফকীহদের ব্যক্তিগত অভিমত ২৯
o আমীরে মুয়াবিয়ার একটি ফায়সালাকে মুহদাসাহ বা বিদআত আখ্যায়িত করণ ৩৩
o ইবনে কুদামার উক্তি ৩৬
o কতিপয় অতিরিক্ত মন্তব্য ৩৮
o মজার অভিযোগ ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দিয়ত প্রসংগ ৪২
o নিজের জন্যে, না বাইতুল মালের জন্যে ৪৩
o অভিযোগের মূল প্রকৃতি ৪৫
o অদ্ভুত যুক্তি ৪৮
o মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রাথমিক কাজের ওপর বিদআত শব্দের প্রয়োগ ৪৯
o ভ্রান্ত অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ৫৩
o প্রথম অভিযোগ ৫৪
o দ্বিতীয় অভিযোগ ৫৫
o তৃতীয় অভিযোগ ৫৭
o চতুর্থ অভিযোগ ৬০
o মৌলিক প্রশ্ন ৬০

তৃতীয় অধ্যায় ঃ গনীমত বন্টন প্রসংগ ৬৩
এক ঃ আজব ও অদ্ভুত ব্যাখ্যা ৬৩
o এসব জটিল ব্যাখ্যার স্বরূপ ৬৪

www.pathagar.com

o ইমাম তাবারীর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ৬৮
o বিস্মৃত অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ৬৯
o সংবাদ পত্রের ভ্রান্ত উদাহরণ ৭২
o স্ববিরোধিতা ৭৪
o মূল অভিযোগ ৭৫
o বাইতুল মালের অবৈধ ব্যবহার ৭৮

চতুর্থ অধ্যায় ঃ হযরত আলী (রা) ও আহলে বাইতের প্রতি ভর্ৎসনা ৮০
এক ঃ হযরত আলী (রা)-কে তিরস্কারের প্রমাণ ৮০
o নাতিদীর্ঘ প্রতিবাদ ৮৫
o অদ্ভুত যুক্তি ৮৮
o হাদীসের প্রমাণ ৮৯
o হযরত আলী (রা)-এর ওফাতের পর ৯০
o ইতিহাস বেত্তাদের আলোচনা ৯৪
o সমালোচনার জবাব ৯৮
o 'আবু তোরাবের' অর্থ ১০১
দুই ঃ গাল মন্দ করার প্রসংগ ১০৫
o 'সাব্ব ও শাতম' বা গালাগাল-এর শাব্দিক ও তাৎপর্যগত অর্থ ১১১
o হযরত আলী (রা)-কে গালমন্দ করার তাৎপর্য এবং এর কতিপয় উদাহরণ ১১৫
o হযরত আলী (রা)-এর উপাধি 'আবু তোরাব' শব্দের অবমাননাকর ব্যবহার ১১৮
o হযরত আলী (রা)-ও কি গালমন্দ করতেন ? ১২১
o গালমন্দ করার দীর্ঘসূত্রতা ১২৬
o শাহ্ ইসমাঈল শহীদের ব্যাখ্যা ১২৭

পঞ্চম অধ্যায় ঃ যিয়াদকে সহোদর ভাইয়ের মর্যাদা দানের কথা ঘোষণা ১২৯
এক ঃ মাওলানা মওদূদী (র)-এর লেখা ১২৯
o জাহেলী যুগের বিবাহ্ প্রথা ১৩০
o ভ্রাতৃ পরিচয়দানে বিলম্ব করার হেতু কি ? ১৩১
o যিয়াদের বংশ পরিচয় ১৩৪
o শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এর ব্যাখ্যা ১৩৫
o অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য ১৩৭

www.pathagar.com

o আধুনিক যুগের আলেমদের ভাষ্য ১৪২
o আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর ভুলের স্বীকারোক্তি ১৪৩
দুই ঃ আবু সুফিয়ান (রা)-এর বিবাহ ১৪৪
o যিয়াদকে সহোদর ভাইয়ের স্বীকৃতি দেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ১৫০
o নসবনামা গ্রন্থাবলীর সাক্ষ্য ১৫৫
o মা যার স্ত্রী বা ক্রীতদাসী সেই সন্তানের মালিক ১৬০

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বসরার গভর্নর স্বেচ্ছাচারী ইবনে গাইলানের প্রতি প্রশ্রয়মূলক নীতি ১৬৪
এক ঃ 'আল বালাগ' সম্পাদক মাওলানা তাকী ওসমানীর অভিযোগ ১৬৪
o মহানবী (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদার আদর্শ ১৬৫
o রাজতন্ত্রের পরিবর্তিত অবস্থা ১৬৮
o বিচারের নিয়মাবলী ১৬৯
o দণ্ডবিধি জারীর ক্ষেত্রে সন্দেহের প্রয়োগ ১৭১
o সন্দেহজনক ঘটনার আইনগত সুবিধা ১৭২
o আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামল ও ইবনে কুদামার অভিমত ১৭৪
o অপরাধী গভর্নরদের বিনা বিচারে অব্যাহতি দান প্রসংঙ্গ ১৭৫
o অপ্রাসংগিক আলোচনার নমুনা ১৭৭
দুই ঃ সত্য গোপন করার কারণসমূহ ১৭৯
o ইসলামে কিসাসের বিধান ১৮১
o বিচার বিভাগীয় আইনের সীমালংঘন ১৮৪
o যুক্তিহীন ও নিরর্থক দলীল ১৮৮
o মাওলানা মানাযের আহসান গিলানীর বর্ণনা ১৯০
o প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার হাস্যস্পদ চিত্র ১৯২

সপ্তম অধ্যায় ঃ গভর্নরদের যুলুম-অত্যাচার ১৯৪
এক ঃ যিয়াদের অত্যাচার ১৯৪
o গভর্নর বুসর বিন আবু আরতাতের যুলুম নিপীড়ন ১৯৫
o সাহাবা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা কি আপত্তিকর ? ২০৩
o হাদীস গ্রন্থাবলী দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সত্যায়ন ২০৫
o মুসলমান নারীদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করা প্রসংগ ২০৮
o হযরত আম্মার (রা)-এর শিরোচ্ছেদ প্রসংগ ২১০
o আমর ইবনুল হামিককে হত্যা ও তাঁর কর্তিত মস্তক নিয়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শন ২১২
দুই ঃ যিয়াদের অত্যাচার এবং তার বর্ণনাকারী ২১৫

www.pathagar.com

০ বুসর বিন আবু আরতাতের অত্যাচার ২২০
০ হযরত আম্মার (রা)-এর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করণ ২২৩
০ আমর বিন আল হামাকের শিরোচ্ছেদ ২২৮
০ যিয়াদ ও বুসরের অত্যাচারের আরো প্রমাণ ২২৯

অষ্টম অধ্যায় ঃ হযরত হুজার (রা) বিন আদীর হত্যা ২৩১
এক ঃ রাষ্ট্রদ্রোহীতার ইসলামী আইন ২৩১
০ কুরআনের আয়াতসমূহ ও এগুলোর ব্যাখ্যা ২৩১
০ ফিকাহবিদদের বক্তব্য ২৩৬
০ কোন্ কোন্ অবস্থায় মুসলমান হত্যা করা জায়েয ? ২৪২
০ হযরত হুজার বিন আদী (রা)-কে হত্যা করা কি শরীয়াতের দৃষ্টিতে অপরিহার্য ছিলো ? ২৪৫
০ হযরত হুজার (রা)-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস ২৪৬
০ হযরত হুজার (রা)-এর অপরাধের তালিকা ২৪৮
০ হযরত হুজার (রা)-এর তৎপরতা ২৫১
০ হযরত হুজার (রা)-এর মকদ্দমা ও তার বিবরণ ২৫৭
০ ইসলামের বিচার পদ্ধতি ২৫৭
০ ইসলামের সাক্ষ্য আইনের আরো লংঘন ২৬১
০ আত্ তাওযীহ্ ও আত্ তালবীহ্ গ্রন্থকারের ভূমিকা ২৬৫
০ হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতিক্রিয়া ২৬৮
০ অন্যান্য সাহাবীদের প্রতিক্রিয়া ২৭৩
০ পরবর্তী ইতিহাস বিদগণের অভিমত ২৮০
দুই ঃ ওসমানী সাহেবের অতিরিক্ত দলীলসমূহ ২৮৭
০ যুদ্ধ এবং গভর্নরকে বহিষ্কারের অলীক কাহিনী ২৮৮
০ অপরাধীদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ ২৯১
০ হাদীসে হুজার (রা)-এর হত্যার নিন্দাবাদ ২৯২
০ ইবনে আসাকিরের ব্যাখ্যা ২৯৬
০ মাবসুতের কথা ২৯৮
০ যিয়াদের পক্ষে সাফাই ৩০০

নবম অধ্যায় ঃ ইয়াযীদের নামে বাইয়াত গ্রহণ ৩০২
এক ঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন ৩০২
০ হযরত আবু বকর (রা)-এর খলিফা নির্বাচন ৩০৩
০ হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর খলিফা নির্বাচন ৩০৫

www.pathagar.com

o হযরত ওসমান (রা)-এর খলিফা নির্বাচন ৩০৭
o হযরত আলী (রা)-এর খলিফা নির্বাচন ৩১২
o নিয়তের বিশুদ্ধতা ৩১৪
o নিয়তের ওপর হামলা ৩১৬
o আলোচনার সারমর্ম ৩২১
o ইয়াযীদের বাইয়াতের ব্যাপারে ওসমানী সাহেবের পরিবর্তিত ভূমিকা ৩২২
o মনোনয়ন প্রদান জায়েয ও নাজায়েয হওয়া ৩২৪
o শাহ্ ওলীউল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি ৩২৪
o ইমাম মাওয়ার্দীর দৃষ্টিভঙ্গি ৩২৮
o কাযী আবু ইয়ালার দৃষ্টিভঙ্গি ৩৩০
o ইবনে খালদুনের ভূমিকা ৩৩১
o মনোনয়ন ব্যাপারে ফকীহদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ৩৩৬
o মাওলানা মওদূদী (র)-এর বিশ্লেষণ ৩৩৭
o মনোনয়ন দান কি একটি প্রস্তাবনা মাত্র ? ৩৪০
o ইয়াযীদের খেলাফতের যোগ্যতা ৩৪২
o ইয়াযীদের সততা ? ৩৪৪
o ইবনে হজর মক্কীর উক্তি ৩৪৮
o ইয়াযীদের মর্যাদা ৩৫২
o মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের উক্তিসমূহ ৩৫৪
o আওজাযুল মাসলিক প্রণেতার বর্ণনা ৩৫৮
দুই ঃ মতপার্থক্যের উপর পীড়াপীড়ি ৩৫৯
o মাওলানা আবদুল হাইয়ের ভূমিকা ৩৬০
o শেখ আবদুল হক (র)-এর অভিমত ৩৬০
o ওসমানী সাহেব এবং তার মুরব্বীদের ভাষ্য ৩৬৩
o মাওলানা আকবার শাহের মন্তব্য ৩৬৬
o মাওলানা নজীব আবাদীর ভাষায় আলোচনার সমাপ্তি ৩৬৭
o ইবনে হাজরের অতিরিক্ত ব্যাখ্যাসমূহ ৩৬৮

দশম অধ্যায় ঃ সাহাবীগণের (রা) আদালত ৩৭১
এক ঃ একটি মৌলিক ত্রুটি ৩৭১
o আদালতের পরিচয় ৩৭২
o মাওলানা মওদূদী (র)-এর ওপর ভ্রান্ত অভিযোগ ৩৭৫
o আদালতে সাহাবীর সঠিক অর্থ ৩৭৭

www.pathagar.com

o হাদীস বর্ণনায় মিথ্যা ভাষণ সাহাবায়ে কিরামদের জন্যে অসম্ভব কেন? ৩৮৪
o আদালত কিভাবে ক্ষুণ্ন হয়? ৩৮৮
o আনুগত্যহীনতার উপর ফিস্‌ক শব্দের প্রয়োগ ৩৯০
o সাহাবীদের প্রত্যেক কাজ ও কথা কি ইজতেহাদ? ৩৯২
o তাওবা ও ক্ষমা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা ৩৯৬
o ভীতি প্রদর্শন ও লোভ দেখানোর অপবাদ কি ভুল? ৩৯৮
o হুযারের হত্যা এবং দিয়ত ও ওয়ারিশ ৪০১
o হযরত আলী (রা)-এর প্রতি তিরস্কারের অতিরিক্ত প্রমাণ ৪০১
o ইবনে তাইমিয়া (র)-এর উক্তিসমূহ ৪০৬
o প্রত্যেক বিদআত ও ফিস্‌কই আদালত বিরোধী নয় ৪০৭
o বিদআত পন্থীদের বর্ণিত রাওয়ায়েত ৪১০
দুই : আদালতে সাহাবীর সঠিক পরিচয় ৪১৪
o সমর্থনসূচক অতিরিক্ত উক্তি ৪১৬
o অদ্ভুত যুক্তি ৪২১
o শাহ আবদুল আযীযের ভূমিকা ৪২২
o পূর্ববর্তী মনীষীদের উক্তিসমূহ ৪২৭
o রাবীর আদালত ৪২৯
o সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ ৪৩২
o ইমাম শাওকানীর উক্তি ৪৩৩

একাদশ অধ্যায় : এক : মারওয়ান ও তার পিতার মর্যাদা ৪৩৭
o মুসতাদরাকের হাদীস ৪৩৮
o ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ইমামদের হাদীসসমূহ ৪৪৩
o মাওলানা শিবলী (র)-এর মন্তব্য ৪৪৬
o ভিত্তিহীন অপবাদ ৪৪৭
o মারওয়ান সূত্রে ইমাম মালেক ও বুখারী (র)-এর বর্ণনা ৪৫০
o দেওবন্দী আলেমদের নীতি ৪৫৩
o আজব ও অদ্ভূত ভ্রান্তি ৪৫৭
o মারওয়ানের পিতা ৪৬০
o আরো একটি ফতওয়া ৪৬৩
দুই : ইমাম যাহবী (র) এবং নোয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের ব্যাখ্যা ৪৬৫

www.pathagar.com

o মুহাদ্দিস আল হাইসুমীর হাদীস ৪৬৭
o দেওবন্দের নীতি ৪৬৯
o মারওয়ানের আরো অপতৎপরতা ৪৭০

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ এক ঃ সম্মানিত সাহাবীগণ কি সত্যের মাপকাঠি ? ৪৭৩
o জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের মূল বাক্য ৪৭৪
o আমীরে জামায়াতের ব্যাখ্যা ৪৭৫
o কুরআনের ফায়সালা ৪৭৬
o হাদীসের ফায়সালা ৪৭৭
o 'আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রসম' হাদীসের পর্যালোচনা ৪৭৭
o সাহাবীদের উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী ইমামগণের নীতি ৪৭৮
o হানাফীদের নীতি ৪৭৯
o শাফেয়ী মতাবলম্বীদের নীতি ৪৮১
o ইমাম শাওকানী (র) ৪৮৪
o শাহ্ ওলীউল্লাহ (র) ৪৮৪
দুই ঃ প্রশ্নোত্তর ৪৮৭
o সাহাবীদের অবমাননার ভিত্তিহীন অপবাদ ৪৮৭
o মারওয়ানের আত্মসাৎমূলক কর্মকাণ্ড ৪৯৮
o মুয়াবিয়া (রা) ও ইয়াযিদের খেলাফত ৫০২
o খেলাফত ও রাজতন্ত্র এবং বেরলভী নীতি ৫১২
o সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের আকীদা ৫১৬

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ হাদীস ও রাওয়ায়েতের আলোকে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মর্যাদা ৫১৮
o বিতর্কিত কার্যাবলীর ওপর অনুতপ্ত হওয়া ৫২২
o দুর্বল রাওয়ায়েত ৫২৫
o ইমাম যাহবী (র)-এর ব্যাখ্যা ৫২৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আমাদের কথা

খেলাফত ও রাজতন্ত্র সুস্পষ্টভাবে দুটি জিনিস। হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন এটা মুসলিম উম্মাহর আকীদা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা) রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের মাধ্যমে রাজতন্ত্রে এমনসব নীতিমালাও চালু হয়, যা ছিলো খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতিমালার সুস্পষ্ট বিরোধী। ফলে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তরভুক্ত গণ্য করা হয় না।

কিন্তু কিছু লোক হযরত আলী (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষের কারণে, কিছু লোক হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রতি অন্ধ ভক্তির কারণে আর কিছু লোক অজ্ঞতার কারণে খেলাফত ও রাজতন্ত্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য মুছে ফেলতে চান। রাজতন্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত বহু অন্যায় নীতি অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা সমর্থন করতে চান।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) তাঁর খিলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থে এ দুটোর সুস্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরেন। ইসলামী খিলাফত কিভাবে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়, সে ইতিহাস তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে কার কি ভূমিকা ছিলো—সে কথাও তিনি তুলে ধরেন—অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে। এ যাচাই বিশ্লেষণের কাজ তিনিই প্রথম করেননি, তাঁর পূর্বেও বহু ইসলামী মণীষী এ কাজ করে গেছেন।

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের নেতা, স্বপ্ন দ্রষ্টা ও রূপকার মাওলানা মওদূদী (র)-এর 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থ প্রকাশ হতেই তিনি সাহাবীর বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন বলে আইউবী ও কংগ্রেসী খেলাফতের পক্ষের হুজুরানে কিরাম আদাজল খেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যবানী এবং কলমী জিহাদ শুরু করেন। তাঁর বিরোধিতায় তারা আদল, ন্যায়-নীতি ও সুবিচারের কোনো প্রকার তোয়াক্কা করেননি। নিজেদের অন্ধ বিশ্বাসে আঘাত লাগাটাকেই তারা যথেষ্ট মনে করেছেন।

তৎকালে স্বৈর শাসক আইয়ুব খানের খিলাফতকে (!) শানদার করার কাজে নিয়োজিত মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর পুত্র তকী উসমানী সাহেব এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

তিনি অনেকটা অন্ধতা, বিদ্বেষ ও একপেশে ভাবধারা নিয়ে মাওলানা মওদূদী (র)-এর খিলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের বিরুদ্ধে আইয়ুব খানের আল বালাগ পত্রিকায় লিখতে থাকেন। পরে সেসব গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়।

মাওলানা মওদূদী (র)-এর ব্যক্তিগত সহকারী মালিক গোলাম আলী (পরে পাকিস্তান শরীয়া কোর্টের জাস্টিস) মাসিক তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় তকী উসমানী সাহেবের বক্তব্যের দলিল-আদিল্লা ভিত্তিক পর্যালোচনা প্রকাশ করতে থাকেন। তকী উসমানী সাহেব তাঁর কিছু কিছু বক্তব্যের সমালোচনা মূলক জবাব পুনরায় আল বালাগ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। মালিক গোলাম আলী সাহেব সেগুলোরও অকাট্য তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক জবাব প্রদান করেন।

অবশেষে মালিক গোলাম আলী সাহেবের এসব জবাবী পর্যালোচনাই 'খিলাফত ও মুলুকিয়াত পর এ'তেরাজাত কা তাজকিয়া' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল।

যারা খিলাফত ও মুলুকিয়াত বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানার্জন করতে চান, যারা রাজতন্ত্র প্রবর্তকদের ভ্রান্তি অবহিত হতে চান, যারা মাওলানা মওদূদী (র)-এর খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের উপর প্রমাণিক ধারণা অর্জন করতে চান, সর্বোপরি যারা বিভ্রান্তির জবাব দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে চান, তাদের জন্যে এ গ্রন্থটি একটি অকাট্য দালিলিক হাতিয়ারের কাজ দেবে।

ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী অনেক আগেই গ্রন্থটি অনুবাদ সম্পন্ন করে। অনুবাদের পর গ্রন্থটি সম্পাদনাও করা হয়। এখন গ্রন্থটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে বিধায় আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করছি।

আমরা গ্রন্থটির বাংলা নামকরণ করেছি, 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের উপর অভিযোগের পর্যালোচনা'। নামটি কিছুটা লম্বা হয়ে গেলেও অর্থবহ।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

গ্রন্থকারের ভূমিকা

আল্লাহ প্রদত্ত রাষ্ট্র পাকিস্তান–আল্লাহ তায়ালা একে চিরস্থায়ী করুন। এ সময় পৃথিবীর বুকে এটি সবচেয়ে বড়ো মুসলিম রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ-এর উপর ভিত্তিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যেই তা অস্তিত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার এ স্বপ্ন এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। বরং উল্টোদিকে এ মহান রাষ্ট্রের বুকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও কুরআন-হাদীসের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী বিপর্যয়কর মতবাদসমূহের সংঘাত বিস্তার লাভ করতে থাকে। এর কতোগুলো বিপর্যয় আমাদের দীনদার মহল পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার ভ্রান্তিকে বিস্তারিতভাবে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন, নিজেদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ "খতমে নুবয়াত (নবুয়াতের পরিসমাপ্তি) অস্বীকৃতি ও নবুয়াত দাবি (কাদিয়ানি মতবাদ) এবং মহানবী (স)-এর হাদীসকে অস্বীকার (মুনকিরীন হাদীস) করার বিপর্যয়কর ফেতনা। সর্বমহলের আলেমগণ এক বাক্যে এর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

কিন্তু অপরদিকে এমন কতোগুলো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভ্রান্ত মতবাদ রয়েছে যাকে প্রত্যাখ্যান ও যার বাতুলতা প্রমাণে কেবল অলসতা ও বাকচাতুর্যেরই আশ্রয় নেয়া হয়নি, বরং অনেক ধর্মীয় মহল ও ব্যক্তি বিশেষ এ ভ্রান্ত মতবাদ ও তার পতাকাবাহীদের পূর্ণ সমর্থন দানের চেষ্টা করছে। উদাহরণ স্বরূপ সমাজতন্ত্র ও নাসিবিয়াত এমন দু'টি ভ্রান্ত মতবাদ যা কোনো কোনো ধর্মীয় মহলের কাঁধে সওয়ার হয়ে আমাদের এখানে পরিচিতি লাভ করেছে এবং এখনও পরিচিত হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের তাৎপর্য তো প্রত্যেক মুসলমান মোটামুটি জ্ঞাত আছেন, কিন্তু নাসিবিয়াত-এর তাৎপর্য জ্ঞাত থাকা তো দূরের কথা, তার নামটা পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক মুসলমান জানেন।

নাসিবিয়াত-এর ঐতিহাসিক পটভূমি এবং তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে প্রদান করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে জেনে নিন যে, নাসিবিয়াত হলো রাফিযিয়াত-এর বিপরীত। যারা হযরত আলী (রা) ও ফাতিমা (রা)-এর বংশধরদের প্রতি অন্ধ আবেগে সীমালংঘন করেছে তারা হলো রাফিযী। আর যারা হযরত আলী (রা) ও আহলে বাইতের (মহানবীর বংশধর) প্রতি ঘৃণা–বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকে ঈমানের অংশ মনে করে তারা হলো নাসিবী। আরবী ভাষায় 'নাসাব' হলো চির শত্রুতা ও অব্যাহত ঘৃণা-বিদ্বেষের অপর নাম। যে ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত সে নিসন্দেহে মোনাফিকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা হযরত আলী (রা)-এর সূত্রে মহানবী (স)-এর নিম্নোক্ত বাণী সহীহ মুসলিম-এর কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

قَالَ عَلِىٌّ وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَاءَ النَّسَمَةَ اِنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَىَّ اَنْ لَاّيُحِبُّنِىْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُنِىْ اِلاَّ مُنَافِقٌ۔

১—

www.pathagar.com

"আলী (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি বীজ থেকে অংকুর উদগম করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন ! নিশ্চয় মহানবী (স) আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, মুমিনগণই আমাকে ভালোবাসবে এবং মোনাফিকরাই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।"–(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাংলা অনু, ১ম খণ্ড, বি. আই. সি. সং, হাদীস নং ১৪৮, ই. ফা. বা. সং. ১৪৪, বাব হুব্বিল আনসার ওয়া আলী)।

আমাদের এ উপমহাদেশের আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত মাযহাব পন্থী ও মাযহাব পন্থী নয় এমন সকলের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দিহলাবী (র), যিনি রাফিযী ও শীআ মতবাদের খণ্ডনে "তুহ্‌ফা ইছনা আশারিয়া" শিরোনামে একখানা কিতাব লিখেছেন, তাঁর সেই কিতাবের নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী 'নাসিবীদের' ভিত্তি স্থাপনকারী ছিলেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

در بخارِ روایت از مروان امد است باوجو دیکه او نیز جمله نواصب بلکه رئیس ان گروه شقاوت پنرده یود ۔ لیکن مدار روایت بخاری بر امام زین العابدین است وسند او منتهی بایشان (تحفه اثنا عشریه ۔ ص ۹۹۔ کید یفتاد ودوم ۔ طبع ۱۲۹٦ھ لکھنؤ) ۔

"অবশ্য বুখারীতে মারওয়ানের সূত্রে বর্ণিত আছে, যদিও সে নাসিবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, বরং এ হতভাগা দলের প্রধান বা দলপতি ছিলো। কিন্তু এ বর্ণনার ভিত্তি রাখা হয়েছে ইমাম যয়নুল আবিদীন (র)-এর উপর এবং তার দ্বারা রিওয়ায়াত সমাপ্ত করা হয়েছে।"–(উর্দূ তরজমা তুহ্‌ফা ইছনা আশারিয়া, পৃ–৯৯, প্রকাশক ঃ নূর মুহাম্মদ, কারখানা তিজারতে কুতুব, আরামবাগ, করাচী)।

একই কিতাবের ৫৫৫নং পৃষ্ঠায় শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, "ইতিহাস থেকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত যে, আহ্‌লে সুন্নাতের অনুসারীগণ হামেশা নাসিবীদের মোকাবিলা করতো এবং এ হতভাগ্যদের বাজে কথনের জবাব দান করে তাদের সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত থাকতো।"

সুপ্রসিদ্ধ ও মহান আহ্‌লে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিদআতের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ "বিদআতের এক প্রকার হলো, 'নাসিব' যা শীয়াদের তুলনায়ও অধিক নিকৃষ্ট। কারণ নাসিব-এর অর্থ আলী (রা)-এর প্রতি ঘৃণা- বিদ্বেষকে নিজের দীন ও ঈমান বানিয়ে নেয়া।"–(হাদিয়াতুস সাইল ইলা আদিল্লাতিল মাসাইল, সাওয়াল ওয়া জওয়াব কা সদ ও পানজম, পৃ–৪৯৬)।

পাকিস্তানে বিভ্রান্তিকর নাসিবিয়াতের প্রতিষ্ঠাতা ও সেনাপতি হলো মাহ্‌মূদ আহ্‌মাদ আব্বাসী। এটা এক দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক সত্য যে, আমাদের কতক সুন্নী মহল এ ফেতনাকে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে স্বাগত জানিয়েছে। হাতে গোণা কয়েকজন আলেম ছাড়া এ ফেতনার বিরুদ্ধে কারো একটি শব্দ লেখা বা বলার তৌফিক হয়নি। ব্যতিক্রমিক এ কয়জন আলেমের মধ্যে একজন হলেন বাহাওয়ালপুরের জামেয়া ইসলামিয়ার উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নোমানী। তার একটি অসম্পূর্ণ নিবন্ধের কয়েক কিস্তি "মাসিক

www.pathagar.com

বায়্যিনাত" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, অতপর তা বন্ধ করে দেয়া হয়। উক্ত নিবন্ধের শিরোনাম ছিলো "আলোচনার ছদ্মাবরণের নাসিবিয়াত।" এখানে মাসিক বায়্যিনাত-এর ১৯৮২ সালের রমযান সংখ্যা থেকে মাওলানার নিবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করছি। তিনি বলেন ঃ

"এটা মাহ্‌মূদ আহ্‌মাদ আব্বাসী সাহেবের "খেলাফতে মুআবিয়া ওয়া ইয়াযীদ" নামীয় কুখ্যাত পুস্তকের সমালোচনা। এদেশে রাফিযীদের ফেতনা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিলো। বাতিনিয়া ও ইমামিয়া সকলেই প্রথম থেকে বিদ্যমান ছিলো। অবশ্য খারিজী ও নাসিবীদের খুঁজেও পাওয়া যেতো না। কিন্তু আব্বাসী সাহেব এ পুস্তক লিখে আহলে সুন্নাত-এর মধ্যে নাসিবিয়াতের নতুন ফেতনা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন এমন অনেক লোক পাওয়া যাচ্ছে যারা হযরত মুআবিয়া (রা)-এর বিপরীতে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে এবং ইয়াযীদের বিপরীতে হযরত হুসাইন (রা)-কে দোষী ও অপরাধী মনে করে। বাস্তবিক পক্ষে এ পুস্তক দ্বারা ক্ষতি ছাড়া ফায়দা মোটেই হয়নি। রাফিযীরা তো সস্থানে আরো শক্ত হয়ে জমে গেছে, কিন্তু আহলে সুন্নাতের অবস্থানে পার্থক্য হয়ে গেছে। অনেক লোক হযরত আলী (রা)-এর খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে এবং হযরত হুসাইন (রা)-এর শহীদ হওয়া সম্পর্কে সন্দীহান হয়ে পড়েছে। আজ পর্যন্ত একজন রাফিযী সম্পর্কেও একথা বলা যায় না যে, সে আব্বাসী সাহেবের পুস্তক পড়ে তওবা করেছে। পক্ষান্তরে এ পুস্তক অধ্যয়নকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এমন লোক পাওয়া যাবে যারা এ মিথ্যার পুটলিকে যথার্থ মনে করে হযরত আলী ও হযরত হুসাইন (রা) সম্পর্কে নিজেদের অন্তর পরিষ্কার রাখতে পারেনি। এ পুস্তক কেবল সরলমনা সাধারণ মানুষকেই নয়, বিশেষ করে শিক্ষিত মহলকেও প্রভাবিত করেছে, যাদের মধ্যে আরবী মাদ্রাসাসমূহ থেকে সনদপ্রাপ্ত অনেক লোকও রয়েছে। যাদের ঐ পুস্তকের বিষয়বস্তুর মূল উৎসে পৌঁছার দক্ষতা নেই তারা এটাকে গবেষণা ও পর্যালোচনার শ্রেষ্ঠ অবদান মনে করছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এখন জাতি হিসাবে মুসলমানরা ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ মূর্খে পরিণত হয়েছে। .... আসল কথা এই যে, রাফিযীদের দুমুখী ও কটুভাষায় লোকজন বিতৃষ্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এমনি সময় উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হলো যাতে হযরত আলী ও হযরত হুসাইন (রা)-এর অবস্থানকে তার চেয়েও অধিক বিশ্লেষণাত্মক ও মননশীল ভঙ্গিতে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছিল যা রাফিযীদের সাহাবায়ে কিরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনের অবস্থানকে আহত করার ব্যাপারে সাধারণ পদ্ধতি ছিলো। এজন্য প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনেক লোক আব্বাসী সাহেবের এ আচরণে প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেনি। অথচ সকল আহলে সুন্নাত এ বিষয়ে একমত যে, হযরত আলী (রা) খলীফায়ে রাশেদ ছিলেন এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো তারা ভুল পথে ছিলো। হযরত মুআবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)-এর নিকট বাইআত গ্রহণ না করে ভুল করেছেন এবং তিনি খলীফায়ে রাশেদ ছিলেন না। তাঁর ছেলে ইয়াযীদ জালেম ও স্বৈরাচারী শাসক ছিলো। পক্ষান্তরে হযরত হুসাইন (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) এবং সকল সাহাবায়ে কিরাম যারা হাররার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং যারা ইয়াযীদের স্বৈরাচার ও ক্ষমতাকে খতম করার চেষ্টা করেছেন তারা সকলে সত্যের দিকে আহ্বানকারী ও কল্যাণের পতাকাবাহী ছিলেন। কিন্তু এ পুস্তক (খেলাফতে মুআবিয়া ওয়া ইয়াযীদ) কেবল উপরোক্ত বিষয়সমূহ প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছে। এ পুস্তক পাঠে আহলে সুন্নাতের উক্ত দৃষ্টিভংগি স্পষ্টভাবে ভুল মনে হয় এবং এটাই হলো নাসিবীদের অভিষ্ট লক্ষ্য।"

www.pathagar.com

বাস্তবিক পক্ষে 'নতুন নাসিবিয়াত' যার পেছনে আমাদের আলেমগণ ও মাদরাসার শিক্ষকগণ যুগপৎ সমর্থন দিয়ে শক্তি যোগাচ্ছেন তা 'পুরাতন নাসিবিয়াতকেও হার মানিয়েছে। পুরাতন নাসিবিয়াতের পতাকাবাহীদের হযরত আলী (রা)-এর খেলাফত অনুষ্ঠানকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করার অথবা তাঁর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করে পেশ করার দুঃসাহস ছিলো না। তাই তারা কেবল আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর ফযীলত ও মর্যাদাকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। অতএব শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আহ্মাদ সাফারীনী তার "লাওয়ামিউল আন্ওয়াবিল বাহিয়্যা ওয়া সাওয়াতিউল আসরার লাছিরিয়্যা" শীর্ষক কিতাবে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি নকল করেছেন ঃ

سالت ابى عن على ومعاوية فقال اعلم ان عليا كان كثير الاعداء ففتش له اعداه شيئا فلم يجدوا فجاؤا الى رجل قد حاربه وقاتله فاطروه كيادا منهم له رضى الله عنه ـ

"আমি আমার পিতার নিকট আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, জেনে রাখো ! আলী (রা)-এর অনেক শত্রু ছিলো। তারা তাঁর দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে তা না পেয়ে এমন এক লোকের (মুআবিয়া) নিকট যায় যিনি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং যুদ্ধ করেন। তারা অতিরঞ্জিত করে মুআবিয়ার প্রশংসা করে, যা ছিলো আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র।"-(লাওয়ামিউ আন্ওয়ারিল বাহিয়্যা, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৩৯, দারুল ইসবাহানী, জেদ্দা ১৯৮০ হি)।

কিন্তু বর্তমান কালের নাসিবী ও তাদের সমকণ্ঠীদের অবস্থা এই যে, তারা প্রকাশ্যে হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতকে সংশয়পূর্ণ, অননুষ্ঠেয় ও ব্যর্থ প্রমাণ করার জন্য এবং তাঁকে ক্ষমতা লোভী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের ক্রীড়নক বানিয়ে পেশ করার হীন দুঃসাহস দেখাচ্ছে এবং তাঁর বিপরীতে হযরত মুআবিয়াকে কেবল "সালাওয়াতুল্লাহ আলাইহে[১] খলীফায়ে রাশেদ এবং নিষ্পাপ ইমাম বানিয়েই পেশ করছে না, বরং ইয়াযীদ, মারওয়ান ও হাকামকেও "রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদূ আনহু"-এর সুসংবাদপ্রাপ্তদের দলভুক্ত করছে। কবিতাংশ ঃ

এখন কতক "সুন্নী" হযরত (তিনি হানাফী, দেওবন্দী, আহলে হাদীস যাই হোন), যারা মাওলানা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদীর "খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত" (খেলাফত ও রাজতন্ত্র) গ্রন্থের বিরুদ্ধে এতো দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লেখালেখি করেছেন ও করছেন এবং যারা বলছেন, সমস্ত বিবাদ উক্ত গ্রন্থের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে, তাদেরকে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ধরা যাক এ ভিত্তিহীন অপবাদকে স্বীকার করে নেয়া হলো যে, এ পুস্তক সাহাবায়ে কেরামের অপমান ও রাফিযীদের শক্তি বৃদ্ধির উপকরণে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারও আগে যে রাফিযীদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট নাসিবীয়াতের চারা গাছটি আপনাদের আশ্রয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে তাও আপনাদের মতে ফেতনার সংজ্ঞাধীন আসতে পারে কিনা ? যদি আসতে পারে তবে তার বিরুদ্ধে আপনারা কতোখানি শক্তি নিয়োগ করেছেন ?

---

১. মাহমূদ আব্বাসী সাহেব তার "হাকীকাতে খেলাফত ওয়া মুলুকিয়্যাত"-এর ২৪৫নং পৃষ্ঠায় লিখেন, "চুক্তিবদ্ধ যিম্মীর দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের সমান ধার্য করা আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়া সালাতুল্লাহ আলাইহি-এর মাযহাব।

www.pathagar.com

এটা এক বাস্তব সত্য যে, আব্বাসী সাহেবের উল্লেখিত পুস্তকের বিষয়বস্তু ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে দুই বছর ধরে করাচীর মাসিক "তাযকিরা" পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে, যার সম্পাদক, নিবন্ধকার প্রমুখের অধিকাংশই দেওবন্দী আলেম ছিলেন। মাওলানা মওদূদীর পুস্তকখানি তারও দশ বছর পর মুদ্রিত হয়েছে। এ পুরা সময়ে কেবল হাতে গোনা কয়েক ব্যক্তিকে (যেমন মাওলানা মুহাম্মদ তায়্যিব সাহেব, মাওলানা আবদুর রশীদ নোমানী সাহেব) বাদ দিলে অধিকাংশ আলেম সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। কিন্তু খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াতের বিষয়বস্তু যখনই প্রকাশিত হতে শুরু হলো তখন হঠাৎ করে শূন্যলোকে গণ্ডগোল বেধে গেলো। সুন্নী ও নাসিবী সকলে এক গলায় মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এক জবান হয়ে গেলো।

"এ ঐক্য মুমিনদের জন্য হোক মোবারক
শহরের ফকীহ্গণ আমার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।"

১৯৬৫ খৃস্টাব্দে "খিলাফাত ও মুলূকিয়াত"-এর বিষয়বস্তু মাসিক তরজুমানুল কুরআন"-এ প্রকাশিত হতেই তার বিরুদ্ধে আব্বাসী সাহেব "হাফ্ওয়াত" (অর্থহীন কথা) পুস্তিকা লিখে ছাপিয়ে দেয়। এটিকে তিন বছর পর "হাকীকাতে খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত" নামে বর্ধিত কলেবরে ছাপানো হয়। তাছাড়া আব্বাসী সাহেব তার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তার অন্যান্য সহযোগী নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রচারের জন্য অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে প্রকাশ করে। এ ফেতনার সুর ও লয় এতো বর্ধিত হয় যে, তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি মুহাম্মদ দীন বাট নিজের উপনাম আবু ইয়াযীদ রেখে "রশীদ ইবনে রশীদ আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদিনা ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করে। এ আন্দোলনের একটি উদ্দেশ্য তো ছিলো ঐ নাসিবিয়াত, যাকে শক্তিশালী করার জন্য কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট দলীলাদিকে অস্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু নিজের মতলব উদ্ধারের জন্য কাঁচা-পাকা, এমনকি শীয়া, কাদিয়ানী, ইসমাঈলী, ইহুদী, হিন্দু ও খৃস্টানদের যেসব বক্তব্য পাওয়া গেছে তাও তার লেখায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু এসব লোকের আরো একটি উদ্দেশ্য ছিলো পাকিস্তানের প্রত্যেক স্বৈরাচারী জালেম শাসকের চাটুকারিতা করা এবং এখানে সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক দমন-নিপীড়ণের শিকড় মজবুত করা। সুতরাং আমি প্রমাণ স্বরূপ আব্বাসী সাহেবের একটি পুস্তক থেকে একটি নমুনা পেশ করছি। "তাহ্কীক মাযীদ বাহ সিলসিলা খিলাফতে মুআবিয়া ওয়া ইয়াযীদ" শীর্ষক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ

"ইসলামের ইতিহাসে সম্ভবত এ একটি অনুসরণযোগ্য উদাহরণ উম্মাতের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে রক্তপাতহীন রাজনৈতিক বিপ্লব সাধন করেছে, যা ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইউব খান এবং তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে কল্যাণকর পুরস্কার দান করুন যে, এভাবে অন্তত উসমান (রা)-এর অনুসরণীয় আদর্শ কার্যকর হতে পেরেছে।"

মাহ্মূদ আব্বাসী প্রমুখের অশ্লীল ও অর্থহীন বক্তব্যকে আমাদের আলেমগণ এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তথাকথিত পতাকাবাহীরা চোখ বুজে উপেক্ষাই করেননি, বরং তাকে অদ্ভুত গবেষনা সাব্যস্ত করে নিজেদের পুস্তিকাসমূহে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তার পুস্তকসমূহের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তা বিক্রয় করেছেন এবং তার গ্রন্থাবলীর পুস্তক সমালোচনা লিখেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আলী আহমাদ আব্বাসীর "হযরত মুআবিয়া কী সিয়াসী যিন্দিগী" পুস্তকের প্রারম্ভে মাওলানা এহতেশামুল হক সাহেব থানবী

www.pathagar.com

পরিচিতিমূলক ভূমিকা লিখেছেন। শীয়াদের প্রতিবাদের মুখে এ পুস্তক সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলে পর হাকীম মাহমূদ আহমাদ যাফর সাহেব শিয়ালকোঠী উক্ত পুস্তকের হুবহু চর্বিত চর্বণ, বরং চুরি করে "সায়্যিদিনা মুআবিয়া (রা), শাখসিয়াত আওর কিরদার" নামক একটি পুস্তক তৈরি করে মুদ্রিত করেন যার পরিচিতিমূলক ভূমিকা লিখেন মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী সাহেব। আব্বাসী সাহেব যে কৃতজ্ঞতা ও অভিযোগের সুরে আবেগের সাথে এ পুস্তকের উল্লেখ করেছেন তা তার বক্তব্যে নিম্নরূপ ঃ

"প্রফেসর মৌলভী আলী আহ্মাদ আব্বাসী সাল্লামাহুর "হযরত মুআবিয়া (রা) কী সিয়াসী যিন্দিগী" শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থখানি পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে ...... একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাকীম মাহমূদ আহ্মাদ যাফরীর আরেকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। "সায়্যিদিনা মুআবিয়া (রা) শাখসিয়াত ওয়া কিরদার" গ্রন্থের ভাসা ভাসা অধ্যয়নে অবহিত হওয়া যায় যে, যাফর সাহেব "হযরত মুআবিয়া (রা) কী সিয়াসী যিন্দিগী" গ্রন্থের শুধু সাহায্যই গ্রহণ করেননি, বরং সেটিকে সামনে রেখেই নিজের পুস্তক রচনা করেছেন। সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে অনুচ্ছেদসমূহও একই রকম এবং বিষয়বস্তুও প্রায় একই রকম। এ ব্যক্তি করাচী এসে এ লেখকের সাথে কয়েক বার সাক্ষাত করেন, নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। খুবই আনন্দের সাথে নিজের ও নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের পুস্তক থেকে তথ্য সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হতো। কেননা উদ্দেশ্য তো আন্দোলনের প্রসার ঘটানো, অন্যথা বিনা অনুমতিতে বিষয়বস্তু নকল করে গ্রন্থ রচনা করা কিভাবে সংগত হতে পারে ? আবু ইয়াযীদ মুহাম্মদ দীন বাট-এর "রশীদ ইবনে রশীদ" উক্ত বিষয়ের উপর একটি উত্তম গ্রন্থ, অনন্তর ইয়াযীদ (র) শীর্ষক পুস্তিকাও।" (মাহ্মূদ আহ্মাদ আব্বাসী, হাকীমাতে খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত, পৃ-৫৫৭)।

এই হাকীম মাহ্মূদ আহ্মাদ সাহেব সম্পর্কে আরো একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার যে, কখনো তার সম্পর্ক থাকে হাযরাবী জমিয়াতে উলামার সাথে আবার কখনো মারকাযী জমিয়াতে উলামার সাথে এবং তার লেখাসমূহ তাদের পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

মাওলানা মওদূদীর বইটি প্রকাশিত হওয়ার আগেও এসব ব্যক্তিত্ব নাসিবী ফেতনার প্রধান ব্যক্তিদের বাহবা দিতে থাকেন। কিন্তু "খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত" পুস্তকখানি ছাপানোর পর তো এ আশ্চর্যজনক অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, এসব সুন্নী হযরত আব্বাসীর অস্ত্র ভাণ্ডার থেকে সমস্ত অস্ত্র ধার নিয়ে অথবা চুরি করে মাওলানা মওদূদীর উপর ঝাপিয়ে পড়েন। কোনো ব্যক্তি যদি এ নাসিবীদের এবং নামমাত্র সুন্নীদের সমস্ত লেখা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে, যা তারা খোশখেয়ালে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আক্রমণ প্রতিরোধে এবং মাওলানা মওদূদীর বিরোধিতায় লিখেছেন, তবে তার মধ্যে কম-বেশি একই রকম অভিন্ন বিষয়বস্তুর ছড়াছড়ি ও একই ভাষা দৃষ্টিগোচর হবে। তাদের মধ্যে কতক নিজেদের যুক্তি-প্রমাণের সমর্থনে আব্বাসী সাহেবের পুস্তকাদির নামও উল্লেখ করেছেন এবং কতক নিজেদের যুক্তি-প্রমাণকে নিজেদের বাক্যে একটি নতুন গবেষনা হিসাবে পেশ করেছেন। তাদের কতক আব্বাসী সাহেবের এমন অন্ধ ভক্ত যে, যদি আব্বাসী মাওলানা মওদূদীর নিকুচি করার জন্য তাঁর প্রতি ভুল বাক্যও আরোপ করে থাকেন তবে তারা মোটেই বুদ্ধির পরিশ্রম স্বীকার না করে হুবহু সেই ভুল বক্তব্যই মাওলানা মওদূদীর প্রতি নিক্ষেপ করেছে এবং মূলের সাথে মিলিয়ে দেখার তৌফিক তাদের হয়নি।[১]

১. উদাহরণ স্বরূপ "আদেলানা দিফা, ১ম সংস্করণ ২য় খন্ড ৩৯১পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত বাক্যে শুরু হয়েছেঃ "মওদূদীসাহেব লিখেছেন এবং মুআবিয়া (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে লিখেছেন .....। অতপর তরজমানুল কুরআন মানসাবে রিসালাত সংখ্যা, ২৪৫নং পৃষ্ঠা থেকে একটি বাক্য উদ্ধৃত করে খুব গালিগালাজ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত গ্রন্থের মূল ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু যদিও "কুরআন ও হাদীসের রাজনৈতিক মতবাদ ও খেলাফতে রাশেদার রাজত্ব? তথাপি তার কয়েক পৃষ্ঠায় আলোচনা ছিলো, খেলাফত ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত হওয়ার ঐতিহাসিক কি কি কারণ ছিলো। স্পষ্টত এভাবে উক্ত পুস্তক আব্বাসী সাহেবের বিপথগামী ও বিদআতী মতবাদের উপর আঘাত হানে। শেষ পর্যন্ত তিনি এ পুস্তকের আঘাত নিজের উপর কিভাবে অনুভব না করে পারেন, যেখানে তার দাবি এই ছিলো যে, ইসলামের ইতিহাসে যদি কোনো ব্যক্তি থেকে থাকে যার নির্বাচন সম্পূর্ণ প্রথমবারের মতো উম্মাতের সর্বসাধারণের সঠিক রায় দ্বারা হয়েছে তবে তিনি হলেন আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদ (র)।[২] কিন্তু যেসব আহলে সুন্নাত আলেম আব্বাসী সাহেবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাচ্ছেন তাদের গতিবিধি বড়ই আশ্চর্যজনক। বাহ্যত মনে হয় যে, এসব আলেম এক কেরামতিতে দুই কাজ উদ্ধার করতে চাচ্ছেন এবং একই অস্ত্রে এমন আঘাত হানতে চাচ্ছেন যার ফলে খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত এর রচয়িতাকেও ঘায়েল ও কালিমালিপ্ত করা যায় এবং নাসিবী ও ইয়াযীদি আন্দোলনও গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হতে পারে আর হযরত আলী (রা), হযরত হুসাইন (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) ব্যর্থ ও অযোগ্য দৃষ্টিগোচর হতে পারে, অপরদিকে আমীরে মুআবিয়া (রা), ইয়াযীদ ও মারওয়ান সফল ও কৃতকার্য শাসকরূপে স্বীকৃতি পেতে পারে। চিত্রের এ প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনাকারীরা শুধু সুন্নীই থাকেনি, বরং তাদেরকে সূক্ষ্ম গবেষণাকারী ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনকারীও বলা হয়।

যাই হোক, এ এক আশ্চর্যজনক যুলুম যে, এসব আলেম উপরোক্ত গোমরাহির প্রতিরোধ করার পরিবর্তে নিজেদের পূর্ণ শক্তি সেই পুস্তকের বিরোধিতায় ও ভ্রান্ত প্রমাণে নিয়োজিত করে যেটিকে নাসিবিয়াতের প্রচারকরা নিজেদের পথের প্রতিবন্ধক মনে করে। এই যে হাঙ্গামা ও দাঙ্গাবাজি যা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত আছে, আমরা এ পর্যন্ত তার মোকাবিলায় নিশ্চুপ থেকেছি। ধারণা করেছিলাম যে, হয়তো এ তুফান ও শত্রুতা এক পর্যায়ে পৌঁছে থেমে যাবে। কিন্তু বাহ্যত এ তুফানে ভাটা পড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এবং মনে হয় যে, এ ধারা কোথাও রুদ্ধ হবে না। তাই আমি বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর নাম নিয়ে কলম ধরেছি এবং পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য সেসব নিবন্ধ নির্বাচন করেছি যেগুলো মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেবের পুত্র মুহাম্মাদ তকী উছমানী সাহেব তার মাসিক "আল বালাগ" পত্রিকায় ১৩৮৯ হিজরীর মুহাররম মাস থেকে লিখতে শুরু করেছেন। আমাদের দীনদার মহলে উক্ত মুফতী সাহেবের একটি মর্যাদা আছে।

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

এখন বাস্তব সত্য এই যে, এ উদ্ধৃত বাক্য মাওলানা মওদূদীর নয়, বরং তা হাইকোর্টের এক রায়ের অংশবিশেষ যা বিচারপতি মুহাম্মদ শফীর লিখিত এবং এই লেখক যার অনুবাদ করেছে। এটা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বাক্যে অত্যন্ত স্পষ্ট শিরোনাম মওজুদ রয়েছে ঃ "পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চ আদালতের একটি রায়"-(গোলাম আলী কর্তৃক অনূদীত)। তা সত্ত্বেও আববাসী এটিকে মাওলানা মওদূদীর বক্তব্য বলে চালিয়ে দিয়েছেন এবং এজন্য মাওলানা মওদূদীকে প্রাণ ভরে অভিশাপ দিয়েছেন। পুনরায় "আদেলানা দিফা"-এর রচয়িতা মাছির পর মাছি মারতে মারতে সেই কাজই করেছেন যা আব্বাসী করেছিলেন, কিন্তু একথা বলেননি যে, এর উৎসও আব্বাসী সাহেবের পুস্তক এবং মানসাবে রিসালাত সংখ্যা তিনি দেখেননি।

২. দ্রঃ খিলাফাতে মুআবিয়া (রা) ওয়া ইয়াযীদ (রা), ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩৮। আরো প্রকাশ থাকে যে, শীয়ারাও "ইমামাত ওয়া মুলূকিয়াত বাবে খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। উক্ত গ্রন্থে মাওলানা মওদূদীর খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত" গ্রন্থকে শীআ মতবাদের জন্য জীবন নাশক বিষ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তাই অপ্রত্যাশিতভাবে তার ঘর থেকে যে আওয়ায উঠেছে এবং বাহ্যত যুক্তি- প্রমাণের রং-এ রঞ্জিত ছিলো তা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত মুসলমানদের মতকে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে প্রভাবিত করতে পারতো। যেসব লোকের বাকযুদ্ধ ও কলম যুদ্ধ তথ্য বিকৃতি ও গালিগালাজ ও অপবাদ দানে নিয়োজিত ছিলো তাদের বক্তব্যে প্রভাবিত করার ক্ষমতা ছিলো শূন্য। তাই আমরা সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন মনে করিনি এবং তাদের বিরুদ্ধে কখনো যথারীতি বিতর্কের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার চেষ্টা করিনি। কিন্তু ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে করাচী, সীমান্ত প্রদেশ এবং আরও অন্যান্য এলাকার আমার কতক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারলাম, যেসব আলেম মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে তৎপর তারা এ সময় খুবই আনন্দিত ছিলো। তারা জানতে পারে যে, অচিরেই মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের এখান থেকে এমন একটি জিনিস সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে আসতে যাচ্ছে যা মাওলানা মওদূদীর মুখোস উন্মোচন করে দিবে। তাঁর অপর কতক বিরুদ্ধবাদীর অভিযোগ তাদের তস্করবৃত্তি ও অশ্লীল বক্তব্যের কারণে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু তখন যে সমালোচনা আসছে তা খুবই পরিপাটি ও যুক্তিনির্ভর।

এর কয়েক মাস আগে মাসিক আল-বালাগ-এর বিজ্ঞাপন এসেছে, অতপর সেই প্রতিশ্রুত নিবন্ধ "হযরত মুআবিয়া (রা) আওর খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সাথে সাথে তা 'বায়্যিনাত' ও অন্যান্য পত্রিকায় একই শিরোনামে নকল হতে শুরু করে, এমনকি হিন্দুস্তানের জমীআতে উলামায়ে হিন্দ-এর মুখপাত্র আল-জমিয়াত-এও তা ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হওয়া শুরু হয়। ফলে পুরাতন অভিযান নতুন জীবন লাভ করে এবং দেশব্যাপী বরং বহির্দেশ থেকেও এ সমালোচনা ও প্রতিবাদের রহস্য উন্মোচন করার জন্য আমাদের নিকট দাবি আসতে থাকে। "খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত" গ্রন্থের যেসব স্থানকে আল- বালাগ-এর লক্ষ্য বস্তু বানানো হয় তা সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার পুস্তকের মাত্র তেরো-চৌদ্দ পৃষ্ঠা। কিন্তু আল- বালাগ পত্রিকায় তা ধারাবাহিকভাবে আট মাস পর্যন্ত আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে শুরুতে আলোচনার পদ্ধতি ছিলো সহনীয় ও যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাতে কঠোর আক্রমণাত্মক রং প্রতীয়মান হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট ভ্রমাত্মক বক্তব্য প্রদান থেকেও সংযত থাকা হয়নি। দুই-আড়াই মাস নীরব থাকার পর বাধ্য হয়ে আমিও 'তরজমানুল কুরআন' পত্রিকায় একই শিরোনামের অধীন ধারাবাহিকভাবে একটি নিবন্ধ লিখতে শুরু করি এবং প্রতিটি অভিযোগ ও আপত্তির সন্তোষজনক জবাব দেই।

এ সময় অধিকাংশ সুহৃদ ও পাঠক উক্ত আলোচনাকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য আমার নিকট দাবি করেন। কিন্তু আমি তা সংগত মনে করলাম না এবং নিজেকে এই আলোচনা থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অপর পক্ষ থেকে নীরবতার পরিবর্তে জওয়াবী নিবন্ধ তৈরি হতে থাকলো এবং আট মাস পার হওয়ার পর ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পুনরায় আল-বালাগ-এর ৮৮ পৃষ্ঠার এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো যা আমার বক্তব্য প্রতিবাদে ওয়াকফ ছিলো। এতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অবজ্ঞা, ভর্ৎসনা, চাতুর্যপূর্ণ আক্রমণ এবং বেশির ভাগই পূর্বের অলিক ধারণা ও প্রগলভতার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আমার প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে এবং আমার উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর কচিৎ প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাই আমি এর পশ্চাদ্ধাবন করার প্রয়োজন অনুভব করলাম। অতএব আমি ঐ বিশেষ সংখ্যার উপর একটি পর্যালোচনা লেখা শুরু করলাম, যার পাঁচ কিস্তি তরজমানুল কুরআন-এর জুলাই ১৯৭১ সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হতে থাকে।

www.pathagar.com

আমার এ আলোচনা সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই মাসিক "বায়্যিনাত" পত্রিকায়ও আমার বিরুদ্ধে লেখা শুরু হয়ে গেলো। আমি আমার নিবন্ধের কোথাও প্রসঙ্গক্রমে মারওয়ানকে অভিশপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলাম। মারওয়ান যেহেতু সকল নাসিবীর রূহানী নেতা ও ঊর্দ্ধতন পূর্বপুরুষ, তাই বলতেই হয় অসাবধানতাবশত আমার হাত নাসিবীদের বেদনার্ত শিরায় আঘাত হানে। মারওয়ানের পক্ষে ওকালতি করার জন্য সর্বপ্রথম আব্বাসী সাহেবরই বলা উচিত ছিলো, কিন্তু তার জাদু যখন আমাদের আহলে সুন্নাত আলেমদের মাথায় সওয়ার হয়ে কথা বলছিলো, তখন আব্বাসী সাহেব কেন অধিক চিন্তান্বিত হবেন ! অতএব বায়্যিনাত পত্রিকাই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং উক্ত পত্রিকার রবীউস সানী ১৩৯১ হিজরী সংখ্যায় মারওয়ানের পক্ষে ওকালতি করা হয়। তাই আমি আল-বালাগ পত্রিকা সম্পর্কে পর্যালোচনা মুলতবি রেখে তরজমানুল কুরআন-এর ১৯৭১ সালের আগষ্ট সংখ্যায় "মারওয়ান আওর উসকে বাপ কা মাকাম" (মারওয়ান ও তার পিতার স্থান) হাদীস ও পূর্ববর্তী বুযুর্গদের বক্তব্যের আলোকে স্পষ্ট করেছি। এ আলোচনা পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিলো, তাই আমি তরজমানুল কুরআনে এর সমাপ্তি টানি। এর দুই মাস পর ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে আল- বালাগ পত্রিকার গোটা আলোচনা "হযরত মুআবিয়া (রা) আওর তারীখী হাকাইক" শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এতে আমার লেখাসমূহের প্রতি আকৃষ্ট পাঠকদের অব্যাহত কঠোর তাগাদায় এখন আমিও আমার নিবন্ধগুলো পুস্তকাকারে পেশ করছি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এটা কেবল আল-বালাগ ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীর জবাবী পশ্চাদ্ধবনই নয়, বরং এতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ও সাক্ষ্য, বিদ্রোহ সম্পর্কে ইসলামী আইন, আদালাতে সাহাবা (সাহাবাদের ন্যায়নিষ্ঠা) ওলী আহ্দ (রাষ্ট্রের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোয়ন) এবং অনুরূপ অন্যান্য বহু বুদ্ধিবৃত্তিক ও আইনগত বিষয়ের উপর অত্যন্ত উপকারী ও ইতিবাচক আলোচনার বিষয়বস্তু জমা করা হয়েছে। খেলাফত ও রাজতন্ত্রের উপর এ ধারাবাহিক আলোচনার পূর্বেও আমার এমন কিছু নিবন্ধ এবং প্রশ্ন ও উত্তর তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয়েছে যা উপরোক্ত আলোচনার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই সেগুলোও আমি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।

আমি আশা করি, যে ব্যক্তিই কুধারণা, অন্ধ বিদ্বেষ ও বিকৃত মানসিকতা পরিহার করে মাওলানা মওদূদী রচিত "খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত"-এর সাথে আমার গ্রন্থখানি মিলিয়ে পড়বে সে পূর্ণরূপে ইসলামের প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি (=) বুঝতে পারবে এবং তার কাছে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্য সুন্দরভাবে প্রতিভাত হবে। এরূপ অধ্যয়নের পর প্রত্যেক ইনসাফ প্রিয় মুসলমান নিজেই ফায়সালা করতে পারবে যে, ফেতনা কি আমরা ছড়িয়েছি না সেই আন্দোলনের পতাকাবাহীরা ছড়িয়েছে যারা প্রকাশ্যে বলে, "ইসলাম মূলতই আমাদের খেলাফত ও রাজনৈতিক মতবাদ দান করেনি, খেলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য নেই, যে ব্যক্তি যেভাবে চায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং যেভাবে ইচ্ছা তা পরিচালনা করতে পারে, ইসলাম সকলকে বৈধতার সনদ প্রদান করে, আবু বাক্র (রা)-কে একটি প্রতিনিধিত্বহীন সমাবেশে খলীফা বানানো হয়েছিলো, আলী (রা)-এর খেলাফত মোটেই অনুষ্ঠিত হয়নি এবং তিনি খলীফা ছিলেন না, বরং খেলাফত লাভের দাবিতে যুদ্ধ করতে থাকেন, হুসাইন (রা) "আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদ (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন" এবং নিজের নানাজানের ফরমান মোতাবেক তার নিহত হওয়াই উচিত ছিলো।" এসব কথার দ্বারা ইসলামের খেলাফতের ধারণাকে যে মর্যাদাহীন ও

www.pathagar.com

ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছিল এবং নতুন বংশধারা মন-মগজকে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে জটিলতায় নিক্ষেপ করা হচ্ছিল তার সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা কোনো বুজুর্গই অনুভব করলেন না, কিন্তু আমাদের খবর নেয়ার জন্য এসব ইয়াযীদ, খারিজী ও নাসিবীদের সরাসরি অথবা পরোক্ষ শক্তি যোগাতে বহুত সুন্নী তৎপর ও প্রস্তুত হয়ে গেলো।

আল-বালাগ পত্রিকার সম্পাদক জনাব মহাম্মদ তকী উসমানী সাহেব, যার অভিযোগসমূহের জবাবদানই আমার আসল বিষয়, তিনিও অন্যদের অনুরূপ এটা উপলব্ধি করতে চেষ্টাই করেননি যে, মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় কি এবং এটাকে উপেক্ষা করে উক্ত গ্রন্থের একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনাকে সমালোচনার বিষয় বানিয়েছেন। অথচ ঐ প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যদি কোনো কিছু ভুলও থেকে থাকে তবে তার প্রভাব আসল বিষয়বস্তুর উপর পড়তো না, যে সম্পর্কে খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত এ আলোচনা করা হয়েছে। মূল আলোচ্য বিষয় এই যে, খেলাফত কোন্ জিনিসের নাম ? খেলাফাত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ? ইসলামের আসল রাজনৈতিক ব্যবস্থা এ দু'টির মধ্যে কোন্‌টি ছিলো ? কবে এবং কিভাবে আসল ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং খেলাফাত থেকে রাজতন্ত্রের দিকে মোড় নিয়েছে ? এ পরিবর্তনের ফলে দ্বিতীয় যে ব্যবস্থা (অর্থাৎ বাদশাহী ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার মধ্যেও খেলাফাতের মধ্যে কি কি স্বাতন্ত্র্য ছিলো ? তারপর আহলে সুন্নাত এ দ্বিতীয় ব্যবস্থাকে কবুল করে নিলেও তা কি অর্থে কবুল করেছিলো ? এই মেনে নেয়াটা কি কোনো পরিণামদর্শিতার ভিত্তিতে ছিলো, না এই দুই ব্যবস্থা আহলে সুন্নাতের মতে সমভাবে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ইসলামী ব্যবস্থা ছিলো ? যে ব্যক্তিই ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন তিনি উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন হন। আরবী মাদরাসাসমূহের পরিমণ্ডলে এসব বিষয় উপেক্ষা করা হয়, এর প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। কিন্তু উক্ত পরিমণ্ডলের বাইরের দুনিয়াতে, যেখানে বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সামাজিক ও সামগ্রিক জীবন সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিক সম্পর্কে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ফলাফল প্রদানকারী সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সেখানে উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। "খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত" গ্রন্থের উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সার্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

এখন যদি কোনো ব্যক্তি গ্রন্থকারের পেশকৃত এসব ফলাফল, যুক্তি ও সাক্ষ-প্রমাণের সাথে দ্বিমত পোষণ করে এবং বাস্তবিক পক্ষে উপরোক্ত বিষয়ে ইসলামের কোনো বাস্তব খেদমত করতে চায় তবে তার কেবল নেতিবাচক দিক নিয়েই পড়ে থাকা সংগত হবে না, বরং স্বয়ং তাকে বলতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং আহলে সুন্নাতের আলেমগণের অনুষ্ঠিত রায় অনুযায়ী খেলাফাতে রাশেদার শাসনকাল হযরত আলী (রা)-এর খেলাফাতকাল পর্যন্ত কেন শেষ হলো ? উক্ত শাসনকালের পর আগত ব্যবস্থাকে খেলাফত-এর পরিবর্তে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন বলা হয়েছে ? হযরত মুআবিয়া (রা)-কে সাহাবী, ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও কেন খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য করা হলো না এবং আহলে সুন্নাতের আলেমগণ নামাযের খোতবাসমূহে খলীফায়ে রাশেদ হিসাবে তাঁর নাম কেন উচ্চারণ করেন না ? খেলাফাতে রাশেদা ও রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন কী পার্থক্য ছিলো যার ভিত্তিতে একটিকে 'খেলাফাতে রাশেদা' এবং অপরটিকে 'রাজতন্ত্র' বলা হলো ? খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রের দিকে মোড় পরিবর্তন কি হযরত মুআবিয়া (রা)-এর যুগে হয়নি ? যদি হয়ে থাকে তবে শেষ পর্যন্ত তা কিভাবে হয়েছিলো এবং এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত

www.pathagar.com

ওয়াল জামাআতের প্রতিক্রিয়া কি ছিলো ? তারা কি খেলাফত ও রাজতন্ত্র উভয়টিকে সমভাবে ইসলামের ইঙ্গিত বা বাঞ্ছিত ব্যবস্থা মনে করতেন না, তাদের নিকট মূলত খেলাফতই ছিলো বাঞ্ছিত এবং রাজতন্ত্রকে তারা উম্মাতের সার্বিক স্বার্থের খাতিরে একটি অনন্যোপায় নিকৃষ্ট ব্যবস্থা হিসাবে কবুল করেছিলেন ? এগুলো হলো আসল প্রশ্ন যার সাথে বিরোধ করার প্রয়োজন আছে, যাতে বর্তমান কালের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের মন-মগজের জটিলতা দূর করা যায়, তাদেরকে স্পষ্টভাবে ইসলামী খেলাফতের ধারণা বুঝিয়ে দেয়া যায় এবং যে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে তারা মনে করছে যে, খেলাফত ব্যবস্থা ব্যক্তি বিশেষের কোনো ভুলের কারণে নয়, বরং এর আভ্যন্তরীণ আদর্শগত কোনো দুর্বলতার কারণে টিকে থাকতে পারেনি, তাই তার পুনরুজ্জীবনের খেয়ালই অনর্থক, সেই বিভ্রান্তি নিরসন করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোনো ব্যক্তিই উক্ত প্রশ্নাবলীর সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেন না এবং যে ব্যক্তিই উদ্যোগী হন তিনি খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত-এর একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনাকে কেন্দ্র করে লম্ফ-ঝম্প শুরু করে দেন।

মাওলানা উসমানী সাহেবও একথা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেননি যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর মর্যাদা বা তাদের পারস্পরিক বিবাদ মূলতই উক্ত গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় নয়, বরং যেসব বিষয় সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে একটি অপরিহার্য তাত্ত্বিক প্রয়োজনে আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর প্রসঙ্গ এসেছে। যে ব্যক্তিই উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করবে তাকে অবশ্যই আলোচনা প্রসঙ্গে আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর সংস্পর্শে আসতে হবে। উসমানী সাহেব নিতান্তই উপদেশের ভঙ্গিতে উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে এভাবে আপত্তি তোলেন যে, মনে হয় খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত গ্রন্থের প্রণেতাই যেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর পারস্পরিক বিবাদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম কলম ধরার অপরাধ করেছেন। অথচ প্রথম হিজরী শতক থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত কোনো না কোনো তাত্ত্বিক প্রয়োজনে বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস, হাদীসের ভাষ্যকারগণ, ফকীহ্‌গণ, দার্শনিকগণ এবং ইসলামের ইতিহাস রচয়িতাগণ, যাদের বিষয়সমূহ বর্ণনা করে আসছেন। এ কাজে যদি অপরাধজনক হয়ে থাকে তবে "খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত-এর রচয়িতাই প্রথমবারের মত এ অপরাধ করেননি। তাহলে পূর্বে যারা এ অপরাধ করেছেন, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে কেন অভিযুক্ত না করে মুক্তি দেয়া হলো ? উসমানী সাহেব চাচ্ছেন যে, ইবনে খালদূন তাঁর আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থে এ বিষয় যা বর্ণনা করেছেন সেই বিষয়ে তাঁকে হুজ্জাত (চূড়ান্ত দলীল) মেনে এ পর্যন্তই যথেষ্ট মনে করা উচিত। কিন্তু প্রথমত, ইবনে খালদূন নিজেই তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে (কিতাবুল ইবর) সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিবাদের ঘটনাবলী বর্ণনা করার অপরাধ করেছেন। জানি না, উসমানী সাহেব কি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থও পড়েছেন না শুধু তার 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থ পড়েই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছেন। দ্বিতীয়ত শুধু ইবনে খালদূনই ইসলামের একমাত্র ফকীহ ও তত্ত্ববিদ ছিলেন না, অপরাপর তত্ত্ববিদ আলেমও আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে পাওয়া যায়, যাদের অভিমত ইবনে খালদূনের বিপরীত। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, খেলাফাত ও রাজতন্ত্র বিষয়ক ইবনে খালদূনের পূর্ণ আলোচনা সম্ভবত উসমানী সাহেব পড়েনওনি বুঝেনওনি, অন্যথায় তিনি তাঁকে হুজ্জাত বানানোর দুঃসাহস করতেন না। কারণ, ইবনে খালদূনকে মেনে নিলে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মারাত্মক অসঙ্গতি সৃষ্টি হবে। এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সামনে অগ্রসর হয়ে ইয়াযীদের যুবরাজ মনোনীত হওয়ার আলোচনায় পাওয়া যাবে।

আল-বালাগ পত্রিকার সম্পাদক তার ধারাবাহিক নিবন্ধে নিজের সমালোচনার লক্ষ্য বানিয়েছেন বিশেষত "খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত" গ্রন্থের সেই অংশকে যেখানে হযরত

www.pathagar.com

মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তার ভাষায় "মাওলানা মওদূদী হযরত মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে একান্তই ভয়ানক সীমায় পৌছে গেছেন, যা থেকে আল্লাহ প্রত্যাবর্তনের তৌফিক দান করুন।" তিনি প্রথম কিস্তিতে নিজের নিবন্ধসমূহে এবং পুনর্বার তার বিশেষ সংখ্যায় যাকিছু লিখেছেন, বাহ্যত তার জবাবে এবং জবাবের জবাবে আমি তার আপত্তির পূর্ণ বাক্য হুবহু এবং শব্দে শব্দে যদিও উদ্ধৃত করতে পারিনি বা তার প্রয়োজনও ছিলো না, তথাপি আমি আমার সীমা পর্যন্ত দলীল-প্রমাণ ও আপত্তিসমূহের সারসংক্ষেপ হয় তার নিজের বাক্যে অথবা তার সঠিক অর্থ আমার বাক্যে পেশ করে তার জবাব দেয়ার পূর্ণ চেষ্টা করেছি। এই প্রকারের আলোচনায় কোনো না কোনো পর্যায়ে অবশ্যই বিবাদের প্রবণতা সৃষ্টি করে। এই প্রকারের সমস্ত জায়গার লেখা সম্পূর্ণ নতুনভাবে উদ্ধৃত করে পুনরায় আমার পক্ষে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিলো না। তথাপি আমি অনেক কথা বাদ দিয়েছি অথবা পরিবর্তন করেছি। তা সত্ত্বেও কোনো কথা যদি ভুল বা বেদনাদায়ক হয় তবে আমি তার জন্য আল্লাহর কাছে, উসমানী সাহেবের কাছে এবং পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আল্লাহ জানেন, মাওলানা মওদূদী যদি একজন সামান্য লেখক অথবা চিন্তাবিদ হতেন অথবা তাঁর উপর অশুদ্ধ অভিযোগসমূহের ক্ষতি অথবা উপকারিতা তার পর্যন্ত বা অভিযোগকারীদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে আমি অভিযোগসমূহ পরিষ্কার করতে এতো সময় ও শক্তি ক্ষয় করতাম না। কিন্তু আমি পূর্ণ দীনদারির সাথে মনে করি যে, চাই বিরুদ্ধবাদীরা মানুক বা না মানুক, মুহতারাম মাওলানা হাজার হাজার নয়, লাখো লাখো মুসলমানের চিন্তা-চেতনায় ও অন্তরে কুরআন ও হাদীসের মাহাত্ম এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও সালাফে সালেহীন (পূর্বকালের মহান বুযুর্গ আলেমগণ)-এর প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও ভালোবাসার নকসা অংকন করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে কুরআন ও হাদীস এবং খিলাফাত আলা মিন হাজিন নুবুয়াতের (নবুয়াতের পদ্ধতিতে রাষ্ট্রশাসন) উপর ভিত্তিশীল ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের আবেগে আপ্লুত এবং এ উদ্দেশ্য কর্মতৎপর করেছেন। এমন এক ব্যক্তিত্বের উপর সাহাবাদের অবমাননা, আহলে সুন্নাতের নীতিমালা থেকে বিচ্যুতি, রাফিযীদের সাহায্য এবং আল্লাহর বান্দাদের বিদ্রোহী ও পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা করার মতো ভয়ানক অপবাদসমূহ আরোপ করার চেয়ে অধিক মারাত্মক অপরাধ আর কি হতে পারে? তাই আমি সত্যকে সত্য এবং বাতিলকে বাতিল প্রমাণিত করা জরুরী মনে করলাম। বিরুদ্ধবাদীরা সমসাময়িকতার অনিষ্টে লিপ্ত থাকুক অথবা অন্ধ বিশ্বাসেরই শিকার হোক, উভয় অবস্থাই কল্যাণ শূন্য। এসব লোক জবানে যে, শেরেকের (আল্লাহর সাথে অংশীবাদ) প্রচুর প্রতিবাদ করে সেই শেরেকও অন্ধ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল। আবার একথা বলা যে. সাহাবায়ে কেরাম (রা) নিষ্পাপ (মাসুম) না হলেও "নিরাপদ " (মাহফুয) এবং তাদের থেকে ভুল বা পাপ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব. এটা কি সেই আকীদা নয় যা শীয়া সম্প্রদায় (তাদের নিজস্ব ধারনায়) এবং নিষ্পাপ ইমামদের সম্পর্কে পোষণ করে? কুরআন, হাদীস এবং আহলে সুন্নাতের নীতিমালার দাবি মোটেই এটা নয় যে, আমরা আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর যে কোনো ভুলকে সঠিক প্রমাণ করবো এবং তাঁর সাথে বনু উমাইয়্যার ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকলের কথা ও কাজকে সঠিক ও উত্তম প্রমাণিত করবো।

"খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত" গ্রন্থে হযরত মুআবিয়া (রা)-এর কোনো কোনো সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম সম্পর্কে যে ভিন্নমত প্রকাশ করা হয়েছে, আল-বালাগ পত্রিকার সম্পাদক যেহেতু দুইবার তার প্রতিবাদ ও তাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। তাই আমিও দুইবার তার জবাব দিয়েছি। এ কারণে তার আলোচনার যেমন পুনরাবৃত্তি হয়েছে, আমার জবাবী

www.pathagar.com

আলোচনায়ও স্থানে স্থানে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু এমনসব স্থানে সাধারণত পুনরাবৃত্তি হয়েছে যেখানে আমি দেখেছি যে, আমি অমুক অভিযোগের জবাব প্রথমে এ বাক্যে দিয়েছি অথবা আমি অমুক প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু প্রতিপক্ষ তার জবাব দেননি, তাই আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেছি। এখন আমি অনুরূপ অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি যতোটা সম্ভব বাদ দেয়ার চেষ্টা করেছি। তথাপি কোথাও যদি পুনরাবৃত্তি অনুভূত হয় তবে তার কারণ তাই যা বর্ণনা করা হয়েছে।

অধিকন্তু কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে যেহেতু দুইবার আলোচনা করা হয়েছে, তাই আমি এক একটি বিষয়ের উপর আমার দুইবারের আলোচনার উভয় অংশকে একের পর এক একই স্থানে জমা করেছি। উদাহরণ স্বরূপ কাফেরের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মুসলমানদের ওয়ারিশ হওয়া অথবা গালিগালাজ সম্পর্কিত বিষয়ে পূর্বে ও পরে যা কিছু লেখা হয়েছিল সেগুলোকে একত্র করে পেশ করা হয়েছে। এই দুইবারের জবাবসমূহের প্রথমটিকে পরবর্তী জবাবের মধ্যে একত্র করে সম্পূর্ণ একটি সুসংবদ্ধ আলোচনায় পরিণত করা কঠিন ছিলো। তাই সেগুলোকে বৃহৎ সীমা পর্যন্ত আসল অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে, অবশ্য কিছু অপরিহার্য রদবদল করা হয়েছে।

"খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত"-এর সম্মানিত লেখক তাঁর যুক্তি-প্রমাণ ও দলীলাদিকে মজবুত ও জোরালো করার জন্য প্রতিটি বক্তব্যের সমর্থনে বিভিন্ন কিতাবের বরাত ফুটনোটে প্রদানের নীতি অবলম্বন করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, বরাতের কিতাবসমূহের প্রতিটির মূল পাঠ বা তার অনুবাদ পৃথক পৃথকভাবে দেয়া সম্ভব ছিলো না। তাই তিনি ঐসব কিতাবের একটি অভিন্ন অর্থ ও সারসংক্ষেপ তাঁর কিতাবের মূল পাঠে বর্ণনা করেছেন। বিরুদ্ধবাদীরা এভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করার রীতিরও এই বলে ভুল আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে যে, "খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত" গ্রন্থে উদ্ধৃত বিষয়বস্তু মূল বরাতসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমি অনুরূপ আপত্তির পথ বন্ধ করার জন্য যতোটা সম্ভব নিজের সীমা পর্যন্ত এ চেষ্টা করেছি যে, এক স্থানে একের অধিক বরাত দেইনি এবং আরবী বা ফারসী কিতাব থেকে বরাত দিলে মূল পাঠ তরজমাসহ উল্লেখ করেছি এবং প্রতিটি কিতাবের সংস্করণ, প্রকাশের স্থান ও মুদ্রণের সনও উল্লেখ করেছি, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিটি বক্তব্য সহজে মিলিয়ে দেখতে পারে। অবশ্য হাদীস ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থসমূহের বরাত দিতে গিয়ে আমি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনাম উল্লেখ করেছি যাতে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি তার কাঙ্ক্ষিত হাদীসখানা যে কোনো সংস্করণে নিজেই খুঁজে পেতে পারে এবং তার নির্দিষ্ট কোনো সংস্করণ খোঁজার প্রয়োজন না হয়।

আমি যদিও জ্ঞানবত্তা ও তাকওয়া পরহেযগারিতে উল্লেখযোগ্য কিছু নই, তথাপি আমি যাকিছু লিখেছি আল্লাহর ভয় জাগ্রত রেখেই লিখেছি, পঞ্চাশাধিক কিতাব এবং হাজারো পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে লিখেছি। অধ্যয়ন চলাকালে আমি আমীরে মুআবিয়া (রা) এবং অপর কতক সাহাবী সম্পর্কে এমন কতগুলো কথাও আমার নজরে পড়েছে যা মাওলানা মওদূদী বা আমার কলম থেকে বের হওয়া কথার চেয়ে অধিক মারাত্মক ও তিক্ত এবং এসব বক্তব্য এমন সব মহান ও মর্যাদাবান আহলে সুন্নাত ব্যক্তিত্বের যাদের জ্ঞান- গরিমা, মর্যাদা, কৃচ্ছ্র সাধনা সম্বন্ধে আমাদের ও আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের দূরতম তুলনা হয় না। কিন্তু আমি সেগুলোর মধ্যকার অনেক বক্তব্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে শুধু বক্তব্যসমূহের সনদ উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার জন্য পেশ করেছি। তারপরও যদি আমার কোনো কথায় কারো সুধারণা বা জ্ঞানবত্তায় সামান্য আঘাত

www.pathagar.com

লাগে অথবা কোনো ব্যক্তি তাকে তার যথাস্থানে প্রয়োগ করার পরিবর্তে যথারীতি সেগুলোকে বিবাদ ও বিরোধের মাধ্যম বানায় তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সকলকে ফেতনা ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং তিনি যেন আমাদের চিন্তা ও অন্তরদৃষ্টির ত্রুটিসমূহ সংশোধন করে দেন। আমীন।

পরিশেষে সেই সকল বন্ধু-বান্ধব, বুযুর্গ এবং এ আলোচনার প্রতি আকৃষ্ট পাঠকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা যারা আমাকে সাহস যুগিয়েছেন, উপকারী পরামর্শ দিয়েছেন, কোনো কোনো বিষয়ের সহায়ক তথ্যের অনুসন্ধান দিয়েছেন এবং কিতাবাদি ধার দেয়ার কষ্ট স্বীকার করেছেন। বিশেষত প্রিয়ভাজন সম্মানিত জনাব রিয়াদুল হাসান নূরী, এম. এ.-এর প্রতি বহুত কৃতজ্ঞ, যিনি আমাকে বেশুমার কিতাব সরবরাহ করার কষ্ট স্বীকার করেছেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেব যদিও এ আলোচনাকে স্বাগত জানাননি এবং তাঁর ব্যস্ততা, অসুস্থতা ও তাঁর বিনয়ী স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর নিকট এটা আশাও করা যায় না, তথাপি তিনি অন্তত আমাকে তাঁর পাঠাগার ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে এবং নিজের মাসিক পত্রিকায় দীর্ঘ লেখা মুদ্রণের বিরক্তি সহ্য করেছেন। অথচ তরজমানুল কুরআন কর্তৃপক্ষের সাথে আমার না কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে এবং না তিনি তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের প্রতি উত্তর দিবেন বা অন্যকে এ কাজে নিয়োজিত করবেন। আমি যা কিছু লিখেছি তা আমার অন্তর নিংড়ানো এবং আমার কলমের নির্যাস। এজন্য আমি একাই আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছে দায়ী।

اِنْ اُرِيْدُ اِلاَّ الْاِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ـ

গোলাম আলী

১১, রমযানুল মুবারক, ১৩৯১ হিজরী

১, নভেম্বর, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হওয়া প্রসংগ

এক ঃ খেলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য

জনাব মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেবের স্নেহধন্য পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব তাঁর মাসিক 'আল বালাগ' পত্রিকায় মাওলানা মওদূদী সাহেবের 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থটির ধারাবাহিক সমালোচনা করেন। তাঁর সমালোচনামূলক লেখাগুলো বই আকারেও প্রকাশিত হয়। 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে উল্লেখিত হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত অংশটি জনাব তাকী উসমানী সাহেবের বইটির প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বিশ্লেষণের সূচনায় লিখেছেন, 'মাওলানা মওদূদী হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রসংগটিকে বিপদসীমার একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর দরবারে আমরা আন্তরিক দোয়া জানাই। তিনি যেনো তাঁকে এ অবস্থান থেকে ফিরে আসার তাওফিক দান করেন।' 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো খেলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য। এ অধ্যায়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষ উপ-পরিচ্ছেদের শিরোনাম হলো আইনের সার্বভৌমত্বের অবসান। এ উপ-পরিচ্ছেদে মাওলানা মওদূদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন ঃ

শরীয়াত তথা খোদায়ী আইন-কানুনই সকল কিছুর উর্ধে। এ মৌল নীতির ভিত্তিতেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শত্রু কিংবা মিত্র, যুদ্ধে লিপ্ত কাফের কিংবা চুক্তিবদ্ধ কাফের, মুসলিম প্রজা কিংবা যিম্মি প্রজা, অনুগত মুসলমান কিংবা যুদ্ধরত বিদ্রোহী যেই হোক না কেন সকলের সাথে আচরণের একটি নিয়মনীতি শরীয়াতে নির্ধারিত রয়েছে। সে রীতিনীত কোনো অবস্থাতেই লংঘন করা যায় না। খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের গোটা শাসনামলে এ নীতি কঠোরভাবে পালন করে গেছেন। এমনকি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেদের শাসনকালে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও শরীয়াতের সীমা লংঘিত হতে দেননি। এসব সত্যাশ্রয়ী

www.pathagar.com

খলীফাদের শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট ছিলো এই যে, তাদের শাসন স্বৈর শাসন ছিলো না বরং তা ছিলো শরীয়াতের সীমানার মধ্যে অবস্থানকারী।

তারপর মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বনী উমাইয়ার শাসনামল সম্পর্কে লিখেছেন, 'যদিও তাদের শাসনামলে দেশে ইসলামী আইন প্রবর্তিত ছিলো তবুও রাজা বাদশার রাজনীতি দীনের অনুগত ছিলো না।' বনী উমাইয়ার বিভিন্ন খলীফার শাসনামলে আইনের প্রাধান্য খর্ব হওয়ার উদাহরণসমূহ পেশ করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের কয়েকটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইমাম যুহরীর বর্ণনামতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খলীফা চতুষ্টয়ের যুগে কাফের মুসলমানদের এবং মুসলমান কাফেরদের ওয়ারিশ হতে না পারাই ছিলো সুন্নাত। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শাসনামলে একদিকে মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ গণ্য করেন, অপরদিকে কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ না হওয়ার নিয়মটি ঠিক রাখেন। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয ক্ষমতায় এসে এ বিদআত খতম করে দেন। তবে হিশাম বিন আবদুল মালিক তাঁর বংশের ঐতিহ্যিক প্রথাটি আবার বহাল করেন।" এ বাক্যটিকে পূর্বাপর আলোচনার সাথে মিলিয়ে পড়লে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবজ্ঞা ও হেয় করা উদ্দেশ্য নয়। খেলাফতে রাশেদার ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাতে রাজতন্ত্রের আগমনের ফলে কি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়, তার ব্যাখ্যা করাই এখানে লেখকের মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে কথা বলতে যেয়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এসব অপরিহার্য আলোচনার মুখোমুখি হতে হয়। তবে মাওলানা ওসমানী সাহেব বিদআতের অপবাদ শিরোনাম দিয়ে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহির এ বাক্যটিকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেন। মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেবের অভিযোগ হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর আরোপিত বিদআতের অপবাদ সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, এটাও ছিলো হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রবর্তিত অন্য একটি সুন্নাত। এটা কোনো বিদআত ছিলো না। তিনি ছিলেন ফকীহ ও মুজতাহিদ। শুধুমাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মতবিরোধের কারণে শরয়ী মাসআলায় ইজতিহাদের অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা যাবে না। অধিকন্তু এ মাসআলায় হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং কতিপয় তাবেঈ হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থক ছিলেন। তাঁদের সমর্থনে একটি মারফু হাদীস রয়েছে। হাদীসটি হলো ঃ الاسلام يزيد ولا ينقص। (ইসলাম বাড়ায় কমায় না)।

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীসের দলিল

জনাব মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজ অর্থাৎ মুসলমান কর্তৃক কাফেরের ওয়ারিশ হওয়াকে যেভাবে ইজতিহাদ ও দ্বিতীয় সুন্নাত প্রমাণ করতে প্রয়াস চালিয়েছেন তাতে কয়েক দিক থেকে প্রশ্নের উদ্রেক হয়। প্রশ্নগুলো কোনো সাহাবী বা তাবেঈর ব্যক্তি সত্তাকে কেন্দ্র করে নয়, বরঞ্চ নীতিগত। প্রশ্ন হলো—একদিকে যদি কুরআনের আয়াত, সহীহ্ হাদীস, নবীর সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকা বর্তমান থাকে, অপরদিকে কোনো সাহাবী অথবা তাবেঈর পক্ষ থেকে ঐসব কুরআন, হাদীস, সুন্নাতে নববী ও খেলাফতে রাশেদার সুন্নাতের স্পষ্টত বিরোধী কথা বা কাজ থাকে, তাহলে সেটাকেও কি "অপর সুন্নাত" কিংবা "ইজতিহাদ" নাম দেয়া সঙ্গত হবে? একথা অবিসংবাদিত যে, কুরআনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত এবং অভিভাবক ও কর্তৃত্ব সংক্রান্ত আয়াতগুলোর নির্দেশাবলীর লক্ষ্য হলো মুসলমান—কাফেররা নয়। উত্তরাধিকারীদের আলোচনার সূচনাই হয়েছে يوصيكم الله শব্দ দিয়ে। আর এ শব্দের সম্বোধিত ব্যক্তিরা স্পষ্টত মুসলমান। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফের ও মুসলমানের মধ্যে ওয়ারিশী সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। বিবাহের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আহলে কিতাবের ব্যাপারে কুরআন কিছুটা শিথিলতা দিয়েছে। অর্থাৎ আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের সতী-সাধ্বী রমণীকে কোনো মুসলমান বিবাহ করতে পারবে, তবে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কোনো পুরুষ কোনো মুসলিম রমণীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না। কুরআনের কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে।

কুরআনের পর হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন। যদি কুরআনের হুকুম আহকামের ব্যাখ্যামূলক ও নীতি নির্ধারক এমন কোনো সহীহ্ হাদীস এবং রাসূলের স্বীকৃত নিয়ম আদর্শ বর্তমান থাকতো—যার মাধ্যমে মুসলমানদের কাফেরের সম্পত্তিতে ওয়ারিশ হওয়া প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটা নিসন্দেহে অনুসরণীয় হতো। কিন্তু সিয়া সিত্তার কিতাবে অত্যন্ত সহীহ্, মারফু এবং মুত্তাসিল সূত্রের হাদীসসমূহে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم-

"মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ নয় এবং কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিশ নয়।"

لايتوارث اهل الملتين-

www.pathagar.com

"দু'টি ভিন্নজাতি অর্থাৎ মুসলমান এবং অমুসলিম একে অপরের ওয়ারিশ হতে পারে না।"

এসব স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হাদীসের মুকাবিলায় নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করা যায়ঃ

الاسلام يعلى ولا يُعلى -

"ইসলাম বিজয়ী বিজিত নয়।"

الاسلام يزيد ولا ينقص

"ইসলাম বৃদ্ধি পায়—হ্রাস পায় না।"

এ হাদীস দু'টির সাথে ওয়ারিশ প্রসংগের কোনো সম্পর্ক আদৌ নেই। এর মুকাবিলায় বিশেষ করে ওয়ারিশী মাসআলায় কুরআন ও সুন্নাতের দলিলই অকাট্য ও সুস্পষ্ট। যদি ইসলামের বিজয় ও বিস্তৃতির সাধারণ ও নীতিগত বর্ণনাকে দলিল বানিয়ে মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ বানানো ঠিক হতে পারে, তাহলে একজন মুশরিক মহিলাকে বিবাহ করাও জায়েয হতে পারে এবং একজন অমুসলমানের জান-মালের প্রতিরোধও সবদিক থেকে দুরস্ত হওয়া সম্ভব।

তাছাড়া এই উভয় রাওয়ায়েতের সনদে 'ইনকেতা' রয়েছে। মুহাম্মদ তাকী সাহেব ইবনে হাজারের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসটিকে (الاسلام يزيد ولا ينقص) তো আবু দাউদের বর্ণনা মতো মারফু লিখেছেন। কিন্তু তিনি আবু দাউদের ফরায়েজ অধ্যায়ের আবুল আসওয়াদ রাবীর এ বর্ণনাটি খুলে দেখেননি। বর্ণনাকারী (রাবী) আবুল আসওয়াদ বর্ণনায় বলেছেন, ان رجلا حدثه ان معاذا قال سمعت .... এ বর্ণনার তাৎপর্য হলো—হযরত মুয়াজ বিন জাবাল থেকে একজন অজানা-অচেনা রাবী এই রাওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই হাফেজ ইবনে হাজার রাওয়ায়েতটিকে মারফু বলার অর্থ হলো —মারফু মুনকাতায়া হওয়া মুত্তাসিল না হওয়া। তাহলে মুয়াজ বিন জাবাল থেকে বর্ণিত এ রাওয়ায়েত এবং এই রাওয়ায়েত ভিত্তিক নীতির সংযোগের মধ্যে অনেক সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। একথাও প্রনিধানযোগ্য যে, ইমাম আবু দাউদ নিজেই এ রাওয়ায়েতের আগে সহীহ সনদসহ হাদীস দু'টির উল্লেখ করেছেন। (لايرث المسلم الكافر .... لايتوارث اهل) তারপর এসব কাওলী (উক্তিমূলক) হাদীস ছাড়া তেমন একটি ফে'লী (বাস্তব কর্ম সংক্রান্ত) হাদীসও নেই যার মধ্যে এটা উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কাফেরের মৃত্যুর পর কোনো মুসলমানকে তার উত্তরাধিকারী

www.pathagar.com

ঘোষণা করেছেন অথবা কোনো মুসলমানের এভাবে ওয়ারিশ হয়ে যাওয়াকে তিনি বৈধ গণ্য করেছেন।

সুন্নাত ও বিদআত

রাসূলের পরবর্তী খলীফা চতুষ্টয় সম্পর্কে একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, তাঁরা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতকে জারী রেখেছেন এবং ক্ষণিকের তরে বিন্দুমাত্রও এর বরখেলাফ করেননি। উত্তরাধিকারী আইন দেশের মৌলিক আইনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং খেলাফতে রাশেদার শাসনামলে এমন অগণিত কাফেরের জীবনাবসান ঘটেছে যাদের আত্মীয়-স্বজন ছিলো মুসলমান। কিন্তু সীরাতের হাদীস অথবা ইতিহাসের কিতাবে খেলাফতে রাশেদার শাসনামলের শেষাবধি পর্যন্ত কোনো মুসলমানকে কোনো কাফেরের ওয়ারিশ ঘোষণা করার মতো কোনো একটি ঘটনা পাওয়া যাবে কি ? হযরত মুয়াজ বিন জাবাল কিংবা আমীরে মুয়াবিয়া (রা) অথবা অপর কোনো সাহাবা উত্তরাধিকার মামলায় এসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা এমন কোনো সাক্ষ্য দিয়েছেন কি, যার ভিত্তিতে মুসলমানকে কাফেরের পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পত্তির ওয়ারিশ বলে গণ্য করা যেতে পারে ? অথবা কমপক্ষে কোনো মুসলমান এই দাবী করেছে যে, ইসলাম যেহেতু হ্রাস পাবার বদলে বৃদ্ধির নিমিত্ত তাই আমাকে আমার কাফের পূর্বপুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করুন ? খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় প্রত্যেক খলীফার যে কথা ঘোষণা করার নিয়ম ছিলো তাহলো :

انا متبع ولست بمبتدع

"আমি কুরআন ও হাদীসের অনুসারী বিদআতী নই। নতুন কোনো কিছুর প্রবর্তনকারী নই।"

উক্ত মহান খলীফাদের সাধারণ নিয়ম ছিলো, গুরুত্বপূর্ণ কাজে যদি মতবিরোধ এবং সন্দেহ দেখা দিতো তাহলে তাঁরা সাহাবাদেরকে একত্রিত করে ঘোষণা করতেন, অমুক ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো বাণী যদি কারো জানা থেকে থাকে তাহলে তা যেন পেশ করা হয়। এরূপ উদ্ভূত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক হাদীস থাকতো তাহলে ঐগুলো অবশ্যই দৃশ্যপটে উপস্থিত করা হতো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের মুকাবিলায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি

www.pathagar.com

ফায়সালা ও নিয়মকে দ্বিতীয় সুন্নাত অথবা একজন ফকীহ্ কিংবা মুজতাহিদের কিয়াস ও ইজতিহাদ বলা পারভেজের মতো লোকের কথারই অনুরূপ। তার মতে মুসলমানের প্রত্যেক আমীর অথবা জাতীয় কেন্দ্র থেকে গৃহীত নীতির সবই সুন্নাত। নবী আলাইহিস সালামের গৃহীত নীতিই কেবল সুন্নাত নয়, বরঞ্চ পরবর্তী সকল যুগের গৃহীত কার্যাবলীও সুন্নাত। মুহাম্মদ তাকী সাহেব ইমাম যুহরীর السنة الاولى (প্রথম সুন্নাত) বাক্যের একটি আজব সূক্ষ্ম রহস্য বের করেছেন। তিনি বলেন, একথা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রবর্তিত নীতিটি ছিলো দ্বিতীয় সুন্নাত। অথচ ইমাম যুহরীর একথার তাৎপর্য হলো—হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের হাতে শাসন ক্ষমতা এলে তিনি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রবর্তিত পদ্ধতি স্থগিত করে প্রথম পদ্ধতি (السنة الاولى) প্রবর্তন করেন। এর অর্থ কখনও এটা ছিলো না যে, প্রথম পদ্ধতি ত্যাগ করতঃ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রবর্তিত দ্বিতীয় পদ্ধতিও সুন্নাত ছিলো।[১] প্রশ্ন হলো—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগ থেকে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত প্রচলিত কোনো নীতি যদি পরবর্তী সময়ের কেউ পরিবর্তন করে অপর কোনো নীতি চালু করে তাহলে শরীয়াতের পরিভাষায় সেটাও কি সুন্নাত নামে অভিহিত হবে ? যদি এমন নীতিই সুন্নাত পদবাচ্যের অধিকারী হয়, তাহলে বিদআত পদবাচ্যটি কোন্ বস্তুর জন্যে ব্যবহৃত হবে ? এ ধরনের সুন্নাত তো আরো আছে, যেগুলো প্রবর্তন করে গেছেন আমীরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। মারওয়ান অথবা বনু মারওয়ান। যেমন, বসে খুতবা প্রদান, ঈদের খোতবার জন্যে মিম্বার বহন করা, ঈদের নামাযের আগে খোতবা পড়া।[২] এ শ্রেণীর ইজতিহাদ দ্বারা কি কোনো সুন্নাত প্রবর্তন করার প্রয়াস চলেছে ? এসব কার্যাবলী যদি সুন্নাত কিংবা আল বালাগ সম্পাদকের ধারণা মতে দ্বিতীয় সুন্নাতের সংজ্ঞায় আসে, তাহলে, বনী উমাইয়ারই বংশোদ্ভূত অপর এক আদর্শ খলীফা হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয কর্তৃক এসব তৎপরতার অবসান ঘটানোর প্রয়োজনবোধ করার কি কারণ ছিলো ? আর আহলে সুন্নাত মতাবলম্বী কোনো বিশেষজ্ঞ আজ পর্যন্ত এসব সুন্নাত অনুযায়ী আমল না করারই বা কারণ কি ?

---

১. স্মর্তব্য যে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল বেদায়ার যে দু'টি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তন্মধ্যে একটিতে প্রথম সুন্নাত বাক্য আছে। অপর জায়গায় (খঃ ৮ পৃঃ ১০১) শুধু সুন্নাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করেন।

২. শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ

عن طاؤس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وابو بكر وعثمان اول من جلس على المنبر معاوية بن ابى سفيان (ازالة المخفاجلد ٢ ص ٢٩٩ ناشرنور محمد كراچى)

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

প্রথম যুগের আলেমদের উক্তিসমূহ

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং হাফেজ ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উদ্ধৃতি দিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মাসরূক রাহমাতুল্লাহ, মুহাম্মদ বিন হানাফীয়া রাহমাতুল্লাহ, মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব রাহমাতুল্লাহ, ইবরাহীম নাখয়ী রাহমাতুল্লাহ, ইসহাক বিন রাহুবিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রমুখের মতে কোনো মুসলমান কাফের অথবা আহলে কিতাবের ওয়ারিশ হতে পারে। কারণ, এটাই কিয়াসের দাবী। সঠিক কথা এবং বাস্তব ঘটনা হলো এই অভিমতটি উপরোল্লেখিত বুযূর্গ ব্যক্তিদের প্রতি সম্বোধন করা কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয়। আর প্রমাণিত হলেই বা কি ! কারণ কুরআন ও হাদীসের মুকাবিলায় কোনো কিয়াস অথবা ইজতিহাদ করার অবকাশ আদৌ কারো নেই। বিস্মিত হতে হয় যে, ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আলোচনা থেকে শুধু নিজ উদ্দিষ্ট অংশটুকু উদ্ধৃত করে মাওলানা মুহাম্মদ তাকী সাহেব বক্তব্যের অবশিষ্টাংশটুকু বিলোপ করে দিয়েছেন।

ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ

وحجة الجمهور انه قياس في معارضة النص وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده- اما اكديث فليس نص في المراد بل هو محمول انه يفضل غيره من الاديان ولا تعلق له بالارث وقد عارضه قياس اخر وهو ان التوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى لاتتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض-

"জমহুরের দলীল হলো—মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ বানানোর কিয়াস করাটা 'নস' তথা কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী। কোনো বিশেষ মাসআলা সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক দলীলের উপস্থিতিতে কিয়াসের কোনোই কার্যকারিতা থাকে না। তবে উত্তরাধিকার মাসআলার সাথে কিয়াসের সমর্থনে পেশকৃত হাদীসটির (الاسلام يزيد ولا ينقص) কোনোই সম্পর্ক নেই। বরং এর তাৎপর্য এতটুকুই যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান। হাদীসটি ওয়ারিশী

(তাউস থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান সর্বপ্রথম বসে খুতবা দেন।) এমনিভাবে ঈদের নামাযের আগে মারওয়ানের খুতবা পাঠের কথা সিয়াহ সিত্তার কতিপয় রাওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত। বসে খুতবাদানের কথাও রাওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

মাসআলার কোনো দলীল নয়। অধিকন্তু এই কিয়াস অপর একটি কিয়াসের সাথেও সাংঘর্ষিক। যেমন, ওয়ারিশী প্রসংগটি অভিভাবকত্ব ও বন্ধুত্বের (ولايت)-এর সাথে সম্পৃক্ত। মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বিলায়েতের সম্পর্ক থাকার প্রশ্নই উঠে না। কেননা আল্লাহ্ তাআলার ঘোষণা হলো—"ইহুদী ও নাসারাকে তোমরা নিজেদের ওলী তথা অভিভাবক, প্রতিনিধি বা বন্ধু বানিও না। তারা পরস্পর বন্ধু শুভাকাঙ্খী।"

ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহির বাক্যের একটি অংশ ওসমানী সাহেব উল্লেখ করে এভাবে তার তরজমা করেছেন যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার এই ফায়সালা ছাড়া আর উত্তম কিছু দেখিনি যে, আমরা আহলে কিতাবের ওয়ারিশ। কিন্তু তারা আমাদের ওয়ারিশ নয় ; যেমন তাদের মহিলাদেরকে বিবাহ্ করা আমাদের জন্যে হালাল কিন্তু আমাদের মহিলাদের বিবাহ করা তাদের জন্যে হালাল নয়। আবদুল্লাহ্ বিন মা'য়াকালের এ উক্তিটি ইমাম ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজেই কিছুদূর অগ্রসর হয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু ওসমানী সাহেব প্রত্যাখ্যান করার প্রসঙ্গটি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেননি। ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেন ঃ

فان الدليل ينقلب فيما لو قال الذى ارث المسلم لانه يتزوج الينا

"দলীলটি তো আমাদের বিপক্ষেও প্রযোজ্য হতে পারে। একজন জিম্মি তো একথা বলতে পারে যে, আমিও মুসলমানের ওয়ারিশ। কারণ, মুসলমানগণ আমাদের নারীদেরকে বিবাহ্ করতে পারে।"

এ মাসআলায় মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কতিপয় সমালোচক ইবনে কুদামা প্রণীত 'আল মুগনী' এর অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। সুতরাং এখানে আল মুগনীর উক্ত কবিতাটির সেই অংশটুকুও উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি, যা আলোচনার শেষ ভাগে সারসংক্ষেপ রূপে লিখিত। ইবনে কুদামা রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহির আল মুগনীর ৭ম খণ্ডে ৬৬ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া, আলী ইবনে হুসাইন, সাঈদ বিন মাসাইয়্যেব, মাসরূক, আবদুল্লাহ্ বিন মা'কাল, শাবী, ইবরাহীম নাখয়ী, ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াসির, ইসহাক প্রমুখ মনীষী সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় যে, তাঁরা মুসলমান কর্তৃক কাফেরের ওয়ারিশ হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করেছেন। তারপর তিনি লিখেছেনঃ

وليس بموثق به عنهم-

"তাদের পক্ষ থেকে সমর্থনের বিষয়টি নির্ভরযোগ্য নয়।"এই (অনির্ভর-যোগ্য) সূত্রের কথাটিই তাকী ওসমানী সাহেব বার বার উদ্ধৃত করেছেন।

www.pathagar.com

ইবনে কুদামাহ আবারও একথার উল্লেখ করেন ঃ

لايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر -(متفق عليه)

وروى ابو داؤد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوارث اهل الملتين شتى - ولان الولايه منقطعه بين المسلم والكافر فلم يرثه كما لايرث الكافر المسلم -

"কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ নয় এবং মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ নয়।"—(বুখারী, মুসলিম)

আবু দাউদে বর্ণিত আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু'টি ভিন্ন ধর্মের অনুসারী একে অপরের ওয়ারিশ হতে পারে না। মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে বেলায়েত তথা বন্ধুত্ব বা অভিভাকত্বের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। এ কারণে একজন মুসলমান যেমন কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না—তেমনি একজন কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারে না।"

দুই ঃ বিদআতের অপবাদ

মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। একথা আমরা উপরোল্লেখিত আলোচনায় কুরআন, সুন্নাত ও প্রথম যুগের বিশেষজ্ঞ আলেমদের অভিমতের আলোকে ওসমানী সাহেবের প্রত্যেক অভিযোগের জবাবে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছি। ওয়ারিশী মাসআলার ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির লিখিত ৫টি লাইন উল্লেখ করার পর ওসমানী সাহেব আমার প্রমাণাদি খণ্ডন করার দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমি এ বাক্যের ওপর দু'টি আপত্তি করেছিলাম। প্রথমত, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বাক্যের শেষে (হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয এসে এ বিদআতের অবসান ঘটান) ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ নীতিকে বিদআত রূপে গণ্য করেছেন। অথচ 'বিদায়া ও নিহায়া'তে ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আসল আরবী বাক্যটি হলো راجع السنة الاولى হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয প্রথম সুন্নাত পুনর্বহাল করেন। আমার আপত্তি ছিলো মাওলানা প্রথম সুন্নাত শব্দটিকে বিদআত দ্বারা কেন বদলিয়ে দিলেন। মাওলানা নিজে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ নীতিকে বিদআত মনে করলে তা তিনি বলতে পারেন। কিন্তু ইমাম যুহরীর প্রতি একথার সম্বোধন করা হলো কেন ? মালিক গোলাম আলী সাহেব আমার এ অভিযোগের কোনোই জবাব দেননি।'

www.pathagar.com

এ অভিযোগের জবাব হলো—আমার দৃষ্টিতে এটা মূলতঃ এমন কোনো অভিযোগই ছিলো না যাকে কেন্দ্র করে সময়ের অপচয় করা যেতে পারে। কিন্তু এখন যেহেতু মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব তার অভিযোগটির দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং আমি একথা জানতে পারলাম যে, অপরাপর কতিপয় ভদ্র মহোদয় একদিকে 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' বইয়ের কোনো বাক্য সামনে রাখেন, অপরদিকে টীকায় বর্ণিত উদ্ধৃতিমূলক গ্রন্থরাজির কোনো একটি কিতাব খুলে বইয়ে লিখিত হুবহু বাক্য কিতাবে না পেয়ে বরং শব্দ ও অর্থের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে জোর গলায় বলতে থাকেন, শুধুমাত্র এ উদৃতিটিই নয় বরঞ্চ অন্যান্য সকল উদ্ধৃতি ও বর্ণনায়ও ভুল করা হয়েছে। অতএব এহেন অভিযোগের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনবোধ করছি।

আসল কথা হলো, একজন লেখক অন্য কোনো গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়ার সময় সাধারণত দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন। এক পদ্ধতিতে লেখক উদ্ধৃতিমূলক গ্রন্থের বাক্য হুবহু উল্লেখ করে দেন। এ অবস্থায় লেখক একই প্রণেতার একটি গ্রন্থের একটি স্থানের সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। এর সাথে অন্য কোনো উদ্ধৃতি শামিল করেন না। এমতাবস্থায় বর্ণিত বাক্য অথবা তার অনুবাদ সাধারণত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবধারায় হয়ে থাকে এবং বিকৃত বাক্যটিকে দু'টি কোলনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়। এ ধরনের সংকলন মূলের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হওয়া জরুরী মনে করা হয়। কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি অথবা রহিতকরণ বর্ধিতকরণকে নাজায়েয ধারণা করা হয়। সংযোজন ও সংকলনের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো—একজন রচয়িতা একাধিক গ্রন্থপুঞ্জীর উদৃতি দিয়ে গৃহীত উৎসসমূহকে নিজের ভাষায় একটি অংশ বানিয়ে পেশ করেন। এ পদ্ধতিতে উদ্ধৃতিমূলক উৎস আসল শব্দসহ পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ করা জরুরী নয় এবং সম্ভবও নয়। এ কারণে অকাট্যভাবে পার্থক্য ও স্বতন্ত্র নির্ণয়ের জন্যে গৃহীত উদ্ধৃতিকে উল্লেখিত আলামত কোলনের (" ") মধ্যে জ্ঞাতসারেই উল্লেখ করা হয় না। এমতাবস্থায় গৃহীত কথার আসল উৎসের অধ্যায়, পৃষ্ঠা ইত্যাদি চিহ্নিতকরণের কাজ সংকলক ও রচয়িতার জন্যে জরুরী। আসল বাক্যের শব্দাবলী হুবহু পুনরোল্লেখ করা এবং এর মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও না হওয়া জরুরী নয়। বরং মূল বক্তব্য ও তাৎপর্য মোটামুটিভাবে ব্যক্ত করাই যথেষ্ট। এ ধরনের তাৎপর্যমূলক অনুবাদ সে সময় আরো আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় যখন একাধিক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া উদ্দেশ্য হয়। এ ক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক গ্রন্থের একেকটি অংশের কিংবা তরজমা পৃথকভাবে সংকলন করা হয় তাহলে এ পদ্ধতি এমন জটিল পুনরুক্তির সৃষ্টি করে যা লেখককে থামিয়ে দেয়, পাঠককে করে বিরক্ত। এজন্য যেখানে একাধিক উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলা হয় সেখানে

www.pathagar.com

লেখক কাছাকাছি অর্থবোধক বাক্যসমূহের মধ্যে একটি সাধারণ বর্ণনা এবং হিকায়াত (Version) নিজের ভাষায় ব্যক্ত করে দেন। এ ধরনের সংকলন ও রচনাশৈলী প্রত্যেক লেখাপড়া জানা ব্যক্তির অতি পরিচিত পদ্ধতি। প্রত্যেক উদ্ধৃতির কোনোরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ছাড়া অক্ষরে অক্ষরে পনরোল্লেখ করা তখনই সম্ভব যখন পূর্ববর্তী লেখকগণের সকলেই হুবহু একই কথা লিখেন। কিন্তু এভাবে আক্ষরিক ও মৌলিক দিক থেকে সকলের লেখা পরিপূর্ণভাবে মিলে যাওয়া অসম্ভব। এমনকি একজন লেখক একই গ্রন্থে যদি একটি ধারণা ও বিষয়বস্তু পুনর্ব্যক্ত করেন তাহলেও শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়। হাফেজ ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং তাঁর রচিত আল বেদায়া ও নেহায়া এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আলোচ্য মাসআলা প্রসংগে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বেদায়ার যে দু'টি উদ্ধৃতি পেশ করেছেন সেটাও উপরোক্ত সংকলন পদ্ধতির উদাহরণ বৈকি ! আর এ সংকলন পদ্ধতি সম্পর্কে 'আল বালাগের' সম্পাদক জনাব তাকী উসমানী অজ্ঞাত থাকার দরুন তিনি উদ্ধৃতি দু'টিকে হ-য-ব-র-ল করে বিদাআত ও সুন্নাত এবং প্রথম সুন্নাত ও দ্বিতীয় সুন্নাত এর আলোচনার জন্ম দেন।

মুহতারাম মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেব 'আল বেদায়া ও নেহায়া'-এর ৮ম খণ্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠা এবং নবম খণ্ডের ২৩২ পৃষ্ঠার দু'টি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ৯ম খণ্ডের ২৩২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিটির তরজমা ওসমানী সাহেব এভাবে করেছেন ঃ

"ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খেলাফতে রাশেদার যুগে মুসলমান কাফের এবং কাফের মুসলমানদের ওয়ারিশ হতো না। পরে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হয়ে মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ ঘোষণা করেন কিন্তু কাফেরকে মুসলমানের ওয়ারিশ করেননি। পরবর্তী খলীফাগণ এ ধারাই বজায় রাখেন। তারপর ওমর বিন আবদুল আযীয খলীফা হয়ে প্রথম সুন্নাত পুনর্বহাল করেন। ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকও এ ধারা অনুসরণ করেন। হিশাম খলীফার মসনদে বসে আবার আগেকার খলীফাদের সুন্নাত গ্রহণ করেন অর্থাৎ মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ বানিয়ে দেন।"

'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থের দ্বিতীয় বরাত হলো বেদায়া গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠা। জনাব তাকী ওসমানী সাহেবের রচিত 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু' নামীয় বইয়ের ১৫৮, ১৫৯ পৃষ্ঠায় সে বরাতের অনুবাদ এভাবে করেছেন।

www.pathagar.com

"আবুল ইয়ামান শোয়াইব থেকে এবং তিনি যুহরী থেকে রাওয়ায়েত করেছেন যে, কাফের মুসলমানের এবং মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ না হওয়াই ছিলো নীতি। ------ ইতিমধ্যে হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয খলীফা হয়ে প্রথম সুন্নাত পুনর্বহাল করেন। তারপর হিশাম মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তৎপরবর্তী বনি উমাইয়াদের প্রবর্তিত সে সিদ্ধান্তকে আবার বহাল করে দেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় সুন্নাত

এ অনুবাদ সম্পর্কে আমার প্রথম বক্তব্য হলো—অনুবাদটি সম্পূর্ণ ভুল। আল বালাগের সম্পাদক সাহেব অপরকে যে বিষয়ে অভিযুক্ত করে থাকেন দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনিই সেই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়লেন। অথচ মরহুম মাওলানা মওদূদী একটি মাত্র উদ্ধৃতি মূল আরবী বাক্যসহ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মূল আরবী বাক্য হলো ঃ

وقال ابو اليمان عن شعيب عن الزهرى : مضت السنة ان لايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر واول من ورث المسلم من الكافر معاوية وقضى بذالك بنواميه بعده حتى كان عمر بن عبد العزيز فراجع السنة، واعاد هشام ماقضى به معاوية وبنوامية من بعده -

মূল আরবী বাক্যের সাথে ওসমানী সাহেবের অনুবাদটি পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় তিনি প্রথমত রেখা চিহ্নিত বাক্যের অর্থ (জ্ঞাতসারে) ছেড়ে দিয়েছেন। পরিত্যক্ত বাক্যের তরজমা ছিলো—"মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ বানানোর প্রথা সর্বপ্রথম যিনি প্রবর্তন করেন তিনি হলেন হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু।" দ্বিতীয় রেখা চিহ্নিত বাক্যের (فراجع السنة) অনুবাদে তিনি লিখেছেন, "তিনি (ওমর বিন আবদুল আযীয) প্রথম সুন্নাত পুনরায় প্রবর্তন করেন।" অথচ এখানে কেবল 'সুন্নাত' শব্দটি এসেছে 'প্রথম' হওয়ার কোনো শব্দ নেই। মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি যদি কতিপয় উদ্ধৃতির একটি সাধারণ সারমর্ম কিংবা তাৎপর্য বর্ণনা করেন তাহলে প্রত্যেকটি উদ্ধৃতির নীচে প্রতিটি শব্দের তরজমা তার থেকে দাবী করা হয়। কিন্তু আপনি একটি মাত্র বরাতের আক্ষরিক অর্থ করতে গিয়ে বিলোপ কিংবা হস্তক্ষেপ করলে তা 'দুরস্ত' হয়ে যায়। এ ধরনের রদবদল 'আল বালাগের' বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই আমি 'তরজুমানুল কুরআনের' মাধ্যমে এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তাতে কোনো বোধোদয় হয়নি।

www.pathagar.com

সম্ভবত ওসমানী সাহেব এখানে কলম অথবা কম্পোজের ওপর দোষ চাপিয়ে পাশ কাটাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু راجع السنة -এর অনুবাদ 'প্রথম সুন্নাত' করা অর্থ বহ (তথা উদ্দেশ্য প্রণোদিত)। কেননা এ ছিদ্র পথেই 'প্রথম সুন্নাত' অথবা 'দ্বিতীয় সুন্নাত'-এর অর্থ আলোচনার অবতারণা করা হয়। অথচ সহজ সরল কথায় সুন্নাতের অর্থ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত। এর মুকাবিলায় অন্য কোনো বস্তু সুন্নাত নয়। আপনি যাকে দ্বিতীয় সুন্নাত নাম দিয়েছেন তা কুরআনের সাথে দলীলরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়। এটাতো বনী উমাইয়ার (হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ও দ্বিতীয় ওমর ছাড়া) প্রবর্তিত সুন্নাত। 'আল বেদায়া'তে উল্লেখিত সুন্নাত শব্দটি নির্দিষ্ট সূচক অক্ষর আলিফ লাম দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে (السنة) ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এখানে প্রথম সুন্নাতের পর দ্বিতীয় সুন্নাত জন্ম লাভ করার প্রশ্নই উঠে না। আল বেদায়ার যেখানে السنة الاولى (প্রথম সুন্নাত) শব্দ এসেছে সেখানেও السنة الاخرى (অপর সুন্নাত) শব্দের উল্লেখ নেই। বরং সেখানে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এভাবে বাক্য এসেছে।

فلما قام هشام اخذ بسنة الخلفاء

যার অনুবাদ আপনিও এভাবে করেছেন, "হিশাম যখন খলীফা হলেন তখন তিনি খলীফাদের সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেন।" এখানে খলীফাদের অর্থ কখনো খোলাফায়ে রাশেদীন নয়। কেননা তাদের সুন্নাত তো আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু পাল্টিয়ে দেন। যে বস্তুকে আপনি দ্বিতীয় সুন্নাত নামে আখ্যায়িত করছেন তা নবী আলাইহিস সালাম অথবা খেলাফতে রাশেদার প্রবর্তিত সুন্নাত না হওয়া সম্পর্কে আপনার কি এরপরও সন্দেহ অবশিষ্ট রয়েছে? এটা উমাইয়া খলীফাদের তৈরী সুন্নাত। আমি প্রবন্ধের প্রথমে এ বিষয়ে বলেছি। বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করেছি। ঐ সকল খলীফা অর্থাৎ উমাইয়া খলীফাদের প্রবর্তিত অগণিত সুন্নাত আছে। সহযোগীতা করার বাসনা থাকলে সেসব দ্বিতীয় সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করে সুন্নাত প্রতিরক্ষার পুরোপুরি সাওয়াব হাসিল করার সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন।

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম সুন্নাত শব্দকে বিদআত শব্দ দ্বারা কেন বদলিয়ে দিলেন ? 'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেবের এ অভিযোগটিও আজব। মরহুম মাওলানা সুন্নাত অথবা 'প্রথম সুন্নাত'কে বিদআত শব্দ দ্বারা বদলাননি। বরঞ্চ ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কর্তৃক সুন্নাতকে ফিরিয়ে আনার মর্মার্থটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি বিদআতের অবসান ঘটান। মাওলানা ওসমানী সাহেবের মতে এই উভয়

www.pathagar.com

বাক্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। অথচ উভয়ের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। সুন্নাত বহাল করা এবং বিদআতের অবসান ঘটানো সম্পূর্ণ মর্মার্থবোধক বিষয়। সুন্নাতের স্থান দখলকারী বিদআতের অবসান ছাড়া সুন্নাত ফিরেই আসতে পারে না। এ সম্পর্কে মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস রয়েছে যে, কোনো সুন্নাতের বিলুপ্তি হলে তার স্থলে বিদআতের অবস্থান ঘটে। সুতরাং সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনের তাৎপর্য বিদআতের অবসান ছাড়া আর কি হবে?

"আল বালাগের সম্পাদকের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেব নিজে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাজকে যে বিদআত রূপে গণ্য করেছেন তা ঠিক নয়।[১] কেননা এটা একটি ফেকহী ইজতিহাদ[২]—যার ভিত্তি একটি মারফু হাদীসের ওপর।" আমি আলোচনার প্রথমেই দলীল-প্রমাণ সহকারে তার এ অভিযোগের অত্যন্ত জোরালো যুক্তি ভিত্তিক বিস্তারিত জবাব দিয়েছি। একাজ কুরআন, হাদীস এবং খেলাফতে রাশেদার কর্মধারার সাথে সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ এবং সাংঘর্ষিক। সুতরাং এটি ইজতিহাদ পদ বাচ্যের অধিকারী নয়। যে হাদীসটি[৩] এর সমর্থনে পেশ করা হয়েছে ওয়ারিশীর তথা উত্তরাধিকার আইনের বিধানের সাথে মূলতঃ এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং সেটা এ সংক্রান্ত অন্যান্য বহু সহীহ হাদীসের খেলাফ। আমার সমস্ত আলোচনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে 'আল বালাগ' সম্পাদক পুনরায় তাঁর বক্তব্যটি এভাবে বলে দিলেন যে, এই দ্বিতীয় নীতিও ভিত্তিহীন নয়। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে হালাল হারাম পার্থক্যের তোয়াক্কা করতেন না, এরূপ অনুমান করা ভুল। আমি আবারও বলছি, একথা মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেননি। বরং রাজতান্ত্রিক যুগ সম্পর্কে একটি সাধারণ কথা বলেছেন। সাধারণ ও অসাধারণের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে।

---

১. ওসমানী সাহেব এখানে প্রকারান্তে একথা স্বীকার করলেন যে, বিদআত শব্দটি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজেই বলেছেন, ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির প্রতি সম্বোধন করেননি বরং সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনকে বিদআতের অবসান ঘটানো দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। অথচ প্রথম অভিযোগ ছিলো, ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যা বলেননি সে কথা তার প্রতি কেন সম্বোধন করা হলো?

২. কুরআন, সুন্নাহর আলোকে কোনো সমস্যার সমাধান কল্পে ইসলামী আইন সংক্রান্ত ইমামদের উদ্ভাবনী গবেষণাকে ইজতিহাদ বলা হয়।

৩. الاسلام يعلو ولا يعلى (ইসলাম বিজয়ী থাকে, পরাজিত থাকে না।) কিংবা الاسلام يزيد ولا ينقص (ইসলাম বৃদ্ধি পায়, হ্রাস পায় না।)

www.pathagar.com

অতপর দেখা যাক যদি কাজটিকে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদ বলে স্বীকারও করা হয়, তাহলে ব্যাপারটি কি দাঁড়ায়। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি তাঁর এ ইজতিহাদের ওপর ব্যক্তিগতভাবে আমল করতেন অথবা নিজস্ব নীতি হিসেবে অন্যান্যদের সামনে বর্ণনা করতেন তাহলে কোনো ক্ষতি ছিলো না। কিন্তু সমস্ত আলোচনা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু তো হচ্ছে এই যে, এরূপ ব্যক্তিগত ইজতিহাদ প্রসূত নীতি পালনে অন্যদেরকেও বাধ্য করা যায় কিনা এবং প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতকে হটিয়ে এ চরিত্রের ইজতিহাদ প্রসূত বিধানকে শাসনতান্ত্রিক বিধান রূপে সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবর্তন করা সঙ্গত হবে কিনা ? অথচ এ কাজটি সুস্পষ্ট দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক। এ বিষয়টিকে তো 'উসূলে ফিকাহ'[১]-এর একটি স্বীকৃত সাধারণ বিধানই বিদআতের সীমায় প্রবেশ করিয়ে দেয়। সেই বিধানটি হলো, জায়েয, মুবাহ বরং মনদুবকে যদি অপরিহার্যতার গুরুত্ব দেয়া হয়, তাহলে সেটি বেদআত বলে গণ্য হবে।

সাহাবায়ে কিরাম ও ফকীহদের ব্যক্তিগত অভিমত

'আল বালাগ' সম্পাদক এখানে কতিপয় সম্মানিত সাহাবার ব্যক্তিগত অভিমত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রবর্তিত নীতির সমর্থনে পেশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, "একদিনের বেশী খাদ্য বা টাকা-পয়সা নিজের কাছে জমা রাখা হারাম"–হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ নীতি ছিলো সমধিক প্রসিদ্ধ। অথচ নীতিটি ছিলা সুস্পষ্ট দলীলের খেলাফ। এ কারণেই সাহাবীদের কেউ তাঁর সমস্বরী ছিলেন না। সকলেরই মত যে, তিনি এ মাসআলায় ইজতিহাদী ভুল করেছেন।

ভালো কথা ! মনে করুন, যদি আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমতায় থাকতেন, তাহলে তিনি একদিনের অতিরিক্ত খাদ্য নিজের কাছে মওজুদ রাখার হারাম নীতিটি আইন করে সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রে জারি করে দিতেন যে, কোনো ব্যক্তি একদিনের অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য নিজের কাছে মজুদ রাখতে পারবে না। কারণ, এটিকে তিনি হারাম মনে করেন, তাহলে মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব এবার আমাকে বলুন, তিনি এ মতটি চালুর স্বপক্ষে অনুরূপ জোর দিয়ে সমর্থন জানাতেন কিনা যেমনটি তিনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর আলোচ্য নীতির ক্ষেত্রে দিচ্ছেন ? যদি তা না করতেন তবে কেন ?

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জনাব তাকী ওসমানীর বক্তব্য হলো, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু শাসক হওয়ার পরও তাঁর ইজতিহাদ

১. কুরআন, সুন্নাহর আলোকে কোনো সমস্যার সমাধানকল্পে ইসলামী আইন উদ্ভাবন ও গবেষণার নীতিমালাকে اصول فقه। (উসূলে ফেকাহ) বলা হয়।

www.pathagar.com

করার উপযুক্ততা শেষ হয়ে যায়নি। কারণ, একথা স্বতসিদ্ধ যে, যদি কোনো ফকীহ মুজতাহিদ আমীর বা শাসক হয়ে যায়, তাহলে নিছক শাসক হওয়ার 'অপরাধে তো তাকে ইজতিহাদ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।' যদি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তাঁর একথা প্রযোজ্য হয়, তবে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য সব সাহাবার প্রসংগেও সে কথা প্রযোজ্য হবে বৈকি। 'আল বালাগ'–এ হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যেসব ফযীলত ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত এর চেয়ে বেশী না হলেও কম ছিলো না। এছাড়া তিনিও স্বমতের সমর্থনে কুরআন মজিদের আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন সব সহীহ হাদীস পেশ করতেন যেগুলো প্রামাণ্য সূত্রের দিক থেকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষের পেশকৃত রাওয়ায়েত-সমূহ থেকে বিশুদ্ধতায় আরও বলিষ্ঠ। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থনে পেশকৃত ইজতিহাদে যে পরিমাণ ভুল ও কৃত্রিমতার অবকাশ রয়েছে হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদ ও উদ্ভাবনে সে পরিমাণ ভুল বা কৃত্রিমতারও অবকাশ নেই।[১]

'আল বালাগ' সম্পাদক তাঁর লেখায় এ অভিযোগও করেছেন যে, "কোনো কোনো অতি উৎসাহী ভদ্রলোক আমাদেরকে সোসালিষ্ট বলেও আখ্যায়িত করেছেন। জানি না এসব ভদ্রলোক কারা এবং এই বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার আগেই কিসের ভিত্তিতে তারা এমন অমূলক অপবাদ আরোপ করলেন। তবে কোনো আবেগী কিংবা সুচতুর ব্যক্তি যদি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থনে তাদের পেশকৃত সমস্ত দলীল-প্রমাণকে হযরত আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফিকহী নীতি হিসাবে এবং সমাজতন্ত্রের সমর্থনে কাজে লাগায় তাহলে 'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেবের তাতে আপত্তির কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে, তা আমি বুঝতে পারছি না?"[২] আপনি যদি এরূপ মন্তব্য করতে পারেন যে,

১. তারপরও জনাব তাকী উসমানী হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যক্তিগত মতকে এজন্যে অসমর্থন যোগ্য বলছেন যে, তাঁর এমত কুরআন মজিদ ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের পরিপন্থী। আর এটাই ঠিক ; কিন্তু একই ঠিক কথাটি তিনিও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক অমুসলমানের সম্পদে মুসলমানকে উত্তরাধিকারী বানাবার নীতিতে তিনি বলতে পারলেন না। সত্যের স্বীকৃতিদানে এ অনীহার পেছনে কি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বা তার জামায়াতের অন্ধ বিরোধিতাই কাজ করেছিলো না স্বমতের প্রাধান্যদানের অবাঞ্ছিত প্রবণতা।

২. কারণ, এ পথটি তো জনাব ওসমানী সাহেবরাই 'দ্বিতীয় সুন্নাত'-এর যুক্তি দ্বারা দেখিয়ে দিলেন। ১৯৭১ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী লাহোরের দৈনিক মাশরিক এ আবদুল হামীদ খান ভাষানীর এ বিবৃতি প্রকাশিত হয় যে, সরওয়ারে আলমের উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাহাবী আবু যরের দৃষ্টিভংগি অনুসরণ করা জনগণের উচিত। তিনি ছিলেন সাম্যবাদ নীতির পতাকাবাহী। দখলদার এবং দুষ্কৃতিকারীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া ইসলামে অনুমতি রয়েছে।

www.pathagar.com

"হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসৃত নীতি কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলীলের খেলাফ" এরূপ বলার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু বিস্ময় জাগে, যখন একই কথা অন্য কেউ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রসঙ্গে বলে, তখন তা 'ভর্ৎসনা' বা 'গালমন্দ' হয়ে যায়।

তারপর ওসমানী সাহেব ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির এ নীতিটি উল্লেখ করেন যে, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে যদি কেউ যবেহ করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়া ইচ্ছা করে পরিত্যাগ করে তবুও যবেহকৃত জন্তুটি খাওয়া হালাল। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেছেন ইমাম শাফেয়ীর এ নীতি গ্রহণ করার দরুন কেউ কি তাঁর ওপর বিদআতের অভিযোগ আরোপ করেছেন ? এখানে আমারও জিজ্ঞাস্য, যদি ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমীরুল মু'মিনীন হতেন এবং এ নীতিটি গোটা উম্মতের জন্য আইন রূপে জারী করে দিতেন, তাহলে কি এটা বিদআত রূপে সংজ্ঞায়িত হতো না ? এ প্রশ্নের দ্বারা তাকী সাহেবের পেশকৃত দলীলের ভুল ও অসারতা প্রমাণ করাই আমার উদ্দেশ্য। কারণ, এটা ঐতিহাসিক স্বীকৃত সত্য যে, কোনো ফকীহ অথবা মুজতাহিদ নিজের ব্যক্তিগত কোনো নীতি বা মতকে অন্যের ওপর কস্মিনকালেও জোর করে চাপিয়ে দিতে চাননি। খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির 'মুয়াত্তা'কে শাসনতান্ত্রিক আইনের উৎস রূপে বানানোর ইচ্ছা করলে ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রস্তাবটি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনা ইতিহাস খ্যাত। পরবর্তী যুগের অনেক রাজা-বাদশাহ্ শাফেয়ী মতাবলম্বী ছিলেন। যবেহের সময় কেউ ইচ্ছাপূর্বক বিসমিল্লাহ না পড়লেও সে জানোয়ার অপর সকলের জন্য হালাল—ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেবের এ নীতি সেসব শাসকদের কেউ নিজ রাজ্যে রাষ্ট্রীয় আইন বা নীতি হিসাবে কখনো প্রবর্তন করেননি। এমনিভাবে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার পরও মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়ার নীতিকে যদি আইনের রূপ না দিতেন এবং বিষয়টিকে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের পর্যায়েই রাখতেন, তাহলে এটা বিদআতে পরিগণিত হতো না।

যার ওপর গোসল ফরয সে পানি দ্বারা গোসল না করা পর্যন্ত তায়াম্মুম করে কোনো অবস্থাতেই নামায পড়তে পারবে না—এ ছিলো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খলীফা হওয়ার আগে ও পরের অভিমত। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাঁর সাথে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এ মাসআলা নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়। তারপরও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ব্যক্তিগত নীতির ওপরই অটল থাকেন।

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিংবা অন্যান্য মুসলমানকে তাঁর এই ব্যক্তিগত নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করেননি। আসলে খেলাফতে রাশেদার শাসনামলে শুরা ভিত্তিক আইন-কানুন পুরোপুরি কার্যকর ছিলো এবং দেশ ভিত্তিক সামষ্টিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ সাধারণত মজলিসে শুরায় পরামর্শের ভিত্তিতে সমাধান করা হতো। এ কারণেই খেলাফতে রাশেদার ইজমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে 'সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদীন' অথবা অন্য ভাষায় তাঁর নিজের সুন্নাতের পরিশিষ্ট ও সংযোজনী বলে গণ্য করে তার অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করে যান। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো উদ্ভূত সমস্যা কেবল মজলিসে শুরায় উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হতেন না বরং সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে এ আহ্বান জানাতেন যে, অমুক মাসআলা সম্পর্কে যদি কারো কাছে নবী আলাইহিস সালামের কোনো কাওলী (উক্তিমূলক) ও ফে'লী (বাস্তব কাজমূলক) হাদীস জানা থাকে, তাহলে সে যেনো আমাদেরকে অবহিত করেন। এ কারণে ইসলামের সোনালী যুগে খলীফাদের কারো ব্যক্তিগত নীতি সাধারণভাবে প্রবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ছিলো। পরবর্তী যুগে এ ধারা ছিন্ন হয়ে যায় এবং এমন সব আইন ও সিদ্ধান্ত চালু করা হয়, যেগুলোকে আজকের দিনে নানা কারণে অযথা সুন্নাতের মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা-তদবীর চলছে। আবার বলা হচ্ছে, এটা 'প্রথম সুন্নাত' না হলেই বা কি 'দ্বিতীয় সুন্নাত' তো অবশ্যই। অথচ যে হাদীসে একথা আছে ঃ

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين-

"তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে রাখবে।"

সে হাদীসের একটু আগে আছে ঃ

واياكم ومحدثات الامور-

"সাবধান ! শরীয়াতের মৌলনীতি বহির্ভূত নতুন নিয়মরীতিসমূহ থেকে দূরে থাকবে।"

যার পরিষ্কার অর্থ হলো—যে ফায়সালা নবীর সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের খেলাফ হবে তা মুহদাছাত বা বিদআত কাজের আওতায় পড়বে। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার জন্যে যেভাবে তাকিদ এসেছে বিদআত থেকে দূরে থাকারও অনুরূপ তাকিদ এসেছে।

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেবের উপরোক্ত প্রসঙ্গ উল্লেখ করার পর 'আল বালাগ' সম্পাদক ইমাম শাতবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির

www.pathagar.com

'আল-ই-তেসাম' গ্রন্থের একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত বাক্যের দ্বারা জনাব তাকী উসমানী এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যে কাজের দ্বারা দীনের বিকৃতিসাধন করা হয়, সে কাজের ব্যাপারে বিদআত শব্দটি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অথচ ইমাম শাতবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বিদআতের যে মূল সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, এবং এর যে পরিচয় ব্যক্ত করেছেন তাতে এমন প্রত্যেক অভিমতকেই তিনি বিদআত বলে গণ্য করেছেন, যা শরীয়াতের মৌলনীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অবশ্য এর সাথে যদি অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণও এসে যুক্ত হয় তাহলে সে বিদআত নিছক বিদআত নয়, ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় বিদআত রূপেই বিবেচিত হবে। জনাব উসমানী সাহেব কর্তৃক হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালাকে 'দ্বিতীয় সুন্নাত' রূপে গণ্য করার বিষয়টি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি বলেছিলাম এ ধরনের কথাবার্তা আজকাল (হাদীস অস্বীকারকারী) পারভেজ ও তার অনুসারীরা বলে থাকেন যে, মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় নেতা অথবা জাতির কেন্দ্র থেকে যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়, তাই সুন্নাত। এর জবাবে মাওলানা মুহাম্মদ তাকী সাহেবের ভাষ্য হলো, কথাতো এটাই বলা হচ্ছে যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদ করার অধিকার আছে। আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পর তাঁর এ অধিকার রহিত হয়ে যায়নি। এ বক্তব্যের জবাব আমি উপরে প্রদান করেছি। নিছক ইজতিহাদের অধিকার নিয়ে এখানে কোনো প্রশ্ন হচ্ছে না, প্রশ্ন হচ্ছে, সেই ইজতিহাদ নিয়ে শরীয়াতের মৌল ভিত্তির উপর যেই ইজতিহাদ প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন ইজতিহাদকে আইন রূপে মুসলিম জাতির ওপর চালু করা যায় কিনা। যদি না করা যায় এবং পারভেজ মহোদয়ের জাতির কেন্দ্রের উল্লেখ যদি জটিলতার কারণ হয়ে থাকে, তাহলে একই অবস্থাতো তাকী সাহেবের প্রমাণের ক্ষেত্রেও। এখানে আমি মাহমুদ আহমদ আব্বাসীর উদাহরণ পেশ করেছি। আব্বাসী সাহেবও বলে বেড়ায়, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত-এর এ বিধানটি দীর্ঘদিন থেকে যখন বনি উমাইয়ার খলীফাগণ সারা দেশে শাসনতান্ত্রিক বিধানরূপে জারী রাখেন, তখন এটা সন্দেহাতীত সুন্নাত। এটি সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে কে অস্বীকার করতে পারবে ? মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব কি মাহমুদ আহমদ আব্বাসীর এ দলীলের সাথে একমত পোষণ করবেন ?

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ফায়সালাকেমুহদাছাহ বা বিদআত আখ্যায়িতকরণ

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজকে কেউ বিদআত বলেছে এমন কোনো দৃষ্টান্ত পেশ করার জন্যে জনাব তকী ওসমানী সাহেব আমার

www.pathagar.com

কাছে দাবী করেছেন। 'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেব লিখেছেন এ কাজকে বিদআত গণ্য করেছেন এমন একজন ফকীহও গত চৌদ্দশ বছরে আমাদের নজরে পড়েনি। অতীত ও বর্তমান সময়ের বিশেষজ্ঞ আলেমদের এমন কতিপয় ব্যক্তির মন্তব্য আমি আগামী আলোচনায় উপস্থাপন করবো। যারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিভিন্ন কাজকে বিদআত নামে আখ্যায়িত করেছেন। আমি এখানে প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আবু বকর আল জাস্সাস প্রণীত আহকামুল কুরআন থেকে ভূমিকা স্বরূপ একটি বিস্তারিত উক্তির বরাত দিচ্ছি। এ উক্তিতে হযরত মাসরূক তাবেঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসৃত উত্তরাধিকার নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং কাযী শোরাহ ও খোদ আবু বকর জাস্সাসও এ সমালোচনার সমর্থন করেন। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় আমি আরবী বাক্যের শুধু তরজমা এখানে পেশ করছি। এ আলোচনাটি من يحرم الميراث مع وجوب النسب" -এ অধ্যায় থেকে সংগৃহীত।

"ইবনে শিহাব যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাই দাউদ থেকে আর তিনি মাসরূক থেকে রাওয়ায়েত করেছেন। মাসরূক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ইসলামে এরূপ আশ্চর্য ও অদ্ভূত ফায়সালা আর দেয়া হয়নি যা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দিয়েছেন। (ما احدث فى الاسلام قضية قضاها معاوية)। "তিনি মুসলমানকে ইহুদী-নাসারাদের সম্পদে ওয়ারিশ গণ্য করতেন এবং তাদেরকে মুসলমানের সম্পদে ওয়ারিশ মনে করতেন না। সিরিয়াবাসীগণ এ নীতি অনুযায়ী উত্তরাধিকার মামলা ফায়সালা করতেন। ওমর বিন আবদুল আযীয খলীফা হয়ে প্রথম পদ্ধতি[১] পুনরায় প্রবর্তন করেন। শাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ বানানোর জন্যে যিয়াদের কাছে ফরমান পাঠান। যিয়াদ কাযী শুরায়েহকে ডেকে এ নির্দেশ মুতাবিক কাজ করার আদেশ দেন। শুরায়েহ এর আগে মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ গণ্য করে কোনো মাসআলার রায় দেননি। যিয়াদের আদেশ মতে শুরায়েহ বিচারকার্য চালান। তবে এ ধরনের রায় প্রদানের সময় তিনি বলতেন, এটা আমীরুল মু'মিনীনের ফায়সালা।

অথচ যুহরী আলী বিন হুসাইন থেকে, তিনি ওমর বিন ওসমান থেকে এবং আবু ওসমান হযরত ওসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দু'টি ভিন্ন

---

১. لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "মুসলমান যেমন কোনো কাফেরের ওয়ারিশ নয় তেমনি কোনো কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিশ নয়।"

www.pathagar.com

জাতি পরস্পরের ওয়ারিশ হতে পারে না। অন্য রাওয়ায়েত আছে, 'মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না এবং কাফেরও মুসলমানদের ওয়ারিশ নয়। আমর বিন শোয়াইব স্বীয় পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দু'টি সম্প্রদায় পারস্পরিক উত্তরাধিকারী হতে পারে না।' এসব রাওয়ায়েত কাফের মুসলমানের অথবা মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়ার অন্তরায়। এর বিপরীতে রাসূলের আর কোনো হাদীসও নেই। এভাবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্র ছিন্ন করার নির্দেশটি প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী নির্দেশে পরিণত হয়। হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসৃত নীতির সহায়ক নয়। তিনি তো الايمان يزيد ولاينقص এ হাদীসের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র। ব্যাখ্যা দলীল এবং অহীর নির্দেশ স্থগিত করতে পারে না। ব্যাখ্যা প্রমাণভিত্তিক কাজের জন্য প্রয়োগ হয়ে থাকে, দলীলের বিপরীতে নয়, বরং সহায়তার জন্যে প্রযোজ্য হয়। ঈমান বাড়ে এবং কমে না। এ হাদীসটির তাৎপর্য হলো, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে আর যে বের হয়ে যাবে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

যদি হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যা এবং এ অনুমানকে সামনে রাখা হয়, তাহলে হযরত ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত কাফের ও মুসলমান কর্তৃক পরস্পরের উত্তরাধিকারী না হওয়ার হাদীসটির সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, ব্যাখ্যা ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে দলীল (নস) রদ করা জায়েয নয়। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনো দলীল প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। কেননা ব্যাখ্যা ও অনুমান হচ্ছে একটি সন্দেহজনক বিষয় এবং আইন রূপে প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বস্তুটি নিজেই দলীলের মুখাপেক্ষী। সুতরাং এ দ্বারা দলীল ও প্রমাণ দাঁড় করানোর প্রয়াস পরিত্যক্ত হয়ে গেলো।

'মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়ার' প্রশ্নে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে অধিক অদ্ভূত নীতি প্রদানের দৃষ্টান্ত ইসলামে আর নেই।' মাসরূকের এ মন্তব্যটি এ ধরনের ফায়সালা বাতিল হওয়ার প্রমাণ। কারণ, তিনি বলেছেন, 'এ ফায়সালা ইসলামে একটি নতুন বিষয়ের সংযোজন আর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক এ নীতি গ্রহণ করার আগে মুসলমান কাফেরের (সম্পদে) ওয়ারিশ হতো না মন্তব্যে একথা অপরিহার্যরূপে বুঝা যায়। সুতরাং তাঁর জন্যে মহান পূর্বসূরীদের ব্যতিক্রম করাটা বৈধ হয়নি। বরং আগের লোকদের মুকাবিলায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথাটি

www.pathagar.com

অকেজো। ওমর বিন আবদুল আযীয প্রথম নীতি[১] জনগণের মাঝে পুনর্বহাল করে দেন—দাউদ বিন আবু হিন্দের একথা উপরোক্ত অভিমতেরই সহায়ক। (احكام القران ابو بكر احمد بن على الجصاص جلد ٢- المطبعة البهيه (١٣٤٨)

সম্ভবত 'আল বালাগ' সম্পাদক আবার একথা বলে জিদ ধরে বসবেন যে, এখানে 'বিদআত' শব্দটির প্রয়োগ তো কোথাও হয়নি। নবী আলাইহিস সালামের নিম্ন বর্ণিত হাদীসটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ঃ

كل محدثة بدعة

(শরীয়াতে) প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত।

شر الامور محدثاتها

"শরীয়াতের মৌল বিষয়ের সাথে শরীয়াত রূপে নতুন বিষয়ের সংযোজন বা উদ্ভাবনই খারাপ কাজ।"

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من احدث فى امرنا ما ليس منه فهو رد

"যে ব্যক্তি দীনের বহির্ভূত কোনো নতুন কথা এর সাথে নতুন করে উদ্ভাবন বা সংযোজন করে, তা প্রত্যাখ্যাত।"

ইবনে কুদামার উক্তি

পরিশেষে আমার আরো একটি ভুল ও ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছে। সেটা হলো—আমি 'আল মুগনীর' ৭ম খণ্ডের ১৬৬ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে লিখেছিলাম। বলা হয়ে থাকে ইবনে কুদামা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম বর্ণনায় মুহাম্মদ বিন হানাফীয়া, আলী বিন হুসাইন, সায়ীদ বিন মুসাইয়্যোব, মাসরূক, আবদুল্লাহ বিন মা'কাল, শা'বী, ইয়াহইয়া বিন ইয়াসর, ইবরাহীম নাখয়ী, ইসহাক প্রমুখ "মুসলমানকে কাফেরদের ওয়ারিশ গণ্য করা"র কথা বলেছেন, অথচ ইবনে কুদামা পরক্ষণে বলেছেন, "উপরোক্ত মনীষীদের বলে বর্ণিত এ ব্যাপারে যে কথাটি বলা হয়, এ তথ্যটি নির্ভরযোগ্য নয়।"

---

১. অর্থাৎ لايتوارث اهل الملتين شتى পরস্পর বিরোধী দুই সম্প্রদায় একে অপরের সম্পদে উত্তরাধিকারী হতে পারে না।

www.pathagar.com

মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব বলেন, "এর আগে ইবনে কুদামা এটাও লিখেছেন যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক একথাও বর্ণিত আছে যে, তাঁরা মুসলমানকে কাফেরের সম্পদে ওয়ারিশ বানিয়েছেন বলে বর্ণিত আছে।[১] এখন যদি অন্যান্য ভদ্র মহোদয়দের পক্ষ থেকে একথার সম্বোধন সন্দেহজনক হয়, তাহলে এ তিনজন সম্মানিত সাহাবী (হযরত ওমর, হযরত মুয়াজ এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়ল্লাহু আনহুম সম্পর্কেও অনির্ভরযোগ্য হওয়ার সন্দেহ করতে হয়। কারণ, ইবনে কুদামাহ সকলের সম্পর্কেই লিখেছেন ليس بموثوق به عنهم (তাদের বলে বর্ণিত এ তথ্যটি নির্ভরযোগ্য নয়।) ওসমানী সাহেবের মতে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেব আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর বিদআতী কাজের যে দোষ চাপিয়েছেন তার ছাফাইয়ের জন্যে আমার এ ভ্রমের অবতারণা।

এর জবাব হলো—মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এখানে বিদআত শব্দটি সুন্নাত বহির্ভূত ও আইনানুগ না হওয়ার অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ অর্থে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাজটি বিদআত হওয়া না হওয়া অথবা সম্বোধন করা নির্ভরযোগ্য হওয়া না হওয়া কেবলমাত্র আল মুগনীর বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। যদ্দরুন বিদআত শব্দ ব্যবহারের প্রশ্নে এটাকে ভুল মনে করা জরুরী বলে অনুভূত হবে। প্রকৃত তত্ত্ব হলো—ইবনে কুদামাহ প্রথমে رُوِىَ শব্দ দ্বারা একটি আলাদা বাক্য শুরু করেছেন। তারপর حُكِىَ দ্বারা দ্বিতীয় বাক্য আরম্ভ করেছেন। এর সাথেই লিখেছেন। وليس بموثوق به عنهم "তাদের বলে বর্ণিত এ তথ্যটি নির্ভরযোগ্য নয়।"[২] এখানে (আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী وليس -এর সংযোগ হয়েছে। حكى ক্রিয়াপদের সাথে। কারণ, এটিই নিকটতম বাক্য। এমনিভাবে عنهم -এর مرجع এবং متعلق به ও উক্ত নিকটতম বাক্যই। আর وليس بموثوق به عنهم (তাদের বলে বর্ণিত তথ্যটি নির্ভরযোগ্য নয়।) বাক্যটি অন্য বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত। তথাপি আমি আমার কথার ওপর জেদ ধরতে চাই না। এ বাক্যের সম্পর্ক প্রথম দু'টি বাক্যের সাথেও হতে পারে এবং ইবনে কুদামার উদ্দেশ্য এটাই যে, এ নীতির প্রতি[৩] যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তাদের সকলের প্রতি এ মত পোষণ

১. অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন হানাফীয়া, আলী ইবনে হুসাইন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মাসরুক, আবদুল্লাহ বিন মা'কাল, শাবী, ইবরাহীম নাখঈ, ইয়াহইয়া বিন ইয়ামার এবং ইসহাক সম্পর্কে যে কথাটি বলা হয় যে, তাঁরা মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ গণ্য করেছেন—এ তথ্যটি নির্ভরযোগ্য নয়।

২. বাক্য দু'টিকে প্রকাশিত কিতাবে আরবী পূর্ণ বিরতি চিহ্ন ە -এর মাধ্যমে একটি থেকে অপরটিকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

৩. মুসলমানকে কাফেরের সম্পদে ওয়ারিশ বানানো।

www.pathagar.com

সংক্রান্ত বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। এ অর্থে যদি কথাটি বাস্তবে সহীহ হতো, তাহলে আমার জন্যে এর চেয়ে খুশীর ব্যাপার আর কিছুই হতো না। কিন্তু আফসোস, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে এ উক্তিটি হাদীস, আছার (آثار), ইতিহাস ও ফিকাহের কিতাবে এতো বেশী পরিমাণে উল্লেখ আছে যে, শুধুমাত্র ইবনে কুদামার একটি দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের ওপর নির্ভর করে সেসব কিতাবের বর্ণিত উক্তিগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়। হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আমি আবারও বলবো, এ দৃষ্টিভংগী তাঁর ব্যক্তিগত হয়ে থাকবে এবং সম্ভবত তিনি কোনো ক্ষেত্রে এ নীতির অনুসরণ করে থাকবেন। কিন্তু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীরুল মু'মিনীন হয়ে যেভাবে এ নীতিটির প্রয়োগ করেছেন এবং বনী উমাইয়ার যুগে যেভাবে নীতিটির প্রচলন ঘটে তাতে ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় এবং এটি অভিযোগ উত্থাপনের ছিদ্র পথও তৈরী করে দেয়। 'আল বালাগ' সম্পাদক একথাও বলেছেন যে, ইবনে কুদামা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম আহমদের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে—এ ব্যাপারে[১] জনগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তাতে একথা প্রচ্ছন্ন হয় যে, ওয়ারিশী সূত্রের মন্তব্যের সম্বোধন কারও দিকেই করা ঠিক নয়।" তবে একথার দ্বারা আল বালাগ সম্পাদক নিজেই ভুল ধারণা করে বসলেন। আল মুগনীর রচয়িতা কর্তৃক ইমাম আহমদের মন্তব্য উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ বানানোর দৃষ্টিভংগী ও কার্যকারিতা বর্তমানে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য। কোনো আলেম ও ফকীহ সে কথার সমর্থক ও অনুসারী আজ আর নেই। এ কারণেই ইবনে কুদামা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার এ আলোচনার শিরোনাম দিয়েছেন ঃ

ولا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلما

"কাফের মুসলমানের এবং মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হয় না।"

কতিপয় অতিরিক্ত মন্তব্য

'মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে'—এ ফরমান ও নীতি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রবর্তিত হয় একথা সকলেই স্বীকার করেন। যেমন, ইমাম ইবনে হাযম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল মুহাল্লার ৯ম খণ্ডে ৩০৪ পৃষ্ঠায় ১৭৪৪নং মাসআলার অধীনস্থ প্রথম শিরোনাম দিয়েছেন ঃ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد। তারপর মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য মনীষীবৃন্দের প্রতি এ নীতির সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তাদের মতে মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে। এরপরই তিনি বিশেষ করে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

১. মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ না বানানোতে।

www.pathagar.com

هو عن معاوية ثابت

"এ নীতি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বলে প্রমাণিত।"

ইবনে হাযম রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ফিকহী রায় সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু হাদীস ও আছার (প্রাচীন নিদর্শন)-এ গবেষণা স্বীকৃত ও গ্রহণীয়। هو ثابت عن معاوية দ্বিতীয়বার বিশেষ করে তাঁর এ বাক্য উচ্চারণ একথারই প্রমাণ যে, ফায়সালাটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সম্বোধন করা নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত। জাস্‌সাসের আহকামুল কুরআনে ইতিপূর্বে বর্ণিত দাউদ ইবনে আবু হিন্দ এবং মাসরূকের মন্তব্য ইবনে হাযমও বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি ইবনে কুদামা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির গৃহীত ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতটিও উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে ইবনে হাযম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত যাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হুজুরের একটি অতিরিক্ত হাদীসেরও উল্লেখ করেন ঃ

لايرث المسلم النصراني

"মুসলমান কোনো নাসারার ওয়ারিশ হতে পারে না।"

আল জাস্‌সাস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইবনে হাযমের পর এবার আমি মোল্লা আলী কারী প্রণীত মিশকাতের শরাহ 'মিরকাত' এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

وعن اسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

ফরায়েজ অধ্যায়ে, বর্ণিত এ হাদীসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, যেসব মহোদয় মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়ার নীতিতে সমর্থক তারা الاسلام يعلو ولا يعلى (ইসলাম বিজয়ী, পরাজিত নয়।") নবীর এ বাণীটি দলীল হিসেবে পেশ করেন। তারপর তিনি লিখেছেন ঃ

وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيص والمراد من حديث الاسلام فضل الاسلام على غيره وليس فيه تعرض للميراث فلا يترك النص الصريح

অর্থাৎ "জমহুর আলেমদের নীতির সমর্থনে ঐ হাদীসটিই (মুসলমান ও কাফের পরস্পরের ওয়ারিশ না হওয়া) সঠিক দলীল। ইসলাম বিজয়ী বিজিত নয়—এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে অ-ইসলামের ওপর মর্যাদা দান করা। এ হাদীসের সাথে মিরাসের তথা উত্তরাধিকার নীতির কোনো সম্পর্ক নেই। স্পষ্ট দলীল ত্যাগ করা জায়েয নেই।"

www.pathagar.com

উপরোক্ত অর্থের ধারক ইবনে হাযমের উক্তি 'ফতহুল বারী' থেকে আমি প্রথমে বর্ণনা করেছি। তাতে মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ বানানোকে তিনি দলীলের বিপরীত বলে অভিহিত করেছেন। এবং এর সমর্থনে পেশকৃত রাওয়ায়েত সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

بل هو محمول انه يفضل غيره من الاديان ولا تعلق له بالارث

(হাদীসটির সাথে মিরাসের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম অন্যান্য দীনের ওপর মর্যাদাবান একথা বলাই হাদীসটির উদ্দেশ্য।)

একথা আমি আগেই বলেছি, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অথবা অন্য কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর ব্যক্তি সত্ত্বা নিয়ে এ হাদীসের আলোচ্য বিষয় নয় কিংবা মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়ার সমর্থক ও প্রবর্তক কোনো বুযূর্গ এবং তাঁদের সংখ্যা কত এ নিয়েও তাতে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। (নিছক ইসলামের বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলাই এ হাদীসের উদ্দেশ্য)। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারীর ভাষ্যের অনুরূপ আমার প্রশ্ন হলো—আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিটি সুস্পষ্ট দলিলের বিপরীত শরীয়াতের বলিষ্ঠ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এবং অসংগতিপূর্ণ কিনা। সুস্পষ্ট 'নস' বা দলীলের অর্থ হলো 'কুরআনের নস', হাদীস এবং সুন্নাতেরও নস। এরপরও যে কেউ যথেচ্ছভাবে এটাকে ইজতিহাদ অথবা অপর সুন্নাত বা 'দ্বিতীয় সুন্নাত' নাম দিয়ে এর সমর্থনে থাকতে চাইলে, তার জোর প্রচেষ্টায় রত থাকুন। যেমন আল বালাগের সম্পাদক সাহেব করছেন। দৃষ্টিভংগীর ব্যাপারে কোনো বলিষ্ঠ দলীল-প্রমাণ ছাড়া জোর-জবরদস্তী চলে না, এটা বলাই বাহুল্য।

মজার অভিযোগ

হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত সুনানে আবু দাউদের বাক্য الاسلام يزيد ولا ينقص। (ইসলাম বৃদ্ধি পায়,হ্রাস পায় না) এ হাদীসটি সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম, ওয়ারেশী তথা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের সাথে হাদীসটির আদৌ সম্পর্ক নেই। পরন্তু এর সনদে রয়েছে ইনকাতা[১] আর রাবী মজহুল বা অজ্ঞাত। সুতরাং এ আলোচ্য বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতের দলীলের মুকাবিলায় হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

এর জবাবে ওসমানী সাহেব এটাও লিখেছেন, প্রথমতো খোদ আবু দাউদেই হাদীসটি জ্ঞাত রাবীসহ মুত্তাসিল[২] হিসেবে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়ত এদিকে মালেক সাহেবের লক্ষ্য যায়নি যে, সনদ তথা প্রমাণসূত্র সম্পর্কে

www.pathagar.com

গবেষণা অনুসন্ধান করা আমাদের জন্যে দলীল হলেও যে সমস্ত সাহাবী সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো কথা শুনেছেন তাদের জন্যে পরবর্তী রাবীদের মধ্যে কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি ঝুঁকে পড়লে তাদের কথা হাদীস রদ করার যোগ্য দলীল কি করে হতে পারে ?' আশ্চর্যের বিষয়, মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব সামান্য চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ভুল ও কল্পনা প্রসূত এ দু'টি কথা কেমন করে লিখলেন ? সুনানে আবু দাউদের একটি হাদীস উল্লেখিত সনদসহ আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি। সনদটিতে হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগে رجال শব্দ দ্বারা রাবীর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন অজানা অচেনা লোক থেকে হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাওয়ায়েত বর্ণিত। এর একেবারে সাথেই উল্লেখিত অপর যে হাদীসটির বরাত ওসমানী সাহেব দিয়েছেন সে হাদীসের সনদে আবুল আসওয়াদ এবং হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাঝখানের رجل (এক ব্যক্তি) শব্দটির উল্লেখ রহিত হয়ে গেছে। আর উভয়ের মধ্যখানে অন্য কোনো রাবীর নামও উল্লেখ করা হয়নি। এভাবে মুনকাতায়া সনদ[১] মুত্তাসিল হয় না। বরং মুনকাতা' হাদীস মুনকাতাই থেকে যায়। কোনো জ্ঞানবান লোক এ ধরনের সনদকে মুত্তাসিল বলতে পারে না।

দ্বিতীয় যেই কথাটি বলা হয়েছে যে, সাহাবাগণ যে বাণী রাসূল থেকে সরাসরি শ্রবণ করেছেন তা পরবর্তী সময়ে রাবীদের অজ্ঞতার কারণে কেমন করে রদ করা যায়—ওসমানী সাহেবের কথিত একথাটিও নজিরবিহনী ! প্রশ্ন হলো এখানে হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু অথবা অন্য কোনো সাহাবীর তশরীফ এনে রাসূল থেকে সরাসরি শ্রুতবাণী রদ করছেন কি ? এখানকার সমস্ত আলোচনা তো একথাকে কেন্দ্র করে যে, মুহাদ্দিস ও হাদীসের রাবীগণ কর্তৃক হুজুরের যে বাণী আমাদের কাছে পৌঁছেছে তার সনদ মুত্তাসিল কি মুনকাতায়া তা জানা অথবা এ ধরনের রাওয়ায়েত অন্যান্য মারফু, মুত্তাসিল[২] ও নিশ্চিত প্রমাণিত হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য নয় তা নির্ণয় করা।

---

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিয়ত প্রসংগ[১]

দিয়ত (রক্ত মূল্য) সম্পর্কে খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থে যাকিছু লেখা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

"হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন, দিয়তের ক্ষেত্রেও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সুন্নাতকে বদলিয়ে দেন।[২] চুক্তিবদ্ধ অমুসলমানের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের সমান হওয়াই সুন্নাত ছিলো। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তা অর্ধেকে হ্রাস করে দেন আর বাকী অর্ধেক নিজে গ্রহণ করা শুরু করেন।"

'আল বালাগ' সম্পাদক উল্লেখিত বক্তব্য সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন নিম্নবর্ণিত ভাষায় ঃ

প্রথমতঃ রেখা চিহ্নিত বাক্য হাফেজ ইবনে কাসীর বা ইমাম যুহরী কারো নয় ঃ বরং মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির নিজের। বাক্যগুলো আমি এ কারণে রেখা চিহ্নিত করেছি যে, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির লেখায় পরিষ্কার বুঝা যায় এ বাক্য হাফেজ ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির। 'বেদায়া ও নেহায়ার' মূল বাক্য এরূপ ঃ

وبه قال الزهرى ومضت السنة ان دية المعاهد كدية المسلم وكان معاوية اول من قصرها الى النصف واخذ النصف لنفسه ـ

উল্লেখিত সনদেই ইমাম যুহরীর বক্তব্য আমাদের কাছে পৌঁছে যে, "সুন্নাত হিসাবে এটাই প্রচলিত ছিলো যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলমানের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের সমান। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুই প্রথম ব্যক্তি যিনি তা হ্রাস করে অর্ধেক করেন আর বাকী অর্ধেক নিজে গ্রহণ করা শুরু করেন।"

وبه قال -এর বোধগম্যতা এখানে কি, আর মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এটি হচ্ছে, হাফেজ ইবনে কাসীরের (র)

১. রক্ত মূল্য হত্যা, রক্তপাতের ক্ষতিপূরণকে দিয়ত বলা হয়।

২. তাকী ওসমানী সাহেবের লিখিত 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু' বইয়ের অনুবাদক এখানে আমানত রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। بدل دیا শব্দ দ্বয়ের অনুবাদে তিনি লিখেছেন 'হস্তক্ষেপ করেছেন।'—অনুবাদক

www.pathagar.com

নিজস্ব কথা কিংবা তিনি এটি ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন। (জনাব তাকী সাহেবের) এসব কথার সাথে আলোচ্য বিষয় (তথা দিয়ত প্রসঙ্গ) এর সম্পর্ক কোথায় ? ইবনে যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাফেজ ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে যে অধিক যোগ্যতর এবং অগ্রবর্তী ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতএব যদি বক্তব্যটি ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হয় তাহলে তো সেটা আরো বেশী মজবুত ও জোরদার হবে। যা হোক, এসব কথায় মূল বিষয়ের ওপর কোনো প্রভাব পড়ছে না। ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিংবা ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যিনিই বলুন কথা এটাই যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলমানের দিয়ত মুসলমানের দিয়ত বরাবর হবে। এ সুন্নাত বা নিয়মই প্রচলিত ছিলো। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তা অর্ধেক করে বাকী অর্ধেক নিজে গ্রহণ করা শুরু করেন। ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহিও একথার অবশ্যই বর্ণনাকারী ছিলেন। সুতরাং যদি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখে থাকেন যে, "হাফেজ ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, তাহলে সেটা ভুল নয়।"

নিজের জন্যে, না বায়তুলমালের জন্যে

মুসলমানকে কাফেরের উত্তরাধিকারী বানানো সংক্রান্ত ইতিপূর্বেকার অধ্যায়ের মতোই আল বালাগ সম্পাদক তাকী ওসমানী সাহেব এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়েও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসৃত নীতিকে সমর্থন করে এটা বিশ্বাস করাতে চান যে—আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক দিয়ত ভাগ করে অর্ধেক নিজের জন্যে রাখার নীতিটি চালু করে প্রচলিত সুন্নাতে কোনো পরিবর্তন সাধন করেননি। বরং তার মতে এটাও সুন্নাতেরই একটা ধরন।

তিনি তার সমর্থনে বাইহাকীতে বর্ণিত اخذ النصف لنفسه "নিজের জন্যে অর্ধেক গ্রহণ করতেন।" এ তথ্যের বিপরীত পেশকৃত ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বাক্যটি দলীলরূপে উপস্থাপন করেন। বাক্যটি হলো ঃ

القى النصف فى بيت المال

"অর্ধেক বাইতুলমালের জন্যে গ্রহণ করেন।"

অতএব বুঝা গেলো, لنفسه -এর অর্থ, বাইতুলমালের জন্যে দিয়ত গ্রহণ করা, নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে নয়। ওসমানী সাহেব অথবা অন্য কয়েকজন মহোদয় ব্যাপারটিকে যতো সহজ ও সরল মনে করেছেন ব্যাপারটির

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ততো সহজ নয়। ইহিতাসবিদগণ অন্যান্য জায়গায়ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং বনী ওমাইয়ার অন্যান্য শাসকদের আরোপিত গনীমাত ও শুল্কসমূহের জন্যে দু' ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। একই ঘটনায় কোথাও لنفسه "নিজের জন্যে কোথাও" لبيت المال "বাইতুলমালের জন্য" শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। নবীর শাসনামলে এবং খেলাফতে রাশেদার যুগে ইসলামী রাষ্ট্রে বাইতুলমালের যে অবস্থান ছিলো যদি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তৎপরবর্তী যুগের অবস্থা বাস্তবে সেরূপ হতো তাহলে لنفسه "নিজের জন্য" শব্দ দ্বারা لبيت مال المسلمين (মুসলমানের বাইতুলমাল) একথাই প্রতীয়মান হতো। কিন্তু বাইতুলমাল যদি ব্যক্তি স্বার্থ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অভিপ্রায় বিনা দ্বিধায় অবাধে ব্যবহৃত হতে থাকে, অনুগতদের বিশেষ ব্যয় এবং জাতির বাইতুলমালের মধ্যে কার্যতঃ কোনো স্বাতন্ত্র বজায় না থাকে, বাইতুলমালের আয়-ব্যয় এবং হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে যদি রাষ্ট্র প্রধান ও তার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলকে মুসলমানদের সামনে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা না রাখা হয় বা এর প্রয়োজনই অনুভব করা না হয়, তাহলেই তো অবস্থা বিপরীত রূপ ধারণ করে। এমতাবস্থায় اخذ لبيت المال "বাইতুলমালের জন্যে গ্রহণ করেন" কথাটির অর্থ اخذ لنفسه। "নিজের জন্য গ্রহণ করেন। অর্থেই পরিণত হয়ে যায়। নবী আলাইহিস সালামের পবিত্র ব্যক্তি সত্ত্বা তো لا اسئلكم عليه اجرا[১] তোমাদের নিকট আমি কোনো পারিশ্রমিক বা বিনিময় চাই না।" এবং ولا نورث ২ "আমার কোনো বৈষয়িক উত্তরাধিকার নেই" এর মর্যাদার মূর্তপ্রতীক ছিলো। ইতিহাস সাক্ষ্য রাসূলের নিবেদিত প্রাণ খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর সকলেই বাইতুলমাল থেকে এক কপর্দকও গ্রহণ করেননি। অপরাপর খলীফাগণ নির্ধারিত যৎসামান্য ভাতা দিয়ে কোনোক্রমে জীবনযাপন করতেন। ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য বাইতুলমাল থেকে কানাকড়িও গ্রহণ করেননি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সময় তাঁর সম্পদ ছিলো ৭ শত দিরহাম। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তো নিজ জীবদ্দশায় গৃহীত ভাতাসমূহ বাইতুলমালে ফেরত দেয়ার জন্য মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে যান। অধিকন্তু তাঁদের শাসনামলে বাইতুলমালের আয় ব্যয়ের কড়া হিসাব নেয়ার অধিকার প্রতিটি মুসলমানের ছিলো। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে যতোটুকু জানা যায়, এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সকলের থেকে ব্যতিক্রম।

---

১. তিনি কাজের কোনো মজুরী চাইতেন না।

২. তার কোনো মিরাস নেই।

www.pathagar.com

একথা অস্বীকার করার কি উপায় আছে যে, রাষ্ট্রপ্রধান হবার আগেই আমীরে মুয়াবিয়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে সিরিয়া প্রদেশের বাইতুলমালের উপর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন ? অথচ সিরিয়াস্থ ঐ বাইতুলমালটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিনস্থ বাইতুলমালেরই একটি শাখা ছিলো। তারপর একথা কি কেউ বলতে পারবে যে, তাঁর শাসনামলে খলীফার জন্যে বেতন নির্ধারণ করা হয় এবং বাইতুলমালের ব্যয় খাত খলীফাদের ব্যক্তিগত ব্যয় খাত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়েছিলো ? তাদের শাসনামলে তাদের কাছে কোনো মুসলমান বাইতুলমালের হিসাব চাইতে পারতো কি ? এরপরও যেসব ভদ্রলোক لنفسه "নিজের জন্যে" শব্দটিকে لبيت المال "বাইতুলমালের জন্যে" শব্দের ছত্রছায়ায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন তাদের যুক্তি ধোপে টিকে না।

অভিযোগের মূল প্রকৃতি

'আল বালাগ' সম্পাদকের দলীলের দ্বিতীয় দিক হলো—চুক্তিবদ্ধ অমুসলমানের দিয়ত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। সুতরাং সাহাবাদের যুগ থেকেই মুসলমান ও জিম্মীর দিয়ত কম বা সমান হওয়ার বিষয়টি বিতর্কিত বিষয় হিসাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে জিম্মীর ওয়ারিশদেরকে অর্ধেক দিয়ত দিয়ে এবং বাইতুলমালে অর্ধেক জমা করে অর্থগত দিক থেকে পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলো এবং آثار 'আছারের')[১] মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদান করেছেন।

আমি যতটুকু গবেষণা করেছি তাতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই ইজতিহাদ খোদ কুরআন-হাদীসের খেলাফ আর এ ইজতিহাদের যে সমস্ত হাদীসে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে সেগুলোতে সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা তার প্রতি সমর্থনদানের অবকাশও তাতে নেই। সর্বপ্রথম কুরআনের দিকে দৃষ্টি ফিরালে দেখা যায় সূরা আন নেসার ৯২নং আয়াতে রয়েছে যে, চুক্তিবদ্ধ কাফের ও মু'মিনের ভ্রমাত্মক হত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত (রক্ত মূল্য) সম্পর্কে دية مسلمة [২] শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের শব্দাবলী এবং দিয়ত সম্পর্কিত রেওয়াতসমূহ (যেমন- دية ذمى دية مسلم تتكافاء دماؤهم وغيره) কাফের ও মু'মিন উভয়ের ক্ষেত্রে দিয়তের পরিমাণের প্রশ্নে সাহাবা, তাবেঈ এবং মুজতাহিদ ফকীহদের এ মতকেই সমর্থন করে যে, উভয়ের দিয়ত সমান হবে।

১. সাহাবা কেরামের কথা ও কাজকে آثار আসার বলা হয়।

২. অর্পিত রক্ত মূল্য (যা নিহত ব্যক্তির পরিবার উত্তরাধিকারীদের কাছে অর্পণ করা হয়)।

www.pathagar.com

ইমাম সুরুখসীর মতে এসব রেওয়ায়েতের খেলাফ আছার[১] বিশুদ্ধতার পর্যায়ে পড়ে না।

তদুপরি একথা অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, উপরোক্ত নীতির বিপরীত আছার ও রেওয়ায়েত আছে। এজন্যে কিছুসংখ্যক ফকীহ্ চুক্তিবদ্ধ কাফেরের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ দিয়ত নির্ধারণ করেন। আর ঐ সকল মাযহাবে আমল হতে থাকে। তবে কুরআন মজীদে মুসলমান ও চুক্তিবদ্ধ অমুসলমান উভয়ের দিয়ত সম্পর্কে مسلّمة الى اهله বাক্য উল্লেখিত হয়েছে। এর অর্থ হলো দিয়ত মুসলমান কিংবা কাফের যারই হোক তার সবটুকুই নিহতের ওয়ারিশের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নির্ধারিত দিয়তের কিয়দংশ নিহতদের ওয়ারিশের পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রদান করে কুরআনের এ আয়াতের অপর কোনো ব্যাখ্যা করার অবকাশ এখানে আদৌ নেই। مسلمة الى اهله (তার পরিবারের কাছে সোপর্দ করতে হবে) আয়াতের তরজমা কি করে الى امير المؤمنين "(রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে)" অথবা الى بيت المال "(বাইতুলমালে)" হতে পারে ? সৎ উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো যুক্তি-ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে যদি অমুসলমানের দিয়ত বাইতুলমালে জমা করা জরুরী মনে করা হয় তাহলে, এক সময় কোনো অজুহাতে মুসলমানের দিয়তের কোনো অংশেও কেন ভাগ বসানো যাবে না বা তা বাইতুলমালে জমা দেয়া হবে না, যা সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইসলামী আইনবিদদের মতের বিরোধী।

রাওয়ায়েত ও আছারে দিয়তের বিকল্প ও পরিমাণ নির্ধারণে মতপার্থক্য আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু জিম্মী অথবা চুক্তিবদ্ধ অমুসলমানের দিয়ত চাই সেটা মুসলমানের দিয়তের সমপরিমাণ হোক কিংবা তার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ, সেখানকার অংশ বিশেষ বাইতুলমালেও জমা দেয়া যায়—এ

---

১. وما تقلوا فيه من الاثار بخلاف هذا لايكاد يصح- فقد روى عن معمر رضى الله عنه قال سألت لزهرى عن دية الذمى فقال قتل دية المسلم فقلت ان سعيدا يروى بخلاف ذلك قال ارجع الى قوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله-(المبسوط ج ٢٦ ص ٨٥)

'দিয়ত সমান হওয়ার বিপরীত রেওয়ায়েত সহীহ্ নয়। মুয়াম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে জিম্মীর দিয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি মুসলমানের দিয়তের সমান হওয়ার উত্তর দিলেন। আমি বললাম ঃ সা'দ তো এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। তাতে ইমাম যুহরী বললেন ঃ কুরআনের যে আয়াতে دية مسلّمة অর্থাৎ মুসলমান এবং জিম্মীদের দিয়ত সমান হওয়ার কথা আছে সে আয়াতের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত।'

www.pathagar.com

ব্যাপারে কোনো একটি সাধারণ রেওয়ায়েতও আমি কোথাও খুঁজে পাইনি। ইসলাম, মুসলমান এবং তাদের বাইতুলমালের হিতাকাংখী আল্লাহ এবং রাসূলের চেয়ে বেশী আর কেউ হতে পারে না। মুসলমান ও অমুসলমানের অধিকার ও কর্তব্যের যে চিত্র কুরআন ও হাদীসে নির্ণিত হয়েছে তাতে হ্রাস বৃদ্ধি করা জায়েয নেই। নবী আলাইহিস সালাম নিজে বলেছেন, যেসব ব্যক্তি জিম্মীদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে কিয়ামত দিবসে আমি নিজে তাদের পক্ষে বাদি হয়ে এ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থী হবো। انا خصمهم يوم القيامة। রাওয়ায়েতের বিভিন্নতার ভিত্তিতে কোনো কোনো মাযহাবের ইমাম জিম্মীদের দিয়ত মুসলমানদের দিয়তের মুকাবিলায় কম হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। তবে সকলের উদ্দেশ্য এটাই যে, দিয়ত যে পরিমাণই হোক তার পুরোটা নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশের কাছে এমনভাবে পৌঁছাতে হবে যেমন কুরআনের নির্দেশ রয়েছে। এমন যেন না হয় যে, মুসলমানের দিয়ত তার ওয়ারিশকে পুরোপুরিই দেয়া হলো কিন্তু কাফের বা অমুসলমানের দিয়তের অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশ বাইতুলমালে জমা রেখে দেয়া হলো। জিম্মীর দিয়তের পরিমাণ মুসলমানের দিয়তের সমান কিংবা অর্ধেক—এ নীতির অনুসরণ প্রকৃতপক্ষে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু করেননি। তিনি যে কাজটি করেছেন তাহলো—জিম্মীর দিয়ত মুসলমানের সমপরিমাণ বজায় রেখে অর্ধেক তাদের ওয়ারিশদেরকে দিয়ে বাকী অর্ধেক বাইতুলমালে জমা দিয়ে নেন। আর একাজটিই ছিলো বিদআত। কারণ তাঁর এ কাজের সমর্থনে কুরআন ও হাদীস থেকে নামেমাত্র দলীলও পেশ করা সম্ভব নয়। ইবনে কাসীরের মুকাবিলায় 'আল বালাগ' সুনানে বাইহাকী থেকে ইমাম যুহরীর অপর যে রাওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দিয়তের যে অংশ বাইতুলমালের জন্য নির্ধারণ করেন, ওমর বিন আবদুল আযীয তা রহিত করে দেন।

আমার মনে হয়, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়া সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়ে তো একজন সাহাবী এবং কতিপয় তাবেঈকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নীতির সঙ্গী সমর্থক হিসাবে দেখানো গেছে, যদিও সাথী হওয়ার কথাটি অনির্ভরযোগ্য—কিন্তু জিম্মীর দিয়ত নির্দিষ্ট হওয়ার পর তার কোনো অংশ বাইতুলমালে জমা দেয়া সংক্রান্ত অপর যে নীতিটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু উদ্ভাবন করেছেন তাতে সম্ভবত তিনি সম্পূর্ণ একা নিঃসঙ্গ অর্থাৎ অপর কেউ এ মত পোষণ করে না। আপ্রাণ চেষ্টা ও যথেষ্ট খোঁজাখুঁজির পরও আমি এমন কোনো রাওয়ায়েত আছার অথবা ফিকহী মত কোথাও পাইনি যাতে চুক্তিবদ্ধ লোকের দিয়তের কোনো অংশ বাইতুলমালে

www.pathagar.com

জমা দেয়ার কথা প্রমাণ করা যেতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে খেলাফতে রাশেদার শাসনামল পর্যন্ত দিয়তের কোনো অংশ বাইতুলমালে জমা দেয়ার কোনো উদাহরণ পাওয়া দুষ্কর। দিয়ত সমান কিংবা অর্ধেক হওয়া তথা এর পরিমাণ নির্ধারণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা আর দিয়তের কোনো অংশ বাইতুলমালে জমা করার বিষয়টি এক কথা নয়। দিয়তের অংশ বিশেষ বাইতুলমালে জমা করার কাজটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্য কেউ করে থাকলে সেই প্রমাণটি পেশ করা উচিত।

অদ্ভূত যুক্তি

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজটির যথার্থতা তাকী ওসমানী সাহেব নিজ ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেন, জিম্মী হত্যায় যেখানে তার আত্মীয়দের ক্ষতি হয় তেমনি মুসলমানদের বাইতুলমালেরও ক্ষতি হয়। ওসমানী সাহেব কথাটির আরো ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে, জিম্মী লোকটি নিহত হওয়ার দরুন জিযিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং দিয়তের অর্ধেক (পাঁচশ দিনার) ওয়ারিশদেরকে দাও আর ঐ পরিমাণ দিয়ত বাইতুলমালে জমা দিয়ে দাও যাতে ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়। এই অদ্ভূত যুক্তি দ্বারা যদি কেউ আশ্বস্ত হয় তাহলে আমি এটাকে 'আল বালাগ' সম্পাদক জনাব তাকী ওসমানীর কারামত হিসেবেই গণ্য করবো। তবে প্রশ্ন জাগে, জিম্মীর নিহত হওয়ায় যদি বাইতুলমালের ক্ষতি হয়, তাহলে মুসলমানের নিহত হওয়ায়ও ক্ষতি হবে না কেন ? কেননা সেও তো যাকাত, ওশর, সদকাহ বাইতুলমালে জমা করে থাকেন। তাহলে তার দিয়তের অর্ধাংশও বাইতুলমালে জমা না হওয়ার কি যুক্তিকতা থাকতে পারে ? শুধু নিহত হওয়ার কথাই বলবো কেন, কোনো জিম্মী কিংবা মুসলমানের স্বাভাবিক মৃত্যু হলে অথবা দুর্ঘটনায় মারা গেলেও তো বাইতুলমালের ক্ষতি হয়। তাই বলেকি মুসলমান অমুসলমান প্রত্যেক মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করার আগে সে সম্পত্তিতে বাইতুলমালের জন্যে একটি মৃত্যু শুল্ক (Deaht Duty) আরোপ করতে হবে ? পাশ্চাত্য দেশে তো এর সাধারণ প্রচলন আছে।

আশ্চর্য ! আল বালাগ সম্পাদক সাহেব তারপরও এমন সুন্দর দলীল এবং ইজতিহাদের প্রশংসা না করাকে মস্তবড় যুলুম বলেছেন। আমি কি সম্পাদক সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, ইজতিহাদ ও ফেক্হী গবেষণার ক্ষেত্রে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যদি এতই সুউচ্চ অবস্থান থাকতো এবং তিনি নিজেই যদি একটি নতুন 'সুন্নাত' জারী করার অনুমতিপ্রাপ্ত হতেন তাহলে

www.pathagar.com

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামগণ তাকে কেন খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত করলেন না ? একইভাবে প্রশ্ন জাগে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত থেকে সরে গিয়ে নিজের থেকে কোনো কাজ করে যদি সে কাজের জন্যে প্রশংসা লাভ করতেন, তাহলে আহলে সুন্নাতের আলেমগণ কি কারণে তাকে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ হিসেবে গণ্য করেননি ? এর নির্গলিত অর্থ তো দাঁড়ায় এই যে, আহলে সুন্নাতের আলেমগণ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব দেখিয়েছেন ! এবার আপনিই এ যুলুমের অবসান করুন এবং তাকে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিন।

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাথমিক কাজের ওপর বিদআত শব্দের প্রয়োগ

একথা প্রথমে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, 'বিদআত' শব্দটি কোনো গালি বা তিরস্কার নয় বরং মাসনুন' তথা সুন্নাত দ্বারা সমর্থিত কোনো কাজের বিপরীত শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় সুন্নী তালাক ও বিদয়ী তালাক।[১] বিষয়টি আমি বিশদভাবে বলতে চাই, কতিপয় ফকীহ ও ইমাম হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাথমিক দিকের এমন অনেক কাজকেও বিদআত ঘোষণা করেছেন, যেগুলোর সমর্থনে দলীল প্রমাণ রয়েছে, এমনকি কিছু সংখ্যক ফকীহ, মুহাদ্দিসও ঐসব ব্যাপারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থক ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ কসম এবং সাক্ষ্যের প্রসংগটি তুলে ধরা যায়। এ ব্যাপারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় হলো—মুদ্দায়ী (বাদী) যদি তার দাবীর সমর্থনে দু'টি সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে একটি সাক্ষী ও একটি কসম দ্বারা দাবী প্রমাণিত হবে। তাঁর এ ফায়সালার সমর্থনে রয়েছে কিছু হাদীস এবং কতিপয় ফকীহ। এ প্রসঙ্গে সদরে শরীয়াতের বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

ذكر في المبسوط ان القضاء بشاهد ويمين بدعة واول من قضى به معاوية

"মাবসূতে আছে, একটি সাক্ষী ও একটি কসমের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিদআত। সর্বপ্রথম এর প্রচলন করেন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।"-(التوضيح، والتلويح পৃঃ ৩১১, মুদ্রণ নূল কিশর ১২৯২ হিঃ)

১. সুন্নাত–অনুমোদিত তালাক আর সুন্নাত অননুমোদিত তালাক।

www.pathagar.com

মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদে কসম অধ্যায়ে আছে ঃ

ذكر ابن ابى ذئب عن ابن الشهاب الزهرى قال سألته عن اليمين مع الشاهد فقال بدعة واول من قضى به معاوية -

"ইবনে আবু যি'ব বর্ণনা করেন, তিনি ইমাম যুহরীকে একটি সাক্ষী ও একটি কসমের সাহায্যে ফায়সালাকৃত রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বললেন ঃ এটা বিদআত। আর এ বিদআতের প্রথম প্রবক্তা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।"

মাওলানা আবদুল হাই التعليق الممجد গ্রন্থে উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন ঃ

قال ابن شيبة حدثنا حماد بن خالد عن ابن ابى ذئب عن الزهرى قال هى بدعة واول من قضى بها معاوية -

وفى مصنف عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى قال هذا شئ احدثه الناس لابد من شاهدين -

"ইবনে আবু শাইবা হাম্মাদ বিন খালিদ থেকে, তিনি ইবনে আবু যি'ব থেকে আর আবু যি'ব যুহরী থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, এ ফায়সালা বিদআত। আর এটা প্রথম প্রবর্তন করেন আমীরে মুয়াবিয়া।

মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক-এ উল্লেখ আছে। তাঁর থেকে মুয়াম্মার আর তিনি যুহরী থেকে রাওয়ায়েত করেছেন। ইমাম যুহরী বলেছেন, এ ফায়সালা সম্পূর্ণ নতুন। মানুষ নিজেরা এটা উদ্ভাবন করেছে। দাবী প্রমাণের জন্যে দু'টি সাক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।"-[মুআত্তা, আল মজদের পরিশিষ্টসহ পৃঃ ৩৬১, ১৩৯৭ হিঃ]

শরহে বেকায়ার 'দাবী' অধ্যায়ে শপথ ও সাক্ষীর ফায়সালা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত উক্তি লক্ষণীয় ঃ

عندنا هذا بدعة واول من قضى معاوية -

"আমাদের মতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিদআত। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম এ বিদআতের প্রচলন করেন।"

-[শরহে বেকায়া পৃঃ ২৫ হিঃ ১৩২৬ প্রকাশিত]

www.pathagar.com

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহি সাহেবের লিখিত মুআত্তার ব্যাখ্যা المسوى والمصفى -এর একটি উদ্ধৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। মুআত্তায় যাকাত পরিচ্ছেদে ইমাম যুহরীরই একটি বর্ণনা এভাবে আছে ঃ

عن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من الا عطيه الزكاة معاوية ابن ابى سفيان-

"ইবনে শিহাব বলেছেন, সর্বপ্রথম আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সরকারী রাজকোষ থেকে যাকাত গ্রহণ করেন।"

একথার বিস্তারিত বর্ণনা হলো, আমীরে মুয়াবিয়া লোকদেরকে রাজকোষ থেকে দান করার সময় তখনই ঐ দানের অগ্রিম যাকাত আদায় করে নিতেন। এখানে একথারও ব্যাখ্যা থাকা দরকার যে, কোনো কোনো ফকীহের মতে অগ্রিম যাকাত আদায় করা জায়েয হলেও রাসূল ও খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে এমন পদ্ধতির সাথে জনগণ পরিচিত ছিলো না যে, প্রত্যেকের জন্যে রাজকোষ থেকে অর্থ নেয়ার সময়ই অগ্রিম যাকাত আদায় করাটা বাধ্যতামূলক। ইমাম যুহরী তো এখানে 'বিদআত' শব্দ প্রয়োগ করেননি ; কিন্তু শাহ ওয়ালীউল্লাহ এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

يعنى گرفتن زكوة ازساليانه وما هيانه دروقتيكه كسى راداده مشود بدعت است

অর্থাৎ "কাউকে বার্ষিক ও মাসিক ভাতা দেয়ার সময়ই সে অর্থ থেকে যাকাত রেখে দেয়াটা বিদআত।"–[আল মুসাফ্ফা পৃঃ ২০৬]

ইমাম যুহরীর বাক্য (اول من اخذ) "যিনি প্রথম তা গ্রহণ করেন" দ্বারা 'বিদআত' সাব্যস্ত হওয়া কি শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের উপরোক্ত কথায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না ? এমতাবস্থায় মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম যুহরীর اول من قصرها (যিনি প্রথম তা হ্রাস করেন) বাক্যটির যদি অর্থ করেন আমীরে মুয়াবিয়া সুন্নাতকে বদলিয়ে দেন এবং ওমর বিন আবদুল আযীয এসে সে বিদআতের অবসান ঘটান। তাহলে মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহি এমন কি অপরাধ করলেন যা ক্ষমার অযোগ্য ? অতীত ও বর্তমান যুগের যেসব আলেম আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাজকে বিদআত নামে অভিহিত করেছেন, তাকী ওসমানী সাহেবের তো কর্তব্য হচ্ছে তাদের পবিত্র আত্মা পর্যন্ত ফাতওয়া পৌঁছে দেয়া। সমস্ত শক্তি কেবল মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি এবং আমার বিরোধিতায় ব্যয় করা কি ন্যায়

www.pathagar.com

-সংগত ? তিনি ফাতওয়ার সিলসিলা এভাবে দীর্ঘায়িত করতে চাইলে আমরাও তজ্জন্য প্রস্তুত। তাকী ওসমানী সাহেবের এ বাস্তব সত্যকেও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, উপরোল্লেখিত বাক্যসমূহে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে সমস্ত ফায়সালাকে 'বিদআত' বলা হয়েছে, তার সমর্থনে শরয়ী দলীল রয়েছে।

একটি 'কসম' ও একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে কোনো কোনো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদীর স্বপক্ষে রায় দেয়ার কথা হাদীসে উল্লেখ আছে। যেমন, ইমাম মুহাম্মদ মুআত্তায় একথার বিবরণ দিয়েছেন। ইমাম শাফেঈ ও আহমদ রাহমাহুমুল্লাহ্ আলাইহি এমতই পোষণ করতেন। এভাবে অগ্রিম যাকাত আদায় করার সুযোগটিও শরয়ী গণ্ডির আওতায় নেয়া যায়। তবে প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত হাদীস এবং খেলাফতে রাশেদার শাসকবৃন্দের কার্যক্রমের বিরোধী হওয়ার কারণে হানাফী ওলামা এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ সাহেব আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালাকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন। হানাফী ইমামদের দলীল হলো— কুরআনের মতে সাক্ষ্যের নেসাব হলো দু'জন সাক্ষী আর হাদীসের দৃষ্টিতে দাবীদারের জিম্মায় সাক্ষ্য আর অস্বীকারকারীর জন্যে হলো কসম। কুরআন ও হাদীসের এ স্বীকৃত বিধান পরিত্যাগ করাই বিদআত।

সাম্প্রতিককালের কতিপয় ইতিহাস লেখকও আমীরে মুয়াবিয়ার কতিপয় কাজকে বিদআত আখ্যায়িত করে তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ মাওলানা মুঈনউদ্দীন নদভী সাহেবের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"জনাব হযরত আমীর (মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক খলীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবেলায় যুদ্ধ করা" যুদ্ধে জয় লাভ করার অভিপ্রায়ে বৈধ অবৈধ সব ধরনের পন্থা অবলম্বন করা পরবর্তী খলীফা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ইসলামী খেলাফতকে রাজতন্ত্রে পরিবর্তন করা, শাসনামলের প্রতিটি ঘটনা এমন প্রকাশ্য ভ্রান্তিময় যাকে সত্যাশ্রয়ী লোক কখনো সমর্থনযোগ্য ও পসন্দনীয় বলে গণ্য করতে পারে না। বিশেষত ইয়াযিদের মনোনয়নে খেলাফতের ফেতনা চিরতরে শেষ হয়ে যায় এবং ইসলামে বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক প্রথা চালু হয়। এসব ঘটনায় কেবল সাধারণ লোকই নয় সমাজের সত্য প্রিয় বিশিষ্ট লোকজনও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতে থাকেন। তাঁর প্রবর্তিত বিভিন্ন বিদআতের মধ্যে ইসলামী খেলাফতকে ব্যক্তিগত ও রাজতন্ত্রে পরিণত করার বিদআত ছিলো সবচেয়ে নিন্দনীয় যা ইসলামী খেলাফতের মূল প্রাণ সত্তাকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়।"(সিয়ারুস সাহাবা খ ঃ ৬ পৃঃ ৯৩, ১২৭)

www.pathagar.com

মাওলানা মুঈনুদ্দীন নদভী তাঁর উক্ত 'সিয়ারুস সাহাবা' গ্রন্থে আরও এগিয়ে গিয়ে বলেন যে, "রাসূলের চাচাতো ভাই অন্যতম খলীফায়ে রাশেদ আলী মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু আর সিরিয়ার গভর্নরের সঙ্গে কি করেই বা তুলনা হতে পারে? কোথায় সূর্য কীরণ আর কোথায় নিষ্প্রভ প্রদীপ।"

মাওলানা মুঈনুদ্দীন সাহেব গ্রন্থটিতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিভিন্ন অভিযোগ থেকে রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তথাপিও উপরোক্ত কথাগুলো তাঁর কলমের আঁচড়ে অবলীলাক্রমেই এসে যায়। আসল কথা হলো, দীনের প্রকৃত মর্যাদা যার কাছেই ব্যক্তির মর্যাদা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবে, তিনি কুরআন ও হাদীস বিরোধী প্রত্যেক কাজকে বিদআত বলবেনই। সেই কাজটির প্রবর্তক যিনিই হোন না কেন। এরূপ সত্য নিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও এ ক্ষেত্রে বিদআতটিকে উমক 'হযরত' 'উমক' 'বুজর্গ' কিংবা উমক অবুজর্গ উমক 'অহযরতের' কাজ—এ রূপ আলাদা আলাদা মানদণ্ডে বিচার করতে বলবেন না। কোনো অহযরত বা অবুজর্গ এরূপ কাজ করলে তাকে নির্দ্বিধায় বিদআত কিংবা এর চাইতেও কঠোরতর অভিধায় আখ্যায়িত করতে হবে আর কোনো হযরত বা বুজর্গ এরূপ করলে তাঁর এ কাজকে ইজতেহাদ আখ্যা দিয়ে তাঁকে অন্তত একটি পুন্য বা প্রতিদানের হকদার প্রমাণ করতে সচেষ্ট হতে হবে এমনটি কোনো সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সমর্থন করতে পারেন না।

যা হোক, আমি একথা আগেও একবার সুস্পষ্টভাবে বলেছি যে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসৃত নীতি কুরআন, হাদীস ও খেলাফতে রাশেদার ইজমার খেলাফ ছিলো। তাঁর অনুসৃত নীতির স্বপক্ষে শরীয়াতের কোনো দলীল নেই। সঠিক অর্থে এ নীতিকে 'ইজতিহাদ' 'সুন্নাত' বা 'অপর সুন্নাত' গণ্য করা যায় না। (যা করতে জনাব তাকী ওসমানী সাহেব ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।) সমগ্র দেশে এ নীতির প্রবর্তন বিদআত ছিলো। কেবলমাত্র মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নয় বরঞ্চ অন্যান্য ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ফকিহ আলেমগণও এ ধরনের নীতিকে বিদআত ও বাতিল বলে গণ্য করে গেছেন।

ভ্রান্ত অভিযোগের পুনরাবৃত্তি

'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেব দিয়তের ওপর আমার উপরোক্ত আলোচনাকে আবারও খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন। সূচনায় তিনি 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থের দিয়ত সম্পর্কিত সেই তিনটি লাইনের উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

প্রথম অভিযোগ

তিনি বলেন, "আমি এ বাক্যের ওপর চারটি অভিযোগ উত্থাপন করি।" (তাঁর প্রথম অভিযোগ) "দিয়তের ক্ষেত্রে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু 'সুন্নাত বদলিয়ে দেন' এ বাক্যটি মওদূদী সাহেব নিজের পক্ষ থেকে জুড়িয়ে দেন।" প্রথম অধ্যায়ে মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়া প্রসংগে যে জবাব দেয়া হয়েছে এখানেও সে জবাবই প্রযোজ্য। এখানেও মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবনে কাসীরের উক্তির ভাবার্থ নিজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যদি ইবনে কাসীরের উক্তির হুবহু তরজমা পেশ করতেন, তাহলে আলাদা প্যারায় অথবা উদ্ধৃতিসহ তা উল্লেখ করতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ইবনে কাসীরের উক্তির মর্মার্থ নিজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। মুহতারাম মরহুম মাওলানার ভাষা এক্ষেত্রে অধিকতর সংযত ছিলো। বিদআতের[১] পরিবর্তে তিনি লিখেছেন 'সুন্নাতকে বদলিয়ে দেন'। ওসমানী সাহেবের অভিযোগটি সম্পূর্ণ অবান্তর যে, "মাওলানা নিজের পক্ষ থেকে জুড়ে দেন।" কেননা বাক্যটি মাওলানা সাহেবের নিজের বাক্যেরই অংশ বিশেষ। আর যদি বলা হয় যে, ইবনে কাসীরের উক্তির ব্যাখ্যা হিসেবেও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সুন্নাত বদলিয়ে দেন—একথাটি বলা ঠিক নয়, তাহলে এমন আপত্তির কোনোই মূল্য নেই। ইবনে কাসীর যখন বলছেন, যিম্মীর দিয়ত মুসলমানের দিয়তের সম পরিমাণ হিসেবেই প্রথম থেকে নিয়ম প্রচলিত ছিলো আর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুই সর্বপ্রথম তা অর্ধেক করে বাকী অর্ধেক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, তাহলে একথার অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে, "তিনি সুন্নাতকে বদলিয়ে দিয়েছেন?"

এখানে আরো যে কথাটির উল্লেখ করা জরুরী মনে হচ্ছে তা এই —মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে যেসব প্রমাণপুঞ্জির বরাত দিয়েছেন সেগুলোর মূল আরবী বাক্য কদাচিত সংযোজিত হয়েছে। কারণ, উদ্ধৃতি এতো বেশী পরিমাণ ও বিভিন্ন প্রকারের ছিলো যে, এগুলোর সব সংযোজন হলে গ্রন্থের কলেবর বর্তমান আকারের চেয়ে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেতো। অধিকন্তু একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াতো। তবে সৌভাগ্যক্রমে দিয়তের আলোচনায় মরহুম মাওলানা মওদূদী তাঁর গ্রন্থের ১৭৪ পৃষ্ঠার টীকায় ইবনে কাসীরের সেই মূল আরবী বাক্যটি উল্লেখ করেন, যাতে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সংশোধন ও বিকৃতি সাধন

---

১. প্রথম অধ্যায়ে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিদআতের দোষে দোষী করেননি। তাঁর বাক্য হলো—"হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শাসনামলে মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ বানান" এবং "ওমর বিন আবদুল আযীয ক্ষমতায় এসে সে বিদআত খতম করেন কিন্তু হিশাম ক্ষমতায় বসে বংশগত ঐতিহ্য পুনর্বহাল করেন।"

www.pathagar.com

করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। মরহুম মাওলানা ২৬নং টীকায় লিখেছেন ঃ

ইবনে কাসীরের বাক্যটি হলো ঃ

وكان معاوية اول من قصرها الى النصف واخذ النصف لنفسه ـ

(আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুই প্রথম ব্যক্তি যিনি দিয়তের আধা আধি করে ভাগ করেছেন এবং নিজের জন্যে অর্ধেক রেখেছেন।)

ইবনে কাসীরের নামে কোনো অসত্য কথা চাপিয়ে দেয়া কিংবা তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোনো প্রকার অবৈধ কথার সংযোজন যদি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ইচ্ছা থাকতো, তাহলে তিনি ইবনে কাসীরের মূল আরবী বাক্যটি উল্লেখ করতে অবশ্যই দ্বিধা করতেন। মূল বাক্য উল্লেখ করাতে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এখানে আক্ষরিক অনুবাদ তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন বা নিজের থেকে কোনো কথা জুড়ে দেয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। তারপরও এ মর্মে একই অপবাদের বারবার অবতারণা করা যে "মূল গ্রন্থে এ বাক্য নেই, ইবনে কাসীর, ইবনে যুহরী এমন ধরনের কথা লিখেননি" ইত্যাদি প্রয়াসকে চর্বিত চর্বন ছাড়া আর কিই বা বলা যায় ? এরূপ খুঁত ধরতে গেলে কোনো লেখকই এহেন অভিযোগ বিহীন পাওয়া যাবে কি ?

দ্বিতীয় অভিযোগ

তাকী ওসমানী সাহেবের দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব আগেই দেয়া হয়েছে। ومضت السنة ان دية المعاهد كدية المسلم (এ সুন্নাত বা নীতি চালু হয়ে আসছিলো যে, চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের দিয়তের পরিমাণ মুসলমানের দিয়তেরই সমপরিমাণ) এ বাক্যটি ইবনে কাসীরের নয় বরং ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইর—এই হলো তাঁর দ্বিতীয় অভিযোগ। অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুত্বসহ বিশেষ সংখ্যায় পুনঃ প্রচার করা হয়। অথচ এর গুরুত্ব কানাকড়িও নেই। তাকী ওসমানী সাহেবের ধারণা উক্তিটি ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হলে এর অর্থ হবে—ইমাম যুহরী হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালাকে সঠিক মনে করেছেন আর জেনে শুনেই ইমাম যুহরীর উক্ত বিদআতকে নিজের মত ও সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জনাব তাকী সাহেবের দলিলটি সঠিক নয়। به قال الزهرى –এ বাক্যের তাৎপর্য আদৌ এটা নয় যে, ইমাম যুহরী আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তকে সঠিক গণ্য করে সেটাকেই তার ফিকহী মত বানিয়ে নিয়েছেন। ওয়ারেশীর ক্ষেত্রে ইমাম যুহরীর প্রকৃত কথা হলো—কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ না হওয়া এবং মুসলমান

www.pathagar.com

কাফেরের ওয়ারিশ না হওয়ার ধারাবাহিকতা প্রথম থেকেই চলে আসছিলো। আর এটাই হচ্ছে তাঁর ফিকহী মত। এ ধরনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা এ কারণেই অনুভূত হয় যে, মুহাদ্দিসগণ পরিপূর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার গুণ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নিজস্ব মতের বিরোধী রাওয়ায়েতগুলোও বিনা দ্বিধায় উদ্ধৃত করে দেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং বনী উমাইয়ার অন্যান্য শাসকগণ তো এ নীতির পরিপন্থী কাজই করেছেন। ঐ গোত্রের শাসকদের মধ্যে একমাত্র ওমর বিন আবদুল আযিয রহমাতুল্লাহ আলাইহি পূর্বের প্রচলিত সুন্নাত বহাল রাখেন এবং আমীরে মুয়াবিয়ার প্রবর্তিত নিয়ম বাতিল করেন। ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আগের প্রচলিত সুন্নাতের পরিপন্থী নীতিকে কি করে সঠিক বলে গণ্য করতে পারেন ? কারণ, তিনি তো শুরুতেই একথা বলে দিয়েছেন যে, "কাফের ও মুসলমান পরস্পরের ওয়ারিশ হতে পারে না।" এটা সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আল বালাগের সম্পাদক সাহেব আমার প্রতিপাদ্য বিষয়কে অদ্ভুত তামাশায় পরিণত করেছেন আর তাঁর উদ্ভাবিত বিষয়ে পক্ষপাতিত্বের দিকটির প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করছেন না।

ইমাম যুহরির একটি রাওয়ায়েত মুআত্তায়ে ইমাম মালেক গ্রন্থে باب لايرث المسلم الكافر "মুসলিম কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না।" শীর্ষক আলোচনায় এভাবেও বিদ্যমান আছে যাতে ইমাম মালিক উদ্ধৃত করেছেন যে, আকীল ও তালেব আবু তালিবের মৃত্যুর সময় কাফের থাকায় তারা আবু তালিবের ওয়ারিশ হয় ; পক্ষান্তরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হওয়ায় ওয়ারিশী থেকে বঞ্চিত থাকেন। একথা প্রমাণিত হলে কিংবা স্বীকার করে নিলে ওসমানী সাহেবের কিংবা আমার দলীলে কোনো সৌন্দর্য বা ত্রুটি সৃষ্টি হয় না যে, দিয়তের ব্যাপারে আলোচ্য উক্তি হাফেজ ইবনে কাসীরের নয়, বরং ইমাম যুহরীর। ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শুধুমাত্র কথাটি বর্ণনা করেছেন। আমি শুরুতেই বলেছি এতে মূল বিষয়ে কোনোক্রমেই ব্যত্যয় ঘটে না।

ইবনে কাসীর কিংবা ইমাম যুহরী যার উক্তিই হোক না কেন, কথা এটাই যে, "যিম্মীর দিয়তের হার আর মুসলমানের দিয়তের হার সমান।" এটাই সুন্নাত যার ধারা খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে চলে আসছিলো। 'আল বালাগ' সম্পাদক আমার জবাবে পুনরায় লিখেছেন, উক্তিটি ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হলে সুনানে বায়হাকীতে বর্ণিত ইমাম যুহরীর অপর উক্তি দ্বারা এ উক্তি অতি সহজ হয়ে যায়। অথচ এভাবে বিষয়টি সহজ হওয়ার নয়। কারণ, অপর উক্তি এমনও আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লামের যুগে ইহুদী-খৃষ্টানদের দিয়ত মুসলমানদের দিয়তের সমান ছিলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে এ ধারাই চালু থাকে। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্ধেক তাদের ওয়ারিশদের দেন আর বাকী অর্ধেক বায়তুলমালে জমা দেন। সুতরাং অর্ধেক দিয়ত ব্যক্তিগত খরচের জন্য গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠে না। সুনানে বায়হাকীর এ ব্যাখ্যাটি আগের উক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য বা প্রভাব সৃষ্টি করে না। দিয়তের কোনো অংশই বাইতুলমালে জমা করার দলীল কুরআন, হাদীস, ইজমা বা ফকীহদের ইজতিহাদে নেই—একথা আগের আলোচনায় আমি সুস্পষ্ট দলীলাদি দ্বারা প্রমাণ করেছি।

তৃতীয় অভিযোগ

'আল বালাগের' সম্পাদক সাহেব আমার দলীলের মূল বিষয়ের জবাব না দিয়ে لنفسه এবং لبيت المال ('নিজের জন্যে' আর 'বায়তুলমালের জন্যে') এ বাক্যের আক্ষরিক মতপার্থক্য সম্পর্কে আমার লিখিত বক্তব্যকে খণ্ডন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি আফসোস করে লিখেছেন, মালিক গোলাম আলী সাহেব এখনো একথার জেদ ধরে বসে আছেন যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্ধেক দিয়ত ব্যক্তিগতভাবে ব্যয় করার জন্য গ্রহণ করতেন। বায়হাকীর بيت المال রাওয়ায়েতটির অর্থ তিনি করেছেন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিগত ব্যয়। সম্পাদক সাহেবের যেমন আফসোস, তেমনি আমারও এটা পরিতাপ। কেননা, তিনি আমার কথার উপর ভুল প্রলেপ দিয়েছেন। আমি কখনো বলিনি যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দিয়ত ব্যক্তিগত খাতে ব্যয় করতেন। আমি যা বলেছি এবং তিনি নিজে যা বর্ণনা করেছেন তা এই—গনীমত, শুল্ক ইত্যাদি আদায়ের ব্যাপারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও বনী উমাইয়ার অন্যান্য আমীর কর্তৃক আরোপিত নীতির ব্যাপারে একই ঘটনায় ঐতিহাসিকগণ কোথাও لنفسه (নিজের জন্যে) আবার কোথাও لبيت المال (বায়তুলমালের জন্য) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ, তখন বায়তুলমাল ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হতে থাকে। আমীর অমাত্যগণকে তখন বায়তুলমালের আয়-ব্যয়ের প্রশ্নে মুসলমানদের কাছে জবাবদিহি করতে হতো না। এটা এমন এক বাস্তব ও প্রকাশ্য ব্যাপার যে, সকল ঐতিহাসিকই এ বাস্তব ঘটনাটি স্বীকার করেছেন এবং তা নিজ নিজ গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। কথাটির আর অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমি সঙ্গত মনে করছিলাম না। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় যে, জনাব তাকী ওসমানী সাহেব আমার বক্তব্যের সমর্থনে আবারও আমার কাছে দলীল পেশ করার দাবী করেছেন।

www.pathagar.com

এখন 'আল বালাগ' সম্পাদক এবং একই মতের লোকদেরকে আমি 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থের ১৪৯ থেকে ১৫০ পৃষ্ঠার বরাত দিচ্ছি। সেখানে এ ধরনের বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে। বিশেষত 'আল কামেল' এবং 'বেদায়ার' উদ্ধৃতিসহ একথা লিখিত আছে যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী শাসকরূপে ইয়াযিদের মনোনয়নে সম্মতিলাভের উদ্দেশ্যে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এক লাখ দিরহাম পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি ঐগুলো গ্রহণে অস্বীকার করে বললেন, আমার দীন তো খুব সস্তা হয়ে গেছে। ঘটনাটি অনেক ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসই বর্ণনা করেছেন। যেমন তাবাকাতে ইবনে সায়াদ খ-৪ পৃঃ ১৮৪, তরজমায়ে আবদুল্লাহ বিন ওমর-এ (বৈরুত থেকে প্রকাশিত ১৩৭৭ হিজরী) একথাই বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম মহিউদ্দীন নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত। হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি تهذيب الاسماء واللغات কিতাবে লিখেছেন ঃ

ولما ابى البيعة ليزيد بن معاوية بعثوا اليه بمائة الف درهم ليستعطفوه فردها وقال لابيع دينى بدنياى رضى الله عنه ـ

> "ইয়াযিদের বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকার করলে সমর্থন লাভের প্রত্যাশায় তাঁর (আবদুর রহমান) কাছে এক লাখ দিরহাম পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তিনি সে অর্থ ফিরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ দুনিয়া হাসিলের বিনিময়ে দীনকে বিক্রি করতে পারি না।"

এখানে বাইয়াতের অর্থ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর ইয়াযিদের জন্য খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ নয়—এমন সন্দেহ করা কারোই উচিত নয়। কারণ, ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীতে নিজেই লিখেছেন, তাঁর মৃত্যু হয় মতান্তরে ৫৩ অথবা ৫৫ কিংবা ৫৬ হিজরী সনে। আর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু হয় হিজরী ষষ্ট দশকের মধ্যখানে। সুতরাং এখানে বাইয়াত গ্রহণ বলতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার জীবদ্দশাতেই ইয়াযিদকে পরবর্তী শাসক রূপে অগ্রিম মনোনয়ন দান উদ্দেশ্য, যেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিলো ৫০ হিজরী সন থেকে। ইমাম নববী তাঁর বর্ণনা ভঙ্গি অনুসারে এ ক্ষেত্রে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা যুবরাজ ইয়াযিদ কারো নাম উল্লেখ না করেই সম্পূর্ণ কথা বর্ণনা করে দেন যা একটি ক্ষুদ্র বিশ্বকোষ তুল্য গ্রন্থে উল্লেখ হয়। অনেক যাচাই-বাছাই করে উপকরণসমূহ গ্রন্থটিতে একত্রিত করা হয়েছে। অন্যান্য

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকগণও বিস্তারিতভাবে ঘটনাটি আলোচনা করেছেন। যেমন হাফেজ ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন ঃ

بعث معاوية الى عبد الرحمن بن ابى بكر بمائة الف دهم بعد ان ابى بيعة ليزيد ابن معاوية فردها عبد الرحمن وابى ان يأخذها وقال ابيع دينى بدنياى ؟ (البداية والنهاية ج ٨ ص ٨٩)

"আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার বাইয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে এক লাখ দিরহাম পাঠিয়ে দেন। আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে বললেন ঃ আমি কি দুনিয়ার বিনিময়ে দীন বিক্রি করে দেবো ?"-(বেদায়া নেহায়া খ ঃ ৮ পৃঃ ৮৯)

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এতো প্রচুর ধন-সম্পদ কোত্থেকে পেলেন তা জনাব তাকী উসমানী সাহেব বলতে পারেন কি ? ব্যক্তিগত বা বায়তুলমালের অর্থ এ ধরনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যয় করা কি সঠিক? বুখারী মুসলিমে বর্ণিত আছে, ফাতেমা বিনতে কায়েস মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রশ্নে হুজুরের কাছে পরামর্শ প্রার্থনা করলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন (انه صعلوك) "সেতো সম্পূর্ণ গরীব নিঃস্ব।"

এ সকল উদাহরণ এবং আমার আগের আলোচনায় পেশকৃত দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপনার পরও যদি তাকী উসমানী সাহেব আমীরে মুয়াবিয়া কর্তৃক বায়তুলমালের অর্থ ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করা সংক্রান্ত আরও দলীল-প্রমাণাদি দাবী করেন, তাহলে এ রোগের ওষুধ কি ? উদাহরণ তো অনেকই পেশ করা যায় এবং জনাব তাকী সাহেবের পক্ষ থেকেও 'বরকত' হিসেবে এর জবাব গতানুগতিকভাবেই সম্ভবত আসতে থাকবে। যেমন তিনি হয়তো জবাবে বলবেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনটি জুময়ায় খুতবা দিচ্ছিলেন সমস্ত সম্পদ আমাদের। শেষ জুময়ায় একজন (নির্ভীক সৎ সাহসী) লোক দাঁড়িয়ে বললেন—সমগ্র সম্পদ তো আমাদেরর (জনগণের)। এর মাঝে কেউ প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়ালে আমরা তরবারি দ্বারা তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। একথায় খুশী হয়ে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পুরস্কৃত করেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি খুতবায় বায়তুলমালের অবশিষ্টাংশ সম্পদ বন্টন করে দেয়ার ঘোষণা করেন। জনাব তাকী সাহেবের ভাবখানা এমন—যার ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে তিনি নিষ্পাপ আর যিনি ভালো কাজ

www.pathagar.com

করেন তিনি যাবতীয় ভুলের ঊর্ধে। এ ধরনের যুক্তি দ্বারা কোনো সংঘটিত বাস্তব ঘটনাকে সাময়িকভাবে ধামাচাপা দেয়া যায় বটে কিন্তু দু'দিন পর এর পরিণতি কত ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এখানে লক্ষণীয় যে, দু' সপ্তাহ পর্যন্ত সকলের নিরবতা অবলম্বন করার পর তৃতীয় সপ্তাহে গিয়ে একজন লোকের মুখ দিয়ে প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারিত হওয়া থেকে কি সহজেই আঁচ করা যায় না যে, ঐ সময়কার পরিস্থিতি কত নাজুক ছিলো ?[১]

চতুর্থ অভিযোগ

জনাব তাকী ওসমানী সাহেব বলেন ঃ "আমার চতুর্থ অভিযোগ ছিলো জিম্মীর দিয়ত মুসলমানের সমান অথবা অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশ হওয়ার প্রসংগটি সাহাবীদের আমল থেকেই বিতর্কিত রূপে চিহ্নিত। কেননা স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মধ্যপন্থা অবলম্বন করতঃ এসব হাদীসের মধ্যে একটি সমন্বয়সাধন করলেন এভাবে অর্ধেক দিয়ত নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশকে দিলেন আর বাকী অর্ধেক জমা করলেন বায়তুলমালে। মালিক গোলাম আলী সাহেব এর মুকাবিলায় যেসব দলীল পেশ করেছেন সেগুলো আমাদের ধারণা মতে আলোচ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

তাঁর এ ধরনের অভিযোগ আজবই বটে। কেননা ওসমানী সাহেব আমার আলোচনার মৌলিক ও কেন্দ্রীয় দিকটিই এখানে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। তিনি আমার বক্তব্যের কোনো জবাব না দিয়ে শুধু মাঝখানে বিষয়টি অপ্রাসাঙ্গিক বলেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। "অভিযোগের মৌলিক ধরন"-এ শীর্ষক আলোচনায় আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আমার বক্তব্য তুলে ধরেছি। ওসমানী সাহেব তার জবাবে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। আলোচনার পুনরোল্লেখ আমার এবং পাঠকবর্গের জন্য অবশ্যই বিরক্তিকর। তবুও পাঠকবর্গ ইচ্ছা করলে পূর্ব আলোচনা দেখে নিতে পারেন।

মৌলিক প্রশ্ন

নিহত জিম্মী ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে তাদের নির্ধারিত দিয়তের অংশবিশেষ থেকে শরীয়াতের কোন্ দলীলের ভিত্তিতে বঞ্চিত করা যায়, এ প্রশ্নের জবাব মাওলানা তাকী উসমানী সাহেব আগের কিংবা সাম্প্রতিক আলোচনায় দেননি। বরং তিনি لنفسه (নিজের জন্যে) শব্দের উদ্দেশ্য لبيت المال (বায়তুলমালের

১. হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগের মতো বাকস্বাধীনতা থাকলেতো প্রথম দিনের বক্তব্যের সাথে সাথেই প্রতিবাদ উঠতো। তৃতীয় সপ্তাহেও যিনি প্রতিবাদ করেছেন, তাকে জীবনের কত ঝুঁকি নিয়ে যে কথাটি বলতে হয়েছে, অপর সকলের এ ব্যাপারে নিরব থাকা এবং ঐ এক ব্যক্তিরই প্রতিবাদ হওয়া থেকে তা সহজে অনুমেয়।

www.pathagar.com

জন্যে) প্রমাণ করার প্রাণন্তকর চেষ্টা করেন। যে সকল ঐতাহিসক لنفسه (নিজের জন্যে) শব্দটিকে لبيت المال (বায়তুলমালের জন্যে) অর্থ করেছেন তাদের দিয়তের অংশবিশেষ বায়তুলমালে জমা দেয়া জায়েয হলো কোন্ দলীলের ভিত্তিতে ? আসলে মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ বানানো যেমন ঠিক নয়, তেমনি অমুসলমানের দিয়তের অংশবিশেষের অংশীদার মুসলমান বা বায়তুলমালকে বানানো দুরস্ত নেই। দিয়ত এক ধরনের ত্যাজ্য সম্পত্তি যা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন হওয়া জরুরী। মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে ওয়ারিশী সূত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া নিষিদ্ধ। কাফেরের দিয়ত যে পরিমাণেরই হোক তা তার ওয়ারিশগণই পাবে। এই উভয় ব্যাপারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ্ সমান ভুল করেন। এ কারণেই হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উভয় নীতি পরিহার করে ভুলের সংশোধন করেন এবং আমীরে মুয়াবিয়ার প্রবর্তিত অর্ধেক দিয়ত বায়তুলমালে জমা দেয়ার নিয়ম পুনর্বহাল করেন।

মুসলমান অমুসলমান সকলেরই দিয়তের অর্থ তাদের ওয়ারিশগণ পাবে, দিয়তের ভগ্নাংশে ভাগ বসানো যায় না—মুফাসসিরদের ব্যাখ্যায় একথা প্রতীয়মান হয়। সূরা আন নিসার চুক্তিবদ্ধ অমুসলমান অথবা জিম্মীর দিয়ত সম্বলিত আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে জারীর নিহত কাফের সম্পর্কে বলেন ঃ

لزمت قاتله دية لان له ولقومه عهدا فواجب اداء ديته الى قومه للعهد الذى بينهم وبين المؤمنين وانها مال من اموالهم ولا يحل للمؤمنين شئ من اموالهم -

"কাফেরকে বধ করায় হত্যাকারীর দিয়ত আদায় করা ওয়াজিব। কেননা কাফের ও তার সম্প্রদায়ের সাথে এ ধরনের চুক্তি রয়েছে। সুতরাং দিয়ত তার ওয়ারিশকে বুঝিয়ে দেয়া কর্তব্য। কারণ, তার ও মু'মিনের মধ্যে এরূপ চুক্তিই হয়েছে। কাফেরের দিয়ত বস্তুত কাফেরদের সম্পদ। কাফেরের মালের অংশবিশেষে মুসলমানের ভাগ বসানো হালাল নয়।"

ইমাম ইবনে জারীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ভাষ্য অনুযায়ী যিম্মীর দিয়তের হকদার তার কাফের আত্মীয়-স্বজন। মুসলমান কিংবা বায়তুলমাল কারো জন্য কাফেরের এ অর্থ-সম্পদ হালাল নয়। ইমাম জারীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর এ মতের সমর্থনে অপর কয়েকটি উক্তিরও উল্লেখ করেছেন। কতিপয় ফকীহ্ জিম্মীর দিয়ত বায়তুলমালে জমা করার একটি মাত্র বিরল

www.pathagar.com

অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। সে অবস্থাটা হলো জিম্মীর কোনো অভিভাবক না থাকা অবস্থায় তার দিয়ত বায়তুলমালে জমা করা যায় অপর কোনো অবস্থাতেই জিম্মীর দিয়ত বায়তুলমালে জমা করা যায় না। 'আল বালাগ' সম্পাদক নিজেই তার সাময়িকীর মহররম (১৩৯১ হিঃ) সংখ্যার ১০ পৃষ্ঠায় 'ইসলামী শাসনতন্ত্রের বোধগম্যতা' শিরোনামে লিখেছেন ঃ

> "দেশের মুসলমান অধিবাসীদের যে মৌলিক মানবাধিকার আছে অমুসলমান অধিবাসীরাও সে অধিকার পাবে (তবে শর্ত হলো তাদের মুরতাদ না হওয়া)।"

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ـ(٤ : ٩٢)

> "(ভুলক্রমে নিহত ব্যক্তি) যদি এমন সম্প্রদায়ের হয়ে থাকে যার সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছে, তাহলে দিয়ত তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৯২)

এ আয়াতেরই আলোকে আমার আরজ ঃ খোদ কুরআন মজীদই যখন জিম্মির দিয়ত তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সমর্পণ করার কথা সুস্পষ্টভাবে বলছে তখন তার কিছু অংশ বায়তুলমালে জমা করা কিভাবে জায়েয হবে? একজন জিম্মীর ক্ষেত্রে যদি এটা জায়েয হয়, তাহলে একজন মুসলমানের দিয়তের সম্পূর্ণ অর্থ তার আত্মীয়দেরকে দিয়ে দিতে হবে এবং তার কানাকড়িও বায়তুলমালে জমা হবে না কেন? মাওলানা ওসমানী সাহেবের কাছে আমার এ প্রশ্নের যুক্তিসংগত জবাব আছে কি?

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

গনীমত বণ্টন প্রসংগ

এক ঃ আজব ও অদ্ভুত ব্যাখ্যা

আগের দু'টি অধ্যায়ে মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়া এবং দিয়ত প্রসংগের জরুরী বিষয়গুলোর স্ববিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো গনীমতের মাল বন্টন প্রসংগে। মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহির যে বাক্যকে কেন্দ্র করে এ বিষয়ে তাঁর ওপর অভিযোগের ঝড় উঠেছে তা এই ঃ

"গনীমতের মাল বন্টনের ক্ষেত্রেও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বিধানসমূহের বিপরীত কাজ করেছেন। কুরআন-হাদীসের আলোকে মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা হয়ে অবশিষ্ট চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহাণকারী সৈনিকদের মধ্যে ভাগ হওয়া উচিত। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু গনীমতের মাল থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য নিজের জন্য পৃথক করে রেখে অন্যান্য মাল শরীয়তের বিধান মুতাবেক বন্টন করার নির্দেশ দেন।"

মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহি এ বিষয়ে পাঁচটি কিতাবের বরাত দেন। পঞ্চম ও সর্বশেষ কিতাবটি হলো 'বেদায়া ও নেহায়া'। বরাতের সবগুলো কিতাব থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে ওসমানী সাহেব কেবল 'বেদায়ার' উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন যে, যিয়াদ হযরত হাকাম বিন আমরকে লিখেছেন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু চিঠি পাঠিয়েছেন যেন তার জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্য আলাদা রাখা হয় এবং গনীমতের সমস্ত সোনা-রূপা বায়তুলমালে জমা করা হয়। এ বরাতের ওপর ভিত্তি করে ওসমানী সাহেব যুক্তি-তর্কের এক বিস্ময়কর প্রাসাদ দাঁড় করেন। তার বক্তব্য এরূপ ঃ

(১) নিজের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য পৃথক রাখা নয় বরং বায়তুলমালে জমা করাই উদ্দেশ্য ছিলো—একথা তাঁর নির্দেশের আলোকে বুঝা যায়। যেমন বাক্যে আছে لبيت المال (বায়তুলমালের জন্যে)।

(২) হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সরাসরি এ হুকুম দিয়েছেন এমন কথা বেদায়া বা অন্য কোনো কিতাবে নেই। যিয়াদ নিজেই এ ফরমান জারি করে অথবা তাঁর দিকে ইংগিত করার সম্ভাবনা তো একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

www.pathagar.com

(৩) মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি নির্দেশটির উল্লেখ করলেন বটে কিন্তু নির্দেশটি যে বাস্তবায়িত হয়নি সেকথা বলেননি। অথচ নির্দেশটি বাস্তবায়িত না হওয়ার কথা কিতাবেই উল্লেখ আছে।

(৪) যিয়াদের কথা সত্য বলে স্বীকার করলেও এ নির্দেশটি ছিলো একটি বিশেষ জিহাদ সম্পর্কে। ভিন্নভাবে এর বাস্তবায়ন হয়নি।

(৫) সে সময় বায়তুলমালে সোনা-রূপা ঘাটতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিলো এবং সমগ্র মালে গনীমতের সোনা-রূপার পরিমাণ এক-পঞ্চমাংশের বেশী নয় একথা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো সূত্রে জ্ঞাত হয়েই শুধু সোনা-রূপা পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ জারী করেন। কিন্তু সোনা-রূপার বাস্তবে এক-পঞ্চমাংশের বেশী হওয়াতে হযরত হাকাম বিন আমর রাদিয়াল্লাহু সে আদেশ অমান্য করেন। এমতাবস্থায় সমস্ত সোনা-চান্দি বায়তুলমালে জমা করা তিনি কুরআন-হাদীস বিরোধী মনে করেন।

সম্ভব-অসম্ভব এমন অনেক জটিল ব্যাখ্যা দেয়ার পর তাকী উসমানী সাহেব লিখেছেন—এই অস্পষ্ট ঘটনার অনেক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সুদৃঢ় ধারণাকে নিশ্চিতরূপে খণ্ডন করা এবং দুর্বল ধারণার ওপর নির্ভর করে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর কুরআন-হাদীসের বিপরীত কাজ করার অভিযোগ আরোপ করা কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংগত হতে পারে না।"

এসব জটিল ব্যাখ্যার স্বরূপ

এ ব্যাপারে প্রথম আরজ হলো—সোনা-রূপা বায়তুলমালের জন্য পৃথক রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন বেদায়ার একথায় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অবশিষ্ট চারটি কিতাবের একটিতেও বায়তুলমালের কথা উল্লেখ নেই। শুধু এতটুকু উল্লেখ আছে যে, আমীরুল মু'মিনীন যিয়াদকে তাঁর জন্যে সোনা-রূপা পৃথক রাখার নির্দেশ দেন। (واصطفى له الصفراء والبيضاء) ইবনে সায়াদ (মৃঃ ২৩০ হিঃ) ইবনে আবদুল বির (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ), ইবনুল আসীর (মৃঃ ৬৩০ হিঃ) প্রমুখ গ্রন্থকারের গ্রন্থে বায়তুলমালের কথা নেই। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি এসব গ্রন্থকারের কিতাবগুলোর বরাত দিয়েছেন। তাদের সকলের পরে আগত শুধুমাত্র হাফেজ ইবনে কাসীর (মৃঃ ৭৭৩ হিঃ) বায়তুলমালের কথা লিখেছেন। এখন প্রশ্ন হলো–৮ম শতাব্দীর আগের সকল ঐতিহাসিক যারা আগের ইতিহাস অধ্যয়নের ভিত্তিতে নিজেদের গ্রন্থ রচনা করেন তাদের বর্ণনা কি সম্পূর্ণ ভুল হবে, বিশেষত তাঁর আমলে যখন বায়তুলমালের অবস্থা ভালো ছিলো ? শুধুমাত্র ইবনে কাসীরের ভাষ্যের আলোকে যদি অন্যান্য ঐতিহাসিকের ভাষ্যের অর্থ হয় 'সোনা-রূপা বায়তুলমালে

www.pathagar.com

জমা দেয়ার নির্দেশ', তাহলে বায়তুলমালের কথা উল্লেখ না করার তাৎপর্য এটা হতে পারে যে, ঐসব ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে রাজতন্ত্রের যুগে সরকারী কোষাগার আর আমীরুল মু'মিনীনের ব্যক্তিগত কোষাগারে কোনো পার্থক্য ছিলো না। অন্যথায় চারজনের সকলেই اصطفى له কিংবা تصطفى له (তাঁর জন্যে আলাদা রাখো) শব্দ কেন ব্যবহার করবেন। যে শব্দের ত্বরিত অর্থগুলো আমীরে মুয়াবিয়া নিজের জন্যে পৃথক রাখার আদেশ দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে বায়তুলমালের জন্য' হুকুমটি মেনে নিলেও তা কুরআন-হাদীস বিরোধী। কারণ, কুরআন মজীদে সমস্ত মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সরকারী বায়তুলমালে জমা দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। রাসূলের যুগ থেকে খেলাফতে রাশেদার শেষ পর্যন্ত এ প্রথাই চালু ছিলো। সোনা-রূপা পৃথক করে মালে গনীমত বায়তুলমালে জমা করার কোনো নজির নেই এবং কুরআনের বাণীর মধ্যে এ ধরনের কিছু নির্ধারণ করারও অবকাশ নেই। সে সময় বায়তুলমালে সোনা-রূপার ঘাটতি হওয়ায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তা পূরণ করতে চেয়েছিলেন এমন ধরনের যুক্তিও এখানে অবান্তর। সে যুগে অর্থ ও পণ্য বিনিময় পদ্ধতি বেশী জটিল ছিলো না এবং সরকারি ট্রেজারীকে শক্তিশালী রাখার জন্যে সোনা চান্দির ভাণ্ডারকে বিশেষ হেফাজতেরও প্রয়োজন ছিলো না। এ কারণেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীন বায়তুলমালে সোনা-রূপার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র জমা হওয়া এবং সেগুলো মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বন্টন হওয়াকে বেশী প্রাধান্য দিতেন।

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সরাসরিভাবে এরূপ কোনো নির্দেশ ছিলো—একথা প্রমাণিত নয়। যিয়াদ নিজেই নির্দেশটি বানিয়ে থাকতে পারে—ওসমানী সাহেবের এ দ্বিতীয় কথাটি নিছক একটি যুক্তির অবতারণা। এ ধরনের যুক্তি জ্ঞান বর্জিত ধারণার ভিত্তিতে যে কোনো কিছুকে অস্বীকার করা যায়। এভাবেও তো এটা বলা অসম্ভব নয় যে, আসলে যুদ্ধ এবং যুদ্ধলব্ধ গনীমত সংক্রান্ত কোনো ঘটনাই ঘটেনি। যিয়াদ অথবা ঐতিহাসিকগণ নিজেদের থেকে কাহিনী রচনাতে দক্ষতা দেখাতে চাইলে তো আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরফ থেকে একটি পূর্ণ চিঠি রচনা করে নিজেদের গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত করে দিতে পারতেন। তবে জনাব তাকী ওসমানী সাহেবের চিন্তা করা উচিত যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আইন-শৃংখলা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন জায়গায় যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে একদিন গভর্নরের পক্ষে মৌখিক বা লিখিত আকারে জাল ফরমান তৈরি করে আমীরের নামে চালিয়ে দেবার দুঃসাহসের অবকাশ ছিল ? যা সেনাবাহিনী এবং

www.pathagar.com

সেনাপতিদের সাথে পেশ করার পর আমীরে মুয়াবিয়া তা জেনেও সে সম্পর্কে নিরব ছিলেন ? এ ব্যাপারে তিনি কোনো কিছু তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি এবং যিয়াদের কোনো প্রকার কৈয়িয়তও তলব করেননি ? ৪৫ হিজরী সনে সংঘটিত 'জাবালে আসল' যুদ্ধের পর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৫ বছর বেঁচে ছিলেন। যিয়াদের এ জাল নির্দেশ সম্পর্কে ১৫ বছরের মধ্যে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিছুই না জানা কি যুক্তিগ্রাহ্য কথা? পরন্তু নির্দেশনামাটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে হওয়ার ব্যাপারটি যদি সন্দেহযুক্ত হতো, তাহলে ওসমানী সাহেবের পূর্বেকার বিগত ঐতিহাসিগণ অন্ততঃ সেদিকে কিছুটা হলেও ইশারা ইংগীত দিতেন। অথচ তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মোহরাংকিত একটি চিঠি দুষ্কৃতিকারীগণ হযরত ওসমানের বলে দাবী করলেও ঐতিহাসিকগণ ওটাকে মারওয়ানের জালকৃত চিঠি বলে মন্তব্য করেন এবং খোদ খলীফাও এটা অস্বীকার করেন যে, তিনি ও রকম কোনো চিঠি লেখেননি।[১] এসব ঘটনা তাকী ওসমানী সাহেবের অজানা থাকার কথা নয়।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশটি পালিত হয়নি। একথাটি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেব তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ না করায় ওসমানী সাহেব আক্ষেপ করেছেন। হুকুমটি পালিত না হওয়ায় এবং মাওলানা মওদূদী সাহেব সে কথা বর্ণনা না করায় মূল নির্দেশটির ভালো-মন্দের হ্রাস বৃদ্ধি কিভাবে হতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি নিজে নির্দেশটি রহিত করে যেতেন অথবা পালিত না হওয়ায় তিনি অন্তত সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন তাহলে তো গোটা বিষয়টির প্রকৃতিই বদলে যেতো। কিন্তু নির্দেশটি পালিত না হওয়ার যে ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকগণ দিয়েছেন তাতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ব্যাপারটি নিশ্ছিদ্র হয় না। আর এ কারণেই সম্ভবত মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইচ্ছা করেই কথাটি এড়িয়ে গেছেন। তাকী ওসমানী

---

১. উল্লেখ্য যে, একবার মিসর থেকে এসে কতিপয় নাগরিক খলীফা ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এ মর্মে অভিযোগ করলেন যে, মিসরের প্রাদেশিক গভর্নর তাদের প্রতি অত্যাচার করেছেন। হযরত ওসমান অভিযোগটি শুনে তাদেরকে বলে দিলেন, তোমরা দেশে চলে যাও আমি এর প্রতিকার করবো। কিন্তু এদিকে তাঁর সেক্রেটারী মারওয়ান খলীফার সিলমোহর দিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে মিসরের শাসনকর্তার কাছে এই বলে এক গোপন চিঠি দিলেন যে, অভিযোগকারী লোকগুলো মিসরে পৌছার সাথে সাথে যেন তাদের হত্যা করা হয়। অতপর চিঠি নিয়ে দ্রুত এক ঘোড়সওয়ার মিসর যাবার পথে অভিযোগকারী কাফেলা তাকে দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয়। তাদের হাতে চিঠি ধরা পড়লে পুনরায় তারা মদীনায় ফিরে আসে। সেই গোলযোগেই হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন।

www.pathagar.com

সাহেব নিজেই 'আল বালাগে' এতোটুকু স্বীকার করেছেন যে, হযরত হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে লিখেন কিতাবুল্লাহ্ আমীরুল মু'মিনীনের চিঠির ওপর প্রাধান্য পাবে। আল্লাহর শপথ ! আসমান-যমীনের যাবতীয় সবকিছু যদি কারো শত্রু হয়ে যায় আর সে যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে কোনো না কোনো পথ বের করে দেন----। একথাটি ৫টি কিতাবেই আছে। তারপর আরো আছে—হযরত হাকাম রাদিয়াল্লাহ দোয়া করেছিলেন, "আয় আল্লাহ ! আমার মংগল হলে তুমি আমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও।" তারপরই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইমাম হাকেম মুসতাদরাকের ২য় খণ্ডের ৪৪২ পৃষ্ঠায় একটি রাওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ

فان امير المؤمنين كتب ان يصطفي له الصفراء والبيضاء ......

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

وان معاوية لما فعل احكم فى فسمة الفئ ما فعل وجه اللّه من قيده وحسبه لما فى قيوده۔

"হযরত হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন (কিতাবুল্লাহ অনুসারে) গনীমতের মাল বণ্টন করলেন তখন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন দূত পাঠালেন। দূত এসে তাঁকে বন্দী করলেন। আর এ অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।"

ইমাম জাহবী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি মুসতাদরাকে সংক্ষেপে হুবহু এই রাওয়ায়েতটিই সংযোজন করেন।

একটি বিশেষ জিহাদকে কেন্দ্র করে নির্দেশনামাটি দেয়া হয়েছিলো বলে জনাব তাকী সাহেব যে কথা বলেছেন, তা সঠিক নয়। এ ধরনের মন্তব্য করে ওসমানী সাহেব আরেকটি ছিদ্রপথ তৈরি করতে চেয়েছেন। তাঁর এ প্রয়াসের প্রেক্ষিতে আরজ করছি—মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি এটিকে কোনো স্থায়ী নির্দেশ বলেননি বরং তিনি লিখেছেন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ্ আনহু এ ধরনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। জেনেশুনে কুরআন-হাদীস বিরোধী নির্দেশ একবার মাত্র দিলে কিংবা আকস্মিক হলে তা কি আপত্তিকর নয় ? কুরআন-হাদীস বিরোধী কাজ কেবল সার্বিক বা ভিন্নভাবে হলে আপত্তি করার অবকাশ থাকবে, নচেত নয় এটা কোন্ ধরনের ফতওয়া ?

পরিশেষে এ ব্যাপারে তাকী ওসমানী সাহেব একটি ধন্যবাদযোগ্য অনুমানেরই অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, সম্ভবত বায়তুলমালে সোনা-রূপার ঘাটতি ছিলো। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কোন্ সূত্রে

www.pathagar.com

গনীমতের সমস্ত মালের মূল্য এক-পঞ্চমাংশ সমপরিমাণ জানতে পারলেন। কিন্তু বাস্তবে এক-পঞ্চমাংশের বেশী মাল ছিল। সুতরাং হযরত হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু সমস্ত সোনা-রূপা বায়তুলমালে জমা করা কিতাবুল্লাহর খেলাফ মনে করেন।

এ ক্ষেত্রে প্রথম যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা এই, সেনাপতি কিংবা তাঁর অধিনস্থ অফিসার ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে গনীমতের পরিমাণ জানার আর কি সূত্র আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর থাকতে পারে? সমস্ত মাল এক জায়গায় একত্রিত হয়ে মূল্য নির্ধারণ হওয়ার পরই এরূপ পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব। যদি বাস্তবে এভাবেই পরিমাণ নির্ণীত হতো তাহলে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুমানের মধ্যে এ মর্মে কোনো পার্থক্য হওয়া উচিত ছিল না যে, একজনের অনুমানে সোনা-রূপা সমস্ত মালের এক-পঞ্চমাংশ আরেকজনের অনুমানে বেশী। এমতাবস্থায় সোনা -রূপা পঞ্চমাংশ সমপরিমাণ হওয়ায় শুধুমাত্র সোনা-রূপাই বায়তুলমালে জমা করলে না। পরিনতিতে মতবিরোধ প্রকাশ পেতো, না হযরত হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিপীড়ন ভোগ ও জীবন দিতে হতো। তাকী ওসমানী সাহেবের ভাষ্যনুযায়ী ব্যাপারটি যদি গুরুত্বপূর্ণ না হতো তাহলে হযরত হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এ নির্দেশ সত্বেও কখনও এ জবাব দিতেন না যে, আমীরের ফরমানের অনেক উর্ধে আল্লাহর কিতাব। তেমনি তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাদেরকে গনীমতের মাল বন্টন করে নিতেও কখনও বলতেন না।

ইমাম তাবারীর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব এবং অন্যান্য বিদগ্ধ পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে বিশ্বখ্যাত এবং পরবর্তী যুগে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উৎস গ্রন্থ তাবারী হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক যিয়াদের কাছে প্রেরিত নির্দেশটি যেভাবে প্রকাশ করেছেন—তা পেশ করতে চাই। নির্দেশটির উল্লেখ তাবারীতে এভাবে আছে যে,

اصطفى له صفراء وبيضاء والروائع فلا تحركن شيئا حتى تخرج ذلك

হযরত হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদের নামে যেই জবাব পাঠান, তাতেও হুবহু এসব শব্দই ছিলো যে, তোমার পত্র পেয়েছি, যাতে উল্লেখ আছে যে, ان اصطفى له صفراء وبيضاء والروائع এতে প্রতীয়মান হয় যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কেবলমাত্র সোনা-চান্দিই দাবী করেননি বরং গনীমতের উত্তম ও উপাদেয় মালও চেয়েছিলেন এবং এসব মাল আলাদা না করা পর্যন্ত কোনো জিনিস স্থানান্তরিত করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ নাজুক

www.pathagar.com

অবস্থায় হযরত হাকাম বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে মৃত্যু কামনা করেন, তাহলে সেটা আমার কাছে তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। স্মর্তব্য যে, হযরত হাকাম বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ পর্যায়ের সাহাবী ছিলেন না। বুখারী ও অন্যান্য সিহাহ্ সিত্তার হাদীসগ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত হাদীস স্থান পেয়েছে। মুসতাদরাক ও অন্যান্য কিতাবের মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি ফেতনার যুগে নিরপেক্ষ থাকেন। পরিশেষে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে যে যুদ্ধে গনীমত সংক্রান্ত এ বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে সে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন।

২. আমার উপরোক্ত আলোচনার জবাবে ওসমানী সাহেব যাকিছু লিখেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করার আগে একটি লেখার দিকে সচেতন পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। লেখাটি হলো উপশিরোনাম নিয়ে। 'গনীমতের মাল আত্মসাত'এই উপশিরোনামটি তিনি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। শিরোনাম এবং শিরোনামের শব্দাবলী আল বালাগ সম্পাদক সাহেবের নিজের বানানো, ধারণাপ্রসূত। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ বিষয়ের ওপর কোনো শিরোনাম দেননি। তিনি আত্মসাত শব্দটিও ব্যবহার করেননি। আমি এ সংক্রান্ত আলোচনায় 'গনীমতের মাল বণ্টন' শীর্ষক শিরোনাম দিয়েছি। জনাব তাকী ওসমানী সাহেব কর্তৃক নিজে এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করে লোকদেরকে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার মনোভাব পোষণ করা, তাঁর জন্যে শোভনীয় কাজ হয়নি। কেননা এক শ্রেণীর লোক তো এ ধরনের তৎপরতার সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে ওঁৎ পেতে বসেই আছে।

বিস্মৃত অভিযোগের পুনরাবৃত্তি

আশ্চর্য ! জনাব তাকী ওসমানী সাহেব আমার মূল অভিযোগে ও দলীলের জবাব দেয়ার পরিবর্তে আবারও لنفسه ও لبيت المال (নিজের জন্যে ও বায়তুলমালের জন্যে) প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করেছেন। পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছেন মূল বিষয়ের। কোনো বিষয়ে একাধিক কিতাবের বরাত দিলে প্রত্যেক কিতাবের বাক্য হুবহু উল্লেখ না করে তার সারসংক্ষেপ নিজ ভাষায় ব্যক্ত করাই ছিলো মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সাধারণ নিয়ম। 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' বইয়ে এ নিয়মই পালিত হয়েছে। গনীমতের মাল বণ্টনের ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পাঁচটি কিতাবের বরাত দিয়েছেন। চারটি কিতাবেই له (তাঁর জন্য) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সংখ্যাধিক্যের দৃষ্টিতেও মওদূদী সাহেবের কথাটিকে ভুল বলার জো নেই।

www.pathagar.com

এতদসত্ত্বেও জনাব তাকী উসমানী কথাটি খণ্ডন করাকে এতোই জরুরী মনে করলে অন্তত মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বরাত দেয়া ৪টি কিতাবের কথা উল্লেখ করেই পঞ্চম কিতাবের কথাটি (بيت المال) বললে আমানতদারী রক্ষা পেতো। অথচ তিনি ঐ চারটি কিতাবের কথা ঘূর্ণাক্ষরেও উল্লেখ না করে শুধুমাত্র 'বেদায়ার' উদ্ধৃতি দিয়েই ঘটনাটি এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সোনা-রূপাসমূহ বায়তুলমালে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া পাঠকের মনে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মওদূদী সাহেব আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ঐতিহাসিকদের ব্যাপারে একটি ভিত্তিহীন কথা বলেছেন। আমি এর জবাবে এটা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, চারটি কিতাব 'বেদায়ার' আগে রচিত। তাঁদের সকলেই (له) 'নিজের জন্য' শব্দ লেখার কারণ হলো—খেলাফতে রাশেদার শাসনামলের পর আমীর-অমাত্যগণের ব্যক্তিগত ভাণ্ডার আর বায়তুলমালের মধ্যে কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট রাখা হয়নি। বায়তুলমালের সম্পদ অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অর্থ সম্পদের মতোই ব্যবহৃত হতো। এ অবস্থার কিছুটা ব্যাখ্যা আমি আগের অধ্যায়ে করেছি।

মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব শুধু একটি কিতাবের বক্তব্যের ওপর ভর করে লিখেছেন—হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তার নিজের জন্যে বায়তুলমালের সোনা-রূপা পৃথক রাখার প্রদত্ত নির্দেশটি 'বেদায়ার' বরাত দিয়ে লেখা মাওলানা মওদূদীর জন্য জায়েয হয়নি।

হ্যাঁ, কথাটি যদি শুধুমাত্র একটি কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হতো তাহলে নিসন্দেহে তা জায়েয হতো না। তাঁর লেখাটি যেহেতু অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের লেখার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং মাওলানা মওদূদী সাহেবের লেখাটি সম্পূর্ণ জায়েয ও সঠিক হয়েছে। তাকী ওসমানী সাহেব লিখেছেন, 'বেদায়ার' বরাত দিয়ে তিনি মস্তবড় অপরাধ করেছেন। আমি বলি এখানে আলোচ্য বিষয়টি মাওলানা বা অপর কারো অপরাধ করার প্রশ্ন নয়। আমি তো শুধু এতোটুকু লিখেছি যে, জনাব মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব বাকী চারটি কিতাব থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে শুধু বেদায়ার বরাতটি উল্লেখ করেছেন। এবার জিজ্ঞাস্য—একটি মাত্র কিতাব থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে ৪টি কিতাবের দলীল দ্বারা সমৃদ্ধ লেখা যদি অপরাধমূলক হয়, তাহলে একটি মাত্র কিতাবের দলীলকেই নির্ভরযোগ্য মনে করে অপর ৪টিকে এড়িয়ে চলাটা কোন্ পর্যায়ে যায়? তাকী ওসমানী সাহেব অযথাই মাঝখানেই অপরাধ হওয়ার প্রসঙ্গটি টেনে এনেছেন।

www.pathagar.com

অন্যথায় আমি লিখেছিলাম তাতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ঐ যুগে রাজকোষ ও ব্যক্তিগত ব্যয়খাতের পার্থক্যটি ছিলো অস্পষ্ট। কারণ, খেলাফতে রাশেদার পরে রাজকোষ ব্যক্তিগত তহবিল বা অর্থ ভাণ্ডারের মতো ব্যবহৃত হতো। যদ্দরুন ইতিহাসবিদগণ কোথাও لنفسه আবার কোথাও لبيت المال শব্দ ব্যবহার করেন। তবে উল্লেখিত ঘটনায় অধিকাংশ লেখক ও ঐতিহাসিকগণ بيت المال শব্দটি ব্যবহার করেননি। আমীরুল মু'মিনীন তাঁর জন্যে সোনা-রূপা পৃথক রাখতে এবং সেগুলো লোকদের মধ্যে বণ্টন নিষেধ করে দিয়ে যিয়াদকে যেই চিঠি লিখেছিলেন, যিয়াদ সেটি সাহাবী হাকাম বিন আমরকে পাঠিয়েছিলেন। 'তারিখে কামেল' ছাড়া উসুদুল গাবা' গ্রন্থে ইবনে আসীর লিখেছেন ঃ

كتب اليه زياد ان امير المؤمنين يعنى معاوية كتب ان يصطفى له الصفراء والبيضاء فلا تقسم فى الناس ذهب ولا فضة ـ

"যিয়াদ তাঁর (হাকাম) কাছে লিখেন যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখেছেন, যেন তাঁর জন্য সোনা-রূপাগুলো আলাদা রাখা হয় এবং সেগুলো জনগণের মধ্যে বণ্টন না করে।"

ইমাম হাকেম মুসতাদরাকে ৩য় খণ্ডের ৪৪২ পৃষ্ঠায় এ ঘটনার আলোচনায় بيت المال শব্দের পরিবর্তে لَهُ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। ইমাম জাহাবী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহির 'তালখীসে' একই রকম রেওয়ায়েত পাওয়া যায়।

এ ধরনের অবাঞ্ছিত আলোচনা আমাদের অনভিপ্রেত। অন্যথায় খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী খলীফাগণের নিজস্ব কোষাগারে গনীমত ও অন্যান্য সম্পদের অন্তর্ভুক্তির কথা সবিস্তারে প্রমাণসহ আলোকপাত করা যায়। আমীরদের শাসনামলে রাজ ভাণ্ডারের পাশাপাশি নিজেদের জন্য খাস ভাণ্ডারের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে মালে গনীমত মালে 'ফাই' জমা হতো। মনে হয় যেন সাধারণের জন্যে বায়তুলমাল একটি আর রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য ব্যক্তিগত বায়তুলমাল আরেকটি ছিলো। তাকী ওসমানী সাহেব যে বেদায়া গ্রন্থের দলীলের ওপর ভর করে (৮ম খণ্ড, ২৯ পৃঃ) মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহিকে ভুলের আবর্তে ফেলার নিষ্ফল চেষ্টা করছেন সে বেদায়ারই ৪৭ পৃষ্ঠায় ইবনে কাসীর ঘটনাটি দ্বিতীয়বার বর্ণনা করতে গিয়ে لبيت المال-এর পরিবর্তে لبيت ماله (তাঁর বায়তুলমাল) শব্দ সংযোজন করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

جاء كتاب زياد اليه على لسان معاوية ان يصطفى من الغنيمة لمعاوية ما فيها من الذهب والفضة لبيت ماله فرد عليه : ان كتاب الله قبل كتاب

www.pathagar.com

امير المؤمنين اولم يسمع لقوله عليه السلام : لاطاعة لمخلوق فى معصية الله وقسم فى الناس من غنائمهم فيقال انه حبس الى ان مات -

"যিয়াদের পক্ষ থেকে হাকামের কাছে আমীরে মুয়াবিয়ার একটি পত্র আসে। সেই চিঠিতে গনীমতের মাল থেকে সোনা-রূপা আমীরে মুয়াবিয়ার বায়তুলমালের জন্যে আলাদা রাখার নির্দেশ ছিলো। হাকাম আল্লাহর নির্দেশকে আমীরের নির্দেশের ওপর প্রাধান্য দিয়ে বললেন ঃ সে কি রাসূলের একথা শুনেননি যে, কোনো কাজে আল্লাহর অবাধ্যতার প্রশ্ন দেখা দিলে তখন কারো কথা মানা যাবে না? অতপর তিনি সমস্ত মালে গনীমত সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। বলা হয়, তাতে হযরত হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু কারা প্রকোষ্ঠেই মৃত্যুবরণ করেন।"

এবার আমার জিজ্ঞাস্য, অন্যান্য সকল ইতিহাসবিদ যদি بيت المال শব্দটি শুরু থেকেই ব্যবহার না করে থাকেন এবং ইবনে কাসীর এক জায়গায় বায়তুলমাল শব্দটি ব্যবহার করলেও তার কয়েক পৃষ্ঠা পরেই তিনি لبيت ماله (তাঁর বায়তুলমাল) শব্দ ব্যবহার করে আগের বাক্যের সংশোধনীমূলক ব্যাখ্যা দেন। আর বনী উমাইয়াদের ব্যক্তিগত খাস ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে আমীরুল মু'মিনীনের বায়তুলমাল পরিভাষাটি যে ব্যবহৃত ছিলো, তা সকলেরই জানা ছিলো। বলা বাহুল্য, এটি ছিলো মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের পাশাপাশি এ ব্যয়ের খাত অতিরিক্ত একটি ব্যয় খাত। এমতাবস্থায় মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইর লিখিত কথায় কোন্ বিধান ও ধারা অনুযায়ী আপত্তি উঠতে পারে? পরিতাপের বিষয় যে, অভিযোগকারী ভদ্র মহোদয়গণ তারপরও এমন সব বিষয় নিয়ে বারবার কাদা ছোঁড়াছুড়ি করায় আমাদেরকেও বাধ্য হয়ে ঐসব কথা খুলে বলতে হয়—যা অত্যন্ত বিড়ম্বনাকর এবং মনের ইচ্ছা বিরোধী।

সংবাদপত্রের ভ্রান্ত উদাহরণ

৪টি কিতাব এবং আমার পক্ষ থেকে আরো ২/৩টি কিতাবের বরাত দিয়ে 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে যে কথা সংযোজিত হয়েছে তা ভুল প্রমাণ করার জন্যে তাকী ওসমানী সাহেব আরো একটি উদাহরণ তৈরি করেছেন। তিনি লিখেছেন, "যদি ৪টি সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয় যে, 'মাওলানা মওদূদী নিজের জন্য' এক লাখ টাকা চাঁদা আদায় করেছেন এবং পঞ্চম একটি সংবাদের খবর হলো, মাওলানা মওদূদী 'জামায়াতে ইসলামীর জন্যে' এক লাখ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। তারপর কোনো ব্যক্তি ৫টি সংবাদপত্রের বরাত দিয়ে নিজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করার অপবাদ মাওলানার ওপর আরোপ করলে

www.pathagar.com

মালিক গোলাম আলী সাহেব সে অপবাদ কিভাবে ঠেকাবেন। পঞ্চম খবরটিকে নিছক পঞ্চম ও সর্বশেষ খবর হওয়ার কারণে এড়িয়ে যাবেন কি ?"

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ওপর আরোপিত অপবাদটি দাঁড় করাবার জন্যে যেই উদাহরণটির অবতারণা করা হয়েছে, তার কয়েকটি দিক ভাববার বিষয় আছে। প্রথমতঃ সংবাদপত্র, ইতিহাস, হাদীস ও আছারের মধ্যকার বিরাট পার্থক্যটি বুঝা দরকার।[১] একটি সংবাদপত্র কোনো একক লিখকের বস্তু নয়। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ষ্টাফ রিপোর্টার, পাঠক, সমালোচক মোটকথা সব শ্রেণীর লেখার সমাহার হচ্ছে সংবাদপত্র। খবরের কাগজে এমন কথাও ছাপা হয়, যার প্রথমে লেখা থাকে 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়।' সংবাদপত্রের প্রতিটি লেখা প্রতিদিন সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইতিহাস ও রাওয়ায়েতের অন্তর্গত লেখা একক ব্যক্তির চিন্তা অনুসন্ধান ও গবেষণার ফসল। লেখক প্রতিদিন তার লেখা সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন না।

এরূপ মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই খোঁড়া উদাহরণটি মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ওপর যদি প্রয়োগ করতেই হয়, তাহলে এর সঠিক প্রয়োগ এরূপ হবে-২৩০ হিজরী সনে ইবনে সায়াদের (র) সম্পাদনায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের জন্যে এক লাখ টাকার চাঁদা দাবী করার খবর প্রকাশ পায়। তারপর ৩১০ হিজরী সনে ইমাম ইবনে জারীরের সম্পাদনায় অনুরূপ খবর সম্বলিত আরেকটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ৪০৫ হিজরী সালে ইমাম হাকেম এ খবরটিই তার কাগজে প্রকাশ করেন। ইবনে আসীর একটি খবরের কাগজ বের করেন ৬৩০ হিজরী সনে। তিনিও অনুরূপ খবরই একই ভাষায় পরিবেশন করলেন। তারপর ৭৪৪ হিজরী সনে ইমাম জাহাবীর সম্পাদনায় যে কাগজ প্রকাশিত হয় তাতেও মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একই খবর প্রকাশিত হয়।

পরিশেষে ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ৭৭৪ হিজরী সনে একটি খবরের কাগজ বের করে খবর পরিবেশন করলেন যে, মাওলানা মওদূদী

১. এ ক্ষেত্রে জনাব তকী সাহেবের মতো আলেমের উপমা এবং উপমেয় বস্তুর পার্থক্য অনুধাবনে ব্যর্থতা যেমন হাস্যকর তেমনি দুঃখজনক। কোথায় ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ সত্যান্বেষী গবেষক ইমাম মুজতাহিদ বৃন্দ, যারা সকল প্রকার পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধে উঠে নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ কল্পে বিশুদ্ধ তথ্য অনুসন্ধানে ডুবে থাকতেন, আর কোথায় সংবাদপত্রের খবর। যার পেছনে থাকতে পারে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থদুষ্ট প্রেরণা কিংবা মতপার্থক্যজনিত বিদ্বেষ অথবা চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশের জন্য বাহবা নেয়া কিংবা নিজ কর্মস্থলে চাকুরির উন্নতি সাধনের মতলব।-সম্পাদক

www.pathagar.com

রাজকোষের জন্যে লাখ টাকার চাঁদা দাবী করেছেন। কিছুদিন পরেই সম্পাদক ইবনে কাসীর রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি তার সেই খবরের কাগজেই খবর দিলেন যে, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ চাঁদা তার নিজস্ব কোষাগারের জন্যে চেয়েছেন। এসব সংবাদপত্র যদি একই সময়ের হতো তবুও একটা ছিদ্রপথ থাকতো। অথচ এগুলোর প্রকাশনাকালের মধ্যে ব্যবধান হলো শত বছর বা ততোধিক সময়। এমতাবস্থায় প্রাচীনতমকালের রিপোর্টই অধিকতর নির্ভরযোগ্য হবে। আর ধারাবাহিকভাবে শত বছর ধরে চলে আসা সেই প্রাচীন রিপোর্টটি কোনো একজন মূল ভাষাতেই উদ্ধৃত করলে তাহলে তাকে কিছুতেই অপবাদ রটনার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় কি ? পরন্তু যে খবর সুদীর্ঘ সাত শ' বছর যাবত নির্ভরযোগ্য সূত্রে বিরাজমান। আর পরবর্তী সংবাদদাতাদের সংবাদ উৎসও সেই পুরাতন সংবাদপত্র এবং পূর্ববর্তী খবর আর পরবর্তী খবরের মধ্যে বাস্তব নয় শুধু শাব্দিক পার্থক্য থাকে, তাহলে সে খবরের ওপর নির্ভর না করে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করা কি সম্ভব। আর যারা শুধুমাত্র প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অছিলাতে পক্ষপাতিত্ব ও দলীয় গোঁড়ামীর আবর্তে ঘূর্ণায়মান সমকালীন সংবাদপত্রের সাথে শত শত বছরের আগের নির্ভরযোগ্য, সন্দেহাতীত বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থের তুলনা করে তারা কোন্ স্বর্গরাজ্যে বাস করেন তা বুঝা দুষ্কর।

স্ববিরোধিতা

মজার ব্যাপার হলো—'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেব যে অপবাদটি মাওলানা মওদূদীর ওপর আরোপ করার প্রাণন্তকর চেষ্টা করেছেন, সে চেষ্টা বুমেরাং হয়ে নিজ স্কন্ধেই পতিত হলো। তিনি লিখেছেন ঃ

"মালিক গোলাম আলী সাহেবের প্রায় নিশ্চিন্ত হবার জন্যে আমরা একথা দৃঢ়তা সহকারে পেশ করতে চাই যে, সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত লোকেরা له (তাঁর জন্য) অথবা لنفسه (তাঁর নিজের জন্য) শব্দ দ্বারা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের জন্যে এসব মাল চেয়েছেন এমন অর্থ মনে করেনি। কেননা তারা ভাষা পরিভাষা এবং প্রবাদ বাক্য বা বাকরীতি সম্পর্কে এতোটা অনবহিত ছিলো না যে, বাক্যের আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ নিয়েই মেতে থাকতো এবং ভাবার্থ বুঝতো না। (তাদের ভাষাগত জ্ঞানের অবস্থা এমনও ছিলো না যে,) একজন রাষ্ট্রপ্রধান নিজ অধীনস্থ কোনো রাজকর্মচারীকে দেয়া সরকারী নির্দেশ যেমন "রাজস্বের অর্থ আমার কাছে পাঠিয়ে দাও" এরূপ ক্ষেত্রে 'আমার' অর্থ যে 'রাজকোষ' তা বুঝতে তাদের অসুবিধা হতো।

www.pathagar.com

মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব অবশেষে নিজেই যখন এ তত্ত্ব উদ্ঘাটন করলেন যে, সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত লোকেরাও এটাই হয়তো বুঝে ছিলো যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের জন্যে অর্থ-সম্পদ চাননি আর সপ্তম শতাব্দীতে এসে ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ্ এ তত্ত্বটি অধিক স্পষ্ট করে দিলেন যে, له 'নিজের জন্যে' শব্দের অর্থ لبيت المال 'বায়তুলমালের জন্য' তাহলে মালে গনীমতের সোনা-রূপা তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট রাখার যে কথাটি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ্ লিখেছেন ওসমানী সাহেব আগের প্রদর্শিত তত্ত্বের মতো মওদূদী সাহেবের লিখিত 'নিজের জন্য' বাক্যটিরও অর্থ যদি রাজভাণ্ডার করতেন তাহলে তো সমস্ত লেটা চুকে যেতো। মওদূদী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহির উপর পর্বত প্রমাণ অপবাদ আরোপ করার এ নিষ্ফল প্রচেষ্টার কোনোই প্রয়োজন হতো না। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহির তরজমা 'তাঁর জন্য' কথাটি ওসমানী নিজে তাঁর যুক্তি অনুসারে 'রাজকোষের জন্য' অর্থ করে তা উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিতে পারতেন। তিনি লোকদেরকে বাক পদ্ধতি সম্পর্কে অবচেতন নয় বলে মন্তব্য করে নিজেই সে অবচেতনার জালে আটকে গেলেন।

মূল অভিযোগ

প্রশ্ন জাগে, গনীমতের মালের সোনা-রূপা যদি বায়তুলমালে জমা করাই উদ্দেশ্য ছিলো, তাহলে এ কাজের ওপর অভিযোগের উত্থাপন করাটা কেমন ধরনের হলো ! এ প্রশ্নের জবাবে আমি আগের আলোচনায় লিখেছি–

> "যদি স্বীকারও করে নেয়া হয় যে, হুকুমটি ছিলো 'বায়তুলমালের জন্যে' তথাপি এ রকম হুকুম কুরআন-হাদীস বিরোধী। কুরআনে সমস্ত মালের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা করার নির্দেশ এসেছে। নবী আলাইহিস সালামের পুণ্যময় যুগ থেকে খেলাফতে রাশেদার যুগ পর্যন্ত এ ধারাই প্রচলিত ছিলো। স্বর্ণ-রৌপ্য আলাদা করে অপর সব মাল বায়তুলমালে জমা দেয়ার কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কুরআনে বর্ণিত বাক্য দ্বারা উল্লেখিত নির্দিষ্টকরণের কোনো অবকাশ নেই।"

'আল বালাগ' পত্রিকার সম্পাদক সাহেব আমার উপরোক্ত জবাব রদ করার সম্ভাব্য সব চেষ্টাই আগের আলোচনায় করেছেন এবং আমি সেগুলোও বাতিল প্রমাণ করেছি। সেগুলোর পুনরাবৃত্তি না করে পাঠকবর্গের সুবিধার্থে উদাহরণ স্বরূপ সাম্প্রতিক একটি কথাই উল্লেখ করছি—সম্পাদক সাহেবের ভাষ্য অনুযায়ী সোনা-রূপা যদি গনীমতের সমস্ত মালের এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ হয়, তাহলে এ হুকুম শরীয়াত সম্মত হয়ে যায়। বায়তুলমালে সোনা-রূপার ঘাটতি থাকার

www.pathagar.com

কারণে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ নির্দেশ দেন। আমার আরজ এই, এরূপ অনিবার্য নির্দেশের তো ভিত্তি থাকা উচিত। সোনা-চান্দিগুলোর পরিমাণ যদি ঠিক এক-পঞ্চমাংশ হতো এবং বায়তুলমালে যদি সত্যিই এগুলোর ঘাটতি থাকতো তাহলে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশ্যই একথাগুলোর ব্যাখ্যাসহ হুকুম দিতেন। কেননা, মালে গনীমতের সঠিক পরিমাণ নিরূপণ করা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিলো না। ঘটনা যদি এভাবে অগ্রসর হতো তাহলে হযরত হাকাম বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ নিদের্শের প্রতি এমন জোর প্রতিবাদ কেন করলেন, যার কারণে পরিণতিতে তাঁকে জীবন দিতে হলো ? আর সমস্ত সেনাবাহিনীই বা কেন চুপ হয়ে গেলেন ? মোটকথা, দু' দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই সাহাবী। এমনকি সেনাবাহিনীতে সাহাবী আরও থাকতে পারেন। কিন্তু যেই সাহাবী (হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু) যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করলেন, তাঁর অনুমানকে আল বালাগ সম্পাদক সাহেব সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল সাব্যস্ত করলেন আর যে সাহাবী (হযরত হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেনাপতি হিসাবে নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং কুরআনকে 'আমীরুল মু'মিনীন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথার ওপর প্রাধান্য দেয়ার জন্যে চিৎকার করে বললেন, তাঁকে আপনি এই বলে যেন অপরাধ ও বিদ্রোহের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন যে, তিনি শরীয়াতের হুকুমের খেলাফও কাজ করেছেন আর আমীরুল মু'মিনীনেরও অবাধ্যতা দেখিয়েছেন। এটাই কি ইনসাফ !

তাকী ওসমানী সাহেবদের দৃষ্টিভংগীতে সম্মানিত সাহাবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এটাই কি একমাত্র পদ্ধতি যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সব কথাই অকপটে সমর্থন করা যদিও সেসব কথার স্বপক্ষে কুরআন হাদীসের কোনো দলীল না থাকে ? আর অপরদিকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দ্বিমত পোষণকারী যে কোনো সাহাবীর অনুসৃত নীতি ও ভূমিকাকে ভুল প্রমাণ করা যদিও সেই নীতি ও ভূমিকা কুরআন-হাদীস সমর্থিতও হয় ? হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সব কথা ও কাজকে বৈধ করার যদি আপনি শপথ করে থাকেন তাহলে আপনাকে শুধুমাত্র 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' এবং ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনা করে ক্ষান্ত হলেই চলবে না, বরং হাদীসের সহীহ গ্রন্থাবলীর কোনো কোনো অংশকেও ভুল বলে চিহ্নিত করতে হবে। যেমন—সিয়া সিত্তার প্রায় কিতাব, মুআত্তায়ে ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি কিতাবে এমন রাওয়ায়েত আছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো কেনা-বেচার ক্ষেত্রে এমন সব কাজও করেছেন, যেগুলো হযরত ওবাদাহ বিন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সামনে হুজুর

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ভুল প্রমাণ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভুল স্বীকার করেননি। এ ধরনের ঘটনা হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথেও সংঘটিত হয়, যার পরিণতিতে তাঁকে সিরিয়া দেশ ত্যাগ করতে হয়। মুহাদ্দিসীন ও হাদীসের ভাষ্যকারগণ এসব হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমালোচনা করেন। যেমন—আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী হাদীস গ্রন্থ ইবনে মাজার 'বুয়ূ' অধ্যয়ের টীকায় এবং ইমাম সুয়ূতি 'তানভীরুল হাওয়ালেক'-এর 'বুয়ূ' অধ্যায়ে সাংঘাতিকভাবে সমালোচনা করেছেন। এসব মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সাহাবাগণের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে কি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অমনোযোগী ছিলেন ? 'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেব কোত্থেকে একচ্ছত্র মত নিয়ে আবির্ভূত হলেন যিনি আমাদেরকে সাহাবীদের তাযীম ও মান-সম্মানের সবক দিতে চেষ্টা করছেন ?

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর তলবকৃত সমস্ত সোনা-রূপা মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ ছিলো—এ দাবী ও ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিলো। প্রত্যেক প্রকারের মালের এক-পঞ্চমাংশ যদি পৃথক করে নেয়া হতো এবং সোনা-রূপারও যদি শুধু এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করা হতো তবেই এ দাবী সুস্পষ্ট বিধান অনুযায়ী জায়েয হতো। সোনা-রূপা সমস্ত মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ হওয়ার দাবী তখনই সংগত হতে পারে যখন যুদ্ধলব্ধ সমগ্র মালের মূল্যও সোনা-রূপার মূল্য আলাদাভাবে নিরূপিত হয়ে সোনা-রূপার মূল্য সমস্ত মালে গনীমতের মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ হবে। বায়তুলমালে সে সময় সোনা-রূপার যে ঘাটতি ছিলো তা পূরণ করার মানসে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দাবী করেন—এ ধারণা প্রসূত কথাটিই 'আল বালাগ' সম্পাদক তাকী সাহেব বারবার পেশ করছেন। আমি এ ধারণার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করলে তিনি সুর বদলিয়ে বলেন, "এ মর্যাদা আমাদের মুহতারাম সমালোচক বন্ধুই অর্জন করেছেন যে, চৌদ্দশত বছর আগে রাজকোষে সোনা-রূপার প্রয়োজন ছিলো কি ছিলো না তার আন্দাজ তৎকালীন প্রশাসকদের চেয়ে এ লোকটিরই বেশী হয়ে থাকবে। আমাদের 'কাশ্‌ফ' ও 'ইলহামের' তো পরিপক্কতা নেই। তবে আল্লাহর দেয়া যৎ সামান্য জ্ঞান দিয়ে একথা আমাদের ধারণা হয় যে, সে সময় অর্থনৈতিক বিনিময় পদ্ধতিতে সোনা-রূপার প্রয়োজনীয়তা ছিলো অপরিসীম ও উল্লেখ-যোগ্য। কাশফ, ইলহাম, জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্ক হওয়া তো দূরের কথা অপরিপক্ক হওয়ারও দাবী করছি না। তবে এতোটুকু তো জানি যে, অর্থনৈতিক বিনিময় ব্যবস্থা কেবলমাত্র আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেই ছিলো না বরং নবুওয়াত ও

www.pathagar.com

খেলাফতে রাশেদার যুগেও এ পদ্ধতি চালু ছিলো। সুতরাং ইসলামের এ সোনালী যুগে সোনা রূপার প্রয়োজনীয়তা পরবর্তী যুগের চেয়ে বেশী না হলেও কম ছিলো না।

তারপরও কি একথা প্রমাণিত হলো যে, নবী আলাইহিস সালাম অথবা খোলাফায়ে রাশেদীন মুজাহিদদেরকে সম্পূর্ণভাবে মাহরূম করে মালে গনীমতের সমস্ত সোনা-রূপা আলাদা করে বায়তুলমালে রেখে দিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো কোনো কোনো সময় মুজাহিদদেরকে এতো প্রচুর পরিমাণে মালে গনীমত দান করতেন যে, সেগুলো বহন করা তাদের জন্যে কঠিন হয়ে পড়তো।

বায়তুলমালের অবৈধ ব্যবহার

নবী আলাইহিস সালাম খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তৎপরবর্তী শাসনামলের শুল্ক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে আমি যতোদূর অধ্যয়ন করেছি তাতে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একথা সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক প্রমাণিত হয় যে, রাজতান্ত্রিক শাসনামলে বায়তুলমালের অবস্থা ও এ সম্পর্কিত ধারণায় বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ইবনে কাসীর (বেদায়া খঃ ৭ পৃ. ১২৪) এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের যে মন্তব্য পাওয়া যায়, এরূপ হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মাসের ভাতা ছিলো ৮০ দীনার যা বড়জোর ১ হাজার দিরহাম পরিমাণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইয়াযিদের মনোনয়ন দানের জন্যে তিনি যে লাখ লাখ দিরহাম অন্যদের কাছে পাঠালেন, সে অর্থ তিনি কোত্থেকে ব্যয় করলেন? আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা মনোনীত হবার পর তাঁকে সিরিয়ার গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করলে তিনি সে নির্দেশ অমান্য করেন। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার কিসাস গ্রহণে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর গড়িমসি করার কারণে যদি তিনি খলীফার হুকুম অমান্য করার অজুহাত দেখান, তাহলে তো সে প্রতিবাদে নিজেরই সর্বপ্রথম পদত্যাগ করা উচিত ছিলো। স্বীয় পদ আঁকড়িয়ে রাখা এবং সিরিয় রাজ ভাণ্ডারের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজে তা ব্যয় করাকে কোন্ নীতির ভিত্তিতে সঠিক বলা যাবে? নিজে ইস্তফা দিয়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক অথবা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরাধিকারী রূপে যদি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কিসাসের দাবী করতেন তবুও অন্তত এটাকে বৈধ বলার একটা সুযোগ থাকতো।

www.pathagar.com

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হওয়ার পরও তিনি নিজে এবং তাঁর পদস্থ কর্মচারীগণ বায়তুলমালের ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো সতর্কতা অবলম্বন করেননি। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নর মারওয়ান সম্পর্কে সুনানে আবু দাউদের শুল্ক অধ্যায়ে এবং ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি 'ফিদাক'কে তার নিজস্ব জায়গীর বানিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি যখন ওমর বিন আবদুল আযীয সে জায়গীরটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন তখন তিনি তা পুনরায় সরকারী খাস ভূমির শামিল করে দেন। ইমাম আবু ওবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 'কিতাবুল আমওয়ালে' মারওয়ান সম্পর্কে ওরওয়ার সূত্রে পূর্ন প্রমাণ-পুঞ্জি সহকারে লিখেছেন ঃ একদিন মারওয়ান মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'আমীরুল মু'মিনীন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তোমাদেরকে মুক্ত হস্তে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এজন্যে যথেষ্ট চেষ্টাও করেছেন। তবে এক লাখ দিরহাম ঘাটতি হওয়ায় তিনি আমাকে লিখেছেন, ইয়ামন থেকে যাকাতের মাল আসলে সেখান থেকে যেনো আমি (তোমাদের জন্য) নিয়ে নেই।' হযরত ওরওয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ একথা শুনে লোকজন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানালেন। তারা বসা থেকে হাটুর উপর ভর করে মাথা তুলে চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ অসম্ভব তা কখনই হতে পারে না। আমরা যাকাতের এক কপর্দক মালও গ্রহণ করবো না। আমরা কি অপরের হক গ্রহণ করতে পারি ? ইয়ামনবাসী যাকাত সাদকা দেয় ইয়াতীম, গরীব, মিসকীন ও নিঃস্ব নিরাশ্রয়দের জন্যে। আমাদের পুরস্কার তো রাজস্ব থেকে পাওয়া উচিত। তুমি মুয়াবিয়াকে লিখ, তিনি যেনো আমাদের অবশিষ্ট উপঢৌকন পাঠিয়ে দেন। হযরত ওরওয়াহ বলেন, মারওয়ান একথা লিখলে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশিষ্ট উপঢৌকন পাঠিয়ে দেন।-[কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ২৫৯, রাওয়ায়েত নং ৬৩৫, জাহিরিয়া লাইব্রেরী, দামেস্ক, ১৩৪৮ হিজরী]

হাফেজ আবু ওবাইদ কাসেম বিন সালাম ২২৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন অতীব অনুসন্ধানী গবেষক মুহাদ্দিস। তাঁর লিখিত গ্রন্থটি ইসলামী শুল্ক ও রাজস্ব সম্পর্কিত একটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য উৎস রূপে গণ্য। তাঁর বিবৃত ঘটনায় একথা প্রতীয়মান হয় যে, জনগণ সময়মতো প্রতিকার ও প্রতিবাদে সোচ্চার না হলে সে সময় গরীব মিসকীনের অধিকার ক্ষুণ্ন হতো এবং যাকাতের মাল ভ্রান্ত খাতে ব্যয় হয়ে যেতো।

---

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বাইতের প্রতি ভর্ৎসনা

এক : হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কারের প্রমাণ

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খেলাফত ও রাজতন্ত্র' বইয়ের ১৭৪ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের ওপর ১০ লাইনের মধ্যে যাকিছু লিখেছেন তার উদ্ধৃতি দিয়ে তাকী ওসমানী সাহেব লিখেছেন :

মাওলানা (মওদূদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি) তাঁর ব্যবহৃত বাক্যে তিনটি দাবী করেছেন। এক, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রচণ্ডভাবে গাল-মন্দ করতেন। দুই, তাঁর সকল গভর্নর এ কাজে লিপ্ত থাকতেন। তিন, গভর্নরগণ হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশেই এ কাজ করতেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ ঘৃণ্য কাজে জড়িত থাকার প্রথম দাবীর সমর্থনে তিনি (মওদূদী রাহমাতুল্লাহ) তিনটি কিতাবের ৫টি বরাত পেশ করেছেন। উদ্ধৃতির প্রতিটি পৃষ্ঠা আতিপাতি করে খুঁজেছি, আশে-পাশের পাতাগুলোও মনযোগ সহকারে দেখেছি। যেহেতু মাওলানা (মওদূদী) স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, তিনি নিজে (অর্থাৎ আমীরে মুয়াবিয়া) (معاذ الله) এ "মানব চরিত্র বিরোধী" কাজ করতেন, তাই ধরে নিলাম যে, হয়তো মাওলানা (মওদূদী) এমন কোনো তথ্য রাওয়ায়েত অপর কোথায় দেখে থাকবেন আর ভুলক্রমে হাওলা দিতে গিয়ে সেই উদ্ধৃতির স্থানটি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে গেছে। সুতরাং আমি এ সম্পর্কিত তাঁর উল্লেখিত সকল উৎস গ্রন্থ চষে ফেলেছি। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোনো কথাই আমরা কোনো কিতাবে পেলাম না। অতপর مروج الذهب -এর মতো শিয়া রচিত কতিপয় ইতিহাস গ্রন্থের স্মরণাপন্ন হলাম (কিন্তু আশ্চর্য!) সেখানেও এমন কোনো কথা পাওয়া গেলো না।"

জনাব তাকী ওসমানী সাহেব হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভর্ৎসনা করার প্রশ্নে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কহীনতা প্রমাণ করার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে এর জবাবে বলতে চাই যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হওয়ার আগে এবং

www.pathagar.com

পরেও নিজ দায়িত্বে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলে বাইতের প্রতি গাল-মন্দ প্রদানের রীতি যথারীতি চালু করেন এবং বনী উমাইয়ার পরবর্তী শাসনামলেও মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে এ ঘৃণ্য রীতি পালনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। অবশেষে হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আমলে এর অবসান ঘটে। ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থসমূহে কথাটি সেই ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লেখিত হয়েছে তাতে দৃঢ়প্রত্যয় জন্ম না হয়ে পারে না। মাওলানা মওদূদীর দেয়া উদ্ধৃতিসমূহের কোনো শূণ্যতা বা দিকের পরোক্ষ উদ্ধৃতি খুঁজে না পেলে তা নিয়ে হৈ চৈ যতোই করা হোক না কেন-তাতে আসল প্রসংগ তল করা যাবে না। তাকী ওসমানী সাহেবের অভিযোগের এতদূর আমি স্বীকার করি যে, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে সমস্ত কিতাবের হাওয়ালা দিয়েছেন, সেখানে একথাটি স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে গালমন্দ দিতেন বরং একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর গভর্নরদেরকে এ কাজ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া ছিলো। কিন্তু ঐ সকল কিতাবেরই অন্যত্র খোদ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ কর্তৃক এরূপ করার কথা বর্ণিত আছে। কাজেই 'আল বালাগ' সম্পাদক জনাব তাকী ওসমানী সাহেব শব্দ ও বাক্যের মারপ্যাচ সৃষ্টি করে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিজের এ কাজ না করা এবং অপরকেও এ কাজ করতে না বলার যে ধারণা দিতে চাচ্ছেন, তার এ প্রয়াস সম্পূর্ণ ভুল ও বাস্তবতা বিরোধী। জনাব তাকী সাহেবের ভাষ্য হলো, তিনি মাওলানা (মওদূদী রহ)-এর উদ্ধৃতিমূলক কিতাব ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থের সর্বত্র চষে ফেলার পরও এ ধরনের কোনো কথা খুঁজে পাননি। এর জবাবে আমি অন্য কিতাব নয়, খোদ তাকী সাহেব যে কিতাবটি তন্ন তন্ন করে দেখেছেন বলে দাবী করলেন সেই কিতাবটি অর্থাৎ 'বেদায়া ও নেহায়াহ' থেকেই দু'টি উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

قال ابو زرعة .... عن عبد الله بن ابى نجيح عن ابيه قال : لما حج معاوية اخذ بيد سعد بن ابى وقاص وادخله دار الندوة فاجلسه معه على سريره ثم ذكر على بن ابى طالب فوقع فيه فقال : ادخلتنى دارك واجلستنى على سريرك ثم وقعت فى على تشتمه - والله لان يكون فى احدى خلاله ثلاث احب الى من ان يكون لى ما طلعت عليه الشمس ولا ميكون لى ما قال له حين غزا تبوكا الا ترضى ان تكون منى بمنزله هارون من موسى الا انه لانبى بعدى احب الي مما طلعت عليه الشمس ولا يكون لى ما قال له يوم

৬—

خيبر لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار احب الى مما طلعت عليه الشمس ولان اكون صهره على ابنته ولى منها من الولد ماله احب الىّ من ان يكون لى ما طلعت عليه الشمس لا ادخل عليك دارًا بعد هذا اليوم۔ ثم نقض رداءه ثم خرج (البداية والنهاية ج ٧ ص ٣٤١)۔

"আবু যারয়া দামেশকী আবদুল্লাহ বিন আবু ওয়াক্কাসের পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হজ্জে এসে সায়াদ বিন আবু ওয়াক্কাসের হাত ধরে দারুন নুদওয়ায় নিয়ে গিয়ে নিজের পাশে বসালেন। তারপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা উল্লেখ করে তাঁর কুৎসা বর্ণনা করেন। হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন ঃ আপনি আমাকে আপনার ঘরে নিয়ে আসলেন, নিজের আসনে বসালেন তারপরই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বদনাম ও তাঁর প্রতি গালমন্দ শুরু করে দিলেন। আল্লাহর কসম ! আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে তিনটি বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত রয়েছে তন্মধ্যে একটিও যদি আমার ভাগ্যে জুটতো তাহলে সেই যোগ্যতা আমার কাছে গোটা সৃষ্টিজগত অপেক্ষা প্রিয় হতো, যেই জগতে সূর্য উদিত হয়। হায় আফসোস ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে তাবুকের যুদ্ধে যে কথাটি বলেছিলেন ঃ সে কথাটি যদি তিনি আমার সম্পর্কে বলতেন ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, হযরত হারুন আলাইহিস সালাম যেভাবে মূসা আলাইহিস সালামের সহকারী রূপে ছিলেন, ঠিক তুমিও আমার জন্য অনুরূপ হবে ? তবে আমার পরে আর কোনো নবী নেই।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী আমার কাছে এ পৃথিবী ও তার মধ্যে যাকিছু আছে সকল কিছু থেকে অতি প্রিয়। নবী আলাইহিস সালাম খায়বার যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বললেন ঃ 'আমি পতাকা এমন ব্যক্তিকে দিব যার কাছে আল্লাহ ও রাসূল খুবই প্রিয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের কাছে সেও প্রিয়। তাঁর হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করবেন। সে ময়দান পরিত্যাগ করার লোক নয়।' হযরতের এ মহান উক্তিও যদি আমার ভাগ্যে জুটতো তাহলে তা দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হতে আমার কাছে অধিক মূল্যবান হতো। তেমনি যদি রাসূলের জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য আমার হতো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো রাসূল তনয়ার ঔরসের সন্তান আমি লাভ করতাম তাহলে

www.pathagar.com

সেটাও আমার কাছে হতো এ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। আজকের এ দিনের পর আর কখনো আমি আপনার ঘরে প্রবেশ করবো না। তারপর তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন।"

বেদায়ার ৮ম খণ্ডে ৫০ পৃষ্ঠায় ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ

كان مغيرة بن شعبة على الكوفة اذا ذكر عليا في خطبته ينتقصه بعد مدح عثمان وشيعتة فيغضب حجر هذا ويظهر الا نكار عليه -

"মুগীরা বিন শুবা কুফার গভর্নর থাকাকালীন তিনি খুতবায় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদের প্রশংসা করার পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভর্ৎসনা করতেন। এতে সাহাবী হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাগে ক্ষোভে এর তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।"

'আল বালাগ' সম্পাদক সম্ভবত এসব রাওয়ায়েতকেও পরিত্যক্ত বলার দুঃসাহস দেখাবেন এবং বিপরীত কিছু বের করার জন্যে রিজাল গ্রন্থ তথা হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্তমূলক গ্রন্থাবলীর পাতা উল্টাতে শুরু করে দিবেন। তবে তাঁকে বলে রাখতে চাই যে, এগুলোর সাক্ষ্য ও সমর্থনে রয়েছে মুসলিম, তিরমিযী, মুকাদ্দামায়ে ইবনে মাযা সহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ। এ সম্পর্কে মুসলিমের একটি হাদীসে আছে ঃ

عن عامر بن سعد بن ابى وقاص عن ابيه قال امر معاوية بن ابى سفيان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب فقال اما ماذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن اسبه لان تكون لى واحدة منهن احبُّ الى من حمرا النعم -(مسلم كتاب فضائل الصحاب باب فضائل على)

"হযরত সায়াদ বিন আবু ওয়াক্কাসের ছেলে আমের স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সায়াদকে নির্দেশ দেন এবং বললেন ঃ আবু তোরাবকে (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে) ভর্ৎসনা করতে তোমাকে কারা বাধা দিচ্ছে ? তিনি জবাবে বললেন ঃ আমি তাঁর মধ্যে যখন রাসূলের তিনটি মর্যাদাসম্পন্ন বাণীর সমাহার দেখতে পাই তখন তাঁকে গালমন্দ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এ তিনটি ফযীলতের একটি ফযীলতও যদি আমার ভাগ্যে জুটতো তাহলে সেটা হতো আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ -------।"

www.pathagar.com

তারপর হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বেদায়ায় উল্লেখিত তিনটি ফযীলতের কথা উল্লেখ করেন। পার্থক্য এতোটুকু যে, তৃতীয় মর্যাদার কথা বলা হয়েছে (মুসলিম ও তিরমিযীতে) মুবাহিলার আয়াত নাযিল (فَقُلْ تَعَالَوْ .... نَدْعُ أَبْنَاءَنَا) হলে রাসূল হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনকে ডেকে বললেন ঃ

اللهم هؤلاء اهلى

"আয় আল্লাহ ! এরা হলো আমার আহল।"

ভাবার্থের দিক থেকে উভয় কথার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিছুসংখ্যক ব্যাখ্যাতা মুসলিম ও তিরমিযীতে লেখা سب শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, শব্দটির উদ্দেশ্য গালমন্দ নয় বরং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, আপনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদ এবং সিদ্ধান্তগুলোকে ভ্রান্ত এবং আমার মত ও সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে বক্তৃতায় তুলে ধরছেন না ? কিন্তু আরবী সাবুন শব্দের এ অর্থ এখানে সম্পূর্ণ অসংলগ্ন অপ্রাসঙ্গিক। আভিধানিক অর্থ কিংবা বক্তব্যের পূর্বাপর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এরূপ অর্থের আদৌ সম্পর্ক নেই। ইজতিহাদ, মতামত বা সিদ্ধান্ত শুদ্ধ-অশুদ্ধ হওয়ার প্রশ্ন এটি নয়। অনুরূপ প্রশ্ন দেখা দিলে এখানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দিতো না। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাহাবীতো আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের জবাবে এ কারণেই হযরত আলীর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন, যেহেতু এখানে তাঁর প্রতি তিরস্কার বাণী উচ্চারণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ইবনে কাসীরের বর্ণনায় যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তাতে ব্যবহৃত শব্দটির অর্থ যে, গালমন্দ বা তিরস্কার একথা সহজেই আঁচ করা যায়। কেননা, হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথপোকথন যদি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উভয়ের মতামত ও ইজতিহাদের শুদ্ধ-অশুদ্ধ নিয়েই হতো, তাহলে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এতোটা রাগে ক্ষোভে উত্তেজিত হবার এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে আর কখনো না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে সেখান থেকে বের হয়ে আসার প্রয়োজন হতো না।[১] ফতহুল বারীতে আলীর ফযীলত অধ্যায়ে

১. এ হাদীস এবং سب শব্দটির সম্পর্কে শাহ আবদুল আযীযের একটি জবাব 'ফাতওয়ায়ে আযীযিয়ায় (পৃঃ ৪১৩ অনুবাদ প্রকাশ সাঈদ কোং) আছে। তিনি বলেছেন, শব্দটির শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করাই ভালো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভর্ৎসনা করা কিংবা ভর্ৎসনা করার নির্দেশ দেয়ার ঘৃণিত কাজটি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হয়েছিলো একথা অপ্রিয় হলেও সত্য। তবে এটা ইসলামের প্রথম ঘৃণ্য কাজ নয়। কেননা নিধন কাজের তুলনায় এটাতো খুবই কম ঘৃণিত। হাদীসে

www.pathagar.com

মুসনাদে আবু ইয়ালার বরাত দিয়ে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বাক্যটির উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

لو وضع المنشار على مفرقي على ان اسب عليا ما سببته ابدا -

"হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভর্ৎসনা করার জন্যে আমার মাথায় করাত রাখলেও তা আমি কষ্মিনকালেও করতে পারবো না।"

এসব রাওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভর্ৎসনা করার রীতি সাধারণভাবেই চালু রাখেন। এমনকি হযরত সায়াদের মতো সম্ভ্রান্ত সাহাবী যিনি আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম এবং ফেতনার যুগে সম্পূর্ণ নির্জনবাসে চলে গিয়েছিলেন, তাঁকে উল্লেখিত নির্দেশ অমান্য করার দরুন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। অবশ্য তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠতার সাথে সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর নীতিতে ছিলেন সোচ্চার এবং অনমনীয়। জনাব তাকী ওসমানী সাহেব সম্ভবত মিম্বারের কথা উল্লেখ না থাকার ছিদ্র আবিষ্কার করে থাকবেন। তবে আমার কথা হলো যে, কাজের নির্দেশ দেয়ার পর তা পালিত না হওয়ায় কৈফিয়ত তলব করা হয় সে কাজ প্রকাশ্যে না হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। তবুও যদি ধরে নেয়া হয় যে, কাজটি মিম্বরে দাঁড়িয়ে নয় বরং আসনে বসে করা হয়েছে তাতেও কি দোষের পরিমাণ কমে যাবে? বরং এভাবে তো প্রাইভেট সভায় গালমন্দের ঘৃণিত কাজ গীবতের মতো জঘন্য দূষণীয় কাজকেও একত্রিত করে ফেলে।

নাতিদীর্ঘ প্রতিবাদ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ভর্ৎসনার ব্যাপারটিকে একেবারে অবাস্তব ও কাল্পনিক প্রমাণ করার জন্যে জনাব তাকী ওসমানী সাহেব দু'টি যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত বরণ করলে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ জীবিতাবস্থায় যাঁর সাথে লড়াই করলেন এখন তাঁর মৃত্যুতে রোদন করছেন কেন? এখানে 'লড়াইয়ের' কথা আছে গালমন্দ করার কথা নেই। সুতরাং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার অপবাদ আদৌ ঠিক নয়।

তো পরিষ্কার ঘোষণা হয়েছে سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر 'মু'মিনকে গালমন্দ করা পাপ কাজ আর হত্যা করা কুফরী। হত্যা এবং হত্যা করার নির্দেশ পূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে যখন অস্বীকার করার উপায় নেই তখন এ অপরাধে দোষী ব্যক্তিকে অন্ততঃ কবিরা গুনাহগার মনে করাই ভালো। তবে গালমন্দ করা থেকে মুখ সংযত রাখা উচিত।

www.pathagar.com

কি অপূর্ব যুক্তি !১ ওসমানী সাহেবের যুক্তিটির জবাবে শাহ্ আবদুল আযীযের উক্তিটিই প্রযোজ্য। সেটা হলো, "খলীফা-এ-রাশেদ এবং ন্যায় ও সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটা ভর্ৎসনা বা গালমন্দের চাইতেও জঘন্য।" জনাব ওসমানীর যুক্তিটি একথারই প্রতিধ্বনি নয় কি যে, মু'মিনের সঙ্গে লড়াই বা তাকে হত্যা করার অপরাধ যত বড় গুনাহের কাজই হোক না কেন এতে তো গালমন্দ করার অপরাধ (فسوق) হয়নি ? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ঘটনায় হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অশ্রু বিসর্জন দেয়ার ঘটনাটি হযরত আবু তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবিতাটির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

لا الفينك بعد المزت تنربى – وفى حياتى مازودتنى زادى-

"এমন অবস্থায় আমি তোমাকে পেতে চাই না যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি শোক প্রকাশ করবে, আর আমার জীবনে তুমি আমার জন্যে কোনো উপকরণের ব্যবস্থা করবে না।"২

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্রন্দন তাঁর বিরোধিতা না করার দলীল নয়। বরং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সুযোগ্য, বিচক্ষণ, খোদাতর্স ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মুকাবিলায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিরোধিতা করা কতবড় অন্যায় হয়েছে সে অনুশোচনারই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর কান্না এটা প্রমাণ করে না যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে অনুরূপ করেননি।

অতপর মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে এ ঘটনা উদ্বৃত করেন যে, বুশর বিন আরতাত, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত যায়েদ বিন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থিতিতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভর্ৎসনা করলে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, তুমি আলীকে গালি দিচ্ছো ? অথচ তিনি ইনার (হযরত যায়েদ) দাদা ছিলেন। কি আশ্চর্য ধরনের যুক্তি ! এ ঘটনা দ্বারাও জনাব তাকী ওসমানী সাহেব প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর গভর্নর হযরত আলীকে ভর্ৎসনা করার অভিযোগে অভিযুক্ত নন। অথচ এ ঘটনা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, গভর্নরদের মধ্যেও এতদূর

১. কপালে আঘাতজনিত কারণে মৃত ব্যক্তিকে দেখে কোনো রসিক দর্শক মন্তব্য করলো ঃ ভাগ্যিষ ! চোখ দু'টি রক্ষা পেয়েছে।

২. হযরত আবু তোফায়েলের জীবনীতে এ ঘটনা ও কবিতাটি উসুদুল গাব্বায় ৫ম খণ্ডে উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

উদ্ধত্য ও বেপরোয়াভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো যে, তারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আপনজনদের উপস্থিতিতেও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ দিতে দ্বিধাবোধ করতো না। বুশর বিন আরতাত ছিলেন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োজিত মদীনার গভর্নর। তিনি এরূপ অসৌজন্যমূলক উক্তি করাতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তাকে বাধা দেয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা ঐ সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর কি হয়েছিলো? 'আল বালাগ' সম্পাদক সেটা উল্লেখ করেননি। ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি সে সম্পর্কে বলেন: ثم ارضاهما جميعا। "অতপর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেন।"

অথচ এ ক্ষেত্রে হযরত যায়েদের এ সমঝোতায় রাজি হবার ধরনটা যে কি ছিলো, তা সহজেই অনুমেয়। গভর্নরের এ জঘন্যতম ও নির্মমতম মন্তব্যে রাগে ক্ষোভে অন্তরে অন্তরে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও বাহ্যত সংযমীর ভাব দেখানো ছাড়া তাঁর করার আর কি ছিলো? একজন ব্যক্তি তাঁর (আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু) সামনে একজন অতি শীর্ষস্থানীয় সম্ভ্রান্ত সাহাবীর প্রতি ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করলো, তাতে তিনি সন্তুষ্ট হননি ঠিকই কিন্তু একজন পরলোকগত মহান ব্যক্তি প্রসঙ্গে তাঁর আপনজনদের সামনে এহেন মন্তব্যকারীকে কোনোরূপ শাস্তি না দিয়ে তাকে বাধাদান কিংবা উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেয়াই কি যথেষ্ট? অথচ এই হলো হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে জনাব তাকী ওসমানী সাহেবের স্বস্তির সাথে সাফাইনামা পেশের নমুনা। সম্ভবত আজও কেউ নবী বংশের কোনো ব্যক্তির সামনে হযরত আলীকে গালমন্দ দিলে তাকী ওসমানী সাহেবরা উভয়ের মধ্যে শুধুমাত্র রাজীনামা করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট মনে করবেন। বিভিন্ন স্থানে গভর্নর বুশর বিন আরতাত কর্তৃক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি গালাজ করার প্রসংগটি স্বীকৃত সত্য এবং ইতিহাস বিবৃত। "হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের উভয়কে রাজী করিয়ে দেন"—এ বাক্যের পটভূমি জ্ঞাতসারেই 'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেব গোপন করলেন কোন্ উদ্দেশ্যে? বুশর বিন আরতাত কর্তৃক মদীনার মসজিদে মিম্বরে দাঁড়িয়ে শত শত লোকের সামনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। যেমন, তাবারী ৪র্থ খণ্ড, ১২৮ পৃঃ, তারিখুল কামাল খণ্ড ৩ পৃঃ ২০৭ এ উল্লেখ আছে বুশর খুতবা দেয়ার সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভর্ৎসনা করতো।

www.pathagar.com

অদ্ভুত যুক্তি

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী সাহেবের বক্তব্য হলো—মাওলানা মওদূদী সাহেবের দাবী তখনই প্রমাণিত হওয়া সম্ভব হতো যদি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সমস্ত গভর্নরদের একটি তালিকা তৈরি করে প্রত্যেকের নামে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর গালাগালী সম্বলিত আদেশটি তুলে ধরতে পারতেন। এ অদ্ভুত যুক্তির জবাবে আমাদের বক্তব্য হলো বেশ কিছু সংখ্যক রাওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে এবং কতিপয় গভর্নরকে এরূপে কাজ করতে নির্দেশ দেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার নীতি সরকারী একটি প্রশাসনিক নীতি ছিলো। একথার সাক্ষী হচ্ছে প্রচুর ঐতিহাসিক রাওয়ায়েত। দু' একজন আলেমের পক্ষে এটা কি করে সম্ভবপর যে, তারা নিজেরা এমন সাংঘাতিক কথা রচনা করার উদ্ধত্য দেখাবেন আর সাধারণ মুসলমান কিংবা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে তা উপেক্ষা করে যাবেন।

তারপর "আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভর্ৎসনা করতে কোন্ বস্তু তোমাকে বাধা দিচ্ছে"—এ ভাষায় হযরত সায়াদের কাছ থেকে আমীরে মুয়াবিয়ার কৈফিয়ত তলব করা একথারই ইংগিত যে, গোপনে প্রকাশ্যে সর্বত্র এ নীতি সাধারণভাবে চালু ছিলো এবং হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ প্রচলিত প্রশাসনিক নীতির বিরোধিতা করার কারণেই তাঁকে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির পেশকৃত রাওয়ায়েত সম্পর্কে 'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেব লিখেছেন, তাঁর কথা সাময়িকভাবে সঠিক বলে ধরে নিলেও বড়জোর দু'জন গভর্নরের ওপর এ অপবাদটি প্রয়োগ হতে পারে। সমস্ত গভর্নরকে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ দেয়ার কথা ঠিক নয়। ওসমানী সাহেবের এ কথায় স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, যদি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একাজ না করতেন এবং শুধু দু' একজন গভর্নরকেই তা করার নির্দেশ দিতেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলতেন যে, আপনি যে কাজ নিজে করেন না, এবং অপর কাউকেও এ কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন না, তাহলে আমাদের থেকে কেন এরূপ কাজের প্রত্যাশা করছেন?

আর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কোনো গভর্নর ব্যক্তিগত আক্রোশে এমন ঘৃণ্য কাজ করতো, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে এজন্য আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভর্ৎসনার শিকার হতে হতো। কিন্তু যেসব গভর্নরের কথা উল্লেখিত হলো, তাদের ব্যাপারে এমন কোনো বর্ণনা নেই যে, তারা কোনো ওজর-আপত্তি পেশ করেছে কিংবা ভর্ৎসনাকারী

www.pathagar.com

কোনো গভর্নরের কোনো প্রকার কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে বা তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের প্রমাণ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভর্ৎসনা করার প্রমাণ ইতিহাস ছাড়া হাদীস গ্রন্থেও পাওয়া যায়। যেমন মুসনাদে আহমদে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কয়েকটি রাওয়ায়েত আছে। তিনি কতিপয় সাহাবীর কাছে অভিযোগ করলেন ঃ

ايسب رسول الله تيكم على المنابر

"তোমাদের সামনে রাসূলুল্লাহর ওপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে গালমন্দ করা হয় কি ?"

লোকেরা বললেন ঃ انى ذالك "কেমন করে ?"

উম্মে সালমাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ

اليس يسب على ومن احبه ؟ اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه-

"আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কি গালী দেয়া হয় না ? (যদি তাই হয়) এভাবে কি তাঁকে (অর্থাৎ রাসূলকেও) গালমন্দ করা হচ্ছে না, যিনি তাঁকে মহব্বত করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে (হযরত আলী) ভালোবাসতেন।"

এসব হাদীসে মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার যে কথা উল্লেখ আছে তা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেই যে হয়েছিলো তা এক প্রকার নিশ্চিত। কেননা উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল হয়েছিলো ৫৯ হিজরী সনে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের এক বছর আগে। আবু দাউদের সুন্নাত অধ্যায়ের 'আল খোলাফা' পরিচ্ছেদে হযরত সায়ীদ বিন যায়েদ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। মুসনাদে আহমদে হাদীসটির বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, কুফার গভর্নর হযরত মুগীরা বিন শো'বার উপস্থিতিতে একজন লোক মসজিদে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনবরত গালাগাল দিচ্ছিলো (سب وسب)। হযরত সায়ীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন ঃ আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, আপনার সামনেই রাসূলের সাহাবীকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে ঃ অথচ আপনি তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ ও তা বন্ধ করছেন না ? আমি

www.pathagar.com

রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী ----- জান্নাতী। তারপর হযরত সায়ীদ বেহেশতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর নাম বললেন। তিনি নিজেও তাঁদের মধ্যে শামিল ছিলেন। হাদীসটি মুসনাদে আহমদ ছাড়া তারিখে বুখারী, ইবনে মাযার ফাযায়েলে সাহাবীতে আছে। আল্লামা আহমদ মুহাম্মদ শাফেঈর লিখিত সংস্করণের ৩য় খণ্ডের ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মুসনাদে আহমদে ঐ সংস্করণের ১১০, ১১২ পৃষ্ঠায় আরো তিনটি হাদীসে আছে ঃ

خطب المغيرة بن شعبة فنال بن علي

"মুগীরা বিন শোবা খুতবায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করেন।"

হযরত সায়ীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জোর প্রতিবাদ করে বলেন ঃ দশজন বেহেশতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত (আশারায়ে মুবাশশারা) সাহাবীর অন্যতম হলেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। আশ্চর্য ! তুমি তাঁকে গাল দিচ্ছো। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস উস্তাদ শাকের হাদীসগুলোর সনদকে সহীহ বলেছেন। তিনি রিজাল শাস্ত্রে ছিলেন পারদর্শী।

হযরত সায়াদ বিন আবু ওয়াক্কাস[১] রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত সায়ীদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ে ছিলেন অত্যন্ত উঁচু দরের সাহাবী। এরূপ ঘৃণ্য তৎপরতার বিরুদ্ধে কণ্ঠ সোচ্চার করা ছিলো তাঁদের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। জনগণের মধ্যে অন্যান্যরা এমন তৎপরতা নিরবে অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এমন ধারণা করা আদৌ ঠিক নয়। জনসাধারণের জোর প্রতিবাদের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে আলোচনা প্রলম্বিত হয়ে যাবার ভয়ে তা থেকে বিরত রইলাম। সচেতন পাঠকবর্গের জন্যে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পর

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গাল-মন্দ দেয়ার ধারা যদি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় সীমাবদ্ধ থাকতো, তাঁর শাহাদাতের পর এ

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দশজন সাহাবীকে বেহেশতের শুভ সংবাদ দিয়েছেন তারাই 'আশারায়ে মুবাশশারা' নামে ইতিহাসে খ্যাত। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাত ব্যক্তির মধ্যে হযরত সায়ীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অন্যতম। হযরত সায়ীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাচাতো ভাই এবং ভগ্নিপতি ছিলেন। তার দাওয়াতে হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

ধারার চির অবসান ঘটতো। তাহলে সান্ত্বনার ক্ষীণ আশা করে এ তিক্ততা ভুলা যেতো। কিন্তু বড়ই বিড়ম্বনা যে, এ ঘৃণ্য ধারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজত্বকালে এবং তৎপরবর্তী শাসনামলে যথারীতি জারী থাকে। হযরত সায়ীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপরোল্লেখিত ঘটনাটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পরই সংঘটিত হয়। কেননা লড়াইয়ের সময় হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলের সংগ থেকে পৃথক হয়ে 'আকীক' নামক জায়গায় নির্জনবাসে চলে যান। সে সময় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা মদীনায় আসার সুযোগ পায়নি। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সমঝোতা চুক্তি হওয়ার পরই তিনি মক্কায় হজ্জ করতে আসেন এবং মদীনায়ও গমন করেন। সে সময় হযরত সায়ীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার সাক্ষাত ঘটে এবং আপোষে প্রশ্নোত্তরের সুযোগ হয়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতে তলোয়ারের ঝনঝনানী বন্ধ হলেও বাকযুদ্ধের অবসান ঘটেনি। এ কারণেই হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সন্ধি করার সময় তাঁর মুহতারাম পিতাকে অন্ততঃ তাঁদের সামনে গাল-মন্দ না দেয়ার শর্ত আরোপ করেন। একথা থেকেই কি অবস্থার নাজুকতা সহজে অনুমান করা যায় না ? ইমাম ইবনে জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে ১২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

صالح الحسن معاوية .... على ان لايشتم على وهو يسمع

"হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে স্বাক্ষরিত সন্ধিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিলো এই যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এমনভাবে গালমন্দ দেবে না যা তাদেরকে শুনতে হয়।"

ইমাম যাহবী 'আল ইবার' ১ম খণ্ডের ৪৮ পৃষ্ঠায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর লেখাটির কথা উল্লেখ করেন ঃ

ان لايسب عليًا بحضرته

"হাসানের উপস্থিতিতে যেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালাগাল না করা হয়।"

ইবনে কাসীর বেদায়ার ৮ম খণ্ডের ১৪ পৃষ্ঠায় সন্ধির একটি শর্তের কথা এভাবে লিখেছেন ঃ

وان لايسب على وهو يسمع فاذا فعل ذالك نزل عن الامر

www.pathagar.com

"আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ না করা যা তিনি শুনে আসছেন। এ শর্ত মেনে নেয়ার পর তিনি (শান্তি ও ঐক্যের সাথে) ক্ষমতা ত্যাগ করেন।"

ইবনে আসীর রাহ্মাতুল্লাহ্ 'আল কামেল' ২য় খণ্ডের ২০২ পৃষ্ঠায় আরো লিখেছেন ঃ

ان لايشتم عليا فلم يجبه الى الكف عن شتم على فطلب ان لايشتم وهو يسمع فاجابه الى ذالك ثم لم يف به ايضا -

"হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যেন গালমন্দ না করা হয়। কিন্তু তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকারও করলেন। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের শুনতে হয় অন্তত এমন অবস্থায় গালাগালি থেকে বিরত থাকার দাবী করেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দাবী মানলেন বটে পূরণ করেননি।"

ইবনে আসীর রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহির এ রাওয়ায়েতটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শুনিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ না করার যে সংক্ষিপ্ত শর্ত ইবনে কাসীর রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি ও তাবারী রাহ্মাতুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন ইবনে আসীর রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহির এ বর্ণনায় তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রথমত তিনি গালমন্দ করার প্রথা সমূলে বন্ধ করার দাবী করেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দাবী মানতে অস্বীকার করলে অন্তত তাঁদের সামনে গালমন্দ না করার ন্যূনতম দাবী পেশ করেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সন্ধিপত্রে শর্তটি মেনে নিলেও বাস্তবে তা পালিত হয়নি।

মুহাম্মদ তাকী ওসমানীর যুক্তি অনুযায়ী বিষয়টি যদি স্বকপোলকল্পিত হতো অথবা একজনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতো তাহলে শান্তি চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিষয়টি শর্ত হিসেবে সংযোজিত হওয়ার হেতু কি হতে পারে তা ওসমানী সাহেবরা বলবেন কি ? প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণই বিষয়টিকে এমনভাবে ব্যক্ত করেন যেনো এটা একটি স্বীকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব, যার মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। যেমন ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফতহুল বারীতে 'কিতাবুল মানাকেবে' হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

ثم كان من امر على ما كان فنجمت طائفة اخرى حار بوه ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا العنه على المنابر سنة ووافقهم الخوارج على بغضه -

www.pathagar.com

"হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে যা হওয়ার তা তো হলো। পরবর্তীতে একদল লোকের অভ্যুদয় ঘটলো যারা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে দিলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোষ চর্চায় লেগে গেলো এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিসম্পাত করাকে তারা নিজেদের নীতি বানিয়ে নিলো এবং খারেজীরা বিদ্বেষবশতঃ তাদের সাথে সুর মিলালো।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত দলটিই যে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর সাথী ও কর্মচারী বৃন্দ তা সুস্পষ্ট। এসব তত্ত্ব ও তথ্য থেকে চোখ, মুখ, কান বন্ধ করে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কি ? উম্মতে মুহাম্মদীর কারও পক্ষে নবী দৌহিত্রকে হত্যা করা অসম্ভব—শুধু এ যুক্তিতে মির্জা হযরত দেহলভী একবার কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনাকে অস্বীকার করে বসলো। তাকী ওসমানী সাহেবদের যুক্তিতর্কে এমন সুরই যেনো অনুরনিত হচ্ছে।

আমি মনে করি, এ বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়ে গেছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার ঘটনা অবাস্তব এবং অসম্ভব বলে জনাব তকী ওসমানী যেই দলীল ও যুক্তি পেশ করেছেন। এর জবাবও যথেষ্ট হয়েছে। তবুও মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির এ সম্পর্কে উপস্থাপিত রাওয়ায়েতসমূহের যেই সমালোচনা করা হয়েছে, সে ব্যাপারে কিছু কথা বলা সঙ্গত মনে করছি।

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইবনে জারীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুগীরাকে কুফার গর্ভনর নিয়োগের সময় উপদেশ দিয়েছিলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার ও গালমন্দ করা থেকে বিরত থেকো না। ওসমানী সাহেব এর জবাবে লিখেছেন ঃ এ রাওয়ায়েতেরই একটু আগে আছে হযরত মুগীরা কেবলমাত্র হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া করতেন। আসলে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করার নির্দেশ পরিস্কার ভাষায় দিয়েছিলেন। এখন হযরত মুগীরা এ হুকুম যদি অমান্য করেই থাকেন, তাহলে এ প্রশংসনীয় কাজের দাবীদার হযরত মুগীরা। কিন্তু তাতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কাজের নির্দেশ দেয়া থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পরিবর্তে জড়িয়ে পড়েন কি না তা তাকী ওসমানী সাহেব তলিয়ে দেখেছেন কি? সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি রাওয়ায়েত দ্বারা একথা নিসন্দেহে

www.pathagar.com

প্রমাণিত যে, হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবায় তিরস্কার করতেন। হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন সচেতন ও বিচক্ষণ শাসক। তাঁর নীতি ছিলো সাপও মরবে কিন্তু লাঠিও ভাংগবে না। কখনো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম সরাসরি উল্লেখ না করে ইশারা ইংগিতে তিরস্কার করা সেই নীতির পরিচায়ক বৈকি ! তাতে একদিকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রাজী থাকেন, অপরদিকে আলীর প্রভাবিত কুফাতে তাঁর মর্যাদা ও গভর্নরীও নিরাপদ থাকে। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সমর্থকগণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী বলে প্রকাশ্যেই বলতেন। (নাউযুবিল্লাহ) সুতরাং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া করার উদ্দেশ্য যে এখানে হযরত আলী তা সহজেই অনুমেয়। ইশারা ইংগীত অনেক সময় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে অধিক কার্যকর ও অন্তর বিদীর্ণকারী হয়ে থাকে।

ইতিহাস বেত্তাদের আলোচনা

মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেবের সমালোচনার অপর শিকার হলেন ঐ সমস্ত রাবী তথা ঘটনার বর্ণনাকারী, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ যাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। তিনি এ ঘটনার বর্ণনাকারীকে শিয়া, মিথ্যাবাদী, অজ্ঞাত, অচেনা ব্যক্তি বলেছেন। আশ্চর্য ! যেসব রাবীর বর্ণনায় অন্যান্য আলেমদের কিতাব রচিত সেসব রাবীর নাম মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রচিত 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে দেখেই ভদ্র মহোদয়গণ রাবীদের জবীন চরিত গ্রন্থ সামনে নিয়ে একেকজনের জীবন বৃত্তান্ত শুনাতে বসে গেলেন।

এমনকি ব্যাপারটি এতোটা গড়ায় যে, যেসব ঘটনা ও রাওয়ায়েত কতিপয় বুযর্গ ইতিপূর্বে নিজেরাই তাদের গ্রন্থসমূহে নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন সেসব রাওয়ায়েত 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' বইয়ে দেখে এবার তারা ছিদ্রান্বেষণে লেগে যায়। এ প্রসংগটি এবং বর্তমান অবস্থা বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তা-ভাবনার মুখাপেক্ষী। এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা স্বতন্ত্র নিবন্ধে করাই সম্ভব। তা সত্ত্বেও এখানে কতিপয় ইংগীত পেশ করা জরুরী মনে করছি। আর এ বিষয়ে প্রথমত যে প্রশ্নের উদ্রেক হয় তাহলো ঃ

এসব রাবী যদি সত্যিই মিথ্যাবাদী, শিয়া বা অজ্ঞাতই হবেন, তাদের বর্ণনা যদি ভুল এবং গ্রহণযোগ্যই না হবে, তাহলে আহলে সুন্নাত জামায়াতের স্বীকৃত ইতিহাসবিদ ইমামগণ সেসব মিথ্যা রাওয়ায়েত গ্রহণ করলেন কেন ? তাকী ওসমানী সাহেবও অন্যান্য মহোদয় এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, ইতিহাসবিদগণ

www.pathagar.com

প্রত্যেক রাওয়াতের সনদ বর্ণনা করে সত্য মিথ্যা যাঁচাই করার দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ করেছেন। তাদের এ জবাব কতিপয় কারণে ভুল এবং অগ্রহণযোগ্য।

প্রথমত এসব ইতিহাসবিদগণ একাধারে হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে ছিলেন অভিজ্ঞ। তাঁরা রাবীদের সম্পর্কে আমাদের চেয়ে শতগুণে বেশী জ্ঞাত ছিলেন। বরঞ্চ রাবীদের শিয়া, সুন্নী, দুর্বল, সবল হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মানদণ্ড হলো তাদের মধ্যে কারো রচিত গ্রন্থরাজি। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী সম্পর্কেও তাঁরা অনবহিত ছিলেন না, যেমন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع। অর্থাৎ "কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হবার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই অপরের কাছে প্রচার করে বেড়ায় (তার বস্তুনিষ্ঠতা পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব পালন করে না)।

এ রাবীগণের বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনা যদি নিছক মিথ্যার বেসাতী হয়, তাহলে মিথ্যা প্রচারনার অপরাধ হতে ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণকে কিভাবে অব্যাহতি দেয়া যাবে ? কেননা তাঁরাও সমালোচক মহোদয়গণের কথা অনুসারে মিথ্যা বর্ণনার সনদে নিজেদেরকে জড়িয়েছেন। ৫/১০টি ঘটনা হলেও না হয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে মেনে নেয়া যেতো। কিন্তু তাদের বর্ণনায় আমাদের ইতিহাস গ্রন্থ যে কানায় কানায় ভর্তি। এগুলো মিথ্যা, শিয়া, জাল, দুর্বল, অজ্ঞাত পরিচয় ইত্যাদির নামে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে আমাদের ঐতিহাসিকদের সততা ও বিশ্বস্ততা কিভাবে রক্ষা পাবে ? তাহলে এ ধরনের নিরর্থক ও বাজে কাজে তাদের জীবনের অমূল্য সময় ব্যয় করা তো বুদ্ধিমানের পরিচয় হয়নি। আর যদি এ ধরনের কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখাই দিল, তবে তো হাদীসগ্রন্থের ন্যায় সহীহ ও মওযু বা সত্য ও মিথ্যা রাওয়াতে আলাদা করে ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত ছিলো। অথবা প্রত্যেক রাওয়ায়েতের প্রথমে কিংবা শেষে কোন্ কোন্ রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, তার তালিকা থাকলে ভালো হতো। ইতিহাস গ্রন্থ রচনায় যখন এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বরং প্রথম থেকে অদ্যাবধি গোটা জাতির কাছে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়ে আসছে, তখন এগুলোর যথার্থতা ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়ারই আশা করা যায়। নিছক মিথ্যার বেসাতি হলে সমকালীন পণ্ডিত ও সচেতন লোকগণ এর ঘোর প্রতিবাদ করতেন এবং বংশ পরম্পরায় এর বিস্তৃতি ঘটতে দিতেন না। ইবনে জারীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বিরুদ্ধে শিয়া ঘেষা হবার অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে। যদিও কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করতে চাই যে, যদি তিনি শীয়া-ই হবেন, তাহলে আবু হানীফা দিনওয়ারী, ইবনে আসীর, ইবনে কাসীর, যাহবী, ইবনে আবদুল বার, ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রমুখ শিয়া ছিলেন কি ? তাঁরা তো সকলেই ইবনে জারীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অনুরূপ রাওয়ায়েত কম-বেশী অবশ্যই বর্ণনা করেছেন। আর 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে তাদের উদ্ধৃতি দেখেই হৈ চৈ শুরু করে দেয়া হলো। তাহলে অন্য সকলের বর্ণনা থেকে চোখ বন্ধ করে শুধু ইবনে জারীরের বর্ণনা নিয়ে এতো হৈ চৈ করার মতলবটা বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়। এটা সত্যিই হাস্যাস্পদ কথা যে, একদিকে তাঁরা মিথ্যা রাওয়ায়েত দ্বারা নিজেদের বইসমূহ পাঠপূর্ণ করে রেখেছেন, আর অপর দিকে সাথে সনদ জুড়ে দিয়ে এ কাজটি অপরের ঘাড়ে সোপর্দ করেছেন যে, তারা সত্য মিথ্যার মধ্যে নিজেরাই পার্থক্য করছেন। এর অর্থ দাঁড়ায় এই, যে ব্যক্তি ইতিহাস গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে চায় তাকে লিসানুল মিযান, তাহযীবুত তাহযীব, কিতাবুল জারাহ ওয়া তাজীল ইত্যাকার মোটা ভলিয়মের বই সামনে রেখে বসতে হবে। তারপর প্রত্যেক আসন্ন রাবীর জীবন বৃত্তান্ত পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে যাঁচাই-বাছাই করতে হবে। অথচ নীতিগতভাবে মর্মদ্ঘাটনের জন্যে এ ধরনের রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক হাদীসের সাহায্য নেয়া হয়। ঐতিহাসিক ঘটনায় এগুলোর প্রয়োগ ঠিক নয়।

প্রত্যেক ইতিহাসবিদ তার ইতিহাসে সনদ উল্লেখ করার যে দাবীটি জনাব তাকী ওসমানী সাহেব করেছেন, তার দাবীটি বাস্তবতা বিরোধী। কেননা ইবনে জারীরই প্রত্যেক রাওয়াতের সনদ বর্ণনা করতেন। অথচ সমকালীন ঐতিহাসিক আবু হানীফা দিনওয়ারী (মৃঃ ২৮২ হিজরী) তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'আখবারুত তিওয়ান'-এ সনদের কথা কদাচিত উল্লেখ করেছেন। বরং قال (তিনি বলেছেন) কিংবা قالوا (তাঁরা বলেছেন) বলে ঘটনার বর্ণনা করেছেন। অথচ তাঁদের রচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলো বিশ্ব স্বীকৃত ও উপাদানে সমৃদ্ধ। অধিকন্তু ইবনে আসীর ও ইবনে খালদুনের মতো জগত বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণও সনদ প্রধানত উল্লেখ করেননি। তাহলে তাঁদের রাওয়ায়েতের সনদ যাঁচাই করা হবে কোন্ উপায়ে ? নাকি এগুলো বিনষ্ট করে ফেলা হবে ? উদাহরণ স্বরূপ বলছি, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির লেখায় ইবনে জারীরের বরাত দিয়ে আবু মুখান্নাফ নামীয় জনৈক রাবীর কথা আছে। মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব ইবনে আদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁকে জলজ্যান্ত শিয়া—ঘোষণা করেন। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অন্যান্য সমালোচকগণও রাবী আবু মুখান্নাফকে নির্দয়ভাবে গালাগল করেছেন। অথচ ইবনে জারীরের 'ফেতনার যুগের ইতিহাসের' প্রায় ৮০% ভাগ সে রাবীই

www.pathagar.com

বর্ণিত। এগুলোর সবই যদি মিথ্যা হতো তাহলে 'তারীখে তাগরীতে' হাত লাগানোও মস্তবড় অবরাধ হওয়া উচিত ছিলো। অথচ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি, ইবনে হাজার, ইবনে আসীর, ইবনে খালদুন প্রমুখ খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ তাদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থসমূহের উৎস ও মূল হিসেবে 'তারীখে তাবারীকে' উল্লেখ করেছেন। শিয়াদের চিরশত্রু ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, আমি শিয়াদের রাওয়ায়েত এড়িয়ে ইবনে জারীরের (র) রাওয়ায়েত গ্রহণ করেছি। বেদায়ার ৭ম খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন ঃ ذكر ابن جرير عن ابى مخنف لوط بن يحيى وهو احدائمة هذا الشان। ঐ কিতাবেরই ৮ম খণ্ডে ১৭২ পৃষ্ঠায় কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনার শিরোনামে লিখিত আছে ঃ

وهذه صفة مقتله ما خوذة من كلام ائمة هذا الشان لاكما يزعمه اهل التشيع من الكذب-

"এটা ইসলামী ইতিহাসের ইমামদের থেকে গৃহীত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের বর্ণনা শিয়াদের বানোয়াট বর্ণনা নয়।"

এ শিরোনামের পরপরই তিনি লিখলেন ঃ قال ابو مخنف আবার কোথাও আবু মুখান্নাফ রাহেমাহু লিখেন। এতে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি আবু মুখান্নাফকে মিথ্যাবাদী এবং কট্টর শিয়া ধারণা করার পরিবর্তে তাঁকে ইতিহাস শাস্ত্রের একজন ইমাম গণ্য করছেন ? অনুরূপভাবে ওয়াকেদীর কতিপয় রাওয়ায়েত 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে স্থান পাওয়ার কারণে তাঁকে সমালোচনার শিকার বাঁচানো হয়। অথচ শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী মাদারিজুন নবুওয়াত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

موسى بن عقبه ابن اسحاق الواقدى ازا كابر علماء سير اند -

"মুসা বিন ওকবাহ, ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদী অধিক প্রখ্যাত আলেম ছিলেন।" মাওলানা আনোয়ার শাহ সাহেবের মন্তব্য মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উল্লেখ করেছেন। ইবনে মাযায় ওয়াকেদীর রাওয়ায়েতে রয়েছে। ইমাম যাহবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির 'মিযানুল ইতেদাল' গ্রন্থে ওয়াকেদীর নির্ভরতা ও দুর্বলতার কতিপয় উক্তি তুলে ধরেছেন। এক জায়গায় তিনি মুজাহিদ বিন মূসার বরাত দিয়ে লিখেছেন, আমি ওয়াকেদীর চেয়ে অধিক সতর্ক হাফিজ থেকে আর কারো রাওয়ায়েত লেখিনি। ইমাম যাহবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

صدق كان الى حفظه المنتهى فى الاخباء والسير والمغازى والحوارث وايام الناس والفقة وغير ذلك -

"মুজাহিদ সত্য বলেছেন, ইতিহাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঘটনাপ্রবাহ, জীবনী, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকেদীর স্মৃতিশক্তি আমাদের জন্যে উৎস ও মাধ্যম।"

মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব ও অপরাপর সমালোচক বন্ধুদের প্রতি আমার সবিনয় অনুরোধ, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে হটকারিতা করে আবেগ তাড়িত ও ভাবপ্রবণ হয়ে ইতিহাস ও ইতিহাস বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে পারভেজ ও মুনকেরীনে হাদীসের অনুরূপ হবেন না। পারভেজ হাদীস ও রাবীদের ব্যাপারে এবং হাদীস অস্বীকারকারীগণ ইসলামের ইতিহাস অস্বীকৃতিতে একই নীতি অবলম্বন করেছেন। অনুরূপ তৎপরতা ও নীতিতে জড়িয়ে পড়া তাদের পক্ষে সঙ্গত নয়। ওসমানী সাহেব ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস পরিহার করে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আপনার মুহতারাম পিতার রচিত 'শহীদে কারবালা' বইখানি একটু পড়ে দেখুন তো সেখানে আবু মুখান্নাফসহ অন্যান্য আহত রাবীদের রাওয়ায়েত আছে কি নেই। একে কেন্দ্র করে تحقيق مزيد -এর ২৩৮ পৃষ্ঠায় মাহমুদ আব্বাসী লিখেছেন—মুফতী সাহেব এতে হিন্দু পৌরানিকতার ঢংয়ে বিভিন্ন কথা মুখান্নাফের মতো যেসব জঘন্য মিথ্যাবাদী উম্মতকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে কথা বানায় সেসব কথা তিনি গতানুগতিক-ভাবে তাঁর কিতাবে সংযোজন করে দেন। মুফতী সাহেবের আদরের দুলালী তা থেকে কিছুটা সবক হাসিল করতে সক্ষম হবেন কি?

সমালোচনার জবাব

এটা কোন্ ধরনের বিচার-বুদ্ধির পরিচয়; একই রাবীর রাওয়ায়েত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী সাহেব নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করলে সেটা হয় মাথার মুকুট। আর একই রাওয়ায়েত মাওলানা মওদূদী সাহেব বর্ণনা করলে সেটা হবে পরিত্যাজ্য ও ঘৃণিত? মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব জবাবে সম্ভবত বলবেন, মওদূদী সাহেব বর্ণনায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার অভিযোগ পাওয়া যায়। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো একই রাওয়ায়াতের শেষের অংশ দ্বারা তিনি নিজেও প্রমাণ পেশ করেছেন এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উক্ত অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন-আমীরে মুয়াবিয়া হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের তিরস্কার করতে গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিজে তিরস্কার করেননি। প্রশ্ন হলো; এ

www.pathagar.com

রাওয়ায়াতের বর্ণনাকারী (রাবী) যদি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি বিদ্বেষী হয়ে এটি রাওয়ায়াত করতেন, তাহলে তিনি রাওয়ায়াতটির শেষাংশে কি করে এমন শব্দ বর্ণনা করলেন, যাতে আমীরে মুয়াবিয়ার উপর আরোপিত অভিযোগ অনেকটা হালকা হয়ে যায় অর্থাৎ তাঁর প্রতি যেখানে অভিযোগ হলো তিনি হযরত আলীকে তিরস্কার করার জন্যে গভর্নরদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে এ রাবীর রাওয়ায়েতের এ অংশে রয়েছে শুধু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের তিরস্কার করার জন্যে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি এ রাওয়ায়াতের রাবী আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি বিদ্বেষী হয়েই এ রাওয়ায়েতটি বর্ণনা করতেন, তাহলে তো তিনি একথা না লিখে স্পষ্ট করে লিখে দিতেন যে, না, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরদের লিখেছেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যেন তারা তিরস্কার করে।[১] জনাব তাকী ওসমানীর কথাটি সম্পূর্ণ স্ববিরোধী। এসব রাবীর এটাতো বদান্যতা যে, তাঁরা হযরত মুগীরার তিরস্কারপূর্ণ কাজটি আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদের মতো সুন্নী ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের মতো বর্ণনা না করে সংযমের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

মারওয়ান মদীনার গর্ভনর থাকাকালীন সময়ে প্রতি জুম'আয় মিম্বারে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার কথা মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এখন তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এ মর্মে তাকী ওসমানী সাহেব লিখেছেন ঃ এ রাওয়ায়েতটি 'বেদায়া ও নেহায়ার' মিসরীয় সংস্করণে নেই। অধিকন্তু মারওয়ানের মৃত্যু তায়েফে হয়েছে বলে লেখা আছে।[২] অথচ তাঁর মৃত্যু হয়েছে মদীনা কিংবা দামেশকে। রাওয়াতেটির শেষে নবীর প্রতি সম্বোধনযুক্ত তবে এটা একটি আজব ব্যাপার যে, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দেয়া সে রাওয়ায়েতের শেষাংশ দ্বারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালাগাল করার অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার চেষ্টা আপনি নিজেই

---

১. মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সমালোচনাকারীদের এটাই অভ্যাস যে, তারা তাঁর যুক্তি খণ্ডনে ঐ রাবীদের বর্ণনাই পেশ করেন যাদেরকে তারা উসূলে হাদীসের পরিভাষা অনুযায়ী প্রমাণপুঞ্জির দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ বলে থাকেন। তবে তারা এখন বলেন, শিয়া হলেও তুলনামূলকভাবে অমুক ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্য অথবা রাবীদের নাম উল্লেখ না করে এর একটা ব্যাখ্যা বা সাফাই দেয়ার চেষ্টা করেন। অথচ তারা যদি মিথ্যাবাদী হবেন তাহলে তাদের গোটা বর্ণনাই মিথ্যা এবং অগ্রহণীয় হওয়া উচিত।

২. রাওয়ায়াতে মারওয়ান নয়, বরং মারওয়ানের পিতা হাকামের মৃত্যুর কথা আছে। বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করুন।

www.pathagar.com

করেছেন। অথচ এ রাওয়ায়েতের রাবী যদি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘোর বিরোধী হন, তাহলে তাকী সাহেবের কাছে তাঁর রাওয়ায়েত অগ্রহণীয় হওয়াই স্বাভাবিক। রাওয়ায়েতের প্রথম অংশ আপত্তিকর আর শেষাংশ আপত্তিকর নয় অর্থাৎ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার না করার প্রমাণ হিসাবে তিনি যে অংশ উল্লেখ করেছেন তা ঠিক—প্রথম অংশ নয়, এমন বলাটা কি স্ববিরোধিতা নয়? শব্দগুলোও মাকতাবাতুল মাআরিফ বৈরুত এবং মাকতাবাতুন নাসর, রিয়াদ থেকে যুক্তভাবে প্রকাশিত 'বেদায়া নেহায়ার' ১৯৬৬ সনের সংস্করণ এ মুহূর্তে আমার সামনে আছে। সংস্করণটির শুরুতে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, এ সংস্করণ হলবে মাদ্রসায়ে আহমদিয়াতে রক্ষিত হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত। অনেক গবেষক এ সংস্করণটিকে অন্যান্য সংস্করণের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উদ্বৃতিটি ঐ সংস্করণেও রয়েছে। মিসরের আল সাআদাহ ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত একটি সংস্করণে এ রাওয়ায়েতটি আছে। অবশ্য টীকায় লেখা আছে, একটি মিসরীয় সংস্করণে এ রাওয়ায়েতটি বাদ পড়ে যায়। কলমের লেখায় একটি বাক্য বাদ পড়ে গেলে সেটা আবার ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হলে তা সন্দেহযুক্ত থাকে কি করে? উভয় সংস্করণে স্পষ্ট লেখা আছে– مات مروان بدمشق মারওয়ান দামেশক, মদীনা কিংবা তায়েফে মারা গেলে১ তাতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালাগাল করার অপবাদ রহিত হয় কি করে। তাকী সাহেব তা বুঝিয়ে বলবেন কি?

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উদ্ধৃত রেওয়ায়েতটি মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেবের দৃষ্টিতে এজন্য সন্দেহযুক্ত যে, তাতে মারওয়ান এবং মারওয়ানের পিতা হাকামকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক লা'নত বা অভিসম্পাত দানের কথা লেখা আছে। জ্বি হ্যাঁ। যারা মারওয়ানকে হযরত মারওয়ান (রাদি) বানিয়ে দিয়েছেন তাদের দৃষ্টিতে মারওয়ানকে অভিশপ্ত রূপে চিহ্নিতকরণ সন্দেহ-সংশয়ের ধূম্র ঘনীভূত না হয়ে যায় কোথায়? তবে বাস্তব অবস্থা এই যে, মারওয়ানের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অভিশাপ প্রদানের কতিপয় রাওয়ায়েত বিদ্যমান আছে। যেমন, মুসতাদরাকে হাকেম গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪৮১ পৃষ্ঠায় হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে ঃ

وقد كان ابوه احكم اكبر اعداء النبى صلى الله عليه وسلم وانما اسلم يوم الفتح وقدم المدينة ثم طرده النبى صلى الله عليه وسلم الى الطائف ومات بها -

মারওয়ানের পিতা হাকাম ছিলো নবীর বড় শত্রু। মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তায়েফে নির্বাসিত করেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে।

www.pathagar.com

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن لحكم وولده -

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাকাম ও তার সন্তানকে (মারওয়ান) অভিশাপ দিয়েছেন।"

এ ধরনের আরো রাওয়ায়েত আছে। ইমাম যাহবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবনে যুবাইরের এ রাওয়ায়েতটিকে সহীহ্ বলেছেন।

'আবু তোরাবের' অর্থ

তাকী ওসমানী সাহেব বুখারীর একটি বরাত দিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি মারওয়ানের গালমন্দ করার বিষয়টিকে হালকা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, এখানে গালমন্দ করার ব্যাপারটি এই যে, মারওয়ান হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর আসল নামের পরিবর্তে 'আবু তোরাব' নামে সম্বোধন করতেন। যার অর্থ 'মাটির পিতা'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই আদর-স্নেহ করে হযরত আলীকে এ নামে ডাকতেন। মারওয়ানের বেশির চাইতে বেশি অপরাধ হলে তাহলো, তিনি এখানে 'আবু তোরাব' শব্দটি আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহার করতেন। আরবীতে 'আবু' শব্দের অর্থ 'ওয়ালা' অর্থও হয়, যেমন আবু হুরাইরা। এখানে যেমন বিড়ালের বাপ অর্থ না হয়ে এর অর্থ হচ্ছে বিড়াল ওয়ালা। ঠিক এখানেও তেমনি। অর্থ হলো 'মাটিওয়ালা'।

ধৃষ্টতা কাকে বলে ? মারওয়ান পরিষ্কার এখানে 'আবু তোরাব' বলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অভিস্পাত ও তাঁর ধ্বংস কামনার অর্থেই ব্যবহার করেছে। অন্যান্য রাওয়ায়েতও একথারই পোষকতা করে। যেমন আমীরে মুয়াবিয়ার গভর্নর এবং তার সঙ্গীরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থকদেরকে আলীকে ব্যঙ্গ করে 'তোরাবিয়া' বলে ডাকতেন। যেমন হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যখন কুফার গভর্নর ও তার সঙ্গীরা অধিক বিদ্রোহের মোকদ্দমা সাজিয়েছিলো তখন তিনি এ প্রসঙ্গে আমীরে মুয়াবিয়ার উদ্দেশ্যে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তোরাবিয়া উল্লেখ করেছেন। ওসমানী সাহেবরা শব্দের হুবহু রেকর্ডের ভিত্তিতে শাব্দিক অর্থ ছাড়া কোনো প্রতিক্রিয়া বা ভাববর্ণনার (Indiscet Narration) কথা শুনতে রাজী

www.pathagar.com

নন। ভালো কথা ! কুফার গভর্নর যেয়াদ হযরত হুজার বিন আ্দীর[১] রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে লিখিত চিঠিতে আছে ঃ

ان الطواغيت فى هذه الترابية السبائية رأسهم حجر بن عدى خالفوا امير المؤمنين-٢

"অর্থাৎ তোরাবিয়া এবং সাবায়িয়াহদের মধ্যে বিদ্রোহীরা রয়েছে, যাদের নেতা হুজার বিন আ্দী সহ তারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধাচরণ করেছে।"[২]

ترابيه 'তোরাবিয়া' শব্দের অর্থ মাটিছাই ধূলিস্মাত, ধ্বংস হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়া ইত্যাদি।[৩] এখানে শব্দটি যে তুচ্ছার্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ধ্বংস হয়ে মাটিতে মিশে যাবার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে একথা বুঝার জন্যে ভাবপ্রবণ হওয়ার প্রয়োজন আছে কি ? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থক ও সহযোগীদেরকে গভর্নরগণ 'তুরাবিয়া' নামে আখ্যায়িত করার উদ্দেশ্যেও যে ব্যাংগ-বিদ্রূপ ও উপহাস করাই নয়। বরং তাদের ধ্বংস কামনা করাই উদ্দেশ্য একথা প্রমাণের অপেক্ষা থাকে কি ?

বলার অপেক্ষা রাখে না, কুফার গভর্নর যিয়াদের এ চিঠিই হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুদণ্ডের জন্যে সরকারী অভিযোগনামায় পরিণত হয়। চিঠির মধ্যে ব্যবহৃত তোরাবিয়া শব্দটি (আবার তাও সাবায়িয়া শব্দের সঙ্গে) কি প্রশংসার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিলো ? না এখানে এর আভিধানিক অর্থ ব্যবহার করা উদ্দেশ্য ছিলো ? এটাতো সম্পূর্ণ তুচ্ছার্থে ও দোষী অর্থেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হলো ধ্বংস হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া বা মিশিয়ে দেয়া।

মারওয়ান এবং তার গোষ্ঠীগণের এ ঘৃণ্য তৎপরতা আহলে বাইতের সীমা পেরিয়ে হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা পর্যন্ত পৌঁছে। তারা হযরত আসমা

১. হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সংগী-সাথীদের করুণ পরিণতির ঘটনা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগেও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দূত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করতে রাজী হওয়ার শর্তে দণ্ড মওকূফ করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তারা সকলেই এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতঃ হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার চেয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করতে অস্বীকার করা অধিকতর জঘন্য অপরাধ ছিলো।

২. তারিখে তাবারী খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা-২০২

৩. হুজার বিন আদীর নেতৃত্বে তোরাবিয়া সাবাইয়া ফের্কাটি আমিরুল মু'মিনীনের বিরোধিতায় লেগে আছে।

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহাকে 'জাতুন নাতাকাইন' (দুটি কটি বন্ধ ওয়ালী) তুচ্ছার্থে ডাকতো। তিনি তাদের এরূপ আচরণের জবাবে বলেছিলেন ঃ এসব অর্বাচীন লোক আমাকে প্রদত্ত লকবের মর্যাদা কিইবা বুঝতে সক্ষম। আমার মুহতারাম পিতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমভিব্যাহারে নবী আলাইহিস সালামের হিজরতের সংকট মুহূর্তে আমার কটি বন্ধ ছিঁড়ে একটি টুকরো দিয়ে রাসূলের খাদ্য দ্রব্য ঢেকে দিলে রাসূল সে মুহূর্তে আমাকে এ লকব প্রদান করেন। এ কাহিনী কয়েকটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তাকী ওসমানী সাহেব হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কার সম্পর্কিত অভিযোগ অত্যন্ত জোর দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ওপর আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ আল্লাহ মালুম! মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিসের ভিত্তিতে কোন্ মনে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর এ অপবাদটি আরোপ করলেন।

কথাটি পড়ে শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উক্তিটি মনে পড়লো। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রচিত 'হিকায়াতুল আওলীয়া' গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায় ইসমাঈল শহীদ রাহমাতুল্লাহ এবং শীয়া পন্থী সুবহান আলী খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির মধ্যে প্রশ্ন-উত্তর চলছিলো।

এক পর্যায়ে শাহ ইসমাঈল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জিজ্ঞেস করলেন, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেখানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হতো কিনা ? তখন সুবহান আলী খাঁ বললো ঃ অবশ্যই। তাতে মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন ঃ আচ্ছা! বলুন তো দেখি! হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে কোনোদিন আমীরে মুয়াবিয়ার কুৎসা রটনা করা হতো কিনা ? সে বললো, না। হযরত আলীর দরবার কুৎসা থেকে মুক্ত ছিলো। অতপর জিজ্ঞেস করলেন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে আলীর কুৎসা রটনা করা হোত কিনা ? সুবহান আলী খাঁ বললো, অবশ্যই হতো। তখন মাওলানা ইসমাঈল শহীদ বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। ব্যস্ আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুরই অনুসরণকারী আর রাফেযীরা আমীরে মুয়াবিয়ার ।

ওসমানী সাহেবের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও কি বলবো ঃ আল্লাহ মালুম! শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিসের ভিত্তিতে কোন্ দিলে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর এ অপবাদটি চাপিয়ে দিলেন। সে অপবাদটি আবার থানবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিই বা তাঁর গ্রন্থে পূর্ণ সমর্থন পূর্বক তাতে সংযোজন করলেন কি করে ?

www.pathagar.com

মূলত হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহীত যেসব পদক্ষেপের স্বপক্ষে কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের নীতি আদর্শের কোনো দলীল-প্রমাণ পেশ করার মতো নেই, সেই কাজগুলোকে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বলতে কিংবা ঐগুলোকে বেদআত শব্দে আখ্যায়িত করনে আহলে সুন্নাতের মতে কোনো বাধা নেই। কারণ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত শিয়া সম্প্রদায়ের মতো নয়। শিয়ারা নিজেদের ইমামদেরকে কবীরা, সগীরা উভয় প্রকার গুনাহ থেকে পবিত্র ও মাসুম মনে করে। আহলে সুন্নাতের লোকেরা সাহাবায়ে কেরামকে অনুরূপ মাসুম মনে করে না। মানবীয় দুর্বলতা সঞ্জাত অপরাধ তাদের দ্বারাও সংঘটিত হতে পারে। তারাতো আর নবীদের মতো ছিলেন না যে, তাদের দ্বারা কোনো ভুলই হওয়া অসম্ভব ছিলো। মাওলানা বদরে আলম মদনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেব নুদওয়াতুল মুসান্নিফিন-এর সদস্য এবং দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তিনি তার গ্রন্থ তরজুমানুস সুন্নাহ এর ৩য় খণ্ডের ৪২৬ পৃষ্ঠায় الرسول العظيم وعصمته رايه صلى الله عليه وسلم শিরোনামে লিখেছেন :

"رسول کے فیصلے کے سوا کسی کے فیصلے کو الٰہی فیصلہ اور قضاء الٰہی نہیں کہا جا سکتا اور نہ رسول کے فیصلہ کے علاوہ کسی اور بشر کا فیصلہ نکتہ چینی سے بالاتر ہو سکتا ہے اور اس لیے رسول کے علاوہ ہر انسان کے فیصلہ پر دل وجان سے راضی ہونا لازم قرار نہیں دیا جا سکتا۔"

یہ وہی بات ہے جو جماعت اسلامی کے دستور میں درج ہے کہ "انسان رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے" اور اس پر ناحق ناروا ہنگامہ آرائی ہوتی رہتی ہے۔

"রাসূলের ফায়সালা ছাড়া আর কারো ফায়সালাকে আল্লাহর ফায়সালা বা হুকুম বলা যাবে না। রাসূলের ফায়সালা ছাড়া অপর কোনো মানুষের ফায়সালা সমালোচনার উর্ধে হতে পারে না। সুতরাং রাসূল ছাড়া প্রতিটি লোকের সিদ্ধান্তকে সর্বান্তকরণে স্বীকার করে নেয়া অনিবার্য রূপে গণ্য করা সম্ভব নয়।"

মূলত একথাটিই জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে যে—"আল্লাহর রাসূল ছাড়া মানুষ অপর কোনো মানুষকে সত্যের মাপকাঠি মনে করতে পারে না এবং আল্লাহর রাসূল ছাড়া কাউকে সমালোচনার উর্ধে মনে

www.pathagar.com

করতে পারে না।" পরিতাপের বিষয় যে, জামায়াতের গঠনতন্ত্রে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহির একথাটি প্রকাশ পেতেই এক শ্রেণীর আলেম এ মহামূল্যবান কথাটির অন্তরনিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা এবং এর ব্যতিক্রম পন্থায় ইসলামের ক্ষতির দিকটি চিন্তা না করেই সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে হৈ চৈ করতে শুরু করে দেন।

দুই : গাল-মন্দ করার প্রসংগ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার ঘৃণ্য কাজটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সূচনা করেছেন এবং এ ধারা ওমর বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহ আলাইহির শাসনামলের আগ পর্যন্ত তা জোরেশোরে চালু ছিলো। একথা আমি প্রয়োজনীয় দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে দেখিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব তারপরও আমার সেসব কথা ভুল প্রমাণ করার আপ্রাণ পেষ্টা করেছেন। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে সেসব কষ্টদায়ক বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হলাম।[১] হযরত সায়াদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনেই আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ ও ভর্ৎসনা করার সূচনা করেন। একথা আমি 'বিদায়া' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছি। তা খণ্ডন করতে গিয়ে তাকী ওসমানী সাহেব সে উদ্ধৃতি এবং মুসলিম শরীফের যে রাওয়ায়েতটি আমি উল্লেখ করেছি, তা পুনর্বার উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হলো এইঃ

امر معاوية بن ابى سفيان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب فقال اما ماذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن اسبه -

মাওলানা তাকী সাহেব এ রাওয়ায়েতের অনুবাদ এভাবে করেছেন ঃ

---

১. 'কষ্টদায়ক' এজন্যে যে, নিজেদের পূর্বসূরীদের ভুল-ভ্রান্তির চর্চা মনস্তাত্ত্বিকভাবেই সুখকর বিষয় নয়। কোনো বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সাধারণত কেউ নিজের মুরুব্বীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চর্চা করে না। কোথাও কোনো মুরুব্বীর ভুল নীতির সামনে বস্তুনিষ্ঠ সত্য তত্ত্ব তল পড়ে যেতে লাগলেই ঐ সত্যকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে তা করতে হয়। মুসলিম উম্মাহর জীবনকে খেলাফত থেকে বিচ্যুতি ও রাজতন্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ার সুদূর প্রসারী ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার প্রয়োজনেই মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি তাঁর খেলাফত ও রাজতন্ত্র বইটি লিখেছিলেন। কিন্তু সেই মহান লক্ষ্যের প্রতি এক শ্রেণীর আলেম ভ্রুক্ষেপ না করে এ আলোচনার প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়াতে এ তিক্ত অবাঞ্ছিত আলোচনার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে বলে লেখক দুঃখ প্রকাশ করছেন। তারপরও একই বিষয় নিয়ে শুধু এজন্যে কথা বলছেন, যাতে এসব প্রচারনায় কোনো পাঠক সত্য থেকে দূরে সরে না যায় এবং ইসলামের স্বার্থে খেলাফত প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হয় আর এ পথে মাঝখানে রাজতন্ত্রের দ্বারা যেই বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তার থেকে খেলাফতকে আলাদা করে বুঝতে শিখে। এদিক থেকে যারা স্বমতের প্রাধান্যদানের প্রবণতা বশতঃ কিংবা অপর কাউকে ঘায়েল করার অভিপ্রায়ে বারবার পূর্বসুরীদের দোষ-ত্রুটি চর্চাকে জিয়িয়ে রাখা বা এ ব্যাপারে অপরকে আলোচনায় বাধ্য করার নীতি গ্রহণ করেছেন। তাদের নিজেদেরই চিন্তা করা উচিত তারা কাজটি কতদূর সঙ্গত করছেন।—সম্পাদক

www.pathagar.com

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়ে বললেন ঃ আবু তোরাবকে (অর্থাৎ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু) গালমন্দ করায় বাধা কোথায় ? জবাবে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে রাসূলের তিনটি বাণী আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলে আমি তাঁকে গালমন্দ করতে পারিনি।

তাকী ওসমানী সাহেবের এ রাওয়ায়েতের উপর অভিযোগ হলো, রেওয়ায়েতের তরজমা সঠিক স্বীকার করলেও এতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার কথা প্রমাণিত হয় না। আমার ভুল তরজমার সাথে তার সঠিক তরজমা সন্নিবেশিত করলে সেটাই হতো বিজ্ঞজনিত কাজ। অধিকন্তু সংশোধন করারও একটা সুযোগ হতো।

আমি 'ফতহুল বারী' মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাযা, তাবারী, বিদায়া-নেহায়া, আল কামেল এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতিসহ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর গভর্নরদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করা সত্ত্বেও তাকী সাহেব কর্তৃক সব দলীল বাদ দিয়ে শুধুমাত্র উপরোক্ত রাওয়ায়েতটির আশ্রয় গ্রহণ করা উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয় কি ? এতদসত্ত্বেও দলিল-দস্তাবেজ পেশ করার দাবী উত্থাপিত হলে আমি এ বিষয়ের উপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করে দিতে পারি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার ঘৃণ্য ঘটনা একটি ঐতিহাসিক সত্য, যা প্রমাণ করার জন্যে ইতিহাসবিদগণও দলিলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। একই কারণে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বিষয়ে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিংবা আমার জন্যেও এটা জরুরী নয়। শুধুমাত্র বরকত হিসেবেই কিছু উদ্ধৃতি পেশ করেছি এবং করবো। গুণীজনদের কেউ এটাকে স্বীকৃত ঘটনা হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন আবার কেউ উদ্ধৃতি উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা আদৌ অনুভব করেননি। আমি এখানে এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি ঃ

মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদভী সাহেব ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থের ২য় খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"امیر معاویہؓ نے اپنے زمانے میں بر سر منبر حضرت علیؓ پر سب وشتم
کی مذموم رسم جاری کی تھی اور ان کے تمام عمال اس رسم کو ادا کرتے تھے مغیرہؓ
بن شعبہ بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے، لیکن امیر معاویہؓ کی تقلید میں یہ بھی اس

www.pathagar.com

مذموم بدعت سے نہ بچ سکے۔ حجر بن عدیؓ اور ان کی جماعت کو قدرۃً اس سے تکلیف پہنچتی تھی ..... مغیرہ بن شعبہ کے بعد زیاد کے زمانہ میں بھی یہ رسم جاری رہی ۔"

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শাসনামলে মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার ঘৃণ্য নীতি চালু করেন। তার বড় বড় কর্তাগণও এ নিয়ম পালন করতে থাকেন। হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন সম্মানিত লোক ছিলেন। কিন্তু তিনিও এ ঘৃণ্য বিদয়াত কাজ থেকে বাঁচতে পারেননি। হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীগণ এর বিপরীত ভূমিকা অবলম্বন করলে তাঁরা এ সময়ে অসহ্য যন্ত্রনাসহ করুণ পরিণতির শিকার হন। হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর কুফার গভর্নর যিয়াদের সময়ও এ রীতি চালু থাকে।"

প্রখ্যাত মিসরীয় আলেম ও ইতিহাসের প্রফেসর মুহাম্মদ আবু যাহরা 'তারিখে মাজাহিবুল ইসলামিয়াহ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায় (দারুল ফিকর আল আরবী কর্তৃক মুদ্রিত) লিখেছেন ঃ

وقد كان العصر الاموى محرضاً على المغالاة فى تقدير على رضى الله عنه لان معاوية سن سنة سيئة فى عهده وفى من خلفه الامويين حتى عهد عمر بن عبد العزيز وتلك السنة هى لعن امام الهدى على ابن ابى طالب رضـ عقت تمام خطبة ....

"বনু উমাইয়ার শাসনকাল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শাসনামলে একটি ঘৃণ্য 'সুন্নাত'[১] (পদ্ধতি) চালু করেন। এ পদ্ধতি ওমর বিন আবদুল আযীযের শাসনকালের আগ পর্যন্ত চালু থাকে। পদ্ধতিটি ছিলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জুময়ার খুতবার শেষাংশে অভিশাপ দেয়া ---- অন্যান্য সাহাবাগণ এর প্রতিবাদ করেন এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার গভর্নরদেরকে এরূপ

---

১. আবু যহরাও এখানে 'সুন্নাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার কার্যক্রমকে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও ইবনে হাজার মক্কীও 'সুন্নাত' শব্দ দিয়েই ব্যক্ত করেছেন। এখানে 'সুন্নাত' শব্দের তাৎপর্য কি তা সকলের জন্যে সহজেই অনুমেয়।

www.pathagar.com

কাজ করতে নিষেধ করেন। এমনকি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকতে চিঠি লিখেন। তিনি আরো লিখলেন ঃ তোমরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রাসূলের প্রিয়জনদেরকে গালমন্দ করে প্রকারান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই মিম্বারে দাঁড়িয়ে গালমন্দ করছো। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুব মহব্বত করতেন— একথার সাক্ষী আমি।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন শাফয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

كان معاوية وعماله يدعون لعثمان في الخطبة يوم الجمعة ويسبون عليا ويقعون فيه -

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর শাসকগণ জুময়ার খুতবায় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দোয়া করতেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ ও তিরস্কার করতেন।"-(المختصر اخبار البشر ২য় খণ্ড পৃঃ-৯৮-৯৯ বৈরুত ১৩৭৫)

ঐ গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ১২০ পৃষ্ঠায় ওমর বিন আবদুল আযীযের জীবন চরিতে লিখেছেন ঃ

كان خلفاء بني امية يسبون عليا رضي الله عنه من سنة احدى واربعين وهي السنة التي خلع الحسن فيها نفسة من الخلافة .....

"বনু উমাইয়ার খলীফাগণ ৪১ হিজরী সন থেকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালাগাল শুরু করেন আর এ সনটি ছিলো হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত থেকে সরে দাঁড়াবার সময়। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের শাসনকাল ৯৯ হিজরী সনের প্রথম দিক পর্যন্ত এ ধারা বহাল থাকে। অতপর ওমর বিন আবদুল আযীয খলীফা হয়ে এর অবসান ঘটান।"

ইবনে হযম আন্দুলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন ঃ

الاّ انهم لم يعلنوا بسب احد من الصحابة رضوان الله عليهم بخلاف ما كان بنو امية يستعملون من لعن علي بن ابي طالب رضوان الله عليه ولعن بنيه الطاهر بن بني الزهراء .....

www.pathagar.com

"তবে (বনু আব্বাসীয়ার) কেউ সাহাবীদের কাউকে গালমন্দ করেননি। অপরদিকে বনু উমাইয়ার গভর্নরগণ আলী বিন আবু তালেব এবং তাঁর সন্তানদেরকে গালমন্দ করতে থাকেন। ওমর বিন আবদুল আযীয এবং ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ ছাড়া সকলেই এরূপ করতেন। এ দু'জন এরূপ কাজ করার অনুমতি দেননি।-(جوامع السيرة -এর পরিশিষ্ট اسماء الخلفاء والولاة দ্রষ্টব্য) দারুল মায়ারিফ মিসর থেকে মুদ্রিত)

ডঃ ওমর ফররুখ একজন নামজাদা ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা বহু ইসলামী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, উপদেষ্টা ও সদস্য। الخليفة الزاهد নামে তিনি ওমর বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবন চরিত রচনা করে 'বিদআতে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ

وكانت سرت في البلد ان بدعة وقحت فاكشفت من وجهها ثم سارت نطأ كل المنابر وتصرخ في كل الاذان ولم تستح فصعدت في سجد رسول الله وبين اهله وعلى منبره كان اتبدها هوي ....

"বনু উমাইয়ার শাসনামলে শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে একটি বিদআতের প্রচলন হয়। বিদআতটি ছিলো অত্যন্ত লজ্জাস্কর। প্রতিটি মসজিদের মিম্বার এ বিদআতের গন্ধে কলুষিত হয়। বিদআতটি মসজিদে নববীর মিম্বার এবং তার বংশধরদেরকেও গ্রাস করে ফেলে। এর প্রথম উদ্ভাবক আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি তার গভর্নরদেরকে জুময়ার খুতবায় এ কাজটি স্থায়ীভাবে করার ফরমান জারী করেন।"

ডঃ ওমর ফররুখ তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী 'সাব ও শাতাম' গালমন্দের এর বিষয়টি স্ববিস্তারে আলোচনা করেছেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণা ছিলো, এ পদ্ধতিতে তার ক্ষমতা শক্তিশালী হবে এবং আহলে বাইতের প্রতি জনগণের সম্মান ও ভক্তিশ্রদ্ধা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে লেখক আরও লেখেন যে ঃ

واخطاء معاوية الرأى ومجاوز الحلم الذى قالوا انه وسم به وعادت البدعة بغير ما ظن ورأى-

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো এবং তিনি যেই ধৈর্য সহনশীলতার জন্যে খ্যাত ছিলেন, নিজেই ধৈর্যের সেই সীমা অতিক্রম করলেন। তাঁর জারীকৃত বিদআতটি স্বীয় ধারণা ও বিশ্বাসের বিপরীত বলে প্রমাণিত হলো।"

www.pathagar.com

'লাওয়ামিউল আনোয়ারুল বাহিয়া ওয়া সাওয়াতিউল আসারুল আসারিয়া' -এর লেখক শায়েখ মুহাম্মদ বিন আহমদ সাফারীনি হাম্বলী এ গ্রন্থের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ অন্যায় আচরণের শিকার হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে পূর্বে জানিয়ে দিয়েছিলেনঃ তাই নবী আলাইহিস সালাম একদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনেক ফযীলতের কথা বর্ণনা করে তাঁর অনুসৃত নীতি আঁকড়িয়ে ধরার কথা বলেছেন। বনী উমাইয়ার লোকজন খারেজীদের সহায়তায় যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা ও গালমন্দ করতে নিমগ্ন, তখন মুহাদ্দিসগণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বর্ণনা করে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি সমর্থনের উপকরণাদি সরবরাহ করেন।[১]

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হযরত সায়াদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজস্ব মজলিশে গালমন্দ করার কথা আমি 'বিদায়া' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছি। তার ওপরও 'আল বালাগ' সম্পাদক তাকী ওসমানী সাহেব দু'টি আপত্তির অবতারণা করেছেন। একটি হলো, মিম্বারে গালমন্দ দ্বারা গীবত করা প্রসঙ্গে। দ্বিতীয়টি হলো, তিনি বলেছেন, আপনারা তো নিজস্ব বৈঠকে এ ধরনের তিরস্কারকে অধিক ঘৃণ্য মনে করে থাকেন অথচ মওদূদী সাহেবের মতে জুময়ার খুবতায় এ ধরনের কাজ অধিকতর ঘৃণ্য।

এ ধরনের অর্থহীন আপত্তিকর জবাব দেয়াও যদি জরুরী হয়, তাহলে আমার উত্তর এই যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় অবস্থানকালে তাঁকে সিরিয়ার মিম্বরসমূহ থেকে ভর্ৎসনা করা ও তার কুৎসা প্রচার করা আর তাঁর মৃত্যুর পর তাকে গালমন্দ করার কাজ অবশ্যই গীবত ছিলো। তবে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিযুক্ত গভর্নর মারওয়ান হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের একেবারে সামনাসামনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জুময়ার খুতবায় যে প্রকাশ্য ভর্ৎসনার কথা মাওলানা মওদূদী 'বিদায়া' গ্রন্থে এবং আমি ইবনে হাজার মাক্কীর উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করবো, সেটাকে নিছক গীবত বলা মুশকিল। কেননা, গীবতের সঙ্গে সেখানে অসৌজন্য আচরণও মিশ্রিত। জুময়ার খুতবাকে এরূপ অসৌজন্য অবাঞ্ছিত শব্দে কলুষিত করাকে নিছক গীবত না বললেও গীবতের সঙ্গে আরেকটি মন্দ ও নিন্দনীয় দিকের মিশন যে ছিলো, তা না বলে গত্যান্তর নেই। আমার মতে গীবত আর ঘৃণ্য আচরণ মুদ্রার এ পিঠ ও পিঠ বৈ কিছুই নয়। তারপরও যদি ওসমানী সাহেব এ

১. সম্ভবত এটা এখানে বর্ণিত ইবনে হাজার আসকালানীর ফতহুল বারীর উক্তি।

www.pathagar.com

দু'য়ের মধ্যে তফাত সৃষ্টি করে মওদূদী সাহেবের সাথে আমার ভিন্ন মত প্রকাশ করার প্রয়াস পান, তাহলে আমি বলবো এটাই ঠিক।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার অপরাপর কতিপয় কথা আদালতে সাহাবী এবং মারওয়ান ও তার পিতা এ শিরোনামে পরে আলোচিত হবে। সপ্তম অধ্যায়ে তাকী সাহেবের ভাইয়ের প্রকাশিত কিতাবের উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

'সাব্ব ও শাতম' বা গালাগাল এর শাব্দিক ও তাৎপর্যগত অর্থ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার ঐতিহাসিক বিষয়টিকে তাকী ওসমানী সাহেব সরাসরি অস্বীকার করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বাঁকা পথ খুঁজছেন। তাঁর মতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সাব্ব ও শাতম অভিস্পাত গালমন্দ তিরস্কার করা হয়েছিল বটে কিন্তু তার অর্থ (মাআযাল্লাহ) গালমন্দ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা কিংবা অভিসম্পাত করা নয়। বরং এর অর্থ হলো—হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহীত কর্মপদ্ধতির সামান্য অভিযোগ করা কিংবা সেগুলোকে ভুল সাব্যস্ত করা এর চেয়ে বেশী কিছু না। তিনি তাঁর কথার সমর্থনে মুসলিম শরীফের এ বাক্যাংশ পেশ করেছেন ঃ

فسبهما النبى صلى الله عليه وسلم

"তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জনকে ভর্ৎসনা করলেন অর্থাৎ তাদের ভুল ধরলেন।" এখানে সাব্ব শব্দের অর্থ গালমন্দ কখনো হতে পারে না। যার কারণ পরে বলছি।

তাকী ওসমানী সাহেবের এ ধারণা ঠিক নয়। 'সাব্ব ও শাতম' শব্দ আরবী, ফারসী, উর্দুতে গালমন্দ, ভর্ৎসনা, তিরস্কার, ধমকানো, ভয়প্রদর্শন ইত্যাকার অর্থে প্রয়োগ হওয়ার কথা ইতিহাস, অভিধান ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ভাবার্থের মধ্যে তারতম্য হওয়াটা বলাই বাহুল্য। রাসূলের সাব করা অর্থাৎ ভর্ৎসনা করা আর মারওয়ানের সাব্ব করার মধ্যে তাৎপর্যগত যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান তা ওসমানী সাহেবের অজানা থাকার কথা নয়। কোনো শব্দের অর্থ পাত্র এবং অবস্থা ভেদে ভিন্নও হয়ে থাকে।[১] এছাড়া মানবীয় আবেগ প্রবণতাবশত বেমওকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এরূপ করলে, সেটা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক

১. বাংলা বাকরীতিতেও এরূপ বহু বাক্য দেখা যায়। যেমন একজন অপরজনকে রসিকতা করে পিতা-মাতা তুলে জঘন্য শব্দে গালি দিলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাগ না করে বরং হাসে। কারণ, প্রেক্ষাপটের দরুন ঐ গালির শব্দটি সেখানে তার জন্যে স্নেহ ভালোবাসার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।–সম্পাদক

www.pathagar.com

রহমাত ও বরকতে রূপান্তরিত করার কথা হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র হযরতেরই দ্বিতীয় অপর কোনো মানুষ এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় না। সহীহ্ মুসলিমেই একটি অধ্যায় আছে যার শিরোনাম হলো ঃ

من لعنه النبى صلى الله عليه وسلم اوسبه او دعا عليه وليس هوا هلا لذلك كان له زكوة واجرا ورحمة-

"কাউকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত কিংবা ভর্ৎসনা করলে বা বদদোয়া দিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব শব্দের উপযোগী না হলে এগুলো তার জন্যে পবিত্রতা, প্রতিদান, বরকত ও রহমতে পরিণত হয়ে যায়।"

এ শিরোনামের অন্তর্গত একটি হাদীসের বাক্য হলো– فلعنهما وسبهما দু'জন লোকের কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা বলার সাথে সাথে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! লোক দু'টিতো কল্যাণ থেকে একেবারেই মাহরুম হয়ে গেলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কিভাবে ? তিনি বললেন ঃ আপনি তো তাদেরকে 'অভিশাপ' ও 'তিরস্কার' করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি জ্ঞাত নও যে, মানবীয় স্বাভাবিক আবেগ প্রবণতাবশত আমি কোনো মুসলমানকে তিরস্কার করলে কিংবা অভিশাপ দিলে, সেটি আল্লাহর পবিত্রতা, রহমাত ও বরকত হিসেবে কবুল করে নেবেন। অপর হাদীসে আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন যে, হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ। কোনো মু'মিনকে যদি (মানবীয় দুর্বলতা হেতু) কষ্ট দিয়ে ফেলি, তাকে ভর্ৎসনা করে বসি, বদদোয়া দেই, এগুলোকে তুমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে সাওয়াব ও পবিত্রতা রূপে গণ্য করো।

তাকী সাহেবের পেশকৃত মুসলিমের হাদীসের পটভূমিতে দেখা যায়, তাবুক যুদ্ধে দু'জন সাথী রাসূলের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একটি কূপের পানি ব্যবহার করে। তাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কঠোর ভাষায় ধমক দেন। হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু একথাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

فسبهما وقال لهما ماشاء الله ان يقول-

"রাসূল তাদেরকে ভালোমন্দ বললেন এবং যা আল্লাহর মঞ্জুর ছিলো তা বললেন।"

www.pathagar.com

এর ব্যাখ্যায় যদি বলা হয় যে, "নবী আলাইহিস সালাম তাদের ভুল করতে নিষেধ করলেন তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।" তাহলে এরূপ অর্থ পটভূমি পূর্বাপর অপর হাদীসের দৃষ্টিতে সঠিক মনে হয় না। তদুপরি 'সাব্ব' এর পরিবর্তে 'লা'নত' শাতম, শব্দ প্রয়োগের বিভিন্ন রাওয়ায়েত এসেছে। সেগুলোর অর্থও কি তাকী সাহেব ভুল সাব্যস্ত করবেন কিংবা কর্মপদ্ধতির ওপর কিছুটা অভিযোগের সুর ইত্যাদি করবেন ? রাসূলের 'সাব্ব' বা 'লাআনা' শব্দের প্রয়োগ আজর 'যাকাত' খাইর ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। তাই বলে মুগীরা বিন শোবা, কিংবা মারওয়ানের 'সাব্ব' ও 'শাতম' পবিত্রতা, কল্যাণ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হওয়ার দুঃসাহসিক কথা বলার ধৃষ্টতা ওসমানী সাহেব প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করেন তো করুন। কুরআনের আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم-

"যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করে তাদেরকে গালমন্দ করো না, তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত দুশমনী করে আল্লাহর শানে ধৃষ্ঠতা দেখিয়ে তাঁকে গালমন্দ করবে।"-(সূরা আল আন'আম ঃ ১০৮)

এ আয়াতেও سب 'সাব্ব' অর্থ মূর্তি বা অপর কোনো বস্তুর প্রতি কারও পূজা-অর্চনামূলক ভ্রান্ত কাজের শুধু মামুলি আপত্তি করা নয়। অনুবাদকগণ 'সাব্ব' শব্দের যখন অর্থ করেন গালিগালাজ, তখন এর তাৎপর্যও 'বাজারি অশ্লীল শব্দে গালিগালাজ' নয় বরং এর অর্থ হলো ঘৃণাত্মক তাচ্ছিল্য ভাষায় অভিশাপ ভর্ৎসনা করা, যা শুনলে প্রতিপক্ষ মনে কষ্ট পায়। যেমন উপরে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, অনেক সময় একই ধরনের শব্দ কোনো বয়োজেষ্ঠ বয়োকনিষ্ঠের ক্ষেত্রে কিংবা কর্মকর্তা তার অধঃস্তন কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বললে সে সময় এ শব্দের অর্থকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যার্থে গণ্য করা হয় না অথচ একই শব্দ যদি কম পদমর্যাদার লোক উচ্চপদ মর্যাদার লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, তখন তা গালিগালাজ ও তিরস্কারের সংজ্ঞায় পড়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, পিতা কর্তৃক পুত্র কিংবা বড় ভাই কর্তৃক ছোট ভাইকে বোকা, পাজি, গাধা বলা হলে এটাকে দোষ বলে গণ্য করা হয় না। অথচ একই শব্দ যদি অধঃস্তন ব্যক্তি উপরস্ত মর্যাদার কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, তখন সেটা গালিগালাজ ও তিরস্কারের সংজ্ঞায় পড়ে যায়।

এখন জনাব তাকী ওসমানী সাহবেকে জিজ্ঞেস করতে হয়, তিনি নিজেই যেখানে স্বীকার করেন যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমকক্ষ নন, তাহলে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে এটা কি করে সঙ্গত হলো যে, তিনি নিজেও

www.pathagar.com

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বা প্রকাশ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুর্নাম ও কুৎসা রটনা করলেন, অপরকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলেন ? এমনকি কেউ যদি এরূপ না করতো তিনি তাকেও কৈফিয়ত দিতে বাধ্য করতেন, আর তাও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকালের পর ? তাকী ওসমানী সাহেব নিজ কিতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় নিজেই লিখেছেন যে, "বুশর বিন আরতাহ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কিছুটা ভালমন্দ বলেছে। তখন হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিচ্ছো ?" এ বাক্যে জনাব ওসমানী নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, উক্ত কুবাক্যটি গালমন্দ করার নামান্তর ছিলো। 'সাব্ব' এর অর্থ গালমন্দ, তিরস্কার বা অভিসম্পাত করার অর্থ অস্বীকার করেছেন এমনটি দাবী করতে পারবেন কি ?

জনাব তাকী ওসমানী সাহেব একদিকে বলছেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'সাব্ব ও শাতম' করার অর্থ গালাগালি করা নয়, বরং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর অভিযোগ করা এবং তাঁর ভুলে নিজে জড়িয়ে না পড়ার কথা প্রকাশ করা। অপরদিকে তিনি গালমন্দ করার রাওয়ায়েতগুলোর বর্ণনাকারীদেরকে রাফেজী, শিয়া, মুয়াবিয়া বিরোধী, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার বলার জোর চেষ্টা করেছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাজের শুধুমাত্র অভিযোগ করাই যদি 'সাব্ব ও শাতম' করার অর্থ হয়, তাহলে এসব ঘটনার ব্যাখ্যাদানকারীগণ সুন্নী, নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়বান হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে রাফেজী, শিয়া ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুশমন বলার প্রয়োজন দেখা দিলো কেন ? ওসমানী সাহেবের এমন কথাগুলো সত্যিই বিস্ময়কর। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার যে কথা বারবার হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বিবৃত হয়েছে সেগুলোর তাৎপর্য যদি ওসমানী সাহেবের দৃষ্টিতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখ নিঃসৃত দু' একটি অসাবধানতামূলক বাক্যই হবে, তাহলে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ আচরণের প্রতিবাদে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো মর্যাদাবান সাহাবীর সোচ্চার হওয়ার কি প্রয়োজন ছিলো। সে ঘটনাটি কি আপনার মনগড়া অর্থটিকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করছে না ? বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ বেদায়ার মতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাছে বসিয়ে আলী রাদিল্লাহু আনহুর গালমন্দ শুরু করে দিলে (فوقع فيه) হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন : আপনি আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করতে শুরু করে দিলেন। (وقعت فى على تشتمه) তারপর হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলতগুলোর বর্ণনা দিলেন।

www.pathagar.com

তিনি রাগে ক্ষোভে প্রতিবাদ জানিয়ে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে উঠে গেলেন এবং তাঁর সংস্পর্শে আর কখনো না আসার কথাও জানান দিয়ে গেলেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামান্য প্রতিবাদ কিংবা দু' একটি অসংযত কথা বলার কারণেই হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তেজিত হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে কি ? বরং অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার মাথার উপর উন্মুক্ত শাণিত তলোয়ার ধারণ করলেও আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালাগাল করতে পারবো না। একথা 'ফতহুল বারীতে' হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলতের ব্যাপারে মুসনাদে আবু ইয়ালা কর্তৃক বর্ণিত আছে। জিজ্ঞাস্য, এ ধরনের কথা ও ঘটনা কি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছোটখাটো হালকা কোনো সমালোচনা কিংবা মামুলি কোনো কটূ কথার প্রতিক্রিয়া নাকি তাঁকে সরাসরি জঘন্য ভাষায় গালমন্দ করার ইংগিতবহ ? এ সহজ ব্যাপারটি সহজভাবে না বুঝে এত আঁকাবাঁকা পথে যাবার রহস্য কোথায় ?

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার তাৎপর্য এবং এর কতিপয় উদাহরণ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ ঘৃণ্য রীতির প্রতিবাদ জানিয়ে এ ব্যাপারে কয়েকবার উষ্মা প্রকাশ করেছেন। আবু যোহরার কিতাব থেকে এর একটি উদ্ধৃতি আগে উল্লেখ করেছি। প্রথম আলোচনায় মুসনাদে আহমাদ থেকে এর দ্বিতীয় উদ্ধৃতি পেশ করেছি। এ উদ্ধৃতিতে আছে মিম্বারে দাঁড়িয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর গালমন্দ করার বিরুদ্ধে হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কৈফিয়ত তলব করলে শ্রোতাগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোথায় এবং কেমন করে হলো ? জবাবে উম্মে সালমাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কি গালাগালি করা হচ্ছে না যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করারই নামান্তর ? অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মহব্বত করতেন যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনোনীত কুফার গভর্নর মুগীরা বিন শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থিতিতে মসজিদের অভ্যন্তরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার ঘৃণ্য প্রথা জারী ছিলো। এ ন্যক্কারজনক প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন হযরত সায়ীদ বিন যায়েদ

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেছিলেন, এসব কি হচ্ছে ? এ কুপ্রথা কেন বন্ধ করা হচ্ছে না ? এ ঘটনা সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদে উল্লেখ আছে। ওসমানী সাহেব যদি এসব ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে বলেন যে, এখানে 'সাব্ব শাতম' করার অর্থ সামান্য প্রতিবাদ করা কিংবা দু' একটি অসংযত কথা বলা, তাহলে উম্মুল মু'মিনীন এবং বেহেশতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত সাহাবাদ্বয়ের কণ্ঠে এ প্রতিবাদ কি অর্থহীন গলাবাজিতে পরিণত হয়ে যায় না ? অথবা এটা প্রমাণিত হয় না যে, এ ব্যাপারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু এবং তাঁর গভর্নরদের মূলতঃ কোনো ত্রুটি আদৌ ছিলো না। তারা শুধু এতোটুকু বলতেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে গড়িমসি করেছেন। এতোটুকু কথাই পরবর্তীতে কল্পকাহিনীরূপে প্রচারিত হয়।[১] অথচ এ ব্যাপারে রয়েছে ভুরিভুরি প্রমাণ ও ইতিহাসের বহু সাক্ষ্য। ওসমানী সাহেবের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, আপনার দৃষ্টিতে সাহাবী হওয়ার দুর্লভ মর্যাদা কি শুধু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাগ্যেই জুটেছিলো, আর উম্মুল মু'মিনীন ও অন্যান্য জলিল কদর সাহাবীগণের তার মুকাবিলায় কোনোই মর্যাদা ছিলো না—একথার জবাব দিবেন কি ? অপরের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শনের অভিযোগ আনয়নকারীদেরও চিন্তা করা উচিত যে, তাঁরা নিজেরা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কতদূর মর্যাদা প্রদর্শন করছেন, না কি অপরের মনগড়া দোষ ধরতে গিয়ে নিজেরাই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছেন ? তারতম্য জ্ঞানহীনতা আর কাকে বলে ?

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নরগণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুৎসা রটনা করা সম্পর্কিত ব্যাপারে মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব শুধু একথা বলেই বিষয়টিকে পরিষ্কার করতে চেয়েছেন যে, মাওলানা মওদূদী এ ব্যাপারে মাত্র দু'টি রাওয়ায়েতের হাওলা দিয়েছেন। একটিতে কুফার গভর্নর হযরত মুগীরা বিন শো'বার উল্লেখ আছে। কিন্তু রেওয়াতেটির বর্ণকারী (রাবী) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই শীয়া। আর দ্বিতীয় রাওয়ায়েতটি, যা মদীনার গভর্নর মারওয়ান সম্পর্কিত, সেটিকে ওসমানী সাহেব এভাবে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন যে, বুখারী শরীফে শুধু উল্লেখ আছে যে, মারওয়ান হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'আবু তোরাব' বলতেন। এটাকে বড়জোর নির্বোধসুলভ টিপ্পনী বলা যেতে পারে—গালি বলা যায় না।

---

১. সহীহ হাদীসে আছে : سباب المسلم فوق ... من اكبر الكبائر ওসমানী সাহেবের অর্থ এ হাদীসের সাথে কিছুতেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সাধারণ মতপার্থক্যকে সবচেয়ে বড় গুনাহ বলাও ঠিক নয়।

www.pathagar.com

তাকী ওসমানী সাহেবকে এবার আমি বলতে চাই, তাবারীর রাওয়ায়েতটির বর্ণনাকারী যদি শীয়া হয়ে থাকে, তাহলে ইবনে মাযা, সুনানে আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমদের রাওয়ায়েতটির বর্ণনাকারীও কি শীয়া কিংবা মিথ্যাবাদী ? যারা শীয়া বর্ণনাকারীদের তুলনায় আরও অধিক স্পষ্ট ভাষায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি গালমন্দের ঘটনা ও এর প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন? বাকি রইলো মারওয়ানের কাহিনী। এ ব্যাপারে বেদায়া গ্রন্থের বরাত দিয়ে 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' বইয়ে যেই রাওয়ায়েতটির উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তাতে এ শব্দগুলো আছে যে, 'মারওয়ান যখন মদীনায় আমীরে মুয়াবিয়ার মনোনীত গভর্নর ছিলেন, তখন তিনি প্রত্যেক জুমায় মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতেন। ওসমানী সাহেব এ প্রসংগে 'আল বালাগে' লিখেছেন 'মারওয়ান হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কিছু অশোভনীয় শব্দ ব্যবহার করতেন. কিন্তু ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে এর উল্লেখ নেই ; এ দাবী ভুল।

জনাব ওসমানীর জ্ঞাতার্থে বলছি, ইমাম সুয়ুতির 'তারিখুল খুলাফা' এবং ইবনে হাজর মক্কীর প্রণীত 'তাতহীরুল জিনান' গ্রন্থের ১৫৩ পৃষ্ঠার একটি বর্ণনায় আছে যে, মারওয়ান জুময়ার খুতবায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এমন জঘণ্য ভাষায় গালাগালি করতো যদ্দরুন হযরত হাসান বিরক্ত হয়ে মসজিদে আগে না এসে নামাযের জামায়াত দাঁড়াবার পূর্বক্ষণে মসজিদে উপস্থিত হতেন। পরিশেষে মারওয়ান বাহক পাঠিয়ে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিয়েছে। তাতে অন্যান্য গালি বলেছে। যেমন ঃ তোমার উদাহরণ হচ্ছে খচ্চরের অনুরূপ। যাকেই জিজ্ঞেস করো যে, তোমার বাপ কে ছিলো ? সে বলবে, তোমার মা ঘোড়ী ছিলো। যেই মারওয়ানকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালউন এবং 'ওয়াগ বিন ওয়াগ' বলতেন এবং শাহ আবদুল আযীয যাকে 'তরিদ বিন তরিদ' বলে ব্যাঙ্গ নামে লিখতেন সেই বদযবান।[১] মারওয়ান হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খচ্চর, রাসূল দুলারী সাইয়েদাতুন নেসা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ঘোড়ী এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গাধার সাথে তুলনা করার ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে। -(নাউযুবিল্লাহ্) এ রাওয়ায়েতের রাবীগণ ইবনে হাজর নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তারপরও যদি কেউ বলে, মারওয়ানের পক্ষ থেকে অশ্রাব্য গালাগাল করার তো খোঁজ পাওয়া যায় না, তাহলে তাদের জন্যে শত-সহস্রবার আফসোস করা ছাড়া আর কিইবা করার থাকে ?

আমি আবারও বলছি যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে এরূপ অশ্লীল তিরস্কার না করার কথা যদিও স্বীকার করা যায় কিন্তু মারওয়ানের

www.pathagar.com

মতো অভিশপ্ত যিয়াদের মতো অজ্ঞাতবংশ পরিচয়ের গভর্নর এ ধরনের কদর্য কাজে লিপ্ত হননি—প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ওসমানী সাহেবরা কিভাবে তা অস্বীকার করেন। যিয়াদের অশ্রাব্য গালাগালিরই তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু। অতপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপাধি 'আবু তোরাব' শব্দের অবমাননাকর ব্যবহার

যা হোক, মারওয়ান কর্তৃক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করা সংক্রান্ত যে সমস্ত রাওয়ায়েত রয়েছে, জনাব তাকী ওসমানী সেগুলোকে উপেক্ষা করে আবারও একই কথার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। তিনি বলছেন, সহীহ বুখারী থেকে শুধু এটুকুন জানা যায় যে, "মারওয়ান হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'আবু তোরাব' বলতেন। বড়জোর বলা যায়, তিনি হয়তো শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'মাটির পিতা' বা 'মাটিওয়ালা' অর্থে ব্যবহার করেছেন। তবে ইসলামের কোনো নীতিতেই একে গালমন্দ বা তিরস্কার বলা যেতে পারে না।"

জনাব তাকী ওসমানী মারওয়ানকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে "ইনসাফের কোনো নীতি বলে যেই কথাটি বানালেন, এর উপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষম হলেও এভাবে আলোচনা অহেতুক দীর্ঘায়িতই হবে। তাই এ মুহূর্তে আমি আমার আলোচনাকে শুধু 'আবু তোরাব' শব্দের মধ্যেই সীমিত রাখতে চাই। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কারের বিষয়টি আমি বিগত আলোচনায় স্পষ্ট করেই বলেছিলাম যে, মারওয়ান এবং তার অন্যান্য উমাইয়া সহযোগী ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে তোরাবিয়া (মাইট্যা) নামে অবহিত করে ধৃষ্ঠতা দেখাতো। কাজেই হুজার ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিবাদ করায় তাঁর ব্যাপারে যিয়াদ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এই বলে অভিযোগপত্র প্রেরণ করে যে, এ 'তোরাবিয়া সাবায়িয়া' গোষ্ঠীর বিদ্রোহীরা আমীরুল মু'মিনীন (মুয়াবিয়া)-এর বিরোধিতা করেছে।

এ থেকেই স্পষ্ট যে, মারওয়ান এবং যিয়াদ প্রমুখ 'আবু তোরাব' এবং তোরাবিয়া শব্দটি এমন ভঙ্গিতে ব্যবহার করতো, যা নাম বিকৃতি সম্পর্কিত কুরআনের নিষেধ বাণীর আওতায় পড়ে। এছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. 'তাত্হীরুল জিনান' এর পূর্ণ বাক্য 'আদালতে সাহাবা' অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ওয়া সাল্লাম আদর স্নেহ পূর্বক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যেই উপনাম বা উপাধিতে সম্বোধন করতেন, সে স্থলে হযরতের দেয়া শব্দটিকেই ব্যাঙ্গ উপহাস ও তিরস্কারের বাহন বানানো এর চাইতে জঘন্যতম অপরাধ ও ধৃষ্ঠতা আর কি হতে পারে ? এতো যেন প্রিয় নবী সত্তার পবিত্র মুখনিসৃত শব্দটিকেই পরোক্ষো ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ করা। অথচ তাঁর প্রতি ভালোবাসা মহব্বত যে কোনো মুসলমানের ধর্ম ও ঈমানের অঙ্গ। হাফেজ ইবনে কাসীর 'আল বেদায়া' ৭ম খণ্ডের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

كان بعض بني اميه يعيب علينا بتسميته ابا تراب وهذا الاسم انما سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم كماثبت في الصحيحن۔

"বনী উমাইয়ার কেউ কেউ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুনিয়াত 'আবু তোরাব' নামের উচ্চারণ করে তাঁর নিন্দা করতো। অথচ এ উপনামটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দান করেছিলেন। বুখারী মুসলিমে প্রমাণ রয়েছে।"

মারওয়ান ও বনি উমাইয়ারাই তার দোসরগণ কর্তৃক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করার বিষয়টিকে ওসমানী সাহেবেরা হালকা ও মামুলী মনে করার কারণেই সম্ভবত মারওয়ানের মানব সন্তানরা আজও সে ধারা অব্যাহত রাখার অনুশীলন করে যাচ্ছে। লাহোরে আবু ইয়াযিদ[১] বাট নামে একজন লোক 'মুহিব্বীনে সাহাবা' নামীয় একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। তিনি বনী হাশিম ও বনী ওমাইয়ার আত্মীয়তা নামে একটি পুস্তিকার ১৫, ১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"ذرا نگاہِ تقدس سے پردہ ہٹا کر نگاہِ تدبر سے غور فرمائیں کہ حضورؐ کی صاحبزادی کو تکالیف کس نے پہنچائیں۔ آخر سیدنا علیؓ سارا دن کیا کرتے تھے۔ جو خاوند گھر میں کچھ کما کر نہ لائے، اپنی بیوی کے کام کاج میں ہاتھ نہ بٹائے، بیوی اور اولاد کی کفالت نہ کر سکے اور بقولِ حضرت امام محمد باقر رسول اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف لکڑیاں لانا، پانی بھرنا اور بیرون خانہ کا کام

১. মাহমুদ আব্বাসীর সদর্প দাবী, তার তৎপরতার প্রভাবে লোকেরা ইতিমধ্যেই আপন ছেলের নাম ইয়াযিদ এবং নিজ কুনিয়াত 'আবু ইয়াযিদ' ধারণ করা শুরু করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

بھی جناب سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کے ذمے ڈال دے تو اندازہ لگائیں جناب سیدہ اور خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہاشمی داماد سے کیا سکھ ملا ہوگا۔ ..... حبیب رسولِ خدا نے فاطمہؓ کو اس حال میں دیکھا، آنسو چشم ہائے مبارک سے رواں ہوئے اور فرمایا اے دختر گرامی تلخی ہائے دنیا کی حلاوت چکھو (یعنی سیدنا علیؓ تمہیں جو دکھ دے رہے ہیں، انہیں برداشت کرو)۔ .... سبائی مفسرین کی روایات سے معلوم ہوتا ہے چونکہ سیدنا علیؓ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے اسی لیے حضور انہیں ابوتراب (یعنی مٹی کا!) بار بار کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ ...... بار بار ابوتراب اس لیے فرماتے تھے کہ یہ کوئی کام کاج نہ کرتے تھے اور گھر میں پڑے رہتے تھے۔

"সকল দোষমুক্ত পূতঃপবিত্র জ্ঞান করার প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছুটা সরে এসে চিন্তা করে দেখুন। নবী দুলালী হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কষ্ট দিয়েছেন কে ! সাইয়্যেদুনা আলী সারাদিন কি করে কাটিয়েছেন। যে স্বামী রোজগার করতে অক্ষম নিজের স্ত্রীকে কাজে সহায়তা করে না। স্ত্রী ও সন্তানদের দায়িত্ব বহন করতে যে অপারগ যিনি রাসূলের সাথে কৃত ওয়াদার খেলাফ লাকড়ি যোগাড়, পানি উঠানো এবং বাহিরের কাজ করতেন সে ফাতেমা এবং রাসূল নিজে এ হাশেমী জামাতা দ্বারা কি সুখ শান্তি পেতে পারেন ? রাসূল ফাতেমার ঐ অবস্থা দর্শনে অশ্রু বিসর্জন করে তাঁকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিতেন ----। সাবায়ী তাফসীরকারদের প্রচারনা হলো আলীর কোনো কাজ-কাম ছিলো না। সারাদিন শুয়ে থাকতেন। যদ্দরুন নবী তাঁকে আবু তোরাব (মাটিওয়ালা) নামে ডাকতো.................... ।"

গোটা পুস্তিকাতেই এরূপ মনগড়া গর্হিত ও ঘৃণিত কথাবার্তার ছড়াছড়ি। তাতে মারওয়ানকে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' এবং ইয়াযিদকে 'সাইয়্যেদুনা' খেতাবেও

www.pathagar.com

ভূষিত করা হয়েছে। তাকী ওসমানী সাহেব এ ধরনের উদ্ধৃতি পাঠ করার পরও বলবেন কি যে, 'আবু তোরাব' নাম নিয়ে কেউ তিরস্কার ও কুৎসা করে না এবং এ শব্দটিকে কোনো নীতিতেই তিরস্কার ও গালমন্দের অর্থে ব্যবহার করা যায় না।[১]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও কি গালমন্দ করতেন ?

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করা সংক্রান্ত আমার পেশকৃত প্রমাণ ভিত্তিক দলীলের জবাবে ওসমানী সাহেব হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীগণও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে খারাপ কথা বলার দোষ আবিষ্কার করেছেন। তিনি লিখেছেন, সনদের দুর্বলতার কারণে আমরা এসব রাওয়ায়েত সহীহ মনে করি না। কিন্তু এসব রাওয়ায়াতের ভিত্তিতে যদি কেউ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপরও গালমন্দ করার অপবাদ দৃঢ় প্রত্যয়সহ আরোপ করে তাহলে মাওলানা মওদূদী ও গোলাম আলী সাহেব যারা ঐতিহাসিক বর্ণনাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করার সমর্থক তারা সে ব্যক্তির জবাব কিভাবে দিবেন ?

প্রমাণসহ এর বিস্তারিত জবাব দেয়া অতীব সহজ হলেও আমি সেদিকে না নিয়ে শুধু এই বলবো যে, আমরা কখনও সব ধরনের ঐতিহাসিক বর্ণনা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করি না। তবে আমরা একথারও সমর্থক নই যে, কোনো সাহাবীর কোনো ভুল যদি সঠিক তথ্যসহ হাদীস 'আছার' অথবা ইতিহাসে বর্ণিত হয় তাহলে নিছক সাহাবী হবার কারণে উক্ত মর্যাদা বিরোধী হবার ভয়ে সে বর্ণনাকে বাদ দিয়ে সত্য গোপন করা হবে।[২] অথবা আমরা একথারও সমর্থক নই যে, কোনো সাহাবীর ভুলকে চাপা দেয়ার জন্যে সহীহ হাদীস ও রাওয়ায়েতসমূহকে অস্বীকার করার দ্বার উন্মোচন করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে কোনো কোনো দুর্বল অসত্যাশ্রিত রাওয়ায়েত দ্বারা অপর সম্মানিত সাহাবীকেও একই অভিযোগে অভিযুক্ত করে শেষ পর্যন্ত একথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি করা

১. মোটকথা, এটাই বাস্তব যে, 'আবু তোরাব' শব্দটি দ্বারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মারওয়ান ও উমাইয়া গোত্রের অনেকেই দীর্ঘদিন যাবত ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালমন্দ করেছে এবং তাঁর ভাব মর্যাদাকে জনসমক্ষে হেয়প্রতিপন্ন ও বনী উমাইয়ার শাসকদের বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। অথচ এ শব্দটি ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদত্ত একটি উপনাম—যার মাধ্যমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা করা হয়েছিলো। কিন্তু সাবায়ী মুনাফিক এবং নবী পরিবারের প্রতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথার প্রতিই এক শ্রেণীর লোক প্রাধান্য দিতে দ্বিধা করছে না।

২. তাতে অপরদিকে ইসলামের বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা যায়। এরূপ সত্য গোপনে অন্যত্র ইসলামের মৌল শিক্ষা ও বিধানের ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠা অসম্ভব নয়।

www.pathagar.com

যে, সহীহ্ অসহীহ্ সকল হাদীসই প্রত্যাখ্যান যোগ্য। আমার গোটা আলোচনা সামনে রেখে যে কোনো ব্যক্তি যাচাই করে দেখতে পারেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার প্রসংগটি প্রমাণ করার জন্যে আমার আলোচনা সহীহ্ মুসলিম, সুনানে তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযা এবং মুসনাদে আহমদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। আর এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হাদীসশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল কিতাব। ওলামা এবং ইতিহাসবিদদের যেসব উক্তি আমি প্রসংগক্রমে উল্লেখ করেছি, তারা সকলেই আহলে সুন্নাতের ইমামরূপে সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত ও বরণীয়। তাদের সকলের মতেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বাইতকে গালমন্দ করার সূচনা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে হয়। এবং ওমর বিন আবদুল আযীযের যমানায় তার অবসান ঘটে। আশ্চর্যের কথা যে, তাকী ওসমানী সাহেব আবেগ তাড়িত হয়ে অশুভ তৎপরতার ভারসাম্য রক্ষার্থে ইবনে হাবীব রচিত 'আল মুহাব্বার'-এর বরাত দিয়ে মন্তব্য করে বসলেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীগণ ও প্রতিপক্ষকে এরূপ গালমন্দ করতেন। এ ধরনের বর্ণনাকে অসার এবং অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করতে যাওয়া কালক্ষেপণ ছাড়া আর কিছু না। তবে এটা অপ্রিয় সত্য যে, কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম হযরত আলীর প্রতি অসহযোগিতা দেখিয়েছেন কিংবা তার বিরোধী ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। ফলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী কিংবা তাঁর বিরূপ সমালোচনাকারীদেরকে দমন করতে পারেননি। এর অর্থ এ নয় যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ঘৃণ্য মানসিকতাকে উৎসাহিত করতেন অথবা এ জঘন্য অপরাধকে স্বাভাবিকভাবে বরদাশত করতেন। এমনিতে কুফার মসজিদে খারেজীরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিতো না এবং হত্যার হুমকি দিতো। এসব ধমকি তিনি এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু তার সামনে কেউ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বদনাম করে সহজে সেরে যেতে পারতো না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকী ওসমানী সাহেব ইবনে জারীর তাবারীর কথা তুলে ধরেছেন। এখানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অথবা অপর কতিপয় সাহাবা সম্পর্কে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন তা নিসন্দেহে অসঙ্গত। আমরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কারও সম্পর্কেই এ আকীদা পোষণ করি না যে, তাঁরা ভুলের উর্ধে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাংদেহী যেই অন্যায় তৎপরতা চলছিলো, তাতে তাঁর মনে আঘাত লাগা অন্তর বিষন্ন হওয়া কিছুমাত্র

www.pathagar.com

বিচিত্র ছিলো না। তিনিও তো একজন মানুষই ছিলেন। এ কারণে যদি কোনো আবেগ-উত্তেজনার মুহূর্তে তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়ে যে, মুয়াবিয়ার কোনো ইসলামী অবদান নেই। তিনি ইসলামে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করার পূর্বে আল্লাহ এবং তার রাসূলের দুশমন ছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন।"—তাহলে এটাকে এক অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ বলতে হবে। আমরা জেদের বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করবো না। আর এ অশুভ মন্তব্যটিকে যদি গালমন্দ করার পর্যায়ে ধরা হয় তাহলে আমরা মুসলিম শরীফে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস এখানে পেশ করা যথার্থ মনে করি। হাদীসটি হলো ঃ

المتسابان ماقالاه فعلى البادى منهما مالم يعتد المظلوم۔

"দু'জন লোক গালাগালি করলে সূচনাকারীর ওপরই সব দায়-দায়িত্ব বর্তাবে, যতোক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি সীমাতিক্রম না করে।"

এ ক্ষেত্রে সূচনাকারী কে ছিলেন তা প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তিরই জানা কথা এবং দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবহৃত যেসব শব্দকে গালমন্দ বলে চালানো হচ্ছে, সেই 'গালমন্দ' ও এর ভাষা, ধরন, প্রকৃতি ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও সকলেই সম্যকভাবে অবগত। দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে যা বলেছে, তাকি প্রথম পক্ষের ব্যবহৃত শব্দ থেকে সীমার বাইরে ছিলো, না কম তাও সকলের সামনে।

তাকী ওসমানী সাহেব হযরত হাজর বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরূপ সমালোচনার কথা উল্লেখ করেছেন ঠিক, কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনুহু যে তাঁকে এ কাজের জন্যে শাসিয়ে সাবধান করেছিলেন একথাটি তিনি এড়িয়ে গেলেন কোন্ মানসিকতায়।[১] এখানে একথাটি স্পষ্টভাবে বলে দেয়া জরুরী মনে করছি যে, হযরত হাজর বিন আদী রাদিয়াল্লাহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর যাকিছু করেছেন এবং তাঁর প্রতি যেসব আচরণ করা হয়েছে, এ দায়িত্বতো কিছুতেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর বর্তায় না। এ সত্ত্বেও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় দেখা গেছে, কেউ যদি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের ব্যাপারে আপত্তিকর কিছু বলতো, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এ জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাসিয়ে সাবধান করে দিতেন। যেমন, আবু হানীফা দিনওয়ারী তাঁর— "তারীখুল আখবার আত্তিয়াল" গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, একদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জানতে পারলেন যে, হযরত হাজর বিন

১. আবু হানীফা দিনওয়ারী কর্তৃক রচিত 'তারিখে আখবারে তিওয়াল'-এর ১৬৫ পৃষ্ঠায় এর বিস্তারিত লেখা দেখুন।

www.pathagar.com

আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরীয় তথা সেখানকার উমাইয়া প্রশাসনের কুৎসা ও সমালোচনা করছেন, তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে চিঠি লিখে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং তা থেকে বিরত থাকতে বলেন। অতপর হযরত হাজর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফার কাছে জানতে চাইলেন—"আমীরুল মু'মিনীন ! আমরা কি সত্যের উপর নই আর তারা কি বাতিলের উপর নয় ?" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ "হ্যাঁ, তবে আমি তোমার জন্যে এরূপ করাটা অপসন্দ করছি যে, তুমি তাদেরকে ভর্ৎসনা করো।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন—এ অপ্রামাণ্য কথার অবতারণা করাকেও মাওলানা তকী ওসমানী সাহেব অতি জরুরী মনে করেছেন। তিনি বেদায়ার ৭ম খণ্ডের ২৫৮ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে তা উল্লেখ করেছেন। অথচ বেদায়ার রচয়িতা ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে কথা প্রত্যাহার করে বলেছেন যে, وهذا عندى لايصح عن على "হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এমন কথা বলেছেন—এটা আমার কাছে সঠিক মনে হয় না।" তাকী ওসমানী সাহেব একথাটিও কোন্ মানসিকতা থেকে অনুল্লেখিত রাখলেন, তাও একটি জিজ্ঞাস্য।

আসলে জনাব মাওলানা তাকী ওসমানীর এ ব্যাপারে প্রমাণ পদ্ধতির ধরন দেখে এটাই মনে হয় যে, তার দৃষ্টিতে আমাদের উপস্থাপিত সকল দলীল-প্রমাণ মিথ্যা মনগড়া। প্রামাণ্য, অতিপ্রমাণ্য বা স্বল্প প্রামাণ্য সকল প্রকার রাওয়ায়েতকেই পাইকারীভাবে একই মানের মনে করার যেই রীতি তাকী সাহেব অবলম্বন করেছেন, তিক্ত হলেও বলতে হয়, এটি সত্যনিষ্ঠ আহলে সুন্নাতের মনীষীদের রীতি নয়। বরং 'মুনকেরীনে হাদীস' (হাদীস অস্বীকারকারী) এবং নাসেবিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের কার্যাবলীরই অনুরূপ। তারা কতিপয় মনগড়া রাওয়ায়েত এক জায়গায় করে, অতপর সেগুলোর ফাঁকে নিজেদের ইচ্ছামতো অন্যের সহীহ বা সহীকর হাদীসও অস্বীকার করে বসে। [উল্লেখ্য যে, 'নাসেবিয়া' ঐ মতের অনুসারীদেরকেই বলা হয়। যারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলে বাইতের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণকে ঈমানের অংশ মনে করে। তারা রাফেযীদের বিপরীত। যারা আহলে বাইত ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অধিক দরদ ও ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে ইসলামের মৌল নীতিমালার সীমালংঘন করে।]-সম্পাদক

ওসমানী সাহেবের দাবী, কোনো গ্রন্থেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার শব্দ স্পষ্টরূপে উল্লেখ নেই। হাদীসে এ সম্পর্কিত যেসব বাক্য

www.pathagar.com

এসেছে তার অর্থ বড়জোর এতোটুকু যে, অসংযত ও অশালীন কিছু শব্দ সম্ভার মাত্র। এরূপ ধারণার অপনোদন কিংবা সংশোধনের লক্ষ্যে আমরা তাকী ওসমানী সাহেবদেরকে সুনানে ইবনে মাযার প্রতি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানাই। সেখানে আছে ঃ

عن سعد بن ابی وقاص قدم معاوية فی بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد ـ

"হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার হজ্জে আসলে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। সেখানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা উঠলে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্পর্কে খারাপ কথা বলেন। এতে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রেগে যান----।"[১]

এখানে نال منه -এর অর্থ 'বদগুয়ী' বা 'খারাপ কথা' করলে ওসমানী সাহেব আপত্তি করতে চাইলে আমি বলবো আপনি আপনার লেখা বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠার ينالون منه -এর তরজমার প্রতি একটু দৃষ্টি প্রদান করুন। একস্থানে দু' ধরনের তরজমা সমীচীন নয়। একটি মুয়াবিয়ার জন্যে অপরটি হযরত হুজ্জারের জন্যে। বিচার ও পরিমাপক দণ্ড দু' রকম হওয়া উচিত নয়।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বালাজুরী তার গ্রন্থ 'আনসাবুল আশরাফে' গালাগাল করার কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ

لما قدم بسر بن ابی ارطاة البصرة وكان معاوية بعثه لقتل من خالفه واستحياء من بايعه ـ صعد المنبر فذكر عليا بالقبيح وستمه وتنقصه ثم قال ايها الناس ـ انشدكم بالله اما صدقت فقال ابو بكره انك تنشد عظيما والله ماصدقت وما بررت فامر بابی بكرة فضرب حتی غشی عليه

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁর বিরোধীদেরকে হত্যা করতে এবং স্বপক্ষীয়দেরকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বুসরা বিন আরতাতকে বসরা নগরীতে পাঠালেন, তখন বুসরা সেখানে উপস্থিত হয়ে মিম্বারে চড়ে গালমন্দ, ভর্ৎসনা ও অবজ্ঞার সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা উল্লেখ করে বললো ঃ সমবেত জনতা ! আল্লাহর কসম করে বলছি ঃ আমি কি সত্য কথা বলিনি ? হযরত আবু বকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন জবাবে বললেন ঃ তুমি মস্তবড় সত্তার কসম করেছো। আল্লাহর কসম ! তুমি সত্য

১. যদি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তিটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ভালোই হবে তাহলে তাঁর অসন্তুষ্ট হয়ে উত্তেজিত হবার কি কারণ থাকতো ?

www.pathagar.com

কথা বলোনি। কোনো ভালো কাজও করোনি। তাতে বুশরা আবু বকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রহার করার নির্দেশ দিলে তিনি এমনভাবে প্রহৃত হোন যে, ঐ প্রহারে তাঁর সংজ্ঞা লোপ পায়।"-(আনসাবুল আশরাফ পৃষ্ঠা ৪৯২, খণ্ড ১, দারুল মাআরিফ, মিশর)

বসরাতে বুসর বিন আবি আরতাতও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনোনীত একজন শাসক ছিলেন। তার যুলুম-অত্যাচারের মর্মান্তিক কাহিনী সকল ঐতিহাসিকই বর্ণনা করেছেন। বালাজুরী সাহেবও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও গালমন্দ করার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতিবাদকারীকে নির্মমভাবে প্রহার কিংবা নাজেহাল করা হয়েছে। সুতরাং গালমন্দ করার রেওয়ায়েতগুলোকে 'কদাচিত' কিংবা গালাগাল করার অর্থ 'যৎকিঞ্চিত মতপার্থক্য' ইত্যাদি বলে বিষয়টিকে হালকা করে দেখার অবকাশ কোথায় ?

গালমন্দ করার দীর্ঘসূত্রিতা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার এ ঘৃণ্য ধারা তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও তা উপেক্ষা করার একটি সুযোগ থাকতো। কেননা তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে যখন তার ঝনঝনানী শুরু হয়ে যায়, তখন ভাষার তলোয়ারকে কোষবদ্ধ রাখা অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কর হয়ে পড়ে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর বিশেষত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের মসনদ ছেড়ে দেয়ার পরও এরূপ তৎপরতা অব্যাহত রাখার কোনোই যৌক্তিকতা ছিলো না। আমি কতিপয় দলীলপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে একথা প্রমাণ করেছি যে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্মানিত পিতা ও পরিবারবর্গকে গালমন্দ না করা অথবা তাদের সামনে অন্তত গালাগালি না করার শর্তে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সন্ধি করেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, শর্তটি উপেক্ষিত হয়ে গালমন্দ করার ধারা আমীরে মুয়াবিয়ার নিরংকুশ ক্ষমতালাভের পর আরও ব্যাপকহারে শুরু হয়। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হযরত হাসান ও তাঁর ভাইয়ের আচরণ ছিলো অত্যন্ত আপোষমূলক। এটা আবুল ফিদা সহ অপর সকল ঐতিহাসিকেরই স্বীকৃত কথা। জনাব মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেবও একথা স্বীকার করেছেন। কয়েক জায়গায় তিনি একথা লিখেছেন যে ঃ

"হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা সত্বেও তাঁরা উত্তেজিত হননি। এমনিভাবে ইয়াযিদ অবাধ্যতা দেখালে

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বিন হানিফিয়া লোকদেরকে তিরস্কার করেন এবং বলেন যে, তিনি (ইয়াযিদ) ভালো মানুষ।"

প্রতিপক্ষের এরূপ নমনীয় ভূমিকা সত্ত্বেও গালমন্দ করার ঘৃণ্যধারা অব্যাহত থাকা এমন বেদনাদায়ক ঘটনা যা বর্ণনার অতীত। ওসমানী সাহেব ইচ্ছা করলে ঘটনাবলীর এ ধারাবাহিকতা অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু চিন্তার বিষয়, এর দ্বারা শুধু ঐতিহাসিক রাওয়ায়েতসমূহকেই অস্বীকার করা হবে না অনেক সহীহ্ হাদীসকেও তাহলে অস্বীকার করতে হবে। 'সাব্ব ও শাতম' শব্দদ্বয়কে উর্দূ ও আরবী ভাষার ব্যবহারিক মারপ্যাচে বিভক্ত করলেও তা দ্বারা পার পাওয়া যাবে না। যেমন আবু দাউদ গ্রন্থের 'লিবাস' অধ্যায়ের একটি হাদীসে আছে—হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে মিকদাম বিন মাআদিকারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেউন বলে উঠলেন, তাতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বিস্ময় প্রকাশ করেন। এই সঙ্গে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক চাটুকার বলে উঠলো : "হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তো ছিলো একটি জ্বলন্ত অংগার যা আল্লাহ্ নিভিয়ে দিলেন।" একথার জবাবে হযরত মিকদাম রাদিয়াল্লাহু আনহু যা কিছু বলেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যাতাগণ এর যে বিবরণ দিয়েছেন তার সবই আমি উল্লেখ করবো। সহীহ্ হাদীস থেকে এ ব্যাপারে অনেক উদাহরণই পেশ করা সম্ভব। কিন্তু এরূপ বিতর্কের ফলাফল কি হতে পারে তার কি চিন্তা করা দরকার নেই?

শাহ্ ইসমাঈল শহীদের ব্যাখ্যা

'হেকায়াতুল আওলিয়া' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে শাহ্ ইসমাঈল শহীদের প্রশ্নোত্তরের যে ঘটনা আমি পেশ করেছি 'আল বালাগ' সম্পাদক তাকী ওসমানী সাহেব সেটাকে শিয়াদের জন্যে শাহ্ সাহেবের নেতিবাচক জবাব বলেছেন। এ জবাব শাহ্ সাহেবকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাল্লিদ হওয়া আদৌ বুঝায় না। আশ্চর্য ব্যাখ্যা বটে ! মাওলানা থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ঘটনাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন—মাওলানা ইসমাঈল শহীদ সোবহান আলী খানকে (শিয়া) জিজ্ঞেস করলেন : বলুন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরূপ সমালোচনা হতো কি ? তিনি বললেন : না। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবার ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করা থেকে পবিত্র ছিলো। তারপর শাহ্ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন : হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ হতো কি ? তিনি বললেন : অবশ্যই হতো। তাতে শাহ্ সাহেব বললেন : আলহামদুলিল্লাহ্ ! আহলে সুন্নাত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাল্লিদ আর রাফেযীগণ[১] হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাল্লিদ ! যে দরবারে

১ যারা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও তার বংশধরদের প্রতি ভক্তি ভালোবাসা প্রদর্শনে সীমাতিক্রম করে।

www.pathagar.com

(অর্থাৎ আলীর) হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরূপ সমালোচনা হতো না তার সাথে শাহ্ সাহেবের একাত্মতা ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিভংগী অস্পষ্ট থাকলো কেমন করে। ওসমানী সাহেব কি শাহ সাহেবকে আহলে সুন্নাত জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না ! অধিকন্তু শাহ্ সাহেবের জবাবকে নেতিবাচক জবাব বলাও অযৌক্তিক। কেননা জবাব তখনই নেতিবাচক হতো শাহ্ সাহেব যদি বলতেন ঃ আরে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারেও তো গালমন্দ হতো। এমতাবস্থায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে গালমন্দ হওয়া বিচিত্র নয়। অথচ তিনি এরূপ জবাব দেননি।

পরিশেষে মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব এই বলে অভিযোগ করেন যে, মালিক গোলাম আলী সাহেব নিকট অতীতের এমন কিছুসংখ্যক লেখকের বক্তব্যই পেশ করেছেন তারাও একই কথা লিখেছেন, যা ইতিপূর্বে মাওলানা মওদূদী সাহেব লিখেছেন।”

এ যুক্তিতে কোনো ভুল বৈধ হতে পারে না যে, নিকট অতীতে অন্যেরা একই ভুল করেছে। জনাব ওসমানী সাহেবকেই জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এসব লেখকের কথাগুলো আগে থেকেই আপনি অথবা অপর কেউ ভুল বলে আসছিলেন কিনা যেগুলো মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহির সমর্থনে পেশ করার কারণে ভুল হয়ে গেল ? তাদের এসব কথা যদি ভুল বলেই আপনারা মনে করে থাকেন, তাহলে এসব ভুলের বিরুদ্ধে কোনো সময় আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, যেমনটি আমাদের বেলায় শুরু করে দিয়েছেন ? ভুল ও নির্ভুল হওয়ার মানদণ্ড নির্ধারণ করার অধিকার কি আপনাদের একচেটিয়া ! এমনটি কি হতে পারে না যে, মাওলানা মওদূদী এবং ঐসব লেখক যা লিখেছেন সেগুলোই সঠিক আর আপনার কথাই বেঠিক ?

আমি তো কেবল নিকট অতীতের লেখকদের কথাই উদ্ধৃত করিনি, দূর অতীতের এমন অনেক মনীষীর বক্তব্যও পেশ করেছি যাদের ইলম, চিন্তা-গবেষণা, মান-মর্যাদা ও তাকওয়া আপনি ও আমার মতো চুনোপুটির চেয়ে লাখো গুণ বেশী। যেমন আপনি জোর দিয়ে উচ্চৈস্বরে বলে থাকেন, “আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালাসমূহের সাথে দ্বিমত থাকতে পারে কিন্তু মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহি ছাড়া অপর কেউ আজ পর্যন্ত সেগুলোকে বিদআত বলার সাহস দেখায়নি।” একথার জবাবে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শরয়ী দলিল ও তাবীলভিত্তিক ফায়সালাকে যেসব ইমাম ও চিন্তাবিদগণ বিদআত বলেছেন তার বেশ কয়েকটি উদাহরণ আমি পেশ করেছি। এতদসত্ত্বেও “মাওলানা মওদূদী ছাড়া আর কেউ এসবকে বিদআত বলেনি” বলে একগুয়েমী প্রদর্শনের যৌক্তিকতা থাকতে পারে কি ?

www.pathagar.com

যিয়াদকে সহোদর ভাইয়ের মর্যাদাদানের কথা ঘোষণা

এক ঃ মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির লেখা

আগের লেখাটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার প্রসংগে ছিলো। এখনকার আলোচ্য বিষয় হলো মাওলানা মওদূদীর সে সকল ভাষ্য যেগুলোতে মাওলানা ওসমানী সাহেবের আপত্তি। যেমন–

"যিয়াদ ইবনে সুমাইয়ার ব্যাপারটিও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এমনসব কার্যাবলীর অন্যতম, যাতে তিনি রাজনৈতিক স্বার্থে শরীয়াতের একটি সর্বসম্মত রীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তায়েফের সুমাইয়া নাম্নী জনৈকা দাসীর উদরে যিয়াদের জন্ম। জনশ্রুতি হলো, জাহেলী যমানায় হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা জনাব আবু সুফিয়ানের সাথে সুমাইয়ার যৌনমিলন ঘটেছিলো। তাতে সে অন্তঃসত্বা হয়। আবু সুফিয়ানও একবার এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, তার বীর্যেই যিয়াদের জন্ম। যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে তিনি উন্নতমানের ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, সেনাধ্যক্ষ এবং অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী প্রমাণিত হন। যিয়াদ প্রথমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘোর সমর্থক ছিলেন এবং অনেক বড় বড় দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। তা দেখে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্বপক্ষে নিয়ে নিজের সহায়ক বানাবার জন্য আপন পিতার যৌনচারমূলক ঘটনাটির সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, যিয়াদ তার পিতার অবৈধ সন্তান। আর এরই ভিত্তিতে তিনি তাকে নিজের ভাই এবং আপন পরিবারের সদস্য রূপে গণ্য করেন।

একাজটি নৈতিক দিক থেকে কত ঘৃণ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[১] কিন্তু আইনের দৃষ্টিতেও এটা ছিলো স্পষ্ট অবৈধ কাজ। কারণ, শরীয়াতে ব্যভিচারের মাধ্যমে কোনো নসব (বংশধারা) প্রমাণিত হয় না। আল্লাহর রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

"শিশু তার যার বিছানায় সে ভূমিষ্ঠ হয়, আর ব্যভিচারের জন্য রয়েছে প্রস্তর খণ্ড।" আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা এ কারণে যিয়াদকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তার সাথে পর্দা করে চলেছেন।

১. অথচ রাজনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ থেকে তাকে স্বপক্ষে ভিড়ানোর জন্যে নতুন ভ্রাতৃ পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

www.pathagar.com

তাকী ওসমানী সাহেব মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহির বর্ণনা ভঙ্গিকে আফসোসজনক আখ্যা দিয়ে যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের বৈধ সন্তান রূপে প্রমাণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। তার মতে 'যিয়াদ জাহেলী যুগের বিবাহ্ প্রথানুযায়ী আবু সুফিয়ানের ঘরে জন্মলাভ করে।' এ প্রসংগে ওসমানী সাহেব সর্বপ্রথম ইবনে খালদুনের যে ভাষ্যটি পেশ করেন, তার অনুবাদ হলো—'যিয়াদের মা সুমাইয়া হারিস বিন কুন্দা তাবীবের দাসী ছিলো। তার ঔরসে সুমাইয়ার গর্ভে হযরত আবু বকরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্ম হয়। তারপর সে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের সাথে তাকে বিয়ে দেয়। সে সময় তার গর্ভে যিয়াদ জন্মগ্রহণ করে। কার্যোপলক্ষে একবার আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু তায়েফে যান। সে সময় তিনি সুমাইয়াকে জাহেলী প্রথানুযায়ী বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করেন। এর ফলে যিয়াদের জন্ম হয় এবং সুমাইয়া যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত বলে সম্বোধন করে। আর আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু তা গোপনে স্বীকার করেন।

ওসমানী সাহেব তো নির্দ্বিধায় বাক্যটি উদ্ধৃত করলেন, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে লক্ষ্য করেননি যে, এখানে একদিকে বলা হলো যে, সুমাইয়ার বিবাহ হয়েছিলো গোলামের সাথে আর সে ঘরেই যিয়াদের জন্ম হয়। অপরদিকে আবার এটাও বলা হয় যে, সুমাইয়ার বিবাহ হয়েছিলো আবু সুফিয়ানের সাথে আর সে সময় যিয়াদ জন্মগ্রহণ করে। এ দুই তথ্যের কোনটি সত্য, নাকি উভয়ই সত্য ? দু'বার বিবাহ ধরে নিলে বলতে হয় যিয়াদের দু'বার জন্ম হয়েছে তাকি সম্ভব ? কিংবা বলতে হয় বিবাহ একটি আর জন্মের ব্যাপারটিতো সকলেরই জানা ছিলো। আর দ্বিতীয় জন্ম দ্বিতীয় বিবাহের ন্যায় গোপন ছিলো। এ রহস্য ওসমানী সাহেব নিজেই উদ্ঘাটন করুন।

জাহেলী যুগের বিবাহপ্রথা

একথা সত্য যে, জাহেলী যুগের বিবাহ অনুষ্ঠানে কতিপয় নির্লজ্জ প্রথা চালু ছিলো। জাহেলী যুগে হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যিয়াদের মায়ের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা আর ঐ সম্পর্ককে জাহেলী যুগের কল্পিত বিবাহ সংজ্ঞার রূপ দেয়া যায় কিনা আর ঐ সুবাদে ভূমিষ্ঠ সন্তান জাহেলী প্রথার মানদণ্ডে বৈধ উত্তরাধিকারী হবে কিনা এগুলোর সুবিস্তার আলোচনা আমাদের কাছে অশোভনীয় হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা তাকী সাহেব ও অপরাপর কতিপয় লোকের বদ্ধমূল ধারণাও এ ব্যাপারে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অমনপুত তথ্য বের করার প্রেক্ষিতে বিষয়টি সুবিস্তারে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হলাম। তাদের ধারণায় জাহেলী যুগের কোনো প্রথাসূত্রে আবু সুফিয়ান যিয়াদের মায়ের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

www.pathagar.com

বুখারী শরীফের 'নিকাহ' অধ্যায়ের একটি বর্ণনামতে জাহেলী যুগে চার ধরনের বিবাহপ্রথার কথা প্রমাণিত হয়। এক ব্যক্তি কারো কন্যা কিংবা কোনো পসন্দনীয় মহিলার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কস্থাপন করতে চাইলে মোহরের বিনিময়ে তাকে বিবাহ করে নিতো। এ প্রথা ইসলাম বৈধ রাখে। দ্বিতীয় প্রথায় কারো স্ত্রীর মাসিক ঋতুস্রাব হওয়ার পর স্বামীর অনুমতিক্রমে অপর কারো অংকশায়িনী হয়ে গর্ভধারণ করতে পারতো। তৃতীয় প্রথা ছিলো, একজন মহিলার সাথে একই সময়ে নয়জন কিংবা তার চেয়ে কমসংখ্যক পুরুষ লোক সম্পর্ক রাখতে পারতো। এ সময়ে মহিলা সন্তান জন্ম দিলে সে তার সাথে সম্পর্কিত সব পুরুষকে ডাকাইতো এবং মহিলা তাদের কোনো একজনকে তার সন্তান বলে নির্ধারণ করে দিলে তাকেই সন্তানের দায়িত্ব বহন করতে হতো। অস্বীকার করার উপায় থাকতো না। চতুর্থ প্রথায় অগণিত সংখ্যক পুরুষের সাথে একজন মহিলার যৌন সম্পর্ক থাকতো। এ ধরনের মহিলা কামুক বলে আখ্যায়িত হতো। এমতাবস্থায় মহিলার ঔরসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার সাথে সম্পর্কিত পুরুষদের একত্রিত করে চেহারা নির্ধারণকারী বিশেষজ্ঞ ডাকা হতো। ভূমিষ্ঠ সন্তানের চেহারার সাথে সমবেত পুরুষদের যার চেহারা আকৃতির সাজুয্য খুঁজে পেতো তাকেই সন্তানের দায়িত্ব বহন করতে হতো। অন্যথা করার কোনো উপায় থাকতো না।

জাহেলী যুগের তথাকথিত বিবাহ প্রথার ধরন যা-ই ছিলো কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই মায়ের সাক্ষ্যে কিংবা চেহারা বিশারদের মাধ্যমে সন্তানের পিতা বা বংশ নির্ধারণ হওয়ার ব্যাপারটি ছিলো সুস্পষ্ট। পদ্ধতিগত-ভাবে নির্ধারিত পিতা ভূমিষ্ঠ সন্তানকে নিজ ঔরসজাত সন্তানের মতো লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করলে এবং তার পিতা হওয়ার কথা সমাজে সাধারণভাবে ঘোষিত না হলে এ পদ্ধতিগত বংশ পরিচয় স্বীকৃত ও বাস্তবায়িত হতো না। একজন পুরুষ একজন মহিলার সাথে গোপনে অভিসারে লিপ্ত হওয়ার ফলে সন্তান জন্মলাভ করলো ঃ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই প্রথানুযায়ী সন্তানের বংশ বা পিতার পরিচয় ঘোষণা না করে তাকে পরিবারভুক্তি থেকে বঞ্চিত করে রাখা হলো। অতপর সন্তান যৌবনে পদার্পণ করলে তার সৌর্যবীর্য আঁচ করে তাকে নিজ পরিবার কিংবা বংশীয় লোক বলে পরিচয় দেয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে দাবীকৃত পিতার মৃত্যুর কয়েক বছর পর পরবর্তী কতিপয় লোকের এরূপ গোপন তথ্য ফাঁস করাকে কিছুতেই বুদ্ধিবৃত্তিক রুচীগ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত মনে করা যায় না।

ভ্রাতৃ পরিচয়দানে বিলম্ব করার হেতু কি

ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুযায়ী হিযরতের আগে কিংবা ২য় সালে যিয়াদের জন্ম হয়। ইসলাম গ্রহণ করার আগে আবু সুফিয়ান যদি তাকে পুত্র

www.pathagar.com

হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে থাকেন ও ৮ম হিজরী সালে মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার পরই যিয়াদ তার ঔরসজাত হওয়ার ঘটনাটি কথা ও কাজের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেয়া তাঁর নৈতিক ও শরয়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিলো। কেননা ইসলাম একজন মানুষের 'নসব' বা বংশ পরিচয় সহ খাদ্য-বস্ত্র, আশ্রয়, পর্দা, বিবাহ-শাদী, মিরাস এবং অন্যান্য সামাজিক ও আইনানুগ নিয়ম-পদ্ধতি ও অপরাপর দায়িত্ব-কর্তব্য তার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। 'নসব' কোনো কবি, ভাবুক, গবেষক কিংবা রাজনীতিবিদের ভালোবাসার পরিহাসের ব্যাপারে নয় যে, এটা গোপনে পোষণ করতে থাকবে, আর প্রয়োজন হলেই তা ঘোষণা করে দিবে। অধিকন্তু আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ কোনো লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন কুরাইশদের নেতা। যিয়াদ এবং তার মায়ের জিম্মাদারী বংশীয়ভাবে গ্রহণ করা ছিলো তার জন্যে অতি সহজ কাজ। ইতিহাসবিদদের মতে যিয়াদের মা সুমাইয়া ওবাইদ নামে একজন গোলামের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলো বিধায় যিয়াদ অনেকদিন পর্যন্ত যিয়াদ বিন ওবাইদ নামে খ্যাত ছিলো। এ পরিচয়টায় যদি ভুলই থাকতো তাহলে তো এর সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা তো আরো তীব্র ছিলো, আর বিষয়টির তদারকী পুত্র আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর ছেড়ে না দিয়ে হযরত আবু সুফিয়ানের নিজেরই করা উচিত ছিলো। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলে তা নিরসনের জন্যে তো খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই বর্তমান ছিলেন। আবু সুফিয়ানের জীবদ্দশায় বরং তার মৃত্যুর অনেকদিন পর পর্যন্ত যিয়াদ নিজকে দাসপুত্র মনে করতেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে যিয়াদ আপন পিতা ওবাইদকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে আযাদ করার কারণে লোকেরা ঈর্ষা করে। হযরত আবু সুফিয়ান কিংবা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এটা কি সম্ভব ছিলো না যে, তখন ব্যাপারটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করে তার সর্বোত্তম ও অকাট্য সমাধান লাভ করে? যেমন সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবদ বিন যুমআর মধ্যে একটি শিশুর বংশ পরিচয় নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফায়সালা করে ছিলেন। কি এক আশ্চর্য! যিয়াদের জন্মের পর আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম ও কুফরী যুগ মিলিয়ে (যথাক্রমে ২৭+৮) ৩৫ বছর জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে যিয়াদের বংশ পরিচয়ের ব্যাপারটি ছিলো ঘোলাটে। আরো আশ্চর্য যে, আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর ৯ বছর পর ৪৪ হিজরী সনে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংকট সময়ে এক কালের দুশমনকে ঘটা করে আপন ভাইয়ে পরিণত করা হয়। তাকী ওসমানী সাহেবের কথা "ঘটনার আগাগোড়া বিশ্লেষণের পর আমাদের হৃদয়মন এ মহান সাহাবীর প্রতি

www.pathagar.com

শ্রদ্ধায় আরো সিক্ত হয়ে আসে। সব বাধা উপেক্ষা করে শরীয়াতের বিধানের সামনে নিজকে সর্বোতভাবে সঁপে দেয়ার এমন অনুপম দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

যে পুত্রকে পিতা দীর্ঘ ৩৫ বছরের মধ্যে পুত্র বলে স্বীকৃতি দিলেন না, পিতার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা যাকে ওয়ারিশরূপে গ্রহণ করলেন না, যার নসবনামা মহানবীর জীবদ্দশায় পর্যন্ত সন্দেহযুক্ত হওয়ার কারণে তাঁর দরবারে বিষয়টি উপস্থাপনার অযোগ্য বিবেচিত ছিলো, তাকে তার ৪২/৪৩ বছর বয়সে উম্মে হাবীবার ভাই তথা নবী আলাইহিস সালামের আত্মীয়ের অন্তর্ভুক্তি করণের ঘটনাটি ভক্তিয়াতিশয্যে বিগলিত কারো মনের ভাব হতে পারে কিন্তু সেটাকে শরীয়াতের আহকাম বা বিধান বলা ধৃষ্টতা বৈ কিছু নয়। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেবের বর্ণনা রীতিকে যারা 'পরিমাপযোগ্য' বলে বেড়ায়, তাদের যুক্তি-প্রমাণের যৌক্তিকতা যে ঠুনকো হাস্যকর তা বলাই বাহুল্য। মাওলানা মওদূদীর সমালোচকদের উচিত নিজেদের প্রমাণ পদ্ধতির সৌন্দর্যের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

মুহাম্মদ তাকী সাহেব এবং ইবনে খালদুন হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সুমাইয়ার যে সম্পর্ককে ইসলাম পূর্বকালের 'এক ধরনের বিবাহ' বলার চেষ্টা করছেন সেটাকে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ সে যুগের নিয়মেই ব্যভিচার বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ে পরে আমি বর্ণনা করবো। তবে আসল প্রসংগ হলো যিয়াদের বংশ পরিচয় ও তাকে আমীরে মুয়াবিয়ার সহোদর ভাই বলে গণ্য করা বৈধ হওয়া না হওয়া। ইসলাম পূর্ব জীবনে কোনো সাহাবীর শিরক, বিদআত জাতীয় কাজে সম্পৃক্ত হওয়া অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। ইসলামতো এজন্যেই এসেছে যেন মানব সমাজকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এরশাদ করেছেন, ইসলাম অতীতের সকল পাপকর্মকে ধ্বংস করে দেয়। হযরতের এ বাণী অনেক সাহাবীকেই আশ্বস্ত করে, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শিরক, মূর্তি পূজা, কিংবা নৈতিকতা বিরোধী কাজে জড়িত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীস অনুযায়ী হযরত আবু সুফিয়ান যদি যিয়াদের নসবের ব্যাপারটি রাসূলের জীবদ্দশায় ফায়সালা করে নিতেন কিংবা অন্ততঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিষয়টি যথারীতি আইনানুগ রূপ পেতো, তাহলেও একটা সুরাহা হতো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, প্রসংগটি সমাধান পেলো এমন এক মুহূর্তে যখন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং যিয়াদ উভয়ই এর প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করেন। তারপর বিষয়টি পক্ষ-বিপক্ষ স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোনো বিচারকের আদালতে নিরপেক্ষভাবে ফায়সালা হয়নি। খোলাফায়ে রাশেদীনের নিয়ম ছিলো, তাঁরা নিজেরা কোনো মোকদ্দমার সাথে জড়িত

www.pathagar.com

থাকলে, ফরিয়াদী হিসেবে নিজেদেরকে বিচারকের সামনে হাজির করতেন। নিজে নিজে ফায়সালা করতেন না, কিন্তু এ ব্যাপারটি শুধুমাত্র এক পক্ষই ফায়সালা করে। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা যিয়াদের পক্ষে সাক্ষীও তালাশ করা হয়। এক শহরে সাক্ষী না পেয়ে অন্য শহর থেকে সাক্ষী খুঁজে বের করা হয় অথচ হযরত আবু সুফিয়ানের কন্যা রাসূল পত্নী উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন জীবিত। কিন্তু এসত্ত্বেও তাঁর সাক্ষ্য না নেয়ার রহস্য স্বভাবতঃই প্রশ্নের উদ্রেক করে।[১]

যিয়াদের বংশ পরিচয়

হযরত আবু সুফিয়ান কিংবা কোনো সাক্ষীর একথা যদি স্বীকারও করা হয় যে, যিয়াদ আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত সন্তান ছিলো, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, এটা বৈধ কিভাবে হতে পারে? এ ব্যাপারে ইবনে আসীরের কথা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি বলেছেন, ইতিপূর্বে ইসলামের নির্ভরযোগ্য কেউ এভাবে কাউকে সহোদর ভাই বলে গণ্য করেনি যে, একে দলীল রূপে গণ্য করা যায়। আবু সুফিয়ান জাহেলী যুগে গোপনে তাকে নিজ সন্তান বলে গেছেন বলে ইসলামেও তা জায়েয—তাকী ওসমানী সাহেবের একথা সম্পূর্ণ ভুল। আবু সুফিয়ানের দেয়া বংশ পরিচিতিটা এমন প্রকৃতির ছিলো যে, তার সন্তানগণ পর্যন্ত তা জানেন না। অথচ মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদে এরূপ একটি সমস্যার ফায়সালা খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে কিভাবে হয়েছিলো তার সুস্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যামআর পুত্র আবদের সাথে যামআর এক কৃতদাসীর গর্ভে জন্মলাভকারী সন্তানের বংশ পরিচয় নিয়ে হযরত সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বন্দ্ব হয়। হযরত সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিয়ে বললেন: আমার ভাই উতবা আমাকে ওসিয়ত করে গেছেন যে, যামআর দাসীর গর্ভে জন্মলাভকারী সন্তানটি তাঁর ঔরসজাত, আমি যেন তার দেখাশোনা করি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উতবার সাথে সন্তানটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে হযরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তার থেকে পর্দা করারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সন্তানটিকে যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আবদের ভাই বলেই গণ্য করা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ফায়সালার

১. ইসতেআবের উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ বলছেন, হযরত উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ ঘটনার আগেই ইন্তেকাল করেন। কিন্তু এ গ্রন্থেরই এক জায়গায় উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওফাতের আগে এ ঘটনা হওয়ার কথা লেখা আছে। ইস্তেআবে যিয়াদের জীবনী সম্পর্কে আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর যেসব কথা উল্লেখ আছে তাতে এ ঘটনার সময় উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবিত থাকার কথাই বুঝা যায়।

www.pathagar.com

উপর ভিত্তি করে হযরত সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবী আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এরূপ কর্মকাণ্ডের ঘোর প্রতিবাদ করেন। ক্রীতদাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ সন্তানের দাবীদার বাপের সাথে চেহারাগত সামঞ্জস্য থাকার প্রমাণ পাওয়া এবং এতদসম্পর্কিত সাক্ষ্য ও ওসিয়ত থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ভূমিষ্ঠ সন্তানকে ক্রীতদাসীর মালিক ছাড়া অন্য কারো বৈধ সন্তান বলে স্বীকার করেননি, তখন যিয়াদকে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাই ও তাঁর স্ববংশীয় ঘোষণা করা কিভাবে বৈধ হতে পারে?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে উতবার ঔরসজাত হওয়ার স্বপক্ষে সাক্ষী দেয়ার জন্যে আরো কতিপয় লোকের উপস্থিত থাকার কথা বলেননি। বরং তিনি বললেন ঃ 'ক্রীতদাসী যার, সেই হবে সন্তানের মালিক। আর ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতের শাস্তি পেতে হবে।' এতে প্রমাণিত হলো, জাহেলী যুগে যে সন্তানের বংশ ও পিতৃ পরিচয় বিতর্কিত, সে সন্তানের পিতা বা বংশ হবে তার মায়ের মালিক বা স্বামী। তবে যার বংশ পরিচিতি সম্পর্কে সকলেই জ্ঞাত এবং এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই, তাকে সেই পরিচিত মালিক বা স্বামীর সন্তানই গণ্য করতে হবে। সুতরাং দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, যিয়াদের পিতা ছিলো ওবায়েদ নামক এক ক্রীতদাস, যদ্দরুন সে কিছুকাল যিয়াদ বিন ওবায়েদ হিসেবে পরিচিত ছিলো। কারণ, তার মাতা সুমাইয়া উক্ত ক্রিতদাস ওবায়েদের স্ত্রী ছিলো। এমন কি যিয়াদও নিজেকে ক্রিতদাসেরই সন্তান মনে করতো। শুধু তাই নয়, আল্লামা আবদুল বার এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকের বর্ণনামতেও যিয়াদ নিজের পিতাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্তও করেছিল, যাতে মানুষ ঈর্ষা করতো।[১]

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ব্যাখ্যা

শিয়া মতবাদ ও অভিযোগ খণ্ডন করতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের নীতি ব্যাখ্যা করে শাহ আবদুল আযীয দেহলভী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া"—রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ

"পারস্য ও সিরাজ রাজ্যের গভর্নর যিয়াদ ছিলো একজন অবৈধ সন্তান ও বিশ্বাসঘাতক। নিজের নির্লজ্জ এবং হারামী হওয়াকে সে গৌরব মনে করতো। সুমাইয়া নাম্নী তার মায়ের পতিতাবৃত্তির কথা গৌরবের সাথে সে প্রচার করে

১. রাজনৈতিক কারণে এবং জাতে উঠার অভিপ্রায়ে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাবে পরে যিয়াদের এ প্রসঙ্গ আড়াল করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

www.pathagar.com

বেড়াতো। ঘটনাটি এরূপ, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের আগে হারিস সকফী তাবীবের সুমাইয়া নামী এক বালিকা দাসীর সাথে সম্পর্কস্থাপন করে। দিনরাত তার কাছে সে আসা-যাওয়া করতো এবং নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করতো। এ সময়ে সুমাইয়ার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেয় তার নামই যিয়াদ। যেহেতু সুমাইয়ার মালিক ছিলো হারিস আর পত্নী ছিলো তার দাসের, সুতরাং যিয়াদ পরিণত বয়সেই আবদুল হারিস নামে ছোট বেলায় খ্যাত হয়।[১] যিয়াদ ভাষায় আলংকারিক, অনলবর্ষী বক্তা এবং প্রগলভতায় অনুপম দৃষ্টান্তের অধিকারী ছিলো। একবার কুরাইশ বংশোদ্ভূত চিন্তাশীল বুযর্গ আমর বিন আস বললেন, ছেলেটি কুরাইশ বংশোদ্ভূত হলে আমাদেরকে আপন যষ্টি দ্বারা তাড়িয়ে নিতো। আর সুফিয়ান একথা শুনে বলেছিলেন, আল্লাহর কসম ! আমি এর 'নুৎফা' তথা বংশ পরিচয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কে ? জবাবে আবু সুফিয়ান বললো ঃ আমি। তিনি বললেন ঃ ক্ষ্যান্ত হও, আবু সুফিয়ান।

যিয়াদ এ কাহিনী শুনে চরম নির্লজ্জভাবে বলতো আমি আসলে আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত। আমিরুল মু'মিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে পারস্যের শাসক নিয়োগ করলে শহরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেয়। তার এ কর্মদক্ষতা দেখে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু গোপনে তার সাথে যোগাযোগ শুরু করেন এবং তাকে নিজের সংগী বানাতে ইচ্ছা করেন। তাকে নিজের খান্দানভুক্ত করার লোভ দেখিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করেন। কেননা, এ ধরনের কর্মদক্ষ ব্যক্তিকে নিজের সমর্থনে নিয়ে আসতে সক্ষম হওয়া প্রতিপক্ষের জন্য একটি বিরাট আঘাত স্বরূপ। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাথে পাকা কথা দেন, যদি তুমি আমার কাছে চলে এসো তাহলে আমি তোমাকে আপন ভাই এবং আবু সুফিয়ানের অন্যতম সন্তান রূপে ঘোষণা করবো। আসলে তুমি তো আবু সুফিয়ানেরই ঔরসজাত। নিজের মান-মর্যাদা, জ্ঞান ও চতুরতা দ্বারাই এ দাবীর সত্যতা প্রমাণে তুমি সাক্ষ্য হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম।"

---

১. শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর এ বক্তব্যের সঙ্গে যিয়াদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে পূর্বে যেই বিবরণ দিয়েছে অর্থাৎ তার মাতা দাসী সুমাইয়ার সঙ্গে ওবায়েদ নামক যামআর এক কৃতদাসের দাম্পত্য সম্পর্কের কথা, তা পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু যেই মহিলা পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত থাকার দরুন তার সঙ্গে বহু পুরুষের যৌন সম্পর্ক ছিলো, সে ক্ষেত্রে তার ঔরসজাত সন্তানের পিতৃ পরিচয় একেক সময় একেকটা হওয়া বা একেক এলাকায় একেকটা হওয়া অসম্ভব কোথায় ?

www.pathagar.com

হযরত আমীরুল মু'মিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর সাইয়্যেদুনা মাওলানা হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু দেশের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যখন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে সোপর্দ করেন, তখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদকে নিজের সমর্থক বানানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কেননা সে ছিলো একজন বিচক্ষণ, সাহসী ও ধূর্ত কর্মকুশলী। তার স্বপক্ষে এক বিরাট জনগোষ্ঠীও ছিলো, যারা রাজ রাজড়াদের বেশ প্রয়োজনে আসে। তার দ্বারা আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কাজ সমাধান করতেন, আমীরে মুয়াবিয়ার উদ্দেশ্যও তাকে দিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সেসব কাজ করানো। এ সময় মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে আবু সুফিয়ানের কথিত বাক্য পেশ করেন এবং তাকে নিজের ভাই সাব্যস্ত করে ৪৪ হিজরী সনে যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান নামে অভিহিত করেন। সমগ্র দেশে ঘোষণা করে দেয়া হয় যেন যিয়াদকে এ নামেই ডাকা হয়। এবার বিভ্রান্ত বংশ পচিয়ের অধিকারী যিয়াদের ভণ্ডামি ও ধূর্তামি দেখুন। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহচর্যে সে প্রথম যে অপকর্মটি করলো, তাহলো হযরত আমিরুল মু'মিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানদের সাথে চরম বৈরীতাপূর্ণ আচরণ।'–(তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া ঃ অনুবাদ, নূর মোহাম্মদ করাচী, পৃ ঃ৪৮৩-৪৮৬)

মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেবকে বলবো, এখন আপনি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং শাহ আবদুল আযীয দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখাগুলোকে পাশাপাশি রেখে ইনসাফের ভিত্তিতে ফায়সালা করুন। এখানে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির লেখাতে শাহ সাহেবের লেখা কিংবা সাধারণ অভিযোগকারীদের ব্যবহৃত শব্দ থেকে কোন্ বাক্য বা শব্দটি জঘন্য ব্যবহৃত হয়েছে? যাতে মওদূদী সাহেবের বর্ণনারীতি সাংঘাতিক আপত্তিকর ও পরিতাপযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে?

অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বেদায়ার যে বরাত দিয়েছেন সে সম্পর্কে ওসমানী সাহেবের ভাষ্য হলো—ঘটনাটি মাত্র সাত লাইনের পরিসরে বিবৃত হয়েছে। তবে সাত লাইনের লেখাটি কি তা কিন্তু মুহতারাম উল্লেখ করেননি। বেদায়ার মতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন সাক্ষীর ওপর ভিত্তি করে যিয়াদকে নিজ বংশীয় ঘোষণা করেন। সাক্ষ্য ছিলো, আবু সুফিয়ান সুমাইয়ার সাথে জাহেলী যুগে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার স্বীকারোক্তি।

www.pathagar.com

আগে লিখিত আছে, الولد للفراش وللعاهر الحجر। "সন্তান মালিকের; ব্যভিচারীর জন্যে প্রস্তরাঘাতের শাস্তি।" রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ শাশ্বত বাণীর উপর ভিত্তি করে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যিয়াদের এ হঠাৎ পিতৃ পরিচয় ঘটনাকে খারাপ মনে করতেন। ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে লিখেছেন, যিয়াদের এরূপ পিতৃ পরিচয় ঘোষিত হওয়ার পর হযরত আবু ওসমান (যিয়াদের মাতৃ ভাই) হযরত আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত করে বললেন ঃ তোমরা এটা কেমন কাজ করলে ! (যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের পুত্র বানিয়ে দিলে[১]) অথচ আমি সাআদ বিন আবু ওক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (ইসলাম গ্রহণ করার পর) নিজ বাপকে ছেড়ে জ্ঞাতসারে অপরকে বাপ বানায় তার জন্যে বেহেশত হারাম।" আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ আমিও এ হাদীসটি হুজুর থেকে শুনেছি। (হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে।)

'আল ইস্তিয়াবের যে উদ্বৃতি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দিয়েছেন তাতে লেখা আছে (যিয়াদের মাতৃভাই) হযরত আবু বকরা যিয়াদের সাথে কথা না বলার কসম করেছিলেন। যিয়াদ সম্পর্কে তার মন্তব্য হলো— সে নিজের মাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে (هذا زنى امه) এবং পিতার নসব অস্বীকার করেছে। এখন সে যদি নবীর হেরেমে উম্মে হাবীবার সামনে (ভাই হিসেবে) যায় আর তিনি পর্দা করলে হবে অপমান আর সামনাসামনি হয়ে গেলে এটা হবে বিরাট মুসিবত এবং নবী মর্যাদার অবমাননা। এরপর দু'টি কথার উল্লেখ আছে। এক, যিয়াদ উম্মুল মু'মিনীনের সামনে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু তিনি দেখা দেননি, দুই, সে দেখা করার সাহসই করেনি।

ইবনে আসীরের জবাবে তকী ওসমানী সাহেব যা বলেছেন তা সঠিক নয়। ইবনে আসীর লিখেছেন ঃ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদকে নিজ পিতার ঔরসজাত ঘোষণা করার মাধ্যমে নিজের দিকে আকর্ষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরিশেষে উভয়ই এ কাজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। ইবনে খালদুনের যে বাক্যাংশ দিয়ে তকী ওসমানী সাহেব জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন সে বাক্যের যে অনুবাদ স্বয়ং ওসমানী সাহেব করেছেন তার প্রতি লক্ষ্য করুন।

---

১. হযরত আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদের মায়ের দিকের ভাই হওয়াতে হযরত আবু ওসমান যিয়াদের পিতৃ পরিচয়ের ব্যাপারে ভুলবশতঃ তাঁকেও জড়িত বলে মনে করেছিলেন। অথচ তিনি এ ব্যাপারে আজীবন বিরোধিতা করেছেন। অপর রাওয়ায়েতে ما هذا الذى صنعتم -এর জায়গায় ماهذا শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আবু বাকরার চিরদিন বিরোধিতা করার কারণে এ শব্দটি বেশী সামঞ্জস্যশীল মনে হয়।

www.pathagar.com

"যিয়াদ মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সন্ধি করে এবং যিয়াদ মুসকালা বিন হোবাইরাকে আবু সুফিয়ানের নসব সম্পর্কে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবহিত করার নির্দেশ দেয়। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নসবের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে যিয়াদকে বশ করতে মনস্থ করেন এবং এ সম্পর্কে অবগত লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন ----।"

এখানে সন্ধি বা সমঝোতা করা 'নসবের স্বীকৃতিদান' 'বশ বা অনুগত করা' শব্দগুলো লক্ষণীয়। ওসমানী সাহেবের ভাষায় যিনি সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক আভিজাত্যের সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে শরীয়াতের আহকাম ও বিধানের সামনে নিজকে সর্বোতভাবে সঁপে দিয়ে ভাইকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি সে ভাইয়ের সাথে এ ব্যাপারে সন্ধি, প্রলোভন ও বস করার এহেন প্রচেষ্টা করা কি ওসমানী সাহেবের বাক্যের স্ববিরোধী নয় ? ইবনে খালদুন কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দগুলোর পরিবর্তে মাওলানা মওদূদী অথবা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য' অথবা শাহ আবদুল আযীয 'লোভ-লালসা' শব্দ ব্যবহার করলে সেটাকি ভুল হবে ?

ওসমানী সাহেব 'ইসাবার' একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বোধগম্য কারণে তিনি উদ্ধৃতিটির প্রথম এবং শেষাংশ বাদ দিয়ে আমানতদারী ও ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। ইবনে হাজার ইসাবার প্রথমাংশে বলেন ঃ

"যিয়াদ বিন আবীহী সুমাইয়্যার ছেলে ছিলো। পরবর্তীতে তাকে যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান নামে ডাকা হয়। সে সকীফীর দাস ওবাইদের ঔরসে জন্মলাভ করে। এ কারণে তাকে যিয়াদ বিন ওবাইদ ডাকা হতো। তারপর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ঔরসজাত ভাই বানিয়ে নেন। উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটলে পুনরায় যিয়াদ বিন আবিহী অথবা যিয়াদ বিন সুমাইয়া নামে তাঁকে ডাকা হতে থাকে......। যিয়াদ তার পিতাকে এক হাজার দিরহামে খরিদ করে আযাদ করে ছিলো।

শেষাংশে ইবনে হাজার বলেছেন ঃ

"ইমাম আহমদ সহীহ সনদসহ হযরত আবু ওসমান থেকে বর্ণনা করেছেন। যিয়াদের নসব প্রদানের দাবী উত্থাপন হলে আমার সাথে আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেখা হয়। আমি বললাম ঃ এসব কি হচ্ছে ! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—যে ইসলামে স্বীয় বাপকে পরিত্যাগ করে অপরকে বাপ বানানোর দাবী করে তার জন্যে বেহেশত হারাম।" একথা শুনে আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ আমিও এরূপ শুনেছি।

www.pathagar.com

জনাব তাকী ওসমানী সাহেব আগাগোড়া বিশ্লেষণ করে নয় বরং উদ্ধৃতিটির পূর্বাপর বাদ দিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বাক্যটি পাঠকের সামনে পেশ করেন এবং সাহাবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ভান করে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বিরুদ্ধে বিষোদগার করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এর নমুনা আমরা আগের ইসাবার উদ্ধৃতিতে দেখিয়েছি। এর আরেকটি উদাহরণ হলো 'আখবারুত তিওয়াল' গ্রন্থের পূর্বাপর পরিত্যক্ত বাক্যাংশ এবং এর উদ্দেশ্য প্রণোদিত তরজমা। আবু হানীফা দিনওয়ারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির যিয়াদ বিন আবিহী শিরোনামের প্রথমে যিয়াদ বিন ওবাইদ নামে খ্যাত ছিলো বলে উল্লেখ করেন। যেমন ঃ

فسار الى معاوية وترقت به الامور الى ان ادعاه معاوية وزعم الناس انه ابن ابى سفيان وشهد له ابو مريم السلولى وكان فى الجاهلية خمار ابالطائف ان ابا سفيان وقع على سمية وشهد رجل من بنى المصلق اسمه يزيد انه سمع ابا سفيان يقول ان زياد امن نطفة اقرها فى رحم سمية فتم ادعاءه اياه وكان فى ذالك ما كان ـ

"যিয়াদ মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলো। অবস্থা ছিলো অনুকূলে। তাই মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদকে (বাপের) ঔরসজাত বলে দাবী করলেন এবং জনগণের কাছে যিয়াদ আবু সুফিয়ানের পুত্র হওয়ার কথা বলে দিলেন। আবু মরিয়ম সুলুলী নামে জাহেলী যুগে তায়েফে মদ বিক্রেতা একজন লোক আবু সুফিয়ানের সুমাইয়ার সাথে মিলিত হওয়ার সাক্ষ্য দিলেন। বনী মুসতালিকের ইয়াযিদ নামীয় আরেকজন লোক সাক্ষ্য দিলো, সে আবু সুফিয়ানকে একথা বলতে শুনেছে যে, আবু সুফিয়ান সুমাইয়ার সাথে মিলনের ফলে তার ঔরসে যিয়াদের জন্ম হয়। তাতে যিয়াদ সম্পর্কে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাবী পূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তীতে যা হওয়ার তাই হলো।"

তাকী ওসমানী সাহেব রেখা চিহ্নিত বাক্যের তরজমা করলেন ঃ "সুতরাং যিয়াদ নিজের পুত্র হওয়ার যে দাবী আবু সুফিয়ান করলেন তা প্রমাণিত হয়।" এ তরজমা ভুল এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

তাকী ওসমানী সাহেব হযরত আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিম্নোক্ত কথাটিকেও ভুল অর্থে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। সেটি হলো ঃ "আল্লাহর কসম ! আমি জানি না, সুমাইয়া আবু সুফিয়ানকে কখনও দেখেছেন কিনা।" আসলে তাঁর এ দাবীর সহজ অর্থ হলো—আবু সুফিয়ান জাহেলী যুগের বিবাহ

www.pathagar.com

প্রথানুযায়ী সুমাইয়ার সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হলে ব্যাপারটি গোপন থাকার কথা নয়। মা তাঁকে একথা বলতেন অথবা নির্ভরযোগ্য সূত্রে একথা তিনি জানতে পারতেন। কেননা, বিবাহ্ প্রথা অনুসারে অনুষ্ঠিত হওয়া যদিও জাহেলী প্রথা হোক-গোপন বস্তু নয়। আর এ কারণেই মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ দাবীকে ব্যভিচারের নামান্তর মনে করে তার প্রতিবাদ করে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। একজন শরীফ রুচিবান লোক মায়ের চারিত্রিক ত্রুটির কথা বরদাশত করতে পারে কি?

'আল বালাগ' সম্পাদক তাকী ওসমানী সাহেব আলোচনার শেষে লিখেছেন, "যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত বলে ঘোষণার পর যারা বিরোধিতা করেছিলো তারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে ক্ষমা চাইতে শুরু করে। এমনকি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ কাজকে সঠিক হিসেবে মেনে নিয়ে যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান সম্বোধন করে তাকে চিঠি লিখেন।"

মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেবের একথার জবাবে আমি বলবো—ইতিপূর্বে আলোচিত দিয়ত ও কাফেরের উত্তরাধিকার ইত্যাকার ক্ষেত্রে কুরআন হাদীস অসমর্থিত কাজ যেভাবে ঐ সময় দেশে জোরপূর্বক প্রচলন করা হয়, তেমনি এ কাজটিও সেভাবেই করা হয়। এখানে ঠিক-বেঠিক হওয়ার প্রশ্ন গৌণ। সে সময় থেকে আজ অবধি যিয়াদ ইতিহাস ও বংশ পরিচয় গ্রন্থে যিয়াদ বিন আবিহী এবং যিয়াদ বিন ওবাইদ নামেই খ্যাত।[১] বরং অবৈধ সন্তান নামেও অভিহিত।[২] এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রসংগটি আগে যেরূপ বিতর্কিত ছিলো এখনও সেরূপই আছে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সম্বোধন সম্পর্কে দু' ধরনের বর্ণনা আছে। ইবনে খালদুন এবং ইবনে আসাকিরের বরাতে যেই রাওয়ায়েতটি উদ্ধৃত আছে। 'তাবাকাতে ইবনে সাদে' তার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই—হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাস কোনো এক প্রয়োজনে যিয়াদের কাছে একটি চিঠি লিখে দিতে তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি যিয়াদকে "আবু সুফিয়ানের পুত্র যিয়াদ সমীপে না লিখে অপর একজনের সন্তান বলে উল্লেখ করেছিলেন। (যেমন ঃ نسبه الى غير ابى سفيان) 'তখন সে লোক বললো, এ চিঠি দ্বারা আমার কাজ উদ্ধারের পরিবর্তে আমি যিয়াদের কোপানলে পতিত হবো। কিন্তু তাতেও আবদুর রহমান বিন আবু

১. অবৈধ পন্থায় জন্মগ্রহণকারী সন্তান কিংবা বংশ পরিচয় সংশায়িত সন্তানকে তৎকালীন আরববাসীরা ফলা ইবনে আবিহি বা উম্মিহী বলে ডাকতো। যিয়াদকে ইতিহাসবিদগণ উভয় নামেই উল্লেখ করেছেন। নামের অর্থ 'যিয়াদ তার মায়ের' কিংবা 'যিয়াদ তার বাপের সন্তান'।

২. শাহ আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহ আলাইহির প্রণীত তোহফায়ে ইসনা আশারা' গ্রন্থের যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সে গ্রন্থেরই এক জায়গায় যিয়াদের জন্য জারজ সন্তান শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান লিখতে রাজী হননি। অতপর হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাসটি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার শরনাপণ্ন হয়। তখন তিনি তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে চিঠিতে 'যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান' লিখে দিলে এ লিখাই যিয়াদের জীবনের জন্য এক অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হয়। চিঠি পেয়ে যিয়াদ খুশীতে আটকানা হয়ে দ্বিতীয় দিন উক্ত চিঠিসহ হাজির হওয়ার জন্যে লোকটিকে বলে দিলো। দ্বিতীয় দিন অনেক লোক একত্রিত করে তাদের সামনে যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান লেখাটি পড়ে শুনায়। শুধু তাই নয়, চিঠির বাহকও অযাচিতভাবে উপহার পেয়ে যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক যিয়াদকে স্বীকৃতিদানের পরও ব্যাপারটি বিতর্কিত ও সন্দেহজনক থেকে যায়, যার কারণে যিয়াদ বিষয়টিকে বিতর্কের উর্ধে ও সন্দেহমুক্ত করার জন্যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে।

আধুনিক যুগের আলেমদের ভাষ্য

এ অপ্রীতিকর বিতর্ক সম্পর্কে আধুনিক যুগের কতিপয় আলেম যে সমস্ত মন্তব্য করেন, তন্মধ্যে মাওলানা কাযী যয়নুল আবেদীন, সাজাদ মিরাঠী অন্যতম। তাঁর রচিত 'তারীখে মিল্লাত' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের একটি উদ্ধৃতি প্রনিধানযোগ্য। কিতাবটি 'নুদওয়াতুল মুসান্নিফীন' জামে মসজিদ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত। এ প্রতিষ্ঠানটি দেওবন্দী মতের বিশিষ্ট ওলামা কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাসিক 'বুরহান' এ প্রতিষ্ঠানেরই মুখপাত্র। লেখক গ্রন্থটির ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"আবু সুফিয়ান তার জীবদ্দশায় নিজে যিয়াদকে স্পষ্টভাবে আপন ঔরসজাত পুত্র বলে গ্রহণ করেননি। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদকে খুশী করার জন্যে কতিপয় তোষামুদে সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নিজের সৎ ভাই বলে গ্রহণ করেন। এতদসত্ত্বেও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজ জনসমর্থন লাভ করেনি। আসলে যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের ঔরস ভুক্তির অধিকারটি ছিলো খোদ আবু সুফিয়ানের, তাও জাহেলী যুগে। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন না। একবার যিয়াদ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে একটি চিঠি লিখে। চিঠির শুরুতে 'যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান' লেখা ছিলো। যিয়াদের আশা ছিলো উম্মুল মু'মিনীন তাকে এ নামেই জবাব দিবেন, আর এমনিভাবে সে আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত বলে স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু গুড়েবালি পড়লো। যখন মা

www.pathagar.com

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা লিখলেন ঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পক্ষ থেকে 'যিয়াদ বেটার নামে'।"

যিয়াদের আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত হওয়া বোরহান' সম্পাদক মাওলানা সায়ীদ আহমদ এম. এ. আকবার আগদী, ফাজেলে দেওবন্দের ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

"যিয়াদের জ্ঞান অভিজ্ঞতা দ্বারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু উপকৃত হতে চাইলেন। কিন্তু যিয়াদের দুর্নাম এ কাজে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি রাসূলের বাণী[১] উপেক্ষা করে ঘোষণা করলেন আগামীতে যিয়াদকে ইবনে আবিহী এর পরিবর্তে ইবনে আবি সুফিয়ান বলতে হবে।"

–(মুসলমানদের উত্থান পতন পৃঃ ৪৭ যাইয়েদ প্রেস, দিল্লী, ১৩৬০ হিজরী)

ভারত উপমহাদেশের নন্দিত আলেম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এ বিষয় লিখেছেন ঃ

"এটা একটি বিস্তারিত আলোচনাযোগ্য প্রসিদ্ধ ঘটনা। তবে সাধারণ পাঠকবর্গের জন্যে এতটুকুই বলা যায় যে, সুমাইয়া জাহেলী যুগের একজন ব্যভিচারিনী ভ্রষ্টা রমনী ছিলো। আবু সুফিয়ান তার কাছে আসা যাওয়া করতো এবং তার ঔরসে যিয়াদের জন্ম হয়। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাকে পুনরায় তাঁর বংশের অন্তর্ভুক্ত করে (আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক) স্বীয় ভ্রাতা সাব্যস্ত করা হয়। (কাজটির বৈধতার রূপ দেয়ার জন্যে) একটি বিশেষ সাক্ষ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষীদের মধ্যে আবু মরিয়ম নামক একজন দুশ্চরিত্র লোকও ছিলো। এ লোকটি আবু সুফিয়ানের সাথে সুমাইয়ার যৌন সম্পর্কের মাধ্যমরূপে কাজ করে। পরিশেষে তার মতো অসৎ চরিত্রের লোকের সাক্ষ্য প্রদানে খোদ যিয়াদও লজ্জাবনত হয়ে পড়ে।"–(মাকালামাতে আবুল কালাম আযাদ পৃঃ ১৪৯-১৫০)

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, অপরাপর আলেমের লেখা ও বর্ণনায় কোনো বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ পেলে যারা সামান্যতম কষ্ট অনুভব করেন না, সে ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর ভাষা ও কলমে একই মন্তব্যের উদ্ধৃতি প্রকাশ পেলে তাতে লংকাকাণ্ড ঘটে যায়। এটা কোন্ ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির কথা ? এ যুলুম ও বেইনসাফির উদাহরণ অসংখ্য, যা গণনা করা সম্ভব নয়।

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভুলের স্বীকারোক্তি

সবচাইতে মজার ব্যাপার হলো এই যে, যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের শরীয়াত সম্মত ঔরসজাত সন্তান প্রমাণ করার জন্যে মাওলানা তাকী

১. الولد للفراش وللعاهر الحجر। বিবাহ সূত্রে হয় ছেলে আর ব্যভিচারের জন্য পাথর।

www.pathagar.com

ওসমানী এবং আরও কতিপয় সম্মানিত আলেম যেখানে উঠে পড়ে লেগেছেন, এ ব্যাপারটি সম্পর্কে অপর কিছু রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, খোদ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের এ কাজের জন্যে পরবর্তী সময় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছিলেন। হাফিজ নূরুদ্দীন হাইসুমী 'মাজমাউল যাওয়ায়েদ' ও 'মামরাউল ফাওয়ায়েদ' গ্রন্থদ্বয়ে মুসনাদে আবু ইয়ালা-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, নসর বিন হাজ্জাজ এবং খালিদ বিন ওলীদের পুত্র খালিদের মধ্যে একটি ছেলে নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিলো। খালিদের কথা হলো, ছেলেটা তাদের দাস আবদুল্লাহর। কেননা সন্তান তার বিছানায় জন্ম হয়েছে। নসরের বক্তব্য হলো, তার ভাইয়ের ওসিয়ত অনুযায়ী ছেলে তার ভাইয়ের ঔরসজাত। দ্বন্দ্বটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে পেশ হলে যার ঘরে সন্তান জন্মলাভ করে, সে ঘরই সন্তানের মালিক বলে তিনি রায় দেন। একথা শুনে নসর বললেন ঃ

فاين قضاءك هذا يا معاوية فى زياد ؟

"মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাহলে যিয়াদের ঔরস ভুক্তির ফায়সালা কিভাবে করলেন ?"

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন ঃ

قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من قضاء معاوية -

"মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালার চেয়ে রাসূলের ফায়সালা উত্তম।"-(مجمع الزوائد খণ্ড ৫ম, পৃ-১৪, দারুল কিতাব, বৈরুত ১৯৬৭ باب الولد الفراش)

রাওয়ায়েতের সনদ যদিও মুত্তাসিল নয়, কিন্তু এর রাবীদেরকে হাইসুমী নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যাহোক, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ফায়সালাটি নিজের কাছেও যে ভুল ছিলো এবং যারা এটাকে সহীহরূপে প্রমাণ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টারত, তারাও যে রাসূলের সুন্নাতের চেয়ে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাজকে অভ্রান্ত রাখার ব্যাপারে অধিক যত্নবান এ রেওয়ায়েত সে কথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ নয় কি ?

আবু সুফিয়ানের বিবাহ

যিয়াদকে সহোদর ভাই হিসেবে পরিচয় দানের প্রসংগটি আমি সংযতভাবে স্ববিস্তারে আলোচনা করেছি। বিষয়টি লজ্জাজনক এবং অশ্রাব্য ধরনের হওয়ায় এ নিয়ে তাকী ওসমানী সাহেব অন্ততঃ মৌনতার ভূমিকা অবলম্বন করবেন

www.pathagar.com

বলেই আমার ধারণা ছিলো। কেননা এ ব্যাপারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকিছু করেছেন তা স্পষ্ট। তাঁর পক্ষে সাফাই গেয়ে তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগ প্রতিহত করা অসম্ভব। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো ওসমানী সাহেব আমীরে মুয়াবিয়ার সেসব তৎপরতাকে বৈধ প্রমাণ করার জন্যে পুনরায় আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সুতরাং আমিও এ বিষয়ের উপর আবার আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হলাম। তাকী সাহেব আবারো লিখেছেন ঃ

"আমি ইবনে খালদুন প্রমুখদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছি, জাহেলী যুগে আবু সুফিয়ানের সাথে সুমাইয়ার যে সম্পর্ক ছিলো তাকে প্রকৃতপক্ষে জাহেলী প্রথানুযায়ী এক ধরনের বৈবাহিক সূত্র বলা যায়। অথচ মাওলানা মওদূদী সাহেব এ সম্পর্কটিকে ব্যভিচার বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ধরনের বিবাহ ইসলাম গ্রহণের পর মানসুখ (রহিত) হয়ে গেলেও এরূপ সূত্রে ভূমিষ্ঠ সন্তানকে বংশীয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যিয়াদের প্রসংগটি এ ধরনেরই ছিলো।"

ইবনে খালদুনের সাথে 'প্রমুখ' শব্দের সংযোজন নিছক লৌকিকতা বৈকি ! মাওলানা মুহাম্মদ তাকী সাহেব ইবনে খালদুনের শুধুমাত্র একটি বাক্য নিয়ে শুরু থেকে আজ অবধি ঘাটাঘাটি করছেন। ইবনে খালদুন এ বিষয়ে যা লিখেছেন আর তাকী সাহেব তা দ্বারা যা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন তা যেনো ধান ভাংগতে শীবের গীত গাওয়ারই নামান্তর।[১] আমার কাছে এটা একটা হেঁয়ালীপনা মনে হয়েছে। এ অধ্যায়ের শুরুতে এ বিষয়ের উপর আমার বিস্তারিত আলোচনা দেখে নিতে পারেন।

আফসোস, আজ পর্যন্ত এ চিত্তাকর্ষক হেঁয়ালীপনার গিট খুলে তাকী সাহেবের পত্রিকা আল বালাগে প্রকাশ হয়নি। পাঠকবর্গের কাছে আমার অনুরোধ, আপনাদের কেউ তাকী সাহেবের এ নিগূঢ় কথা বুঝতে সক্ষম হলে আমাকেও অবহিত করলে খুবই কৃতজ্ঞ হবো। হযরত আবু সুফিয়ানের সাথে যিয়াদের মায়ের সম্পর্ককে বৈবাহিক সূত্র প্রমাণ করার জন্যে তাকী সাহেব আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেটাকে জাহেলী যুগের প্রথানুযায়ী বিবাহের শামিল বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। জনাব তাকী সাহেব বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বিবাহের যে বিভিন্ন রকমের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আমি স্ববিস্তারে আলোচনা করে প্রমাণ

---

১. যিয়াদের মা সুমাইয়া হারিস কুন্দা তবীরের দাসী ছিলো। তখন তার গর্ভে হযরত আবু বাকরাহ জন্ম নেয়। তারপর হারিস তাকে এক আযাদকৃত দাসের সাথে বিবাহ দেয় সেখানে জন্ম হয় যিয়াদের প্রয়োজনে। আবু সুফিয়ান একবার তায়েফে যায়। সেখানে প্রাক ইসলামী বিবাহ পদ্ধতিতে সুমাইয়ার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সেই সুবাদে সুমাইয়ার গর্ভে যিয়াদ পয়দা হয়। সুমাইয়াও তাই বলেছে। আবু সুফিয়ানও চুপে চুপে নাকি একথা বলেছেন। প্রশ্ন এ পরস্পর স্ববিরোধী কথার কোনটি সত্য ?

www.pathagar.com

করেছি যে, এ সুবাদে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার বংশ পরিচয় নির্ণয় হয়ে যেতো। কিন্তু তাকী ওসমানী সাহেব এর জবাবে আবারো লিখলেন ঃ

"জাহেলী যুগে বংশ পরিচিতির জন্যে সাধারণ ঘোষণা থাকা অপরিহার্য শর্ত, একথাটির দলিল গোলাম আলী সাহেব পেশ করেননি।" ওসমানী সাহেবের দলিল পেশ করার এই দাবীর তাৎপর্য ও পরিমাপ জানার জন্যে সকলেই আমার 'জাহেলী যুগের বিবাহ' শীর্ষক আলোচনা পুনর্বার দেখে নিতে পারেন।

পূর্ণ তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী আমি আমার দলিলসমূহ স্ববিস্তারে আলোচনা করেছি। তারপরও তিনি আমার কাছে কি ধরনের দলিল চান তা আমি বুঝতে পারছি না। আমার কথা হলো, জাহেলী যুগের এ বৈধ কিংবা অবৈধ সম্পর্ক গোপনে হোক কিংবা প্রকাশ্যে তাতে ভূমিষ্ঠ সন্তানের বংশ পরিচয় গোপন থাকতে পারে না। কেননা ভূমিষ্ঠ সন্তান গোপন থাকার বস্তু নয়। জন্মের সাথে সাথেই সন্তান বৈধ অবৈধ হওয়ার প্রশ্ন জাগে। বৈধ হলে তার পিতা কে ? যদি পিতা সাব্যস্ত না হয় এবং মা তার সন্তান বলে স্বীকার না করে তাহলে জাহেলী সমাজেও এ সন্তানটি হারামী বা জারজ হিসেবে গণ্য হতো। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার বেশ কয়েক বছর পর কারো সাথে তার পিতৃ পরিচয় প্রমাণ করা এবং বৈধ হিসেবে সাব্যস্ত করা মুক্তবুদ্ধির খেলাফ। জাহেলী যুগে "ব্যভিচারের যেসব প্রথাকে বিবাহ মনে করা হতো সে অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেও কেউনা কেউ তার পিতা হতো কিংবা পিতা বানিয়ে ছাড়তো। মাতা বিবাহিতা, ক্রীতদাসী কিংবা কুমারী যাই হোক না কেন, সে নিজেই তার সন্তানের বাপের নাম বলে দিতো কিংবা কুষ্টি গণনাকারীর মাধ্যমে পিতা নির্ধারিত হওয়ার পর পিতা হওয়ার কথা সে নিজেই ঘোষণা করতো। তাকী ওসমানী সাহেব বুখারীর لانكاح الابولى অধ্যায়ের যে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে উল্লেখ আছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই মা তার সাথে জড়িত পুরুষদের নাম বলে দিতো। তারপর সন্তানের পিতৃ পরিচয় যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যেতো, সে তা কোনোক্রমেই অস্বীকার করতে পারতো না। (لايستطيع ان يمتنع به الرجل) হাদীসটিতে একথারও ব্যাখ্যা আছে, নর্তকী বা বেশ্যার ঘরে যদি কোনো সন্তান জন্ম নিত তাহলে বেশ্যার কাছে যাতায়াতকারী সকল পুরুষদেরকে একত্রিত করে কুষ্টি গণনাকারীর মাধ্যমে যে পিতা নির্ধারিত হতো সে তা মানতে বাধ্য হতো। অস্বীকার করা সম্ভব হতো না। (دعى ابنه لايمتنع من ذلك) এরূপ সুস্পষ্ট রূপরেখার কথা হাদীসে উল্লেখ থাকার পরও এ প্রসংগটি গোপন থাকা, সংশয়িত হওয়া অথবা সাধারণভাবে ঘোষিত না হওয়ার যে কারণ তাকী ওসমানী সাহেব উল্লেখ করেছেন তাকি ধোপে টিকে ?

www.pathagar.com

উপরোক্ত রাওয়ায়েতে আলোচ্য বিবাহ পদ্ধতির সাথে ওসমানী সাহেব আরো কিছু পদ্ধতি সংযোজন করার চেষ্টা করেছেন। দাউদীর বর্ণিত একটি কথা ওসমানী সাহেব তার কথার স্বপক্ষে যোগ করেছেন। কথাটি হলো, জাহেলী যুগের কতিপয় বিবাহ প্রথার কথা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেননি। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো গোপন প্রণয়ের বিবাহ আর ولا متخذات اخدان কুরআনের এ আয়াতে একথা উল্লেখ আছে। জাহেলী যুগের লোকেরা বলতো, এরূপ সম্পর্ক গোপনসূত্রে হলে কোনো ক্ষতি নেই, প্রকাশ্যে হলে তা নিন্দনীয়।

এরূপ বাজে কথা বলার পূর্বে এ সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করা ওসমানী সাহেবের জন্যে ভালো হতো। কথাটি এতোটা ভিত্তিহীন এবং গোপন পরিচয়কে বিবাহ বলা এতোই দুঃখজনক যে, তাকী ওসমানী সাহেব নিজেই শেষ পর্যায়ে এখানে বিবাহের পরিবর্তে 'সম্পর্ক' শব্দ প্রয়োগ করেন। অন্যথায় গোপনে হলে ক্ষতি নেই, প্রকাশ্যে হলে ক্ষতিকর—এমন উদ্ভট কথা কি কোনো বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব ? ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ ধরনের কথা বর্ণনা করে সাথে সাথেই তা রদ করে দিয়ে বলেন ঃ এসব কথা 'বিবাহ' পরিভাষার জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে না। বিবাহের এসব প্রথা বর্ণনা করার পরিবর্তে তাকী সাহেবের শুধু এটুকু বলে দেয়া উচিত যে, আরবে বিবাহ এবং ব্যভিচারের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য ছিলো না এবং সব ধরনের ব্যভিচারই বিবাহের অন্তর্গত ছিলো। তবে এ ধরনের ধারণা বাস্তব বিরোধী।

ولا متخذات اخدان কুরআনের এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে জারীর লিখেছেন ঃ

ولا متخذات اصدقاء على السفاح .... الصديق الفجور بها سراً

"এবং তারা গোপন পরিচয়ের মাধ্যমে ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত নয়।"

আগে অগ্রসর হয়ে তিনি ولا متخذى اخدان এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

ولا منفردين ببغية واحدة اتخذ لنفسه صديقة بفجربها -

"এবং তারা যে ভ্রষ্টা নারীর সাথে অপকর্ম করতো তাদের কাউকে গোপন পরিচয়ের জন্যে তারা নির্দিষ্ট করতো না।"

এভাবে ইমাম ইবনে জাওযী তাঁর 'যাদুল মাসীর' গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

كان الجاهلية يحرمون ماظهر من الزنى ويستحلون ما خفى

www.pathagar.com

"জাহেলী যুগের লোকেরা প্রকাশ্য ব্যভিচারকে হারাম এবং গোপনে ব্যভিচারকে হালাল মনে করতো।"

এখানে ইবনে জাওযী বিবাহের পরিবর্তে 'যিনা' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। বস্তুত হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জাহেলী অবস্থা সম্পর্কে দাউদীর তুলনায় অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তিনি এ ধরনের সম্পর্ককে বিবাহের প্রকার হিসেবে বর্ণনা করেননি।

গোপন সূত্রের পিতৃ পরিচিতি জাহেলী যুগে অগ্রহণীয় ছিলো বটে কিন্তু আবু সুফিয়ান ১০জন লোকের উপস্থিতিতে পিতৃ পরিচয় সাব্যস্ত করেছিলেন বলে তাকী ওসমানী সাহেবের বারবার বলাটা সত্যিই বড় দুঃখজনক। প্রশ্ন জাগে, যেই পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে সন্তানের মা জানলো না, জানলো না বংশের অপর কেউ কিংবা মাতৃভাই আবু বাকরাহ এমনকি খোদ যিয়াদও যৌবনে পৌঁছা পর্যন্ত তা জানতে পারলো না। এমন পরিচিতির সঠিক ভিত্তি কতটুকু। দশজন[১] সাক্ষী গোছালো ছাড়া আর কেউ যে ঘুর্ণাক্ষরেও যেই পরিচিতির কথা জানলো না। শুধু তাই নয় বরং যেই যিয়াদ নিজেকে ক্রীতদাস পুত্র মনে করতো এবং পিতৃ পরিচিতির এ কর্মকাণ্ড ঘটার আগ পর্যন্ত যিয়াদ বিন ওবাইদ নামে খ্যাত ছিলো, যে নিজের ক্রীতদাস বাপকে অর্থ দিয়ে আযাদ করলো, সেই হঠাৎ করে ৪৪ হিজরী সনে হয়ে গেলো আবু সুফিয়ানের পুত্র। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবার সহোদর ভাই আর আবির্ভূত হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালক হিসাবে ! এ সম্পর্ক প্রমাণ ও তা মযবুত করতে প্রয়াসীদের আগ্রহের ধরন সত্যিই আরেক বিস্ময়।

মনে হয় দীর্ঘ সাড়ে পঁয়ত্রিশ বছর যাবত অন্যান্য সবলোক নিথর ও নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। প্রথম হিজরী সনে যিয়াদের জন্ম হয়। কিন্তু আফসোসের বিষয়, ১৩ বছরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বললেন না, এ ব্যক্তি আপনার শ্যালক আবু সুফিয়ানের পুত্র এবং ৪৪ বছরের মধ্যে হযরত উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কেউ অবহিত করলেন না যে, যিয়াদ আপনার সহোদর ভাই। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া

---

১. ওসমানী সাহেব শুধুমাত্র মাদায়েনী গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ১০জন সাক্ষীর কথা বারবার উল্লেখ করছেন। অথচ আশ্চর্যভাবে লক্ষ্যণীয় যে, তিনি মরহুম মাওলানা মওদূদীর দেয়া গ্রন্থের উদ্বৃতিকে খণ্ডন করার অভিপ্রায়ে এ গ্রন্থটিকে তাঁর নিজের গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠায় বিতর্কিত বলে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনে মুহাম্মদ লিখার পরিবর্তে মুহাম্মদ বিন আলী লিখে তিনি গ্রন্থনায় ভুল করেন। 'মাদায়েনী' গ্রন্থটির নির্ভরযোগ্যতার দিকে না তাকিয়ে বলতে চাই, একই গ্রন্থের উদ্ধৃতি আপনারা দিলে তা হয় নির্ভরযোগ্য আর অন্যেরা দিলে তা হয়ে যায় অনির্ভরযোগ্য কিংবা বিতর্কিত, এটা কেমন ধরনের বিচারবোধের পরিচায়ক ?

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহার সহোদর ভাই হওয়াতে নিসন্দেহে তিনি সমগ্র মুসলিম জাতির মামা। অতএব আল বালাগের সম্পাদক জনাব তাকী ওসমানী সাহেব যদি বর্তমানে 'যিয়াদ বিন আবিহীকে' এভাবে সমগ্র মুসলিম জাতির মামা বানাতে চান, তাহলে বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করে দিন। আপনার পরবর্তী সময়ের সমস্ত লেখা বক্তৃতা বিবৃতি ও আলাপ-আলোচনায় যিয়াদকে "খালুল মু'মিনীন' বা মু'মিনদের মামা উপাধিতে ভূষিত করতে থাকুন, তাতে এ যাবতকার যত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে, তাতে কিছুটা হলেও তার কাফ্ফারা হতে পারে।

আমার বর্ণিত সাক্ষ্য-প্রমাণ, যুক্তি ও তথ্যসমূহের সরাসরি জবাবদানের পরিবর্তে তাকী সাহেব নিজের স্বভাবসুলভ খোঁড়া যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁর কথা হলো, যিয়াদের পিতৃ পরিচয়ের ঘটনাটি এরূপ ভিত্তিহীন হলে (خير القرون) সর্বোৎকৃষ্ট শাসনামলের যুগে সত্যের ধারকদের সংখ্যা সত্য রক্ষার ক্ষেত্রে শূন্য হয়ে গিয়েছিলো বলে স্বীকার করতে হয়। অন্যথায় ঐ আমলে এতোবড় একটি প্রহসনমূলক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের জড়িয়ে পড়া কি করে যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া সম্ভব?

জনাব তাকী ওসমানীর এ যুক্তিটিও আসলে তাঁর ইতিপূর্বেকার যুক্তি ও দলীল প্রমাণেরই অনুরূপ যা তিনি দিয়ত, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করা এবং কাফের-মুসলমানের উত্তরাধিকারী হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে পেশ করে আসছেন। ঐতিহাসিক প্রামাণ্য ঘটনাবলী ও তথ্যসমূহ যদি শুধুমাত্র স্থূল কথাবার্তার তুড়ি মেরে এভাবে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব হতো, তাহলে অকাট্য হাদীস-'আছার' ও ইতিহাসে স্ববিস্তারে বর্ণিত ফেতনায়ে মুরতাদ, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত, হাররার ঘটনা, মক্কা-মদীনার অবমাননা ইত্যাকার ঘটনাবলী ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা অতীব জরুরী হয়ে পড়তো। কোন্ ঘটনা যুক্তির কষ্টিপাথরে সম্ভব, কোন্টি সম্ভব নয়—আমি সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে বলতে চাই, মুসলিম জাতি সর্বোৎকৃষ্ট যুগ সহ পরবর্তী কোনো যুগেই সত্যের মহান রক্ষক শূন্য ছিলো না। যদি মুসলিম উম্মার সত্যবাক থেকেই শূন্য থাকতো তাহলে সংঘটিত ঘটনাবলী এবং এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ স্বরূপ যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সেগুলো আমাদের ইতিহাস থেকে অদৃশ্যই থেকে যেতো এবং ভুল নির্ভুল ও সুন্দর অসুন্দরের স্বাতন্ত্র পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে মুছে যেতো।

www.pathagar.com

যিয়াদকে সহোদর ভাইয়ের স্বীকৃতি দেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বিতর্কিত বিষয় নিয়ে অধিক বিতর্ক করা তাও আবার সত্য উপলব্ধির পরিবর্তে অযৌক্তিকভাবে হলেও স্বমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা প্রবল থাকা অতীব আপত্তির কথা। তাকী ওসমানী সাহেবের পেশকৃত ঠুনকো দলিল কিংবা স্ববিরোধী কথার যৎকিঞ্চিত জবাবদানই আমরা মংগলজনক মনে করছি। আমাদের বাসনা ছিলো, তাতে ওসমানী সাহেবের চৈতন্যের উদয় হবে অথবা কমপক্ষে তিনি ইসলামী ইতিহাসের এসব অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর ঘটনা অবলম্বন করবেন। কিন্তু উচ্ছ্বাস-আবেগ আচ্ছন্ন মন-মস্তিষ্কের উদার ও সহনশীল হওয়া কঠিন বৈকি। সুতরাং এ বিষয়ে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আরো কিছু আলোচনা করতে বাধ্য হলাম।

যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের ঔরসভুক্তির বিষয়টির ঘোর প্রতিবাদ করেন তৎকালীন কতিপয় সাহাবী। পরবর্তী সময়ের বেশ কিছুসংখ্যক আলেম ও ইতিহাসবিদ এ বিষয়ের সমালোচনা করতে থাকেন। এ বিষয়ে সহীহ্ মুসলিমের সূচনায় 'কিতাবুল ঈমান'-এর একটি অধ্যায় হলো ঃ

حال ايمان من رغب عن ابيه وهو يعلم

"জ্ঞাতসারে নিজ পিতৃ পরিচয় পরিবর্তনকারীর ঈমানের অবস্থা।"

এ অধ্যায়ের হাদীসটি লক্ষ্যণীয় ঃ

عن ابي عثمان قال لما ادعى زياد لقيت ابا بكره فقلت له ما هذا الذى صنعتم اني سمعت سعد بن ابى وقاص يقول سمع اذ ناى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى ابا فى الاسلام غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام فقال ابو بكرة وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"হযরত আবু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। যিয়াদ আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত বলে দাবী করা হলে আমার সাথে (তার মাতৃভাই) হযরত আবু বাকরাহ-এর সাক্ষাত হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমরা এটা কি কাজ করলে ? আমি হযরত সায়াদ বিন আবি ওক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে রাসূলের এ হাদীসটি শুনেছি। হাদীসটি তিনি তার নিজ কানে শুনেছেন। হাদীসটি হলো—যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর জ্ঞাতসারে স্বীয় পিতাকে পরিত্যাগ করে অন্য কাউকে পিতা বলে দাবী

www.pathagar.com

করে তার জন্যে বেহেশত হারাম। হযরত আবু বকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন ঃ আমি নিজে রাসূলকে এরূপ বলতে শুনেছি।"

হযরত আবু বকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদের মাতৃভাই ছিলেন। তাই আবু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এ প্রশ্ন করেন। অথচ আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দাবীর ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এ কারণে তিনি আজীবন যিয়াদ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। এমনকি তার সাথে তিনি কথাও বলতেন না। ইমাম নববী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় যিয়াদ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

كان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي ثم ادعاه معاوية بن ابي سفيان والحقه بابيه الي سفيان وصار من جملة اصحابه بعد ان كان من اصحاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ـ

"যিয়াদের প্রসিদ্ধ নাম ছিলো যিয়াদ বিন ওবাইদ সাকফী। পরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত হওয়ার দাবী করে স্বীয় বংশে শামিল করে নেয়। এভাবে যিয়াদ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থক হয়ে যায়। যদিও সে প্রথমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সমর্থন করতো।"

মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 'ফতহুল মুলহিম' কিতাবে প্রায় একই ভাষায় হাদীসটির ব্যাখ্যা করেছেন। আবু দাউদ সহ অন্যান্য সহীহ হাদীসের কিতাবে হাদীসটি রয়েছে। মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব বজলুল মাজহুদে হাদীসটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

انما ذكر ابو عثمان هذا الحديث لابي بكرة لان زيادا اخا ابي بكرة لامه انتمي نسبه الي ابي سفيان صخرا بن حرب وقصته ان ابا سفيان لازني بامه في الجاهلية فولده زيادا فكان زياد تقول له عائشة زياد بن ابيه وكان زياد من حماة علي وكان شجاعا مقداما في الحرب فاستماله معاوية فانتسب اليه وجعله اخاه فلهذا حدث ابو عثمان هذا الحديث ابا بكرة لانه ظن ان ابا بكرة لعله يرضي به فلما قال ابو بكرة اني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بهذا انه ليس براض بما فعل زياد ـ

"আবু ওসমান এ হাদীসটি হযরত আবু বকরাহ থেকে এজন্যে বর্ণনা করেছেন যে, যিয়াদ তার মায়ের দিক থেকে ভাই ছিলো। যিয়াদ পিতৃ পরিচয়ের দিক থেকে নিজেকে আবু সুফিয়ানের সাথে সম্পৃক্ত করে। সে

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান জাহেলী যুগে যিয়াদের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো। তাতে যিয়াদের জন্ম হয়। এ কারণে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে যিয়াদ বিন আবিহি নামে ডাকতেন। প্রথমে সে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমর্থক ছিলো। সে ছিলো অতি সাহসী পারংগম। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিজের দলে ভিড়াবার জন্যে স্বীয় পিতার ঔরসজাত বলে ঘোষণা করে এবং আপন ভাই বানিয়ে নেন। আবু বাকরাহ্ এ কাজে রাজী ছিলেন ধারণা করে আবু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেন। কিন্তু আবু বাকরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই এ হাদীসটি শুনালে আবু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারলেন যে, তিনি যিয়াদের পিতৃ পরিচয় পরিবর্তনের ব্যাপারে রাজী ছিলেন না।"–(বজলুল মাজহুদ)

সুমাইয়ার সাথে আবু সুফিয়ানের ব্যভিচারে এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক যিয়াদকে নিজের পিতার ঔরসজাত বলে আপন ভাই বলে স্বীয় দলে ভিড়ানোতে লিপ্ত হওয়া—একথাগুলো মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের কিতাবে কেন লিখলেন এজন্যে তাকী ওসমানী সাহেব মাওলানা মওদূদীর এ প্রকাশ ভংগীকে খুবই পরিতাপযোগ্য বলে গণ্য করেছেন এবং তাওবা করার দাবী জানিয়েছেন। তাকী ওসমানী সাহেব দাবী দাওয়ার মাধ্যমে সাহাবী প্রিয় সত্যানুসন্ধানী ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার যতোই চেষ্টা করছেন ততোই তিনি সংকীর্ণতা, গোঁড়ামী ও পক্ষপাতিত্বের জালে আটকে পড়ছেন। মাওলানা খলীল আহমদ (র) সাহেব দেওবন্দের 'উস্তাদুল আসাতেজা' এবং 'শায়খুল শুয়ুখ' হিসেবে সমাদৃত। তিনিও লিখেছেন যে, সুমাইয়্যার সাথে আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুলের আগে যেনায় জড়িত হতো। ভারত উপমহাদেশ তথা বিশ্ব মুসলিমের নন্দিত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয এ ভাষায় লিখেছেন যে, 'যিয়াদ হারামী, বেহায়া, মারদুদ এবং অজ্ঞাত মায়ের ফসল।' আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিজ পিতার ঔরসজাত বলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে ছিনিয়ে আনেন।" মাওলানা আবুল কালাম আযাদ লিখলেনঃ "ঔরসভুক্তির ব্যাপারে এমন সাক্ষী দাঁড় করানো হলো, যা দেখে স্বয়ং যিয়াদের মাথাও লজ্জায় অবনমিত হয়ে গেলো।" তাওবার পরামর্শদাতা ওসমানী সাহেব উপরোক্ত নন্দিত আলেম যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁরাও একই বিষয়ে কলম ধরতে গিয়ে একই "পরিতাপযোগ্য ও কঠোর অপসন্দনীয় কাজ করে গেছেন, এজন্য তাওবা করে যেতে পারেননি, এমতাবস্থায় তাওবার পরামর্শদাতা তাকী ওসমানী তাদের বেলায় কি বলবেন? তাঁকে বলছি, নিজের আস্তিনের ভিতরটার দিকেও নজর রাখুন। মাওলানা মওদূদীর প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরই নিজের শ্রদ্ধেয় পূর্বসুরীদের বুকে গিয়ে লাগছে নাতো?

www.pathagar.com

বিভিন্ন মানসিকতার শিকার হওয়ায় কেউ এ সত্যের স্বীকৃতি দিক আর না দিক প্রকৃত অবস্থা এই যে, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে সমস্ত কথা লিখেছেন—একই কথা ইসলামের বিশেষজ্ঞ অধিকসংখ্যক আলেম অতীত থেকেই লিখে আসছেন, বলে আসছেন। এবার এ সম্পর্কে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আসাকিরের ভাষ্য দেখুন ঃ

قال زياد لابى بكرة الم تران امير المومنين ارادني على كذا وكذا وولت على فراش عبيد واشبته وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى لغير ابيه فليتبو اد مقعده من النار۔

"যিয়াদ আবু বকরাহকে বললো ঃ আপনি কি দেখছেন না যে, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে ঔরসভুক্তির ইচ্ছা করছেন, অথচ আমি ওবাইদের ঔরসজাত এবং তার সাদৃশ্য। আপনি জানেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা ছাড়া নিজেকে অন্য কারো ঔরসজাত বলে দাবী করে, সে যেন দোযখে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"-(ইবনে আসাকির রচিত 'তারিখে দামেশক, খঃ ৫, পৃঃ ৪০৯ রওজাতুশ শাম প্রেস, ১৩৩২ হিজরী)

বইটির ৪১২ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

وكان عمر بن عبد العزيز اذا كتب الى عماله فذكر زيادا قال ان زيادا صاحب البصرة ولا ينسبه وقال ابن بجه اول داء دخل العرب قتل الحسن يعني سمه وادعاء زياد۔

"ওমর বিন আবদুল আযীয তাঁর প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে চিঠি লিখার সময় যিয়াদের প্রসঙ্গ আসলে শুধু লিখতেন, 'বসরার গভর্নর যিয়াদ' এর প্রতি নসবনামা লিখতেন না। ইবনে বুজা বলেন, প্রথম ব্যাধি যেটি আরব মুসলমানদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তাহলো হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিষ পানে হত্যা করা এবং যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত বলে (মুয়াবিয়ার) দাবী।"

হাফেজ ইবনে আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে যিয়াদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে যিয়াদ ইবনে ওবায়েদ নামেই উল্লেখ করেছেন, যাতে আমার একথারই পোষকতা হয় যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিক যিয়াদকে ইবনে আবু সুফিয়ান বলে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন।"

www.pathagar.com

قال ابن يحيى اول حكم زدمن احكام رسول الله احكم فى زياد وقال سعيد بن السيب اول قضية ردت من قضا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية قضاء فلان يعنى معاوية نى زياد۔

"ইয়াহইয়া বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালা-সমূহের মধ্য থেকে প্রথম যেই ফায়সালাটি প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করা হয় সেটি হলো, যিয়াদ কেন্দ্রিক মামলার ফায়সালাটি। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালা সমূহের মধ্য থেকে যেই ফায়সালাটি প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যাত হয়, সেটি করেছেন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদের ব্যাপারে। অর্থাৎ যিয়াদকে ঔরসভুক্তির ঘোষণাটি ছিলো নবী আলাইহিস সালামের ফায়সালার প্রথম প্রকাশ্য খণ্ডন।"

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবুল ফিদা তাঁর 'ইতিহাসে' কি লিখেছেন শুনুন–

كانت سمية جارية للحارث بن كلدة الثقفى فزوجها بعبد له رومى يقال له عبيد فولدت سمية زيادا على فراشه فهو ولد عبيد شرعًا وكان ابو سفيان سار فى الجاهلية الى الطائف ....

"সুমাইয়া হারিস বিন কিলদাহ্ সাকাফীর ক্রিতদাসী ছিলো। হারেস তাকে স্বীয় ক্রীতদাস ওবায়েদের কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। যিয়াদ সেই ওবায়েদেরই ঔরসজাত সন্তান এবং তারই শরীয়াত সম্মত সন্তান। আবু সুফিয়ান ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে তায়েফ গিয়ে ছিলো-----। পরবর্তীতেও একই কাহিনী যা অন্যান্য ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন।"

অতপর আবুল ফিদা বর্ণনা করেন যে, যিয়াদকে ঔরসজাত ঘোষণা করার সময় আবু মরিয়াম এভাবে সাক্ষী দেয় যে, খোদ যিয়াদ তাকে এ বলে চুপ করিয়ে দিয়েছিলো ويدك طلبت شاهدا ولم تطلب شتامًا "চুপ করো তোমাকে সাক্ষী দিতে ডাকা হয়েছে গালি দিতে নয়।"

আবুল ফিদা আরও লিখেছেন ঃ

فاستلحقه معاوية وهذا اول واقعة خولفت فيه الشريعة علانية لصريح قول النبى صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر واعظم الناس ذلك وانكروه خصوصا بنو امية لكون زياد بن عبيد الرومى صار من بنى امية۔

www.pathagar.com

"মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক যিয়াদকে স্বীয় পিতার ঔরসজাত বলার ঘটনাটি প্রকাশ্য বিরোধিতার প্রথম পদক্ষেপ। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্ব্যর্থহীন শব্দে বলে গেছেন, যার ঔরসে সন্তান হবে সেই তার মালিক আর ব্যভিচারীর জন্য হলো প্রস্তরাঘাত।" ঘটনাটিকে লোকেরা একটি বিরাট দুর্ঘটনা বলেই মনে করলো। বিশেষতঃ বনী উমাইয়ার লোকজন। কেননা এতে করে যিয়াদ বিন ওবাইদ রুমী বনী উমাইয়ার একজন সদস্য হয়ে গেল।"-(তারিখ খ ২, পৃ ঃ ৯৮-৯৯)

এ সমস্ত সম্মানিত আলেম সকলেই ওসমানী সাহেবর দাবী অনুযায়ী তাওবা ছাড়া পরপারে গেছেন। ওসমানী সাহেব তাদের পরিণতি সম্পর্কে ভালো জ্ঞাত থাকবেন। যদি তিনি প্রধান বিচারক হতেন আর এসব মনীষী বেঁচে থাকতেন তাহলে সম্ভবত তাদের সকলকেই তাঁর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো এবং পিঠে চাবুকের কষাঘাতে রঞ্জিত হয়ে যেতো !

নসবনামা গ্রন্থাবলীর সাক্ষ্য

'আল বালাগ' সম্পাদক তাকী ওসমানী সাহেব অভিযোগের সুরে লিখেছেন, "ইতিহাস ও নসবনামার কিতাবগুলোতে যিয়াদ বিন আবিহী এবং যিয়াদ বিন ওবায়েদই লেখার যে দাবী মালিক গোলাম আলী সাহেব করেছেন তা ঠিক নয়।" বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক বালাজুরি তার কিতাবে যিয়াদের জীবনীতে যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান শিরোনামে লিখেছেন।

আমার আসল বাক্য ছিলো, "ইতিহাস ও নসবনামার গ্রন্থসমূহে সাধারণত যিয়াদ বিন আবিহী এবং যিয়াদ বিন ওবায়েদ লেখা হয়ে আসছে।" আমি এখনও আমার বক্তব্যটিকেই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মনে করি এবং জনাব তাকী ওসমানীর বক্তব্য ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টিকারী এবং বাস্তবতার বিপরীত। বালাজুরীর লিখিত 'আনসাবুল আশরাফ' গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন। তবে প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা অধ্যায় সংখ্যা, মুদ্রণ, এবার কিছুই উল্লেখ করেননি। কিতাবটি এখনো ছাপার অক্ষরে বর্তমান আছে। সম্ভবত ওসমানী সাহেব ১৯৫৯ সালে মিসরের দারুল মায়ারিফ থেকে মুদ্রিত ড. হামিদুল্লাহর সম্পাদনায় প্রকাশিত ১ম খণ্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকবেন। প্রকৃতপক্ষে সে খণ্ডে যিয়াদের জীবনীর স্বতন্ত্র কোনো শিরোনামে সন্নিবেশিত নেই। কেননা সে অংশটি সীরাতুন নবীর সম্পর্কিত। অবশ্য পরোক্ষ ভাবে যিয়াদের কথা কয়েকটি জায়গায় এসেছে। গ্রন্থটিতে প্রায় ৩০বার যিয়াদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে ৩৬৭ পৃষ্ঠার একটি মাত্র জায়গা ছাড়া আর কোথাও উক্ত কিতাবে যিয়াদ বিন আবি

www.pathagar.com

সুফিয়ান লেখা পাইনি। বরং ঐ একটি স্থান ছাড়া অধিকাংশ স্থানেই যিয়াদ বিন ওবায়েদই লেখা আছে। ৪৮৯ পৃষ্ঠায় আছে– يقال له عبيد فولدت منه زيادا ওবায়েদের ঔরসে যিয়াদের জন্ম'। ৪৯১ পৃষ্ঠায় আছে زياد بن عبيد مولى ثقيف 'সাকীফের গোলাম ওবাইদের ছেলে যিয়াদ।' ৪৯৩ পৃষ্ঠায় আছে (انتفاءه من عبيد وادعاه الى ابى سفيان) 'ওবায়েদের ঔরসভুক্তি অস্বীকার করতঃ আবু সুফিয়ানের নসব দাবী করে।"

ইবনে হাযমের جمهرة انساب العرب-এ গ্রন্থটির পুরো বিষয়বস্তু হচ্ছে —নসবনামা। গ্রন্থটিতে হযরত আবু সুফিয়ানের সন্তানদের পূর্ণ তালিকা দেয়া হয়েছে। সেখানে যিয়াদের নামগন্ধও নেই।[১]

আবু হানিফা দিনওয়ারী تاريخ الاخبار الطوال গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ زياد بن عبيد كان عبدا مملوكا لثقيف

এখানে আছে যিয়াদ বিন ওবায়েদ।

২১৯ পৃষ্ঠায় একটি শিরোনাম আছে ঃ زياد بن ابيه

এই শিরোনামের শুরুতে আছে ঃ

كان زياد بن ابيه انما يعف بزياد بن عبيد

"যিয়াদ বিন আবিহী যিয়াদ বিন ওবায়েদ নামে খ্যাত ছিলো।"

হাফেজ ইবনে হাজার 'আল ইসাবা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

زياد بن ابيه وهو ابن سمية الذى صار يقال له ابن ابى سفيان ولد على فراش عبيد مولى ثقيف - فكان يقال له زياد بن عبيد - ثم استلحقه معاوية ثم لما انقضت الدولة الاموية صار يقال له زياد بن ابيه وزياد بن سمية ..... اشترى اباه بالف درهم فاعتقه -

"যিয়াদ বিন আবিহী ছিলো সুমাইয়ার ছেলে। পরে সে যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান নামে কথিত হতে থাকে। সে বনী সকীফের গোলাম ওবায়েদের ঔরসে জন্ম নেয়। আর এ কারণেই তাকে যিয়াদ বিন ওবায়েদ বলা হতো। তারপর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আবু সুফিয়ানের ঔরসভুক্তির ঘোষণা করেন। বনী ওমাইয়ার শাসন ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটলে তাকে

১. যেমন, ইয়াযিদ, হানযিলাহ, আমর, মুয়াবিয়া, মুহাম্মদ, আনবাসা, উতবা, উম্মে হাবীবা।

www.pathagar.com

পুনরায় যিয়াদ বিন আবিহী এবং যিয়াদ বিন সুমাইয়া নামে ডাকা হয়। ---------------- সে তার পিতা ওবায়েদকে হাজার দিরহাম দিয়ে মুক্ত করে দেয়।"

যিয়াদ বিন আবিহী নামে যিয়াদকে ডাকার কথা ইবনে সিরীন সহীহ সনদসহ উল্লেখ করেছেন। ইমাম জাহবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি العبر في خبر من غبر গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৫৮ পৃষ্ঠায় (৫৩ হিজরী) যিয়াদ বিন আবিহী লিখেছেন। ৬৪ পৃষ্ঠায় তিনি পুনর্বার তাকে এ নামেই উল্লেখ করেন। অবশ্য সাথে একথা লিখেছেন যে, استلحقه معاويه وزعم انه ولد ابى سفيان মুয়াবিয়া তাকে নিজ পিতার ঔরসজাত বলে গণ্য করেছেন এবং দাবী করেছেন যিয়াদ তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের পুত্র।

তকী ওসমানী সাহেব সম্ভবত একথাও ভুলে গেছেন যে, তিনি নিজের লেখা কিতাবের ৫৬ পৃষ্ঠায় আলোচনার উপসংহারে খোদ আমীরে মুয়াবিয়ার একটি চিঠি যা তিনি যিয়াদের নামে লিখেছিলেন বলে উদ্ধৃত আছে, তাতে যিয়াদকে তিনি লিখেছেন, যে পিতার দিকে তোমাকে পুত্র সম্পর্কিত করা হতো, তিনি হাসানের পিতা অপেক্ষা এই সম্বোধনের অধিক হকদার। একথার অর্থ কি, এটা নয় যে, আমীরে মুয়াবিয়া নিজেও এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, যিয়াদ আবু সুফিয়ানের বংশজাত বলে ঘোষণার পূর্বে ইবনে ওবায়েদের পুত্র রূপে পরিচিত ছিলো।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর প্রেক্ষাপটে ইতিহাস ও নসবনামা গ্রন্থাবলীতে যিয়াদকে বিন আবু সুফিয়ানের পরিবর্তে অন্য নামে উল্লেখ করার আমার দাবীর যৌক্তিতা এবং ওসমানী সাহেবের একথায় বিরোধিতা করার অন্তরসারশূন্যতা সহজেই প্রমাণিত হলো। আবেগ তাড়িত লোকদের এরূপ দশা প্রায়শঃ হয়ে থাকে। বিস্ময় যে, এ দৈন্য দশাকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার পরও তাদের চৈতন্যের উদয় হয় না।

ওসমানী সাহেবের আত্মপ্রসাদমূলক আরো একটি যুক্তি হলো—আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ কর্তৃক যিয়াদকে নিজের পিতার ঔরসজাত বলে ঘোষণা দেয়ার কাজকে যারা প্রথমে সহ্য করতে পারছিলো না তারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে এসে লজ্জায় অনুতপ্ত হয়েছেন। কিন্তু ওসমানী সাহেবের এ দাবী সঠিক নয়। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজের যারা বিরোধিতা করে প্রতিবাদ করেছেন, (প্রতিবাদীদের কথা হাদীসের প্রমাণসহ আগে আলোচনা করা হয়েছে) তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হাদীস বিরোধি এ কাজের ঘোর বিরোধিতা করেছেন। হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু

www.pathagar.com

আনহুর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা সারা জীবন যিয়াদের সাথে পর্দা করে চলেছেন কখনো ভাই বলে স্বীকৃতি দেননি। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে একবার যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান লেখার তাৎপর্য ও পটভূমি আমরা আগে বর্ণনা করেছি। তবুও আবার বলছি, কারণ উসমানী সাহেব এ বিভ্রান্তিকেও অত্যন্ত জোরালোভাবে পেশ করেছেন যে, যদি যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের পুত্র বলাটা অবৈধ ছিলো, তাহলে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যিয়াদকে ইবনে আবি সুফিয়ান লিখে কি করে তাতে স্বাক্ষর ও সিলমোহর দিয়েছিলেন ?"

আমি পূর্বে এর জবাবে বলেছিলাম যে, যদিও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ সিদ্ধান্তটি হাদীসের আলোকে ভুল ছিলো। কিন্তু যেহেতু তিনি বিষয়টি সারা দেশে সরকারীভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, যিয়াদকে সকলে ইবনে আবি সুফিয়ান বলতে হবে। তাই রাষ্ট্রীয় শৃংঙ্খলা ও বৈষয়িক দিক থেকে এ সরকারী ফরমানটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সে অনুযায়ী যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান বলাও বৈধতার আওতায় এসে গেছে।

তাকী ওসমানী সাহেবের সম্ভবত জানা আছে যে, হানাফী ফকীহগণ (ইসলামী আইনবেত্তা) এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো হাকিম বা বিচারক যে রায় ঘোষণা করে ফেলেন, বাস্তবে সেই রায় নির্ভুল না হলেও (সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে) সেটিই কার্যকর করতে হয়। সে অনুসারে জনগণের আমল করাও অবৈধ নয়, যদিও আল্লাহর কাছে উক্ত ভুল রায় ভুলই থেকে যায়। কাজেই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যদি ইবনে 'আবু সুফিয়ান' লিখেও থাকেন সেটাকে এভাবেই গণ্য করা যেতে পারে।

তথাপিও আমি আগে একথা বলে এসেছি যে, কোনো কোনো রাওয়ায়েত অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যিয়াদকে ইবনে আবু সুফিয়ান বলতে অনিচ্ছা দেখিয়েছেন। যেমন একবার যিয়াদ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার খেদমতে একটি দরখাস্ত লিখেছিলো। তাতে সে তার বক্তব্যের শুরুতে লিখেছিলো—'যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ানের পক্ষ থেকে' —তার আশা ছিলো যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে সে নামেই সম্বোধন করবেন আর সেটা তার জন্যে একটি সনদ বা সার্টিফিকেটের কাজ দেবে। কিন্তু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উক্ত দরখাস্তের জবাবে লিখে দিলেন—'সকল মুসলমানের মা আয়েশার পক্ষ থেকে যিয়াদ বেটার নামে'।

জনাব তাকী ওসমানী এটাও লিখেছেন যে, "সাক্ষীগণ যখন বিবাহের সাক্ষ্য দিয়েই দিলেন, তখন যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের পুত্র বলে ঘোষণা করায়

www.pathagar.com

যারা আপত্তি জানিয়েছিলেন, তারা সেই আপত্তি প্রত্যাহার করে নেন এবং নিজেদের আপত্তির জন্যে লজ্জাবোধ করেন।" ওসমানী সাহেবের একথাটি ঠিক নয়। কারণ, যেসব মনীষী এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত বলে ঘোষণাকে অবৈধ বলেছিলেন, তারা আমরণ একই মতের উপর অটল ছিলেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। তিনি সকল সময় যিয়াদের সাথে পর্দা করেছেন এবং কখনও তাকে নিজের ভাই বলে স্বীকার করেননি। এছাড়া আপত্তি ও প্রতিবাদের ঘটনাটিতো তখনই সামনে আসে, যখন যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত বলে ঘোষণা করা হয়। এদিক থেকে জনাব ওসমানীর একথাটি কতইনা বিস্ময়কর যে, তিনি বলেন, "ব্যাপারটি যখন ১০জন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হলো তখন আপত্তি ও প্রতিবাদকারীরা নিজেদের আপত্তি প্রত্যাহার করে নেন।" যে সমস্ত লোক যেমন আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ যিয়াদের মাতা সুমাইয়ার সঙ্গে আবু সুফিয়ানের বিবাহকেই অস্বীকারকারী ছিলেন। তাদের মতে এহেন সাক্ষী জ্বেনা-ব্যভিচারের অপবাদেরই নামান্তর ছিলো। তদ্রূপ যখন 'বযলুল মাজহুদ' গ্রন্থের লেখক বলেন যে,—আবু সুফিয়ান (ইসলাম পূর্ব যুগে) ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁর কাছেও বিবাহের এ সাক্ষ্য দান জ্বেনার সাক্ষ্য রূপেই গণ্য। বিবাহের সাক্ষ্য রূপে নয়।

জনাব তাকী ওসমানী মারওয়ানের ভ্রাতা আবদুর রহমান এবং ইবনে মুফাররাগের প্রসঙ্গে পূর্ব আপত্তি থেকে প্রত্যাবর্তন ও লজ্জিত হবার যেই কথা উল্লেখ করেছেন তার বাস্তবতার ধরন এই যে, বনী উমাইয়ারা যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের ঔরসজাত বলে ঘোষণা করাকে কখনও পসন্দ করেনি। কারণ, তারা মনে করতো, অপর একটি গোত্রের লোককে তাদের গোত্রে শামিল করা হয়েছে। তাদের পঠিত কবিতায় এ কার্যক্রমের নিন্দা সুস্পষ্ট। আবদুর রহমান ইবনে হাকাম কিংবা জনৈক হেমইয়ারী কবি যিয়াদ ইবনে মুফাররাগ-এর বলে কথিত কবিতাগুলো সম্পর্কে আবদুর রহমান ইবনে হাকাম এটাই বলতো যে ঃ

"হে মুয়াবিয়া ! যদি আপনি কোনো কৃষ্ণকায় নিগ্রোও পান, তাকেও আমাদের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে এ গোত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে থাকবেন।" যিয়াদ ইবনে মুফাররাগ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে শুধু একথাই বলেছিলেন যে, "এ কবিতা আমি রচনা করিনি। বরং আবদুর রহমান রচনা করে আমার বলে চালিয়ে দিয়েছে।" বলাবাহুল্য, এটাকেই জনাব তাকী ওসমানী পূর্ব মতের প্রত্যাহার ও লজ্জিত হওয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন।

www.pathagar.com

যাহোক, কোনো বিষয় যদি আপত্তিকর হয়, তাহলে সেটা শুধু এ কারণে প্রশংসা ও সমর্থনযোগ্য হতে পারে না যে, এর আপত্তিকারকদের মধ্য থেকে কেউ নিজ মত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

মারওয়ানের ভাই আবদুর রহমান বিন হাকাম এবং যিয়াদ বিন মুগাফররাগের কবিতার ওপর ভর করে তাকী ওসমানী সাহেব সম্ভবত লজ্জা ও ঘৃণায় বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক যিয়াদ আবু সুফিয়ানের ঔরসভুক্তি করাটাকে বনী উমায়ার লোকেরাও সহজে স্বীকার করেনি। এ কাজের প্রতি ক্ষোভ, দুঃখ, ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে তারা কবিতা রচনা করেন। আবদুর রহমান তো এ পর্যন্ত বলে দিলেন যে, মুয়াবিয়া ! যদি আপনি কোনো হাবশী পেয়ে যান তাকেও আমাদের বংশে শামিল করে আমাদেরকে অপমান করতে থাকুন। আর ইবনে মুফাররাগ তো কবিতার আকারে বিদ্রোহের সুরে আকাশ-বাতাস অনুরণিত করে তুলেন। ইবনে মুগাফররাগের বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বরোষে উচ্চারিত হলো ঃ

شهدت بان امك لم تباشه ابا سفيان واضعة انقناع -

"আমি জানি ! তোমার মা বিবস্ত্র হয়ে আবু সুফিয়ানের সাথে মিলিত হয়নি (তারপরও তুমি আবু সুফিয়ানের সন্তান হলে কিভাবে ?)" আশ্চর্য ! বিদ্রোহীদের নিজেদের ক্ষোভ, ঘৃণা, বিদ্রোহ ও প্রতিবাদকে ওসমানী সাহেব প্রতিবাদকারীদের অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসার বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে সরলমনা পাঠকবর্গকে মওদূদী সাহেবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমরা বলবো—জাগতিক জীবনে যদিবা কিছুটা সফলতার মুখ দেখলেন। আখেরাতে এর জবাব ওসমানী সাহেবরা কি দিবেন ?

মা যার স্ত্রী বা ক্রিতদাসী সেই সন্তানের মালিক

একটি সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের ঔরসভুক্তির ব্যাপারে হযরত সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদ বিন যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্বের ঘটনা আমি ইতিপূর্বেকার আলোচনায় বর্ণনা করেছি। বুখারীর মীরাস অধ্যায়ে এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবে ঘটনাটি এভাবে বিবৃত হয়েছে যে—হযরত সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছিলেন, ভূমিষ্ঠ সন্তানটি তাঁর ভাই ওতবার ঔরসজাত যদিও সে যামআর ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মে। এদিকে আবদ বিন যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাবী হলো, সন্তান আমার পিতার ক্রীতদাসীর ঔরসে জন্ম হওয়ায় সে আমার ভাই। সন্তানের চেহারা ওতবার চেহারার সাথে যথেষ্ট মিল থাকা সত্বেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুটিকে আবদ বিন যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সোপর্দ করলেন। হাদীসটি একথার

www.pathagar.com

অকাট্য প্রমাণ যে, ঔরসভুক্তির ব্যাপারে যতো জটিলতাই দেখা যাক, সন্তানের মা যার স্ত্রী বা ক্রীতদাসী তার সাথেই সন্তানের পিতৃ পরিচিতি সম্পর্কিত হবে। কিন্তু আশ্চর্য, জনাব তাকী ওসমানী সাহেব হাদীসের এ উদাহরণ বিদ্যমান থাকাবস্থায়ও যিয়াদের ব্যাপারে আবার বলছেন যে, "আবু সুফিয়ান ছাড়া অন্য কারও পিতৃ পরিচিতি স্বীকৃতি প্রমাণিত নয়। যিয়াদকে যেই ওবায়েদের ঔরসজাত বলা হয়, সে তো খোদ নিশ্চুপ। তাই এখন যিয়াদ একমাত্র আবু সুফিয়ানের পুত্র বলেই স্বীকৃত বৈকি। ইসলাম গ্রহণের আগে এ ঘটনা হওয়ায় এ দাবীই গ্রহণযোগ্য।"

আমার জিজ্ঞাস্য, যিয়াদ যেই ক্রিতদাস ওবায়েদের ঘরে জন্ম নিলো, তার কাছে লালিত-পালিত হলো এবং পিতা ওবায়েদকে দাসত্বের শৃংখলমুক্ত করলো, দীর্ঘ ৪৪ বছর পর্যন্ত সমাজে ওবায়েদের পুত্র বলেই অভিহিত হতে থাকলো, এত কিছুর পরও যদি যিয়াদের পিতৃ পরিচয় স্বীকৃত না হয়, তাহলে আবু সুফিয়ান কর্তৃক কখন কার কাছে চুপিসারে বলে যাওয়া কথাকে তাঁর পুত্র আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে রাজনৈতিক বিশেষ এক স্বার্থ সংঘাতময় মুহূর্তে কতিপয় লোকের সাক্ষ্য ধরে যিয়াদকে তার পুত্র বলে চালিয়ে দেয়া কেমন করে পিতৃ পরিচয়ের জন্যে যথেষ্ট হতে পারে ? এতদ্ভিন্ন তাঁর একথাটিও কেমন যে, "ওবায়েদ তো খোদ নিশ্চুপ।"

ঔরসভুক্তি এবং ঔরসজাত বলে দাবীর কার্যক্রমের পূর্বে যিয়াদের পিতা ওবায়েদের এজন্যে কি করণীয় ছিলো ? তিনি এজন্যে কি সাধারণ্যে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে দিবেন কিংবা আদালতে গিয়ে আরজী পেশ করবেন যে, 'যিয়াদ আমার ছেলে ?' কোনো পিতা কি এভাবে নিজ পুত্রের বংশ পরিচয় প্রমাণ করে ?

একথা দ্বারা জনাব তাকী ওসমানীর উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, সরকারীভাবে যিয়াদের বংশ পরিচয় ঘোষণা এবং এ নিয়ে বিতর্কের সময় ওবায়েদ 'নিশ্চুপ ছিলো' তাহলে তার এ নিরবতার পূর্বে তার জীবিত থাকার প্রমাণও ওসমানী সাহেবকে দিতে হবে। যিয়াদের বয়স যখন চল্লিশ বছর অতিক্রম করেছে, তখন সম্ভবত আবু সুফিয়ানের ন্যায় ওবায়েদ এবং স্ত্রী সুমাইয়া উভয়ই সম্ভবত পরজগতের বাসিন্দা। আর সেই নির্বাকদেরকে প্রতিবাদ করার জন্যে স্ববাকে পরিণত করা কারও সাধ্য থাকার কথা নয়।

এর পূর্বে আমি শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী, কাযী যয়নুল আবেদীন সাহেব, মাওলানা সায়িদ আহমদ আকরাবাদী সাহেব, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সাহেবের উক্তিসমূহ এ ব্যাপারে উদ্ধৃত করেছি। এ আলোচনার

www.pathagar.com

পরিশেষে আমি মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেব নোমানীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে আলোচনাটির পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই। তিনি (নোমানী) মাহমুদ আহমদ আব্বাসীর মন্তব্যের প্রতিবাদে মাসিক 'বাইয়্যেনাত' পত্রিকায় কয়েক কিস্তিতে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিলো 'গবেষণার বেশে নাসেবিয়ত মতবাদ'। প্রবন্ধটি অনেক মূল্যবান উপকরণ সম্বলিত ছিলো। কিন্তু এক পর্যায়ে উক্ত ধারাবাহিক প্রবন্ধটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। জনাব আব্বাসী সাহেব ইবনে কুতাইবা লিখিত গ্রন্থ কিতাবুল মাআরিফ এর বরাত দিয়ে তাতে লিখেছিলেন যে, "ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের প্রচলিত বিবাহ রীতিসমূহ অনুসারে সুমাইয়ার সঙ্গে আবু সুফিয়ানের এক ধরনের বিবাহ হয়েছিলো। সেই বৈবাহিক সম্পর্কে যিয়াদের জন্ম হয়।"

এ বক্তব্যের উপর প্রতিবাদ জানিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশিদ নোমানী ১৩৮২ হিজরী সনের 'মাসিক বাইয়্যেনাত' পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে যা মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর অত্যাবশ্যকীয় অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেলো।

"একথাটি মাআরিফে ইবনে কোতাইবা গ্রন্থে উল্লেখ নেই। লেখক (জনাব আব্বাসী সাহেব) নিজের থেকে এ বাক্যটি সংযোজন করে—অযথাই ইয়াযিদের দাবী ছিলো এই যে, আমরা যিয়াদকে সাকীফ গোত্র থেকে কুরাইশ গোত্রে আর ইয়াযিদ ইবনে ওবায়েদ এর বংশ পরিচিতি থেকে হরব (আবু সুফিয়ান) ইবনে উমায়ার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। যিয়াদের মা সুমাইয়া হারেস বিন কালদাহ সাকাফীর ক্রিতদাসী ছিলো। যিয়াদের পিতা ওবায়েদ সাকীফ নামক গোত্রের ক্রিতদাস ছিলো। যিয়াদের একটি উজ্জ্বলতর অবদান এই যে, সে এক হাজার দেরহাম দিয়ে তার পিতা ওবায়েদকে মুক্ত করেছিলো। সে যেহেতু তার পিতা ওবায়েদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলো, তাই তাকে সকলে যিয়াদ ইবনে ওবায়েদ বলেই ডাকতো। এখন হয়তো সকলেই এটা বুঝে নিয়েছেন যে, ইয়াযিদের উক্তির তাৎপর্য কি ছিলো এবং যিয়াদের প্রতি কি রূপ আঘাত করছিলো। ব্যাপারটি স্পষ্ট। ইয়াযিদ প্রকাশ্যে বলতো যে, যিয়াদের ব্যাপারটি আমাদের ক্রিতদাস পোষণের কাজ। যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের বংশধর বলে আমরা তাকে উমাইয়া গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি। এ কার্যক্রমের ভিত্তিতেই যিয়াদ কুরাইশ বংশের লোক হিসাবে গণ্য হয়। অন্যথায় সে তো সাকীফ গোত্রের ওবায়েদ নামক এক ক্রিতদাসের পুত্র ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

লেখক এখানে আবু সুফিয়ানের বিবাহের দাস্তান শুনাতে বলেছেন। এটা স্পষ্ট যে, আবু সুফিয়ানের সাথে যদি যিয়াদের মায়ের বিবাহ হয়েই থাকবে, তাহলে তিনি আমরণ তার এই প্রিয় সন্তানটিকে এভাবে একটি গোলাম সন্তান

www.pathagar.com

রূপে কি করে দেখে যেতে পারলেন ? তাঁর জন্যে তো এটাই স্বাভাবিক ছিলো যে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই ব্যাপারটি হযরতের কাছে পেশ করতেন এবং প্রিয়তম সন্তানটিকে পিতৃত্বের পরিচয় দিয়ে নিজের সন্তান রূপে আপন সান্নিধ্যে নিয়ে আসতেন। কিংবা প্রথম দুই খলীফার আমলেও তো ঘটনাটি প্রকাশ করে সমস্যাটির একটি সমাধান করে যেতে পারতেন। যেমন অনুরূপ ঘটনার বেলায় এমনটি করা হয়েছে। এটা করা হলে, উক্ত বেচারার বংশ পরিচিতিটি প্রমাণিত হয়ে থাকতো। এটা কেমন আশ্চর্য ধরনের বিবাহ (লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন), যেই বিবাহের খবর না জানে বর, না জানে কনে। আর এ বিবাহ সম্পর্কের দ্বারা যেই সন্তানের জন্ম হলো তার তো সেটা জানারই কথা নয় অথচ লেখকই একমাত্র বিবাহটি সম্পর্কে জানলেন !"

মাওলানা নোমানী সাহেবের মন্তব্যটির সঙ্গে আমি শুধু এতটুকু সংযোজন করতে চাই যে, এ বিচিত্র বিবাহ এবং এর গোপন রহস্য সম্পর্কে এখন শুধু উল্লেখিত লেখকই অবহিত নয় বরং আল বালাগ সম্পাদকও। মাহমুদ আহমদ আব্বাসীর সঙ্গে তার এ একাত্মতা মোবারকবাদ।

পরিশেষে তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ 'আলকাওকাবু দুর্রী'-র একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করছি। তিরমিযীতে "হযরত হোসাইনের মর্যাদা" অধ্যায়ে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় আছে, যখন শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্তিত শির মোবারক কুফার গভর্নর (যিয়াদের পুত্র) আবদুল্লাহর কাছে নীত হয়, তখন সেই কলুষ আত্মার পাপিষ্ট নরাধমটি হযরত হোসাইনের মুখমণ্ডল এবং নাকের উপর হাতের ছড়ি দ্বারা আঘাত করেছিলো।" এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে কাওকাবু দুর্রী-র লেখক বলেছেনঃ

ولا عجب منه فيما فعله فان اباه كان ولد زنية استلحقه معاوية ولذا يقال له زياد بن ابيه -

'ইবনে যিয়াদের এহেন আচরণে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, তার পিতা যিয়াদ ছিলো অবৈধ সন্তান, যদ্দরুন তাকে যিয়াদ ইবনে আবিহী বলা হতো। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিজের ভ্রাতা বলে ঘোষণা করেন।- [আল কাওকাবু দুর্রী ইফাদাত-এ-মাওলানা রশিদ আহমদ গংগুহী, সংকলিত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া কান্ধলভী। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮৪ হিজরী, ২য় খণ্ড, ৩২৭ পৃঃ মাকতাবা-এ-ইয়াহ ইউবিয়া, মাযাহিরুল উলূম, সাহারানপুর।]

এবার মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাকী সাহেব এবং তাঁর সম্মানিত পিতা এ উক্তি এবং উক্তিকারী সম্পর্কে কি ফতোয়া প্রদান করবেন ? بينوا توجروا

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বসরার গভর্নর স্বেচ্ছাচারী ইবনে গাইলানের প্রতি প্রশ্রয়মূলক নীতি

এক ঃ 'আল বালাগ' সম্পাদক মাওলানা তাকী ওসমানীর অভিযোগ

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে কতিপয় প্রাদেশিক গভর্নর কুরআন-হাদীস বিরোধী যেসব কর্মকাণ্ড করেন, সেগুলোর প্রতি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অবস্থার প্রেক্ষাপটে যে ইশারা-ইংগীত করেন, মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব সেটিকে সমালোচনার একটি বিষয়বস্তু হিসেবে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। সমালোচনা পক্ষপাতিত্বমূলক এবং অনিরপেক্ষ হওয়াতে আমরা এর জবাবদানে প্রবৃত্ত হই। অন্যথায় এগুলোর প্রতি নজর দেয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হতো না। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বসরার গভর্নর ইবনে গাইলান সম্পর্কে লিখেছেন[১]–

"হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গভর্নরদেরকে আইনের উর্ধে স্থান দেন। তাদের যুলুম-অত্যাচারের জন্য শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তিনি স্পষ্টত অস্বীকৃতি জানান। তাঁর গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে গাইলান একবার বসরার মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় (এক আপত্তিকর বক্তব্য করায়) এক ব্যক্তি তার দিকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে। তাতে তিনি তাকে গ্রেফতার করেন এবং তার হাত কেটে দেন। অথচ শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটা হাত কাটার মতো অপরাধ ছিলো না। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এ ব্যাপারে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করা হলে তিনি বললেন, আমি বাইতুলমাল থেকে হাত কাটার দিয়ত (ক্ষতি পূরণ) আদায় করবো কিন্তু আমার শাসকদের কাছ থেকে প্রতিশোধ বা (কিসাস) গ্রহণের কোনো উপায় নেই।"

মাওলানা ওসমানী সাহেবের অভিযোগ হলো, মওদূদী সাহেবের প্রতি এ বর্ণনায় ঘটনার সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বাদ দেয়া হয়েছে। ওসমানী সাহেব ইবনে কাসীরের বাদ পড়া অংশটুকুর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ

---

১. এ অংশটুকু অনুবাদক পরবর্তী আলোচ্য বিষয় পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য করার জন্যে কিছুটা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছেন।–সম্পাদক

www.pathagar.com

"যে লোকটির হাত কেটে দেয়া হলো সে লোকটির গোত্রীয় লোকজন ইবনে গাইলানের কাছে এসে বললো ঃ আমীরুল মু'মিনীন তার হাত কাটার কারণ জানতে পারলে আমাদের সাথে হাজর বিন আদীর অনুরূপ নিপীড়নমূলক আচরণ করবেন বলে আমাদের ভয় হয়। সুতরাং আপনি একথা লিখে দেন যে, সন্দেহবশত তার হাত কাটা হয়েছে। ইবনে গাইলান তাই করলেন। সুযোগ বুঝে গোত্রের লোকেরা এ লেখাসহ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে এসে ফরিয়াদ করলো, "ইবনে গাইলান সন্দেহবশত আমাদের একজনের হাত কেটে দিয়েছেন। আমরা এর ক্ষতিপূরণ চাই।"

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমার গভর্নরদের থেকে কিসাস নেয়ার উপায় নেই, দিয়ত নিয়ে নাও। তিনি দিয়ত দিলেন এবং ইবনে গাইলানকে বরখাস্ত করলেন।"

ওসমানী সাহেব আরো লিখেছেন ঃ

'দিয়ত ও কিসাস' সম্পর্কিত শরয়ী বিধান সম্পর্কে যিনি ওয়াকিফহাল, তিনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসৃত ফায়সালার ওপর সামান্যতম অভিযোগ কিভাবে করতে পারে তা আমরা কিছুতেই ভেবে কূল পাই না। ইবনে গাইলানের লিখিত স্বীকৃতিতে দেখা যায় সন্দেহবশত লোকটির হাত কাটা হয়েছে। নিয়ম হলো—চুরির অপবাদ প্রমাণ করতে সামান্যতম সন্দেহ হলেও হাত কাটার শাস্তি স্থগিত থাকবে। সন্দেহের ফায়দাটি অভিযুক্ত ব্যক্তিই ভোগ করবে। কিন্তু ভুলক্রমে বিচারক হাত কেটে ফেললে তখন এ সন্দেহবশত ক্ষেত্রে নির্দেশ এটি নয় যে, কিসাস স্বরূপ বিচারকের হাত কাটা যাবে। কারণ সন্দেহজনক অবস্থার যে ফায়দা রয়েছে, এ ক্ষেত্রে বিচারকও সে ফায়দা পায়। তা না করে যদি এ ধরনের সিদ্ধান্তের দরুন বিচারককে শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে কেউ এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ বিচারক পদ গ্রহণে রাজী হবে না। মূলত একথাটিকেই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, "আমার গভর্নরদের কাছ থেকে 'কিসাস' গ্রহণ করার কোনো উপায় নেই।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খেলাফতে রাশেদার আদর্শ

বিষয়টির ফিকহী ও আইনানুগ দিক সম্পর্কে আলোচনা করার আগে একটি বিশেষ দিকের প্রতি ওসমানী সাহেব সহ সকল পাঠকবর্গকে ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বিশেষ দিকটি হলো—নবীর যুগে এবং খেলাফতে রাশেদার যুগে গভর্নর বা প্রশাসনকে পাথর ছোড়ার ফলে কারও হাত কেটে ফেলা এবং একজন গভর্নর কর্তৃক নিছক পদচ্যুতির ভয়ে লিখিত

www.pathagar.com

আকারে জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা কি কল্পনা করা যায় ? সে যুগের যে চিরভাস্কর চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠে তাহলো—একবার বিশ্ব নবীর খুতবাদানের সময় একজন লোক দাঁড়িয়ে তার প্রতিবেশীর আটক হওয়ার অপরাধ সম্বলিত একটি প্রশ্ন করেন। তিনি তিনবার এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। মদীনার কোতওয়াল এর জবাব দিবে এ আশায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবদানে ক্ষান্ত ছিলেন। তাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা কোনো সাহাবী তাকে থামিয়ে বা বসিয়ে দেননি। রাসূল বললেন ঃ

خلّوا جيرانه "তাঁর প্রতিবেশীদেরকে ছেড়ে দাও।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো অমিত তেজী, দিগ্বিজয়ী পরাক্রমশালী মহাশাসককেও খুতবাদানের সময় গায়ের বড় জামা তৈরির অর্থ কোথায় পেলেন, কোত্থেকে অতিরিক্ত কাপড় আনলেন—এমন ধরনের তুচ্ছ বিষয়ের ব্যাপারেও জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের সেই আদর্শ মুসলিম শাসক কোনোরূপ উষ্মা প্রকাশ না করে দ্বিধাহীন চিত্তে সহাস্য বদনে সব প্রশ্নের জবাব ধৈর্য সহকারে প্রদান করতেন। যদি কেউ আপত্তি উত্থাপনকারী হিসেবে আসতেন তাহলে তিনি বলতেন ঃ তাকে আপত্তি উত্থাপন করতে দাও ; যদি তারা আমার প্রতিবাদ না করে তাহলে তাতে কারও কল্যাণ বা অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে। তাদের কারও প্রতিবাদকে খারাপ মনে করা আমার জন্যেই অকল্যাণকর।

মিসর বিজয়ী এবং সেদেশের গভর্নর হযরত আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে মুহাম্মদ একজন মিসরবাসীকে চাবুক মেরে ছিলো। লোকটি মদীনায় এসে অভিযোগ করলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহাম্মদ ও তাঁর পিতাকে মদীনায় তলব করেন। সব বৃত্তান্ত শোনার পর মিসরীয় লোকটির হাতে চাবুক দিয়ে তিনি বললেন ঃ এবার বাপের ছেলেকে চাবুক মেরে প্রতিশোধ নাও। ছেলেকে মারার পর তিনি বললেন ঃ বাবাকেও ক'ঘা লাগিয়ে দাও।' মিসরীয় লোকটি বললো ঃ আমার প্রতিশোধ হয়ে গেছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ এটা তোমার ইচ্ছা। অন্যথায় পিতাকেও সমুচিত শিক্ষা দিতে আমি তোমার জন্যে বাধা হতাম না।[১] তারপর ছেলের পরিবর্তে বাপকে উদ্দেশ করে অত্যন্ত কড়া ভাষায় তিনি বললেন ঃ

১. এক জঘন্য অন্যায় করায় খলীফা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বহস্তে নিজের ছেলে আবু শাহমাকে ইসলামী বিধান মতে দোররা মেরেছিলেন। সেই বেত্রদণ্ডে তাঁর পুত্রের মৃত্যু ঘটেছিলো। পৃথিবীতে ন্যায়বিচারের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আছে কি ?

www.pathagar.com

متى تعبد تم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارًا ؟

"তোমরা কখন থেকে লোকদেরকে গোলাম বানিয়েছো, অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন হিসেবেই তো জন্ম দিয়েছেন।"

এই ছিলো ইসলামের আদর্শ শাসক ফারুকে আযমের চরিত্র ও তাঁর শাসন বৈশিষ্ট্য।

তবকাতে ইবনে সায়াদে (খঃ ১ পৃঃ–৩৭৪ ذكر اعطائه القود من نفسه صلى الله عليه وسلم) হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর ইবনুল আসের অপর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ আছে। ঘটনাটি হলো—একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় গেলে সেখানকার আমীর কর্তৃক প্রহৃত একজন লোক খলীফা সমীপে এসে অভিযোগ করলো। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত আমীরের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ আপনি কি প্রতিশোধ গ্রহণে লেগেছেন ? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ হ্যাঁ ! তাতে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ তাহলে আমরা আর আপনার কর্মকর্তা হবো না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন ঃ তাতে আমার মোটেও পরওয়া নেই। আমি কি এ আমীরের কাছ থেকে কিসাস নেব না ? খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে কিসাসের জন্যে পেশ করেছেন। (يعطى القود من نفسه) হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেদেরকে এমনিভাবে কিসাসের জন্যে পেশ করার কথা সায়ীদ বিন মুসাইয়েবের বর্ণনায় উল্লেখ আছে।

স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্বাকে কিসাসের জন্যে পেশ করার ঘটনা সর্বজনবিদিত সত্য। আবু দাউদের 'আদাব' অধ্যায় এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ এর প্রমাণ। যেমন, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসাইদ বিন হোদাইরের বাহুতে লাঠি দিয়ে আঘাত দেন। তারপর তিনি তাঁর পবিত্র জামা উত্তোলন করে উসাইদকে বললেন ঃ আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নাও।

এমনিভাবে নাসায়ী এবং আবু দাউদের 'দিয়ত' অধ্যায়ে এ ধরনের রাওয়ায়েত আছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার খুতবায় বললেন ঃ তোমাদেরকে মারপিট করা কিংবা সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে আমি আমার কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগ করিনি। যদি কারো উপর তারা যুলুম করে তাহলে আমার কাছে

www.pathagar.com

অভিযোগ করতে হবে, আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবো। হযরত আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন : কোনো প্রশাসক জনগণকে শিক্ষামূলক শাস্তি দিলেও কি আপনি প্রতিশোধ নিবেন ? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন :

ای والذی نفسی بیده الا اقصه منه وقد رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اقص من نفسه -

"হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি। আমি অবশ্যই কিসাস নেবো। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে কিসাসের জন্যে পেশ করতে আমি দেখেছি।"

রাজতন্ত্রের পরিবর্তিত অবস্থা

আমি মনে করি, কিছু সময়ের জন্যে ফিকাহভিত্তিক দলিল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দু'টি শাসনকালের পরিবর্তিত অবস্থার কথা চিন্তা করলেই খেলাফত ও রাজতন্ত্রের আকাশ-পাতাল ব্যবধানের কথাটি বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকবে না। 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' বইয়ের লেখক উভয়ের পার্থক্যজনিত এই ধ্রুব সত্যটি সকলের মনে গেঁথে দিতে চান। নবুওয়াত ও পরবর্তী খেলাফতে রাশেদার যুগে কোনো গভর্নর কিংবা কর্মকর্তা লঘু অপরাধে গুরু দণ্ডের এমন দুঃসাহস দেখাতে সাহস করেননি যে, ঢিল বা পাথর নিক্ষেপের অপরাধে কারও হাত কেটে দিয়েছেন। এরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাবার বিষয়টি ধরে নিলেও পরবর্তীতে এ ঘটনার জের বা ধারাবাহিকতা চলতো না। যাতে আরও যুলুম-নিপীড়নের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেতো। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ তিক্ত বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ না দিলেও জনাব তাকী ওসমানী নিজেই সে ঐতিহাসিক ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

ইতিহাস বলছে, লোকটির হাত কর্তনের পর তার স্বগোত্রীয় লোকজন গিয়ে গভর্নরের কাছে এ মর্মে আবেদন জানালো যে, দেখুন হুজুর ! আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি এটা জানতে পারে যে, তাঁর কর্মচারীকে ঢিল বা পাথর নিক্ষেপের অপরাধে ঐ ব্যক্তিকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হয়েছে, তাহলে (তার প্রতি লঘু অপরাধে এ গুরুদণ্ডের জন্যে সহানুভূতিশীল হওয়াতো দূরের কথা বরং) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও তার গোত্রের লোকদের সাথে হুজার বিন আদি এবং তাঁর সাথীদের অনুরূপ নির্মম আচরণই করা হবে। অর্থাৎ হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের যেই পরিণতি হয়েছিলো, এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। হাত কাটার উপরও তাকে আরও অধিক শাস্তি দেয়া

www.pathagar.com

হবে এবং এ সঙ্গে আমরা যারা তার গোত্রের লোক আছি, আমাদের উপরও চরম যুলুম-নিপীড়ন চলবে। সুতরাং তার হাত কাটার শাস্তিটি সরকারী কর্মচারীকে ঢিল মারার অভিযোগে না বলে অন্য কিছু লিখলেই ভালো হয়।

ঐ সকল লোকের এটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, পরিস্থিতি এমন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অংগুলি প্রদর্শন করলেও কারও নিস্তার নেই। বলা বাহুল্য, প্রতিপক্ষের ব্যাপারে দমননীতি অতীব কঠোর না হলে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দরবারে সরাসরি উপস্থিত শাস্তির নামে উক্ত বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ না করার কোনোই কারণ ছিলো না। কিন্তু ঘটলো তার বিপরীত—গরীব বেচারার হাত কাটার পর গোত্রীয় লোকেরা হাতের কথাটি ভুলে গিয়ে উল্টো খান্দানের সকল মানুষের জীবন রক্ষার প্রশ্নে চিন্তায় পড়ে গেলো। কেননা তারা জানতো, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ করে অন্যায় শাস্তিদানের জন্যে গভর্নরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা বরং তিনি যদি জানতে পারেন যে, তাঁর কর্মচারীর প্রতি ঢিলা বা পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাহলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। এ কারণে তারা গভর্নরের কাছ থেকে একটি মিথ্যা দলীল লিখিয়ে নেয়। তাতে লেখা হয় গভর্নর বা রাষ্ট্রীয় কোনো কর্মচারীর প্রতি অসদাচরণের জন্যে তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হয়নি বরং অন্য অপরাধের শাস্তি হিসাবে তার হাতকাটা হয়েছে। কিন্তু এটাও সন্দেহের উর্ধে ছিলো না। এ লিখিত দলিল দ্বারা অপরাধী ও তার আত্মীয়-স্বজনের জীবন তো রক্ষা পেলো, কিন্তু অপরদিকে গভর্নরের নিজের লিখিত এ স্বীকৃতি থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এটা প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, তিনি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একজন লোককে 'হদ' দণ্ডবিধি প্রদান করে শরীয়াত পরিপন্থী কাজ করেছেন।

বিচারের নিয়মাবলী

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবর্তে যদি খেলাফতে রাশেদার কোনো গভর্নর কর্তৃক এ ধরনের ঘটনা ঘটতো তাহলে ঘটনাটির জন্যে এরূপ লিখিত কোনো কারসাজিরই প্রয়োজন হতো না। আর এ ধরনের কোনো লেখা তৎকালীন খলীফার সামনে উপস্থাপিত হবার কথা ধরে নিলেও, এটা নির্ঘাত ছিলো যে, খলীফা বিষয়বস্তুটির চুলচেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এর গভীরে গিয়েই প্রকৃত সত্য উদঘাটনে সচেষ্ট হতেন এবং প্রকৃতপক্ষে এটা চুরি বা অপর কোনো অপরাধ ছিলো কিনা তা দেখে নিতেন। তাতে সন্দেহের কিছু থাকলেও কি ধরনের সন্দেহ ছিলো, আবার সন্দেহটির পেছনে কোনো সংগত কারণ ছিলো কিনা অথবা সন্দেহ থাকায় এর সুযোগ কি বিচারক ও অভিযুক্ত উভয়ই

www.pathagar.com

পাবে, না কেবলমাত্র একজনই পাবে ? তা দেখে নিতেন। আর যদি বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষই নিজেদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলক কোনো লেখা খলীফার সামনে তুলে ধরতো, তাহলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার আগে বিষয়টি সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যানুসন্ধান নেয়ার পথে খলীফাকে কোনো কিছুই বারণ করতে পারতো না। ঘটনার সামান্য বিশ্লেষণে শুরুতেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যিনি হাত কাটার দণ্ড দিলেন, তিনি নিজেই এই কেসের একপক্ষ। শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত দেয়া এবং দণ্ড প্রয়োগ করার কোনোই অধিকার নেই। পাথর বা ঢিলা নিক্ষেপকারী অপরাধীকে বিচারক কিংবা অন্য কোনো প্রশাসকের কাছে সোপর্দ করাই ছিলো তার উচিত কাজ। একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে খোদ গিয়ে হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বিচার প্রার্থী হয়ে ছিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম সারাখসী 'মাবসুত' গ্রন্থে (বিচারকের নিয়মাবলী সম্পর্কে) বলেছেন ঃ

فيه دليل على ان الامام لايكون قاضيا فى حق نفسه -

"ইমাম বা রাষ্ট্রীয় নেতা নিজে তার নিজের ব্যাপারে বিচারক না হওয়ার এটা একটি দলিল।"

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফাকে বললেন ঃ আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হতো। জবাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ বিচার কারো কাছে হেঁটে যায় না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য একটি বসার আসন পেশ করা হলে তিনি বললেন ঃ هذا اول جورك 'এটা তোমার প্রথম অবিচার।' কারণ, তোমার ন্যায় বিচারের পথে আমার প্রতি তোমার সম্মানবোধ মস্তবড় প্রতিবন্ধক। খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হলফ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে হযরত যায়েদ (রা) বললেন ঃ ওবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু মাফ করে দিলে কতইনা ভালো হতো। কিন্তু হযরত ওমর হলফ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। এভাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কতিপয় ক্ষেত্রে কাজী শুরাইহ এবং অপরাপর বিচারকের আদালতে হাজির হয়ে সত্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলা করতে জুবাইর বিন মুতইমের আদালতে হাজির হন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি লৌহ বর্মের ব্যাপারে এক ইহুদীর বিরুদ্ধে কাযী সুরাইহের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করেন। মোকদ্দমায় স্বীয় দাস কানবার এবং আপন পুত্র হাসানের সাক্ষ্য পেশ করা হলে বিচারক পিতার স্বপক্ষে পুত্রের, মনীবের স্বপক্ষে দাসের সাক্ষী আইনত অগ্রাহ্য বলে মামলাটি খারিজ করে দেন।

www.pathagar.com

ইবনে কুদামা 'আল মুগনী' গ্রন্থের ১১ খণ্ডের ৪৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ ليس للحاكم ان يحكم لنفسه كما لايجوز ان يشهد لنفسه "বিচারক নিজের ব্যাপারে কোনো আইনানুগ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না ; তেমনি সে নিজের আদালতে নিজের ব্যাপারে সাক্ষীও হতে পারে না।"

ফতওয়ায়ে আলমগীরির বিচার কার্যের নিয়ম বিধি অধ্যায়েও এ বিধান লেখা আছে যে, মানুষ নিজে নিজের স্বপক্ষে বিচার করতে পারে না। আর করলেও তা কার্যকর হবে না। (لاينفذ قضاؤه) এ ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ لايحكم الحاكم وهو غضبان "ক্রোধ অবস্থায় বিচারকের বিচার না করা উচিত।"

বলাবাহুল্য, গভর্নরের ক্রোধোত্তেজিত হওয়া, তার এ কাজ থেকেই প্রমাণিত যে, তিনি পাথর টুকরা নিক্ষেপের অপরাধে নিজেই হাত কাটার দণ্ডটি প্রয়োগ করেছিলেন।

দণ্ডবিধি জারীর ক্ষেত্রে সন্দেহের প্রয়োগ

এ ব্যাপারে সামান্যতম অনুসন্ধান কার্য চালালেই এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়তো যে, হাত কাটার ব্যাপারটি ছিলো এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতর আচরণ। ফকীহদের পরিভাষায় যে অবস্থায় সন্দেহের দরুন 'হদ' দণ্ডবিধি বা শাস্তির আইন প্রয়োগ করার শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে, তার সঙ্গে এ ব্যাপারটির দূরতম সম্পর্কও ছিলো না। চুরি করার অপরাধে হাত কাটার ব্যাপারে সন্দেহের যতগুলো দিক ও ক্ষেত্রের সম্ভাবনা আছে স্বয়ং ফকীহগণ সেগুলোর সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে গেছেন। যেমন, কারো অরক্ষিত মাল চুরি করা কিংবা চোরাই মালের মালিকানায় তার নিজেরও অংশ থাকা অথবা চোরাই মাল এতোটা স্বল্প মূল্যের হওয়া, যা নিসাব পরিমাণ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ কিংবা বিতর্কের সুযোগ থাকে। পাথর নিক্ষেপের অপরাধে হাত কাটার ঘটনাকে কোনোক্রমেই ফকীহদের ব্যবহৃত পরিভাষা 'সন্দেহ' এর আওতায় নেয়া যায় না। এ কারণেই ইবনে জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে (খঃ ৪, পৃঃ ২২৩) এ ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে—انه قطع على شبهة وامر لم يضح "সন্দেহ বশত এমন অবস্থায় হাত কাটা হয় যা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি।" তারপর বনী দাব্বার গোত্রীয় লোকেরা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে লেখাটি পেশ করে নিম্নোক্ত ভাষায় নিজেদের বক্তব্য পেশ করে। বক্তব্যটি হলো ঃ انه قطع صاحبنا ظلما "এ গভর্নর অন্যায়ভাবে আমাদের সাথীর হাত কেটে দিয়েছে।"

www.pathagar.com

ইবনে খালদুন তার ইতিহাস গ্রন্থে যেখানে ঘটনাটির উদ্ধৃত করেছেন, (খঃ ৩, পৃঃ ১৫) তিনি সেখানে শোবাহ্ সন্দেহ শব্দের ব্যবহারই করেননি। বরং তার মতে মূল ভাষা ছিলো এরূপ– انه قطع على امر لم يصح। (ঘটনা বিশ্লেষণ না করেই হাত কেটে দেন।) গোত্রের লোকেরা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে মৌখিকভাবে যে বর্ণনা দেন তা ছিলো এরূপ ঃ ان ابن غيلان قطع صاحبهم ظلما (গভর্নর ইবনে গাইলান অন্যায়ভাবে তাদের সাক্ষীর হাত কেটে দিয়েছে। তারপর তো একথাও বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা গোপন ছিলো এবং এর রহস্য উদঘাটনের জন্যে দীর্ঘ মেয়াদী অনুসন্ধানের দরকার ছিলো। এটা বাস্তবিকই বড় বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমীরে মুয়াবিয়ার কাছে সন্দেহ ভুল কিংবা অন্যায়ভাবে হাত কাটার কোনো লিখিত মোকদ্দমা পেশ করা হলো কিন্তু তিনি সে ভুল বা অন্যায়ের ধরন জানার জন্যে আদৌ চেষ্টা করেননি।

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী বলেন, সন্দেহবশত হাত কেটে দেয়া নিসন্দেহে একটি মারাত্মক ভুল। তবে তাই বলে কেউ এ হুকুম দেয় না যে, এ ব্যাপারে বিচারকের 'কিসাস' দণ্ডের ক্ষেত্রে তার হাতও কেটে দিতে হবে। কারণ, সন্দেহের ক্ষেত্রে যেমন অভিযুক্ত সুবিধা পায় তদ্রূপ বিচারকও সেই সুবিধা পায়। জনাব ওসমানীর মতে এর অপর সুবিধাটি হলো এই যে, বিচারকদের এরূপ ভুল সিদ্ধান্তের কারণে যদি বিচারকগণ দণ্ডিত হন, তাহলে এ গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণে কেউ রাজী হবে না। ওসমানী সাহেব এ ক্ষেত্রে শরয়ী আহকাম ও ফকীহদের মতামতের সম্পূর্ণ ভুল ভাষ্য প্রদান করেছেন। তার পেশকৃত দলিলটি যেমন খোঁড়া তেমনি ভ্রান্তি মিশ্রিত ও স্বকপোলকল্পিত। আলোচ্য ঘটনায় বর্ণিত অপরাধীর এমন অপরাধ ছিলো না যাতে হাত কাটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। পরন্তু তার কাজটি সন্দেহ যুক্তও ছিলো না। রাহাজানী কিংবা সন্ত্রাসমূলক বিদ্রোহী তৎপরতা অথবা চৌর্যবৃত্তির অপরাধ জনিত কাজে অপরাধী সাব্যস্ত হলে পর হাত কাটার দণ্ডবিধি নির্ধারিত রয়েছে। এখানে যার হাত কেটে দেয়া হয়েছে সে ছিলো নিরপরাধ ; জ্ঞাতসারে ইচ্ছাকৃতভাবে তার হাত কাটা হয়েছে। সুতরাং অপরাধী ও গভর্নর কারো কাজেই সন্দেহের কোনো দখল ছিলো না এবং শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী গভর্নর কিছুতেই কিসাস বা প্রতিশোধ নেয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন না।

সন্দেহজনক ঘটনার আইনগত সুবিধা

এ বিষয়ে সুনানে তিরমিযির দণ্ডবিধি অধ্যায়ে এবং অন্যান্য স্থানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ....

"যতোটা সম্ভব মুসলমানদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দাও। রক্ষা করার যদি কোনো উপায় থাকে, তাহলে অভিযুক্তকে ছেড়ে দাও। ভুলবশতঃ সাজা দেয়ার তুলনায় বিচারকের ভুলক্রমে ক্ষমা করে দেয়া উত্তম।"

আবু দাউদের 'কিতাবুল আদাবে' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হলো ঃ

ان الامير اذا ابتغى الريبة فى الناس فسدهم-

"নেতা বা প্রশাসক জনগণের মধ্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি অনুসন্ধানে লেগে গেলে প্রকারান্তরে সে নিজেই জনগণের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে দেয়।"

এসব বাণীর আলোকে বিচারে সন্দেহজনক ক্ষেত্রে সুবিধা লাভের প্রকৃত অধিকারী অভিযুক্ত বিচারক নয়। তবে একথা কার্যক্ষেত্রে স্বীকৃত যে, একজন প্রশাসক বা বিচারক স্বীয় সিদ্ধান্তে অপর মানুষের মতোই ভুল করতে পারেন এবং তিনি বৈধ নিরাপত্তার অধিকারী। প্রশাসক কিংবা বিচারক তার ব্যবস্থামূলক কিংবা আইনানুগ ক্ষমতাসমূহ আন্তরিকতা ও যথাযথভাবে প্রয়োগ করার পরও যদি নিজের অজান্তে ও অলক্ষ্যে ভুল হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে তিনি অনুগ্রহ ও সুযোগ পেতে পারেন। তবে এর তাৎপর্য আদৌ এটা নয় যে, তিনি নিজের ব্যাপারে কোনো অপরাধ করবেন কিংবা অন্যায়ভাবে প্রতিশোধমূলক তৎপরতা চালাবেন অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করতে থাকবেন, আর তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। অবশ্য ফকীহগণ এটা লিখেছেন যে, ইমাম কিংবা বিচারপতি অনিচ্ছাকৃত ভুলে কিসাস কিংবা দণ্ডবিধি জারী করলে তজ্জন্য তাকে জবাবদিহি ও পাল্টা শাস্তি দান করা যাবে না। কারণ হিসাবে তাঁরা বলেছেন, যেহেতু বিচারক তাঁর নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত নয়। সুতরাং তিনি যে সিদ্ধান্তই দিবেন তা সাধারণ অবস্থায় অবশ্যই বাদী বিবাদী ও সাধারণ মুসলমানদের মংগলকে কেন্দ্র করেই হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে অন্যায় ও অবিচারের লেশমাত্র থাকবে না।[১] এখন একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কেউ ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে কারো হাত কেটে দিলে তজ্জন্য তাকে আইনের উল্লেখিত সুবিধা পাওয়ার উপযোগী মনে করা

---

১. ইমাম কাসানী বাদায়ে গ্রন্থের ৭ খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় 'বিচারকের ভুল সিদ্ধান্তের বর্ণনা' অধ্যায়ে বলেছেন ঃ لانه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره বিচারকের ভুল ধর্তব্য নয়। কেননা তিনি নিজের জন্যে ফায়সালা দেন না, তিনি সিদ্ধান্ত দেন জনগণের কল্যাণের জন্যে।

www.pathagar.com

সঙ্গত নয়। কারণ, "ব্যক্তিগত আক্রোশ" চরিতার্থ করা আর ন্যায়বিচার তো এক কথা নয়। এ কাজের সাথে বিচারকসুলভ ফকীহ্গণ একথাও লিখেছেন, যদিও এর সাথে বিচার বিভাগীয় ফায়সালার কোনো সম্পর্ক নেই—এটি আইন ও বিচার সংক্রান্ত সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কাজেই তাকে কি করে রেয়াত করা যেতে পারে? ইসলামী আইন শাস্ত্রে পারদর্শীরাতো এতদূর লিখে গেছেন যে, বিচারপতি কোনোরূপ অন্যায় অবিচারের আশ্রয় গ্রহণ করলে, তাকে শুধুমাত্র বরখাস্ত করলেই চলবে না বরং শাস্তি ও জরিমানা তার উপর বলবৎ হবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন 'রুদ্দুল মুখতার' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪৭৪ পৃষ্ঠায় শামী আলমগীরীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ

وان كان القضاء بالجور عن عمدٍ اقربه فالضمان فى ماله فى الوجوه كلها بالجناية والاتلاف ويعزّ والقضاضى و يعزل عن القضاء ـ

"অর্থাৎ আইনের ক্ষেত্রে সন্দেহের ফায়দা যেমন অপরাধী পাবে তেমনি বিচারকও সন্দেহ দ্বারা উপকৃত হবেন—এমন আজব নীতি তাকী ওসমানী সাহেব কুরআন-হাদীস কিংবা ফিকাহ্র কিতাবের কোন্ জায়গা থেকে সংগ্রহ করলেন তা আমাদের অজানা।"

(গভর্নর) ইবনে গাইলানকে শুধুমাত্র বরখাস্ত[১] করা ইসলামী ন্যায় বিচারের দাবীকে কতটুকু পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং "আমার গভর্নরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ নেই"—আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর একথাও কতদূর যুক্তিগ্রাহ্য ও ন্যায়সংগত সে সম্পর্কে এখন একজন ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধানী লোক নিজে চিন্তা করে সঠিক মতে পৌঁছতে পারবে। তারপর 'আল বালাগ' সম্পাদক এ বিষয়ে যে অতিরিক্ত তত্ত্বের সংযোজন করেছেন তাতে বুঝা যায় প্রত্যেক গভর্নর কিংবা ব্যবস্থাপনা অফিসার লুটপাট বা আত্মসাৎ যা ইচ্ছা তাই করুক তাদের জন্যে তা জায়েয। পরবর্তীতে সন্দেহ বশত এসব করা বা হওয়ার কথা লিখে নিলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। বড়জোর বলপ্রয়োগে অবসর গ্রহণ করার মতো দণ্ড ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেয়া যাবে না।

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামল ও ইবনে কুদামার অভিমত

ইবনে গাইলানের অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে যায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে। ঘটনার উল্লেখ করে বিষয়বস্তুর ইতি

১. মারওয়ানকেও তো আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বরখাস্ত করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা, এ বরখাস্তও ছিলো ভ্রান্ত তৎপরতার কারণে। কিন্তু দীর্ঘ আট বছর ব্যাপী নবীর পবিত্র শিয়রে বসে যে অপকর্মে লিপ্ত ছিলো তাকি শুধুমাত্র বরখাস্ত করায় পূরণ করা সম্ভব?

www.pathagar.com

টানা অত্যন্ত প্রাসংগিক মনে করে ঘটনাটি এখানে বিবৃত হলো। প্রখ্যাত হাম্বলী ফকীহ ইবনে কুদামাহ এ ঘটনা থেকে প্রমাণ করেছেন যে, 'কিসাস' থেকে কোনো ব্যক্তিত্বই অব্যাহতি পাবে না। তিনি আল মুগনীতে বলেছেন ঃ

ويجرى القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الايات والاخبار وان المؤمنين تتكافاء ومـاء هم ولا نعلم فى هذا اخلافًا وثبت عن ابى بكر رضـ انه قال لرجل شكى اليه انه قطع يده ظلما لئن كنت صادقا لاقيدك منه ـ

"আমীর, রাজা, প্রজা, ধনী-গরীব, মালিক-শ্রমিক সকলের জন্য কিসাস বিধান প্রযোজ্য হবে। কেননা এতদসংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর মধ্যে এ সবের কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। মু'মিনের রক্ত বা জীবনকে খুবই মূল্যায়ন করা হয়েছে। এর ব্যতিক্রম কোনো কিছু আমাদের জানা নেই। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রমাণিত, এক ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তার হস্ত অন্যায়ভাবে কর্তিত হওয়ার অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ তোমার কথা সত্য হলে আমি কর্তনকারী প্রশাসকের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। (المغنى الابن قدامه ৯ম খণ্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, মিসর, ১৩৪৮ সাল।)

আবদুর রহমান ইবনে কুদামাহ প্রণীত 'শরহে কবীর' গ্রন্থের ৩৮২ পৃষ্ঠায় প্রায় অনুরূপ বাক্য ও দলিলের কথা উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থে انه قطع يده ظلما (অন্যায়ভাবে তার হাত কাটা হয়েছে) বাক্যটি রয়েছে। আর এ বাক্যটিই বনু দাব্বার লোকেরা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পেশ করেছিলো। তাবারী ও অন্যান্য গ্রন্থে একথার উল্লেখ আছে। এতো কিছু দলিল-প্রমাণের পরও একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গভর্নর কিসাস থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন কিনা তা যে কোনো লোক সহজেই অনুমান করতে সক্ষম।

অপরাধী গভর্নরদের বিনা বিচারে অব্যাহতি দান প্রসঙ্গ

ইবনে গাইলানের ঘটনার ব্যাপারে 'আল বালাগ' সম্পাদক তাকী ওসমানী সাহেবের প্রতিটি অভিযোগ ও যুক্তির জবাব আমি স্ববিস্তারে দিয়েছি। সেগুলোর প্রতি মোটেই গ্রাহ্য না করে তিনি আবার লিখলেন ঃ

"এ ঘটনার মূল উৎস 'আল বেদায়ার' উদ্ধৃতি দিয়ে আমি প্রমাণ করেছি যে, হাতকাটা ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনগণ ইবনে গাইলানকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় যে, হাকিম তথা বিচারক সন্দেহবশতঃ তার হাত কেটে দেন। সুতরাং

www.pathagar.com

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে স্বয়ং ফরিয়াদীদের পেশকৃত মোকদ্দমার অবস্থা এবং স্বয়ং বিচারকের লিখিত স্বীকৃতিতে একথাই বুঝা যায় যে, ইবনে গাইলান সন্দেহ বশতঃ এক ব্যক্তির হাত কেটে দেন।"

পাঠকবর্গ মুহাম্মদ তাকী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য পড়ে যেন এটা মনে না করেন যে, ঘটনায় বর্ণিত বিচারক এবং ইবনে গাইলান দু'জন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। আসলে ইবনে গাইলান আর গভর্নর একই ব্যক্তি যিনি শুধু কংকর নিক্ষেপের অপরাধে অন্যায়ভাবে এক ব্যক্তির হাত কেটে দিয়েছিলেন। আবার ইনিই সেই পাষণ্ড বিচারক ইবনে গাইলান যিনি হাত কাটার ঘটনাটি সন্দেহ বশত ঘটেছিলো বলে মিথ্যা কথা লিখে দেন যে, ভুলবশতঃ আমিই তার হাত কেটে দিয়েছিলাম।

মাওলানা তাকী সাহেব আরো লিখলেন, সন্দেহবশতঃ হাত কাটা নিসন্দেহে মারাত্মক ভুল। কিন্তু তাই বলে বিশ্বাস স্বরূপ বিচারকের হাত কেটে দেয়ার কথা কেউ বলেননি।১ আমি আগেও এর জবাবে স্ববিস্তারে বলেছি, যে ব্যক্তি লোকটিকে হাত কাটার শাস্তি দিলো, সে নিজেই এ মুকাদ্দমার একটি পক্ষ। সুতরাং শরীয়াতের দৃষ্টিতে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দণ্ডবিধি জারী করার অধিকার তার আদৌ ছিলো না। অধিকন্তু তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যেই শুধু নিছক কংকর নিক্ষেপের অভিযোগে লোকটির হাত কেটে দেন। অথচ রাসূলের সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, ক্রোধাবস্থায় কোনো বিচারকের সিদ্ধান্ত নেয়া কিছুতেই উচিত নয়। আমি আরো প্রমাণ করেছি, এ কাজ কোনো অবস্থাতেই ইসলামী আইনবিদ ফকীহ মুজতাহিদদের পরিভাষা 'সন্দেহ' শব্দের আওতায় পড়ে না। আমি আমার মতের স্বপক্ষে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও খেলাফতে রাশেদার কতিপয় উদাহরণও পেশ করেছি। তাকী সাহেব একথার মন্তব্যে লিখেছেন ঃ

"আমার দলিলের জবাবে মালেক সাহেবের প্রদত্ত আলোচনা অপ্রাসংগিক কথার বেদানাদায়ক উদাহরণ বৈকি ! তিনি ৩/৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী খেলাফতে রাশেদার ন্যায়নিষ্ঠার বিভিন্ন ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত সঠিক ও উঁচুমানের হওয়ার ব্যাপারে কারো অস্বীকৃতি করার উপায় নেই। কথা তো হচ্ছিলো—"হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে ফায়সালাকে "আইনের সার্বভৌমত্বের সমাপ্তি এবং শরীয়াত বিরোধী" সাব্যস্ত করা হয়েছে সেটাকে শরয়ী আইনের দৃষ্টিতে কেমন করে ভুল বলা যেতে পারে ?"

১. এটা বিচারক যখন বিচার বিভাগীয় বিধিমালা মেনে চলে এবং ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহা ও ব্যক্তি গোষ্ঠীগত স্বার্থ প্রবণতার উর্ধে থেকে রায় দেয়। তার ব্যতিক্রম হলে বিচারকের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

www.pathagar.com

অপ্রাসংগিক আলোচনার নমুনা

ওসমানী সাহেবের এ লেখাটি পড়ার আগে আমি ক্ষণিকের জন্যও একথা কল্পনা করতে পারিনি যে, বিচার ও আইন-আদালত বিষয় সম্পর্কে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব বাণী এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যেসব উক্তি ও বাস্তব নমুনা বর্ণনা করেছি, সেগুলোকে কেউ অপ্রাসংগিক আলোচনার বেদনাদায়ক নমুনা বলে গণ্য করার দুঃসাহস দেখাবে। তবে এখন জানলাম, সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের দাবীদার কিছু লোক মৌখিকভাবে কুরআন, হাদীস ও খেলাফতে রাশেদার ফায়সালাকে সর্বোচ্চ মানদণ্ড হওয়ার কথা স্বীকার করলেও বিশেষ কোনো সাহাবীর ফায়সালা সেই মানদণ্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও তারা সেই ফায়সালাটিকেই সঠিক বলে বেড়ান। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনাকালে আমার সবসময়ের জন্য নিয়ম ছিলো, প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আমি প্রথমত কুরআন ও হাদীসের স্মরণাপন্ন হয়েছি, খেলাফতে রাশেদার কার্যাবলীও সামনে রেখেছি। এখনো আমি সেসব দাবীদারদের মুকাবিলায় আমার আলোচনা পদ্ধতি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত। এখনও আমি বলছি, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তিটি (আমার গভর্নরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার কোনো সুযোগ নেই) শরীয়াতের আইনের আলোকে সঠিক নয় বরং বেঠিক[১] অনৈসলামী

---

১. কারণ, ইসলামী বিধান মতে শাসক প্রজা, গরীব-ধনী, কেউ আইনের উর্ধে নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন : "ওহে ঈমানদাররা! হত্যার ক্ষেত্রে তোমাদের উপর কিসাস ফরয করা হয়েছে।" এছাড়া খোদ আল্লাহর রাসূল এবং খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেদেরকে এবং নিজেদের গভর্নরদেরকে কখনও আইনের উর্ধে মনে করতেন না। যেমন, ফজল বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (অসুস্থ অবস্থায়) ভর দিয়ে মিম্বারে বসার জন্যে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। লোকদের একত্র করার পর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন : লোক সকল ! আমার উপর তোমাদের কতিপয় অধিকার অর্পিত হয়ে আছে। আমি তোমাদের কারও পিঠে চাবুকের আঘাত করে থাকলে আমার এ উন্মুক্ত পিঠে চাবুক লাগিয়ে কিসাস নিও। আমি কারও মানসম্মানের হানি ঘটিয়ে থাকলে আমার মানহানি ঘটিয়ে বদলা নিতে পারো। কারো মাল-সম্পদ নিয়ে থাকলে আমার এ মাল থেকে তা আদায় করে নাও। আমার পক্ষ থেকে শত্রুতা ও বিদ্বেষের কোনো আশংকা রেখো না।-(আল কামেল ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৬)

একই সূত্রে উল্লেখ আছে, কিসাসের ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একই নিয়ম ও ভূমিকার অনুসারী ছিলেন। তাঁরা উভয়ই রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে কিসাসের জন্যে পেশ করেছেন এবং জনগণকে গভর্নরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বিবাদীকে মিসর গভর্নর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ঘটনা ছাড়াও তাঁর আমলের আরেকটি প্রসিদ্ধ ঘটনাও রয়েছে। সেটি হলো, একবার কাবাঘর তাওয়াফের সময় গাসসানের যুবরাজ জাবালা বিন আইহামের লুংগী এক বেদুইনের পায়ে লেগে গেলে নওমুসলিম যুবরাজ বেদুইনকে থাপ্পড় লাগিয়ে ছিলেন। হযরত ওমর তাতে যুবরাজকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাকে থাপ্পড় মেরে তার বদলা নেয়ার জন্যে বেদুইনকে নির্দেশ দেন। এছাড়া হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আপন প্রিয় পুত্র আবু শাহমাকে নিজ হাতে কিসাস এর শাস্তিদান করেন যদ্দরুন তার মৃত্যু ঘটেছিলো। সে দৃষ্টান্ততো বিশ্ব ইতিহাসে আজও ন্যায় বিচারের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রূপে জ্বলজ্বল করছে।-সম্পাদক

www.pathagar.com

আইন ব্যবস্থায় এ ধরনের ব্যতিক্রম বৈষম্য ও পার্থক্যের সুযোগ থাকলেও ইসলামী আইনে তার অবকাশ নেই। এখানে গভর্নর, প্রশাসক, বিচারক এমনকি খোদ রাষ্ট্রপ্রধানও যদি কোনো কিসাস যোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে কিসাসের অভিভাবকের সন্তুষ্টি ও ক্ষমা ছাড়া অপরাধীর পক্ষে কিসাস থেকে অব্যাহতি পাবার কোনো উপায় নেই। আমি এ বিষয়ে আগেও লিখেছি এবং পরবর্তী আলোচনায়ও তা উল্লেখ করবো।

ওসমানী সাহেব আমার কথার জবাব দিতে গিয়ে প্রথমেও যে কথা লিখেছেন দ্বিতীয়বারও একই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেমন, উল্লেখিত ঘটনায় ফরিয়াদীগণ এবং বিবাদী গভর্নর উভয় পক্ষের কেউ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাথর নিক্ষেপ করার কথা উল্লেখ করেননি। যখন বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের আরজিই এক হয়ে গেলো, তখন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ইলমে গাইব কিভাবে পেলেন যাতে তিনি বুঝলেন মযলুম নিজে প্রকৃত ঘটনাটি গোপন রেখে বিবাদীর অপরাধকে হালকা করেছে।

প্রশ্ন জাগে, কংকর নিক্ষেপের কারণে গভর্নর হাত কেটে দেয়ার ঘটনাটি যদি দুনিয়াবাসীর 'ইলমে গাইব' সংক্রান্ত বিষয় হয়ে যেতো যা তাকী ওসমানী সাহেব বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছেন, তাহলে সকল ইতিহাসবিদ ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ এভাবে কেন দিয়ে আসছেন ? যেমন—বনু দুব্বার লোকটি গভর্নর ইবনে গাইলানের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করলে তিনি তার হাত কেটে দেয়ার নির্দেশ দেন। তারপর হাত কাটা লোকটির গোত্রীয় লোকগণ ইবনে গাইলানের কাছে এসে বললো ঃ এ ঘটনার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপ্রধান আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের সাথে হুজার বিন আদীর মতো আচরণ করবে বলে আমরা আশংকা করছি। সুতরাং আপনি এটা লিখে দেন যে, সন্দেহ বশত আপনি তাকে হাত কাটার শাস্তি দিয়েছেন। গভর্নর ইবনে গাইলান কর্তৃক এ মিথ্যা কথা লেখার পর এ অন্যায় আচরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা পর্দার অন্তরালে এমনভাবে লুকিয়ে থাকেনি, যাতে শুধুমাত্র কাগজের টুকরো ছাড়া অতিরিক্ত অনুসন্ধান করার কোনো সুযোগ কারো জন্যে অবশিষ্ট থাকেনি কিংবা অবহিত হওয়ার অপর কোনো উপায় আদৌ বাকী ছিলো না। বিষয়টি যদি সত্যিই এরূপ হতো তাহলে ঐতিহাসিকদের কাছে তার বিস্তারিত বিবরণ কিভাবে পৌঁছলো ? তারা গভর্নর ইবনে গাইলানের এ বাস্তব বিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর লেখার সাথে সাথে প্রকৃত ঘটনাও বর্ণনা করলেন কিভাবে ? সত্যিই এটা এক আশ্চর্য, কোনো ব্যক্তি এমনকি তাকী ওসমানী সাহেবও আজ পর্যন্ত এ সূক্ষ্ম বিষয়টি সম্পর্কে কেন চিন্তা করলেন না যে, এটি কি সম্ভব যে, কোনো অজানা

www.pathagar.com

ও অজ্ঞাত ব্যক্তির সন্দেহবশত হাত কেটে দেয়া সংক্রান্ত ঘটনার খবর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থাপিত হলো আর বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্যে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অতিরিক্ত তথ্য ও সঠিক অবস্থা জানার সুযোগ ছিলো না ? তাহলে এ ঘটনার বর্ণনাকারী ও বিবৃতিদানকারী অপরাপর লোকজন কোন্ ইলহাম ও কাশফের বদৌলতে আজ অবধি পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে যাচ্ছেন ?

দুই ঃ সত্য গোপন করার কারণসমূহ

আসলে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে খবর জানার খুবই উত্তম ব্যবস্থা ছিলো। তাঁর গভর্নরদের বাড়াবাড়ির ঘটনাসমূহ সর্ব সাধারণের কাছে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলো এবং পরবর্তীতে এসব ঘটনা ইতিহাসের পাতায় দ্ব্যর্থবোধক শব্দে লিখিত হয়। ইবনে গাইলানের এ ধরনের বানোয়াট লেখা যদি এসব ঘটনাকে আমীরের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে এর দু'টি কারণই সম্ভব। ঐতিহাসিকদের লেখা অনুযায়ী এর একটি হলো, হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীদের অন্যায় হত্যাকাণ্ড জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। যালেম গভর্নরদের পরিবর্তে মযলুম জনগণের উপর উল্টো বিপদ আসার ভয়ে জনসাধারণ প্রশাসকদের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের কথা প্রকাশ্যে বলার সাহস করতো না।[১] দ্বিতীয়ত

১. উল্লেখ্য যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তার গভর্নরগণ কর্তৃক খুতবায় প্রকাশ্যে মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর অভিসম্পাত দেয়া হতো এবং তাঁর প্রতি তিরস্কার বর্ষণের রেওয়াজ শুরু হলে সকল মুসলমানের অন্তর ব্যথিত হতো। কিন্তু তারা অতিকষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন এবং হত্যা বা কঠোর শাস্তির ভয়ে চুপ হয়ে থাকতেন। কুফায় হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু তা সহ্য করতে পারেননি। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিন্দার সমালোচনা শুরু করেন ও এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেন। হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু যতদিন কুফার গভর্নর ছিলেন ততদিন তিনি ব্যাপারটি এড়িয়ে চলতেন। পরে কুফাকে বসরার শাসনকর্তা যিয়াদের শাসনাধীন করা হলে সাহাবী হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে। যিয়াদ যখন জুমার দিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কারসূচক শব্দ ব্যবহার করে সমালোচনা করতো, হযরত হুজার দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করতেন। এক জুমার নামাযে বিলম্বের জন্যেও তিনি যিয়াদের সমালোচনা করেন। অবশেষে আমীরে মুয়াবিয়ার গভর্নর যিয়াদ ১২জন সঙ্গীসহ হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গ্রেফতার করে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করে। অতপর তাঁর নির্দেশে সাতজন সঙ্গীসহ হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয়। এঁদের মধ্যে আবদুর রহমান বিন হাসসানকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদের কাছে ফেরত পাঠান এবং তাকে লিখিতভাবে নির্দেশ দেন যেন, হযরত আবদুর রহমানকে নিকৃষ্টতম অর্থাৎ নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

সুতরাং লক্ষ্যণীয় যে, মাওলানা তাকী প্রমুখ যাঁরা নিজেদেরকে সাহাবা প্রেমিক বলে দাবী করেন, তারা একজন শাসক সাহাবীকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে আরেকজন বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী সাহাবীকে তাঁর সৎসাহসিকতাপূর্ণ সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে তাঁকে হত্যা করার মতো জঘন্য অপরাধটি সমর্থন করলেন। রাষ্ট্রের বিরোধিতা আর সরকারের বিরোধিতা কি এক ? সরকারকে ঠিক পথে রাখার জন্যে তো সমালোচনা জরুরী। তাই প্রশ্ন—সাহাবী বিদ্বেষের আওতায় কি এটা পড়ে না ? মাওলানা মওদূদীতো শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যাতে কেউ একে ইসলামী কাজ মনে না করে। সে ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেব সাহাবী বিদ্বেষী হন কি করে ? সাহাবী বিদ্বেষের প্রমাণতো দিচ্ছেন তারা।—সম্পাদক

www.pathagar.com

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে যে কথা যে আকারে পৌছতো কিংবা পৌছানো হতো তার চেয়ে অতিরিক্ত অনুসন্ধান কিংবা খোঁজখবর নেয়ার তিনি চেষ্টা করতেন না। কোনো মামলার তথ্য মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে অদৃশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জানা এ দুনিয়ায় কারো জন্যেই সম্ভব নয়। তবে প্রকৃত তত্ত্ব জানার জন্যে মানুষের সাম্ভাব্য সব মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করার তাঁর অবাধ সুযোগ অবশ্যই ছিলো। ধরে নিলাম, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থাপিত লেখাটি ঘটনা জানার একমাত্র মাধ্যম ছিলো। এ লেখায় হাত কেটে দেয়ার কথাটিতো ছিলো ? অবস্থার নাজুকতায় হাত কাটা অভাগা লোকটি আমীরের সামনে আসার সাহস পায়নি। স্বগোত্রীয় লোকজন তার পক্ষ থেকে সামনে উপস্থিত হয়। হাদীসের মর্মানুযায়ী ইসলামী দণ্ডবিধির সর্বস্বীকৃত বিধান হলো, বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে সামনে ডেকে তাদের জবানবন্দি কড়াকড়িভাবে নেয়ার পর সিদ্ধান্ত নেয়া। মরে যাওয়া, সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ্য হয়ে পড়া, নিখোঁজ হওয়া, অজানা দেশে চলে যাওয়া কিংবা তলব করা সত্ত্বেও হাজির না হওয়া ইত্যাকার সংগত কারণে যদি কোনো একপক্ষ আদালতে হাজির না হয়, তাহলে এরূপ অবস্থাতেই কেবল অনুপস্থিতিতে দণ্ডবিধি জারী করা জায়েয।

"সন্দেহ বশতঃ হাতটি কাটা হয়েছে"—ইবনে গাইলানের লিখিত এ শব্দগুলো ওসমানী সাহেব পৌনপুনিকভাবে উচ্চারণ করছেন, অথচ এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় ব্যবহৃত পরিভাষা 'সন্দেহ' শব্দটির প্রয়োগ আদৌ ঠিক নয়—একথা আমি প্রথমে স্ববিস্তারে আলোচনা করেছি।[১] এ কারণেই স্বয়ং

১. এটা ঠিক যে, ইসলামী আইন বিশারদ ফকীহগণের মত হলো, বিচারক ভুলবশতঃ কোনো আসামীকে শাস্তি দিলে বা কিসাস প্রয়োগ করলে, তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে বিচারকের বিরুদ্ধে কিসাস বা হদ দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু এটি কোন্ অবস্থায় ? ইসলামী আইন বিশেজ্ঞগণ তাও বলে দিয়েছেন। সেটি হলো, যখন বিচারক তার বিচার বিভাগীয় স্বীকৃত বিধিমালা অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধে থেকে ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রায় দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ইনসাফের মানদণ্ড বজায় রেখে সাধারণ জনগণের স্বার্থকে সামনে রেখে রায় ব্যক্ত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কারও হাত কেটে দেয় বা তার অন্য কোনো অঙ্গচ্ছেদন করে অথবা তাকে হত্যা করে সেটাতো কিছুতেই বিচারকসুলভ বা বিচার বিভাগীয় নিয়মবিধির আওতাধীন রায়ের সংজ্ঞায় পড়ে না। বরং এক্ষেত্রে ইসলামী আইন বিশারদ ফকীহগণের রায় হলো, বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠিত নিয়মবিধি যদি বিচারক ভঙ্গ করে এবং সেটার দ্বারা কোনো প্রকার যুলুম অত্যাচারে লিপ্ত হয়, তখন রাষ্ট্রীয় সর্বাধিনায়কের কর্তব্য হলো তাকে বরখাস্ত করা এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (রাদ্দুল মুখতার ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪৭৪) এ জাতীয় দৃষ্টান্ত খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে বহু দেখতে পাওয়া যায়।

যদি এক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সামনে রেখে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী আইনকে সর্বোচ্চে স্থান না দেয়া হয় বরং রাষ্ট্রীয় কোনো উচ্চমর্যাদার লোককে আইনের উর্ধে জ্ঞান করা হয়, তাহলে এটা দেশের শাসক গভর্নর বা প্রশাসনিক উচ্চ কর্মকর্তাদের যাবতীয় লুটপাট, শোষণ, বঞ্চনা ও যুলুম-নিপীড়নকে বৈধ বলে স্বীকার করার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। অতপর কোঁনো অন্যায় কাজের জন্যে তাদের কৈফিয়ত তলব করা যাবে না। বড়জোর চাকুরী থেকে বরখাস্ত করাকেই যথেষ্ট মনে করা হবে।—সম্পাদক

www.pathagar.com

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুও ওসমানী সাহেবের মতো এ ফিকহী সূক্ষ্মধারা পেশ করেননি যে, সন্দেহের সুযোগ গভর্নরেরও পাওয়া উচিত। বরং তিনি স্পষ্ট বললেন ঃ "আমার গভর্নরদের কাছ থেকে কিসাস নেয়ার কোনো সুযোগ নেই।" এ দু'টি কথা সম্পূর্ণ ভিন্নতর এবং একটি অপরটি থেকে আলাদা। এ দু'টি কথাকে পারস্পরিকভাবে বিমিশ্রিত করতে পারলে এটাই হতে পারে অপ্রাসংগিক আলোচনার একটি সঠিক উদাহরণ। তারপর ইবনে জারীর ৫৫ সালের আকস্মিক ঘটনাসমূহের বিবরণ দিতে গিয়ে এ ঘটনাটি যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে পরিষ্কার জানা যায় যে, হাতকাটা লোকটির গোত্রীয় লোকেরা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যে যবানবন্দী দেয় তাতে 'সন্দেহ' শব্দটি আদৌ ছিলো না। বরং 'যুল্ম' বলে তার প্রতিশোধ দাবী করে। তারীখে তাবারীর ৪র্থ খণ্ডের ২২৩ পৃষ্ঠার মূল ইবারতটি নিম্নরূপ ঃ

فقالوا يا امير المؤمنين انه قطع صاحبنا ظلما وهذا كتابه اليك وقرأ الكتاب فقال اما القود من عمالي فلا يصح ولا سبيل اليه -

তারা বললো ঃ "আমীরুল মু'মিনীন ! গভর্নর (ইবনে গাইলান) অন্যায়ভাবে আমাদের লোকটির হাত কেটে দেন। তার এ লেখা আপনার খেদমতে পেশ করলাম।" তিনি লেখাটি পড়ে বললেন, "আমার গভর্নরদের কাছ থেকে কিসাস নেয়ার কোনো উপায় ও সুযোগ নেই।"

'আল কামেল' গ্রন্থেও লেখা আছে– انه قطع ظلما অর্থাৎ অন্যায়ভাবে (গভর্নর) তার হাত কেটে দেন।

ইসলামে কিসাসের বিধান

গভর্নরের লেখায় যদিও 'সন্দেহ' শব্দটি লেখা ছিলো কিন্তু বনু দাব্বার লোকেরা তাদের যবানবন্দীতে এ শব্দটি ব্যবহার করেননি এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুও একথার উল্লেখ করেননি। তবে তিনি শুধুমাত্র এ গভর্নরের জন্যে নয় বরং তাঁর সকল গভর্নর ও কর্মকর্তাদের জন্যে তাদের কাছ থেকে কিসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ না করার একটি সঠিক আইনের বর্ণনা করেন। এখন প্রশ্ন হলো, এ আইন কুরআন হাদীসের কোন্ দলিলের ভিত্তিতে তৈরি হলো ? অপ্রাসংগিক আলোচনার মতো শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করার পরিবর্তে মুহাম্মদ তাকী সাহেবকে আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ঃ বলুন ! একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গভর্নর কি আল্লাহর এ ফরমানের ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى এবং وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ সম্বোধিত ব্যক্তি নয় ? তিনি কি এ ধরনের আইনের ঊর্ধে ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং

www.pathagar.com

খুলাফায়ে রাশেদীনগণ কি তাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের গভর্নরদেরকে কখনো কিসাস থেকে ব্যতিক্রম মনে করেছেন ? আমার কথা কারো কাছে যতোই অপসন্দনীয় কিংবা অপ্রাসংগিক অনুভূত হোক আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম সময়ে বর্ণিত শেষ ভাষণের কিয়দংশ এখানে বর্ণনা করবো। রাসূলের এ বাণী হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আমি এখানে ইবনে আসীর প্রণীত 'আল কামেল' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত লেখা উল্লেখ করছি। হযরত ফজল বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন, আমি এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভর দিয়ে মিম্বারে বসার জন্যে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। ঘোষণা দিয়ে লোকদেরকে একত্রিত করার পর তিনি এরশাদ করলেন ঃ

ايها الناس ان قد دنامني حقوق من بين اظهر كم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا، فهذا اعرضى فليستقد منه ومن اخذت له مالا فهذا مالي فليا خذا منه ولا يخش الشحناء من قبلي فانها ليست من شأني الا وان احبّكم الي من اخذ مني حقا ان كان له او حللني فلقيت ربى وانا طيب النفس ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع الى المنبر فعاد لمقالته الاولى-

"লোক সকল ! আমার উপর তোমাদের কতিপয় অধিকার অর্পিত হয়ে আছে। আমি তোমাদের কারো পিঠে চাবুকের আঘাত দিয়ে থাকলে আমার এ উন্মুক্ত পিঠে চাবুক লাগিয়ে 'কিসাস' নিয়ে নাও। আমি কারো মান-সম্মানের হানি ঘটিয়ে থাকলে আমার মানহানি ঘটিয়ে বদলা নিতে পারো। কারো মাল-সম্পদ নিয়ে থাকলে আমার এ মাল থেকে তা আদায় করে নাও। আমার পক্ষ থেকে শত্রুতা ও বিদ্বেষের কোনো আশংকা রেখো না। কেননা এমন ধারণা পোষণ করা আমার জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিত। তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে ঐ লোকটি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় যে সত্যিই পাওনাদার হয়ে আমার কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিলো অথবা আমাকে পাওনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে আমার রব আল্লাহর সান্নিধ্যে সন্তুষ্টচিত্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দিলো।" তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে জোহর নামায পড়ালেন। তারপর তিনি আবার মিম্বারে উঠে আগের বক্তব্যগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন।

www.pathagar.com

ইবনে আসীর লিখেছেন, এ ভাষণের পর এক ব্যক্তি তাঁর কাছে তিন দেরহাম দাবী করলে তিনি তা আদায় করে দেন।

কিসাসের ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একই নিয়ম ও ভূমিকা ছিলো। তাঁরা উভয়ই নিজেদেরকে কিসাসের জন্যে পেশ করেছেন এবং জনগণকে গভর্নরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা আমি আগেই বর্ণনা করেছি। তাঁর আমলের এ ঘটনাটিও প্রসিদ্ধ। ঘটনা হলো, একবার কাবাঘর তাওয়াফের সময় গাসসানের যুবরাজ জাবালাহ বিন আইহামের লুংগী এক বেদুইনের পায়ে লেগে গেলে নওমুসলিম যুবরাজ বেদুইনকে থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাতে যুবরাজকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাকে থাপ্পড় মেরে তার বদলা নেয়ার জন্যে বেদুইনকে নির্দেশ দেন। ইসলামী মতে আইনের সামনে ছোটবড় সবাই সমান। জাবালাহ ক্ষুব্ধ হয়ে মুরতাদ হয়ে চলে গেলেও পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে শোক বিহ্বল কবিতা আবৃত্তি করতো। এগুলো ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ী 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে ৪২ পৃষ্ঠায় القصاص دون النفس শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন ঃ

روى في حديث عن عمر انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى القود من نفسه وابا بكر يعطى القود من نفسه وانا اعطى القود من نفسى

"হাদীসে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে কিসাস দিতে দেখেছি এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও নিজ পক্ষ থেকে কিসাস দিয়েছেন। আমিও আমার নিজস্ব কিসাস আদায় করে থাকি।"

তারপর ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ঃ

ولم اعلم مخالفا في ان القصاص في هذه الامة كما حكم الله عز وجل انه حكم بين اهل التوراة ولم اعلم مخالفًا فى ان القصاص بين الحرين المسلمين فى النفس وما دونها من الجراح -

"আহলে তাওরাতের মতো এ উম্মতের জন্যে আল্লাহর নির্দেশের আওতায় কিসাস অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে আমার জানামতে কারো মতভেদ

www.pathagar.com

নেই। দু'জন স্বাধীন মুসলমানের মধ্যে হত্যা কিংবা হত্যার চেয়ে কম আহত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে গেলে তাতে কিসাস অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে আমার জানামতে কারো দ্বিমত নেই।"

বিচার বিভাগীয় আইনের সীমালংঘন

বস্তুত ইসলামী আইনে সরকারী কর্মকর্তা ও প্রশাসকগণকে কিসাসের জবাবদিহি থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত সাব্যস্ত করার কোনো অবকাশ নেই। যেমনটি আমি প্রথম আলোচনায় আরজ করেছি, ইবনে গাইলানের প্রসংগটির সামান্য অনুসন্ধান বাস্তবায়িত করলেই হাত কাটার কাজটি অন্যায় ও হৃদয়বিদারক হওয়ার যথার্থতা এবং ফিকহী পরিভাষায় সন্দেহবশতঃ দণ্ডবিধি জারী করার যে ব্যাখ্যা দেয়া হয় তার সাথে এ ব্যাপারটির দূরতম সম্পর্কও না থাকার কথা অত্যন্ত সুস্প ি হয়ে যেতো। এখানে হাতকাটা ব্যক্তি ছিলো রক্তপণ থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ। সে এরূপ শাস্তিযোগ্য অপরাধ আদৌ করেনি। সে চুরি কিংবা এমন কোনো অপরাধ করেনি যাতে সন্দেহ বা ভুল বুঝার ভিত্তিতেও হাত কাটার শাস্তি ও দণ্ড দেয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং গভর্নর ইবনে গাইলান শরয়ী আইন মোতাবিক কিসাস থেকে কিছুতেই অব্যাহতি লাভের অবস্থায় ছিলেন না। এ অবস্থার উপর ওসমানী সাহেবের বক্তব্য হলো—"বাদী-বিবাদীর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান ও খোঁজ-খবর নেয়ার প্রশ্ন উঠে। মোকদ্দমার উভয় পক্ষ কোনো কথায় একমত হলে তাদের বর্ণিত ঐকমত্যের উপর ভিত্তি করে বিচারক বা প্রশাসক ফায়সালা প্রদান করলে তাতে প্রশাসককে অভিযোগের হোতা সাব্যস্ত করা যাবে না।" মনে করুন, যায়েদ দাবী করলো, ওমর তার ভাইকে হত্যা করেছে। ওমরকে জিজ্ঞেস করলে সে তার এ অপরাধ স্বীকার করলো। এ অবস্থায় বিচারক ওমরকে হত্যা করার দণ্ড দিলে তাতে কি তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হতে পারেন? লাগামহীন বক্তব্য প্রদানের এটা একটি মনলোভা উদাহরণ। প্রশ্ন হলো, বাদী-বিবাদী কে, তাদের সম্মিলিত বর্ণনা কি, কার সামনে এসব বিবৃত হলো? বাদী ছিলো বনু দুব্বা গোত্রের যাবীর বিন দাহাক নামীয় এক ব্যক্তি। তার কোনো বিবরণ বসরার বিচারপতির সামনে আনা হয়নি। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনেও পেশ করা হয়নি। এ অসহায় লোকটি কারো সামনে হাজির হওয়ার সাহস করেনি এবং তাকে কেউ ডেকেও পাঠায়নি। মামলার ২য় পক্ষ আবদুল্লাহ বিন আমর বিন গাইলান। বিবাদী হিসেবে তারও কোনো বিবরণ বসরার আদালতে আসেনি, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারেও পেশ হয়নি। "আমি সন্দেহবশতঃ তার হাত কেটে দিয়েছি" এ সংশয়িত ও কুটিল লেখার উপর নির্ভর করে পুরো মামলাটির ফায়সালা হয়ে গেলো। অথচ

www.pathagar.com

লিখিত বস্তু বিবৃতিমূলক হোক কিংবা স্বীকৃতিমূলক অথবা এক পক্ষ থেকে অপর পক্ষের ঠিকানায় লিখিতভাবে প্রেরিত হোক অথবা লিখিত আকারের সাক্ষ্য হোক বস্তুত এ ধরনের কার্যপ্রণালী আগের আমলের ফিকাহবিদদের কাছে স্বভাবতই দলিলরূপে বিবেচিত হতো না এবং বিচারালয়ে এসবের উপর নির্ভর করা জায়েয নয়। বিশেষত দণ্ড ও কিসাস ধরনের ফৌজদারী মোকদ্দমাসমূহে লিখিত আকারের কোনো কিছু সাক্ষ্য ও দলিলরূপে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। অধিকন্তু একজন লোক অপর পক্ষ থেকে বর্ণনা বা স্বীকার করার অনুমতিপ্রাপ্ত হতে পারে না।

ইবনে গাইলান একই সাথে প্রাদেশিক গভর্নর ও বিচার বিভাগের আইনানুগ নীতি নির্ধারক হলেও নিজের অভিপ্রায়ের ব্যাপারে ফায়সালা করার এবং দণ্ড দেয়ার কোনো অনুমতি তার আদৌ ছিলো না। তবে সে সময় যারারাহ বিন আওফা বসরার মনোনীত বিচারক থাকার কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। তারিখে তাবারী ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ আছে। তিনি ইমরান বিন হাসীন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর কতিপয় আদালতি ফায়সালার কথা গ্রন্থরাজিতে বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ বিন খাল্‌ফ বিন হাইয়ান ওয়াকী তার প্রণীত আখবারুল কোজাত গ্রন্থে ১ম খণ্ডে তার স্বতন্ত্র অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি যিয়াদের মৃত্যু এবং হাজ্জাজের শাসনামলের শেষ সময় পর্যন্ত বসরার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। গ্রন্থটিতে একথাও স্পষ্টত লেখা ছিলো ঃ

استعمل عبد اللّه بن عمر وبن غيلان الثقفي فاتر زرارة على القضاء فلم يزل زرارة حتى عزل عبد اللّه بن عمرو-

"ইবনে গাইলান গভর্নর থাকাকালীন সময়ে যারারাহ সেখানকার বিচারপতি ছিলেন। এ সময়ে ইবনে গাইলান বরখাস্ত হন।"[১]

এবার প্রশ্ন জাগে, খুলাফায়ে রাশেদীন যদি নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাদের মনোনীত বিচারকদের আদালতে দাবীদার বা ফরিয়াদী হিসেবে নিজেরাই হাজির হতেন তাহলে ইবনে গাইলানের সাথে কর্কশ ব্যবহারের অপরাধে নিজে তার হাত কেটে দেয়ার পরিবর্তে অপরাধীকে বসরার বিচারপতির সামনে পেশ করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে কি তিনি নির্দেশিত ও বাধ্য ছিলেন না?

১. اخبار القضاة প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা–২৯২–২৯৭; ১৩৬৬ হিজরী সনে কায়রোর الاستقامة প্রেস থেকে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা এ পর্যায়ে প্রণিধানযোগ্য। তিনি এক ব্যক্তির ঘোড়া ভারবাহীর জন্যে ব্যবহার করেন। ঘোড়ার মালিক ঘোড়া দিয়ে বেশী ভারী বোঝা বহন করার কারণে ঘোড়া দুর্বল হওয়ার অভিযোগ করলে তিনি একজন শালিস নিয়োগ করার কথা বলেন। ঘোড়ার মালিক কাজী সুরাইহের ফায়সালা মেনে নেয়ার কথা বলেন। সুরাইহ উভয়ের বিবরণ শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন ঃ

اخذت صحيحًا سليما فانت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما ـ

"আপনি সুস্থ্য সবল অবস্থায় ঘোড়া নিয়েছেন। সুস্থ্য সবল অবস্থায় সেটাকে ফেরত দেয়া আপনার জিম্মাদারী।"

সুরাইহের এ স্বচ্ছন্দ ফায়সালা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এতোটা মনঃপূত হয়েছিলো যে, তিনি তাকে বিচারপতি মনোনীত করেন এবং কয়েকবার মামলার একপক্ষ হয়ে তাঁর আদালতে হাজির হন।

বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ 'কিতাবুল খারাজ, এখতিয়ারুল বেলাত' গ্রন্থে অনুরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো বিরক্তিকর কথার প্রেক্ষিতে একজন লোককে প্রহার করেন। প্রহৃত লোকটি বললো ঃ আমার অবস্থা সেই দু' অবস্থার লোকের মধ্যে এক অবস্থার লোকের মতো। আলোচ্য বিষয়ে ছিলাম অজ্ঞ যা আমাকে জানানো সম্ভব হতো অথবা এটা ছিলো আমার ভুল যা ক্ষমা করা ছিলো সম্ভব। একথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

صدقت دونك فامتثل ـ

"তুমি সত্য বলেছো ! এবার তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নাও।"

লোকটি অভিভূত হয়ে বললো, "আমি ক্ষমা করে দিলাম।" এসব ঘটনাকে অপ্রাসংগিক আলোচনা সাব্যস্ত এবং তাঁদের মানদণ্ড সর্বোচ্চ ও উন্নততর হওয়ায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরদের বেলায় এগুলো প্রযোজ্য না হওয়ার কথা বলা এবার কতবড় অনুতাপ ও বিস্ময়কর ব্যাপার। তারপর বিষয়বস্তু সন্দেহযুক্ত হওয়ার কারণে তা থেকে উদ্বুদ্ধ অনুসৃত ফায়দা অপরাধীর মতো বিচারকও পায় বলে যেই মনগড়া দৃষ্টিভংগী পেশ করা হয়েছে, তার সমর্থনে আমার দীর্ঘ লেখার পূর্বাপর বাদ দিয়ে তাকী ওসমানী সাহেবের শুধুমাত্র প্রথম বাক্য ব্যবহার করাটা তাঁর জন্যে কতদূর শোভনীয় হয়েছে ? অথচ আমি বিচারপতি কিংবা প্রশাসকের জন্যে যে বৈধ নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করছি তা

www.pathagar.com

শুধুমাত্র আদালত বা নিম্ন আদালতে ফায়সালা দানকারীদের ব্যক্তি সত্ত্বা যেন জড়িয়ে না পড়ে এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সঠিক ফায়সালা করার সৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্বেও কোনো ত্রুটি হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মনে করুন, একজন প্রশাসক কিংবা বিচারপতি তাঁর নিজস্ব পদাধিকার বলে অপর কারো মাথা গুড়িয়ে দিলো, ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্যায়ভাবে কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলো কিংবা কাউকে হত্যা করে ফেললো অথবা ধরে নেয়া হলো, আদালতের বিচারাসনে কিংবা রাষ্ট্রীয় সিংহাসনে সমাসীন কোনো ব্যক্তির প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা কিংবা জুতা ছুঁড়ে মারার অপরাধে বিচারক বা প্রশাসক উক্ত পাথর বা জুতা নিক্ষেপকারীর হাত কেটে দিলো বা তার গলা কেটে দিলো, তাহলে সেই প্রশাসক কিংবা বিচারপতি কি নিজের উচ্চ পদমর্যাদার কারণে কিসাসের সাধারণ ও ব্যাপক আইনানুগ জবাবদিহি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে ? অথবা কোনো বিশেষ সতর্কতা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর থেকে কিসাস না নিয়ে কি শুধু শাস্তি দেয়া হবে কিংবা শাস্তির পরিবর্তে তাকে বরখাস্ত করে দেয়াই যথেষ্ট হবে ? এসব প্রশ্নের জবাবদানের পরিবর্তে মুহাম্মদ তাকী সাহেব আমার পেশকৃত শামী গ্রন্থের উদ্ধৃতি সম্পর্কে বলছেন, "এ গ্রন্থের কোথাও কিসাসের কথা উল্লেখ নেই। গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র বিচারককে শাস্তি এবং বরখাস্ত করার কথা লিখা আছে।" শামী গ্রন্থের উল্লেখিত বাক্য দ্বারা ইবনে আবেদীন শামীর লিখিত বক্তব্য থেকে এ প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ ভুল যে, বিচারকের কাছ থেকে কিসাস নেয়া মূলত জায়েয নয়। মনে হয়, ওসমানী সাহেব বাক্যের তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হননি। এ ক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো, বিচারপতি যখন তাঁর আইনগত অধিকারসমূহ প্রয়োগ কালে আইনানুগ ফায়সালায় ভুলবশত অন্যায় করে বসবে, কেবলমাত্র সে অবস্থার সাথে উক্ত বাক্যটি সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ বিচারকের কাছ থেকে কিসাস নেয়া যাবে না। কিন্তু বিচারকের ফায়সালা যদি জ্ঞাতসারে অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ? তখনতো এজন্যে তাকে কিসাসের সম্মুখীন হতেই হবে। জনাব তাকী ওসমানী সাহেব আপনি নিজেও আল বালাগে এ অর্থই করেছেন যে, "ফায়সালাটি যদি জ্ঞাতসারেই যুলুমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।" কোনো বিবেকবান লোক কি এটা স্বীকার করতে পারে যে, ইবনে গাইলান কর্তৃক ব্যক্তিগত প্রতিশোধ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হাত কেটে দেয়ার ঘটনাটা বিচার বিভাগীয় বিধি সম্মত ছিলো ?

দ্বিতীয় কথা, যেসব কাজের প্রেক্ষিতে কিসাস অপরিহার্য হয়, বিশেষত সেগুলো এখানে আলোচনায় আসেনি। এখানে বিচারালয়ের অন্যায় ও ভ্রান্তিজনিত কার্যাবলীর উপর একটি সাধারণ আলোচনা হয়েছে মাত্র। সুতরাং

www.pathagar.com

বিচারপতির উপর কিসাস প্রয়োগ হওয়ার কথা উল্লেখ করার এটা কোনো স্থান নয়, প্রয়োজনও ছিলো না। এর উপর শাস্তি ও জরিমানার আইন জারী হওয়ার কথা বলে দেয়াই বরং যথেষ্ট ছিলো।

অবশ্য এ প্রশ্ন আমাকে করা যেতে পারে, শামী গ্রন্থের লেখা যখন বিচার সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থার সাথে জড়িত তখন সেটাকে আমি এ আলোচনায় উল্লেখ করলাম কেন ? এর জবাব হলো, আমি এ বাক্য দ্বারা শুধু এটাই প্রমাণ করতে চাই যে, অন্যায় বিচার এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে বিচারপতিকে যখন অবশ্যই জবাবদিহি করতে হয় এবং তাকে শাস্তি, জরিমানা এবং বরখাস্ত করার সাজা দেয়া সম্ভব, তখন প্রশাসক বা বিচারপতিকে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অপরাধের কারণে সাধারণ মুসলমানের ন্যায় জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না কেন ? এ কারণেই আমি লিখেছিলাম, ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে হাত কেটে দেয়া মূলত বিচার বিভাগীয় বিধিমালার আওতায়ই আসে না। ফিকাহ্ বিশেষজ্ঞগণ তো এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, আইনানুগ ও বিচার বিভাগীয় কর্মকাণ্ডেও অন্যায় ও যুলুম হলে, সে জন্যেও সংশ্লিষ্ট বিচারককে জবাবদিহি করতে হবে।

যুক্তিহীন ও নিরর্থক দলীল

ওসমানী সাহেব রদ্দুল মুখতার শামী গ্রন্থের কিসাস সম্পর্কিত عدم ذكر (অনুল্লেখ) ও ذكر عدم (অনস্তিত্বের উল্লেখ) এই উভয় বাক্যকে সমার্থক ধরে নিয়ে তা থেকে যে অতিরিক্ত দলিল উদ্ভাবন করেছেন তার প্রকাশভংগীও অদ্ভুত। ওসমানী সাহেবের ভাষ্য ঃ

"শামী গ্রন্থের বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিচারকের রায় অন্যায়ভাবে ঘোষিত হলেও তাতে বিচারক থেকে কিসাস নেয়া অপরিহার্য নয়, বরঞ্চ জরিমানা, শাস্তি কিংবা বরখাস্ত করার মতো শাস্তি দেয়া যায়। শামী গ্রন্থের যে বাক্য মালিক সাহেবের ভূমিকার সুস্পষ্ট খণ্ডন করে, তিনি সে বাক্যকেই নিজের স্বপক্ষে উপস্থাপন করে আমার কাছ থেকে পাল্টা দলিল দাবী করছেন। এটি তার একটি চরম 'দুঃসাহস'। إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ এটা সত্যিই এক আজব কথা।

আমার যে দুঃসাহসিকতার অভিযোগ করা হয়েছে তার কিছুটা তাৎপর্যতো আমি ইতিপূর্বেকার আলোচনায় উল্লেখ করেছি। এখন আমি বলতে চাই, যদি ধরেও নেই যে, গভর্নর ইবনে গাইলান (যাকে বিচারকের জোব্বা পরিয়ে দেয়া হয়েছিলো) তিনি কিসাস এর উর্ধে ছিলেন। কিন্তু একথাতো আপনিও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তাকে জরিমানা ও পদচ্যুতির যে কোনো শাস্তি দিতে হবে।

www.pathagar.com

জরিমানার কথাই ধরা যাক, এ অত্যাচারী গভর্নরের কাছ থেকে কি একটি শস্য বীজ কিংবা এক কপর্দক অর্থ কি জরিমানা হিসেবে আরোপ বা আদায় করা হয়েছে ? এরূপ জরিমানা করা তো দূরের কথা, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, এ অত্যাচারের শাস্তি নিরপরাধ সাধারণ মুসলমানদেরকেই বাইতুলমাল থেকে দিয়ত আদায় করার কারণে ভোগ করতে হয়। (কেননা বাইতুলমাল বা রাজকোষ প্রকারান্তরে জনগণেরই সম্পদ।) “দোষ করে একজন, শাস্তি পায় অন্যজন” এটা এই প্রবাদ বাক্যের মতোই হয়েছে। মুসলমানের বাইতুলমাল এতীমের সম্পদের সাথে তুলনা করা হয়। কর্মকর্তা ও প্রশাসকদের অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক আচরণের খেসারত বাইতুলমাল থেকে আদায় করা সম্ভব কি? স্মর্তব্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ী হাত কাটার জরিমানার পরিমাণ হলো ৫০টি উট। আর যাই না হোক অন্তত এতোটুকু জরিমানা গভর্নরের কাছ থেকে খেসারত হিসেবে আদায় করতে পারলে তার কিছুটা শিক্ষা হওয়ার আশা করা যেতো।

এবার শাস্তি দেয়ার কথায় আসুন। গভর্নর ইবনে গাইলানকে একটি বেত্রাঘাতও কি দেয়া হয়েছে কিংবা তিরস্কার ও ভর্ৎসনামূলক একটি বাক্যও প্রয়োগ হয়েছে ? আপনি বারবার বলছেন, কিসাস নেয়া যাবে না। ভালো কথা। কিসাস নিলেন না। কিন্তু যে শাস্তি পাওয়ার ফতওয়া আপনি নিজেই দিলেন, সে শাস্তিও কি তাকে দেয়া হয়েছিলো ? বাকী রইলো বরখাস্ত করার কথা।

এবার বরখাস্তের বিবরণ শুনুন। ইবনে জারীর ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে গাইলানকে বরখাস্ত করলেন ঠিকই কিন্তু পরক্ষণেই বসরাবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমাদের পসন্দনীয় গভর্নর কে ? তারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাকওয়া, নৈতিকতা ও অভিজ্ঞতায় তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল থাকা সত্ত্বেও শুধু এতোটুকু বললো, আমীরুল মু'মিনীনই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন, বসরাবাসী ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুকেই গভর্নর রূপে পেতে চায়। এমনকি তিনি ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামও উচ্চারণ করে বারবার জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু তারা তাদের মনের বাসনা খুলে বলতে সাহস পায়নি। তারপর তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে। আমি আমার ভাতিজা ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে তোমাদের গভর্নর নিয়োগ করলাম। ইবনে গাইলানের স্থলে ইবনে যিয়াদের নিয়োগ 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' দেয়ার মতো হলো। এই ইবনে যিয়াদ রাসূলের কলিজার টুকরা নয়নের মনি আদরের দুলারী হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পবিত্র তাজা

www.pathagar.com

রক্তে কারবালার মরু প্রান্তর রঞ্জিত করেছিলো। বস্তুত আমার এ কতিপয় নিবেদনের আলোকে প্রতিটি লোকের সহজেই বোধগম্য হতে পারে যে; চরম দুঃসাহসী আমি নাকি যিনি ইংগীতে অপরকে আঘাত হানার পদ্ধতি রপ্ত করে আমাকে দুঃসাহসী প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা ও কসরত চালাচ্ছেন।

মাওলানা মানাযের আহ্সান গিলানীর বর্ণনা

তারপর একথাও আমাদের বোধগম্য নয়, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাষণ্ড গভর্নরদের সম্পর্কে আমরা কোনো কথা বলতেই এক শ্রেণীর আলেমের গাত্রদাহ্ শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অপরাপর খ্যাতিনামা বুদ্ধিজীবী ঐ সকল গভর্নেরের কঠোর সমালোচনা করলেও ঐ মহল থেকে টু শব্দটিও পর্যন্ত উচ্চারিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ মাওলানা সাইয়েদ মানাজের আহ্সান গিলানী সাহেবের কথা পেশ করা যায়। তিনি দাক্ষিণাত্যের ওসমানীয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রধান একজন বিখ্যাত দেওবন্দী আলেম ছিলেন। তাঁর লিখিত একখানা গ্রন্থ "ইমাম আবু হানীফার রাজনৈতিক জীবন" উপমহাদেশে খুবই প্রসিদ্ধ। সাড়ে পাঁচ শ'র বেশী পৃষ্ঠা ব্যাপী এ গ্রন্থে উমাইয়া বংশের শাসনামলে বিচার বিভাগের উপর কর্মকর্তাদের প্রভাব শীর্ষক একটি অধ্যায় রয়েছে। শ্রদ্ধেয় লেখক মাওলানা গিলানী গ্রন্থটির সূচনা এভাবে করেছেন যে–

খেলাফতের কর্তৃত্ব নেতৃত্ব মদীনা থেকে দামেশকে স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথেই বিচার বিভাগের মান এত নিচে চলে যায় যে, রাষ্ট্রীয় সর্বাধিনায়কের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের আঞ্চলিক বিচারপতি নিয়োগের অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়। انما كان ولاة بلدهم هم الذين يولون القضاء (حسن المحاضرة صـ ٨٨ امام سيوطى) অনেক দিনের অপেক্ষা করতে হলো না, মারওয়ানের আমলেই এর অশুভ পরিণতি প্রকাশ পেলো। একবার মারওয়ান সরকারী সফরে মিসর যান। তিনি সেখানে পৌঁছে আবেস নামের তৎকালীন মিসরের বিচারপতিকে ডেকে পাঠালেন। মুসলিম ঐতিহাসিক বৃন্দ এবং 'হুসনুল মোহাদারা' গ্রন্থের উদ্ধৃতি অনুযায়ী মিসরের বিচারপতি আবেস ছিলো অশিক্ষিত। লেখাপড়া কিছুই জানতো না। মারওয়ান এ অশিক্ষিত বিচারককে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেনঃ "তুমি কি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছো ? জবাব আসলো—না। আমি কুরআন হেফজ করিনি। তার পরের প্রশ্ন ঃ তুমি কি ইসলামী উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেছো ? উত্তরে বিচারপতি বললেন ঃ আমি তো এ বিষয়ে আদৌ কিছু জানি না। মারওয়ান বিচারপতি আবেসের জবাবের ধরন দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাহলে তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচারের রায় দিয়ে

www.pathagar.com

থাকো ? অসহায় বিচারপতি আবেস এর কোনো জবাব দিতে ব্যর্থ হলো। মোটকথা, বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফার পরিবর্তে রাষ্ট্রপ্রধান গভর্নরদের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় আঞ্চলিক গভর্নরগণ তাদের দূরভিসন্ধি চরিতার্থের কাজে সহায়ক লোকদেরকে বিচারকরূপে নিয়োগ করেন। আবেস এ ধরনের নিয়োগপত্র নিয়েই বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলো। তার নিয়োগের ইতিবৃত্তি ও পটভূমি ছিলো এই যে, তৎকালীন মুসলিম জাহানের রাষ্ট্রপ্রধান হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসর রাজ্যের গভর্নর মুসলিমাকে ইয়াযিদের স্বপক্ষে জনগণ থেকে বায়আত গ্রহণের ফরমান লিখে পাঠালেন। তিনি নির্দেশ মোতাবেক ইয়াযিদের অনুকূলে জনগণের বায়আত নেয়া শুরু করেন। সকলেই বায়আত গ্রহণ করলো। কিন্তু বাধ সাধলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর। তিনি হলেন মিসর বিজয়ী বিখ্যাত সাহাবী আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও বিখ্যাত সাহাবী। শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও নৈতিকতার দিক থেকে জনগণের কাছে স্বীয় পিতার চেয়ে অধিক সমাদৃত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ইয়াযিদের স্বপক্ষে বায়আত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন মিসর গভর্নর মুসলিমা হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে কে আছো যারা আবদুল্লাহকে 'সোজা' করতে পারে ?" তখন মিসরের সেই অশিক্ষিত বিচারপতি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং গভর্নরকে জানালেন—"আমি পারবো।" এ সময় আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ফুসতাতে তার পবিত্র বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। আবেস একদল তরুণ পুলিশ নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাসভবন ঘেরাও করে ইয়াযিদের বায়আত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে চাইলো। তিনি তখনও তাঁর অস্বীকৃতির উপর অটল। তারপর আবেস যে ঘৃণ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলো ইতিহাসের ভাষায় তা ছিলো এই রূপ—হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করার জন্যে ইন্ধন আনা হলো। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ বাসভবনে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। অসভ্য ঐ গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড বিচারপতি যা বললো তাকে সেসব কথারই পুনরাবৃত্তি করতে হলো। একজন স্পষ্টবাদী সাহাবীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার হুমকি দিয়ে রাষ্ট্রিয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মনযোগানোই ছিলো মূর্খ আবেসের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। আর এ চাটুকারিতার পুরস্কার হিসাবেই সরকার সরল প্রাণ মুসলিম জনতার জীবন সম্পদ, ইজ্জত-আবরু ফায়সালা করার ভার অজ্ঞ বিচারক আবেসের হস্তে ন্যস্ত করে—যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের জ্ঞান ও ফারায়েজ শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

www.pathagar.com

যা হোক, এখানে আমি উদাহরণ স্বরূপ মাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার উল্লেখ করলাম। অন্যথায় ঐ শাসনামলে বিচারকদের নিয়োগের ব্যাপারে বিভিন্ন চাপের মুখে ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্ঠতার কাহিনী খুবই দীর্ঘ এবং বড়ই করুণ।[১]

আমরা যখন ইয়াযিদের বেআইনী ক্ষমতা দখল ও তার স্বপক্ষে বাইআত গ্রহণ এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যুলুম অত্যাচারের কথা উল্লেখ করি, তখনই একটি মহল এই বলে নানান কুট যুক্তির অবতারণা শুরু করে দেয় যে, এ যুগে এসে এহেন ধরনের আলোচনা কি করে শোভনীয়। সে আমলের লোকদের ত্রুটির আলোচনা করা বে-আদবী যা সাহাবীদেরকে অবমাননা করারই নামান্তর। তাতে ঈমান হারা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার অর্থ দীনের মূল সৌধের ভিত্তির একটি ইটকে তার জায়গা থেকে স্থানান্তরিত করে ঈমানী ভবনকে নড়েবড়ে করে দেয়া। কিন্তু দেওবন্দ মতবাদের বড় বড় স্তম্ভ যখন ইমাম সুয়ূতির (র) মতো ঐতিহাসিক ও হাদীস বেত্তার বরাত দিয়ে এরূপ ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন, তখন জনাব মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেবদের ঈমানী বালাখানায় প্রকম্পোন আসে না। আর এ বুযূর্গদের প্রতি ফতওয়ার বাণও নিক্ষিপ্ত হয় না। মুহতারাম তাকী ওসমানী সাহেব ! এ ধরনের পরস্পর বিরোধী বিচারবোধ ও আচরণের দরুন কেউ যদি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে সেটা কি বে-মানান হবে ? সে আয়াতটি হলো ঃ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ "অবশ্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।"

প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় হাস্যস্পদ চিত্র

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তিই এমনকি খোদ রাষ্ট্রপ্রধান, আমীরুল মু'মিনীনও আইনের উর্ধে নয়, ইতিপূর্বে আমি এ আলোচনা করেছি। শরীয়াতী আইনের ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে শাসক ও শাসিত উভয়ই সমান। এ আইন সমভাবে সকলেই মেনে চলতে বাধ্য। একজন সাধারণ নাগরিককে অন্যায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে যেভাবে রাষ্ট্রীয় আদালত ও ফৌজদারী কোর্টে হাজির হতে হয়, তেমনি রাষ্ট্রীয় কোনো উর্ধতন কর্মকর্তা এমনকি খোদ সমসাময়িক রাষ্ট্রপ্রধানও আইনের আওতায় দণ্ডভোগের উপযোগী বিবেচিত হতে পারেন। পরিশেষে আমি একথা বলে দেয়া সমীচীন মনে করছি যে, আজ অবধি আমাদের দেশে যেসব বৃটিশ আইন প্রচলিত রয়েছে, তাতেও সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারী কাউকে তাদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি মাফিক কোনো নাগরিকের অর্থ সম্পদ লুট করা কিংবা কারও প্রাণ-সম্ভ্রম হরণ করার অধিকার

১. আল্লামা সাইয়েদ মানাজের আহসান গীলানীর (র) প্রণীত হযরত ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক জীবন গ্রন্থ পৃষ্ঠা-৫০-৫১; করাচী নাফিস একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত। বইটির ভূমিকা লিখেছেন তদীয় শিষ্য ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ এম. এ. পি. এইচ, ডি।

www.pathagar.com

নেই। কেউ এমনটি করলে তাকে অবশ্যই আইনত এর কৈফিয়ত দিতে হয়। তবে বিচারপতি এবং সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এ আইনে এতোটুকু নিরাপত্তার অবকাশ আছে যে, তারা যদি সরকারী দায়িত্ব পালনকালে কোনো অপরাধ অনিয়ম করে বসেন, তাহলে পূর্বাহ্নে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা দায়ের করা যায় না। মোকদ্দমা দায়ের হয়ে গেলে আদালত তাকে বিধিসম্মতভাবে যে শাস্তি দান ইচ্ছা করতে পারবেন। সরকার মোকদ্দমা রহিত বা প্রত্যাহার করতে পারে না এবং আদালতের রায়ের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকারও সরকারের থাকে না। এটাতো হলো সেই আইনের কথা যেই আইন সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়। অন্যথায় দুনিয়াব্যাপী এমন অনেক আইন ব্যবস্থা রয়েছে যাতে সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার ও কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্যে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অত্যন্ত সুষ্ঠু আইনগত ব্যবস্থা ও স্বাধীন ট্রাইবুনাল রয়েছে। উক্ত ট্রাইবুনালে অপরাধী বলে প্রমাণিত অফিসারদেরকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমাদের কতিপয় অনভিজ্ঞ নবীন ফকীহ ও সম্পাদক নিজেদের লেখার মাধ্যমে ইসলামী প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার এমন আজব চিত্র তুলে ধরছেন যে, তাদের ঐসব লেখা অনুযায়ী কোনো গভর্নর কিংবা ডেপুটি কমিশনার যদি নিছক তার প্রতি ধৃষ্ঠতার দায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে কারও হাত তারা কেটে দেয় কিংবা কাউকে হত্যা করে লিখে দেয় যে, সন্দেহবশতঃ হাত বা গলা কাটা হয়েছে, তাহলে তার উপর কিসাস বা জরিমানা কিছুই আরোপিত হবে না। তাকে শুধুমাত্র চাকুরি থেকে বরখাস্ত করলেই চলবে। আর জরিমানা যদি একান্ত দিতেই হয় তাহলে অপরাধীর নিজের কাছ থেকে নয় সরকারী তহবিল থেকে দিলেই হয়ে যাবে। জানতে চাই, ইসলামী রাষ্ট্র ও তার প্রশাসন আইন ও বিচার ব্যবস্থার এহেন মনগড়া চিত্র তুলে ধরে আধুনিক বিশ্বে কাকে এ আইনের অনুরাগী করতে পারবেন ? অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাজের সমর্থনের আবেগে আপনি ইসলামী রাষ্ট্র, সরকার, আইন ও বিচার ব্যবস্থাকেই দুনিয়াবাসীর সামনে অপমানিত ও কলঙ্কিত করে ছাড়ছেন।

----

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

গভর্নরদের যুলুম-অত্যাচার

এক ঃ যিয়াদের অত্যাচার

ইবনে গাইলানের ঘটনা আলোচনার পর মুহাম্মদ তাকী সাহেবের ভাষ্য হলো ঃ

তাবারী ও ইবনে আসীরের উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা ২য় ঘটনার বর্ণনায় লিখেছেন, "একবার খুতবাদানের সময় যিয়াদের প্রতি লোকেরা পাথর নিক্ষেপ করে। শুধুমাত্র এ অপরাধে যিয়াদ অনেক লোকের হাত কেটে দেয়।" তাবারী ও ইবনে আসীরে ঘটনাটি অবশ্যই এভাবে উল্লেখ আছে ঃ

"ঘটনা নির্ভুল স্বীকার করলেও এটা ছিলো যিয়াদের ব্যক্তিগত আচরণ কোনো ইতিহাস গ্রন্থেই একথার উল্লেখ নেই যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদের এ ঘটনা অবহিত হয়েও প্রতিকার করেননি। ঘটনার খবর তাঁর কাছে পৌছেনি এটাও হতে পারে। এটাও সম্ভব যে, ইবনে গাইলানের ঘটনাটি তাঁর কাছে পৌছে। এটাও অসম্ভব নয় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদকে এ তৎপরতার জন্যে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন।"

তাকী ওসমানী সাহেবের এরূপ আজব দর্শন ও খোঁড়া যুক্তির জবাব আমি ইতিপূর্বে বারবার প্রমাণাদি সহ পেশ করেছি। তাকী সাহেবের এ ধরনের হেঁয়ালীপনা যুক্তির জবাবে আমাদের অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হয় যে, শুধুমাত্র পাথর ছোঁড়ার কারণে দু' চারজন নয় ৩০/৪০জন লোকের হাত কেটে ফেলার মতো মর্মান্তিক ঘটনার খবর সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রনায়কের কাছে না থাকা কি যুক্তিসংগত। জাবালে আসাল যুদ্ধে মালে গনীমাতের সোনা-রূপার পরিমাণ কত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তা জানতে পারলেন, আর বসরার মসজিদের দরযায় ৩০/৪০জন রক্ত মাংশের দেহবিশিষ্ট জলজ্যান্ত মানুষের হাত কেটে দেয়ার লোমহর্ষক ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতে পারেননি। ইবনে গাইলানের ঘটনার মতো যিয়াদের ঘটনা ব্যক্ত হয়ে থাকলে অন্ততঃ দিয়তের কথার উল্লেখ থাকতো। ইতিহাসে এমন কোনো কথা খুঁজে পাওয়া যায় না যে, যিয়াদ সর্বমোট ৩০ থেকে ৮০জন লোকের হাত কেটে দেয়ায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে দিয়ত দিয়েছেন কিংবা যিয়াদকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। সম্ভাব্য রাজনৈতিক বিপর্যয় ঠেকানোর জন্যে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যেখানে যিয়াদের মতো লোককে তড়িঘড়ি করে ভাই বলে ঘোষণা দেয়ার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারলেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর

www.pathagar.com

মতো দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ এত বড় ঘটনার কিছুই জানলেন না। যদ্দরুন বিচার হতে পারেনি, জনাব তাকী কি করে এটা ধরে নিলেন ? এই প্রকাশ্য যুলুম সত্ত্বেও যিয়াদকে তার গভর্নরী পদে বহাল রাখার ব্যাপারটি যেহেতু ইতিহাসে স্বীকৃত তাই জনাব তাকী ওসমানী সাহেব বাস্তব অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরায়ে বললেন, "হতে পারে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদকে এ কাজের জন্যে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন।"

একথা সত্য যে, ইতিহাস গ্রন্থে যিয়াদের অত্যাচার ও যুলুমের কথা শুধুমাত্র একটি ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তার যুলুম ও নির্দয়তার ফিরিস্তি বড়ই করুণ, খুবই দীর্ঘ। বিশ্ব বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন কতিপয় ক্ষেত্রে বনী উমাইয়ার কর্মকর্তাদের দমনমূলক আচরণকে পর্দার অন্তরালে ঢেকে রেখে সেগুলোকে হালকাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনিও তাঁর গ্রন্থে (৩য় খণ্ড ৮ম পৃষ্ঠা) লিখেছেন ঃ এশার নামাযের পর কিছুটা বিরতি দিয়ে যাকে পেতো তাকেই যিয়াদের নির্দেশে পুলিশ নির্বিচারে হত্যা করতো। (لا يجد احداً الا قتله) তারপর ইবনে খালদুন লিখেছেন, যিয়াদ প্রথম ব্যক্তি যে তলোয়ার নাংগা করলো, সন্দেহ প্রবণ হয়ে গ্রেফতার করতে লাগলো এবং সন্দেহ পরায়ণ হয়ে শাস্তি দিতো।

جرد السيف واخذ بالظنة وعاقب على الشبه۔

সন্দেহ ও ধারণার বশবর্তী হয়ে জনগণকে গ্রেফতার করা, কারফিউ দিয়ে নির্বিচারে লোকদেরকে হত্যা করার মতো অস্বাভাবিক ঘটনা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অনবহিত থাকার কথা কি ধোপে টিকে ?

গভর্নর বুসর বিন আবু আরতাতের যুলুম নিপীড়ন

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অপর গভর্নর বুসর বিন আবু আরতাতের যুলুম-নিপীড়নমূলক যে সকল কর্মকাণ্ডের কথা মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি উল্লেখ করেছেন, সেসব সম্পর্কে 'আল বালাগ' সম্পাদক লিখেছেন ঃ এ ধরনের অভিযোগ তো জারিয়া বিন কুদামার বেলায়ও উত্থাপিত হতে পারে, যাকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বুসরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। আল বালাগ সম্পাদকের মতে, ঘটনাটি সত্য হলেও এটা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের ঘটনা নয়। বরং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেনাবাহিনীর যুদ্ধকালীন সময়ের ঘটনা। আমরা তাদের উভয়কেই এ ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত বলে মনে করি। কারণ, এসব বর্ণনার যথার্থতা নেই। ইসাবা গ্রন্থে

www.pathagar.com

বুসর সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাব্বানের একটি উক্তি রয়েছে। সেটি হলো, গোলযোগপূর্ণ সময়ে বুসরের দ্বারা সংঘটিত অনেক ঘটনারই উল্লেখ আছে, তবে সেগুলোর আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়াই উচিত।

এ দলীলের জবাব দেয়ার আগে প্রথমে আমি যে কথাটি খুলে বলা প্রয়োজনবোধ করছি, সেটি হলো—হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিভিন্ন আক্রমণাত্মক তৎপরতা আর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিরক্ষামূলক প্রদক্ষেপসমূহকে এক করে দেখার বিষয়টি উভয় কার্যক্রমকে একই স্তরে একই মানদণ্ডে করার চেষ্টা সম্পূর্ণ ভুল এবং অযৌক্তিক। কথা এখানে স্পষ্ট, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি খলীফায়ে রাশেদই হয়ে থাকেন, যা সর্বস্বীকৃত, তাহলে তার বিরুদ্ধে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খুন-খারাবীমূলক ক্রিয়াকাণ্ডসমূহকে কেবলমাত্র[১] পারস্পরিক কলহ-বিবাদ কিংবা মতবিরোধ শব্দাবলী দ্বারা সংজ্ঞায়িত করাই যথেষ্ট নয়। এ ধরনের তৎপরতাকে সেই ইজতিহাদী ক্রিয়াকলাপ বলারও উপায় নেই যে, ইজতিহাদ সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম এরশাদ করেছেন ঃ

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر -

"(ইসলাম সম্পর্কে) বিজ্ঞ লোকের ইজতিহাদ সঠিক হলে তার জন্যে দু'টি প্রতিদান রয়েছে, আর ভুল হলে সে একটি প্রতিদান পাবে।"

হ্যাঁ, এ ধরনের কর্মকাণ্ড এমন হাদীসের আওতায় আসতে পারে যে হাদীসে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন ঃ

من اراد ان يفرق امر هذه الامة وهى جميع فاضربوه بالسيف ....

(যে ব্যক্তি উম্মতের সম্মিলিত ব্যাপারে ফাটল ধরাতে প্রয়াসী তার গর্দান উড়িয়ে দাও।)

অপর একটি হাদীসে আছে ঃ

اذا بويع لخليفتين فاقتلو الاخر منهما -

(মুসলিম, কিতাবুল ইমারত)

---

১. 'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেব হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেশোদ্রোহিতা ও আক্রমণাত্মক তৎপরতাকে মতবিরোধ শব্দের ব্যবহার করেছেন। তিনি আল বালাগের মহররম সংখ্যায়ও লিখেছেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মতবিরোধ করায় হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইজতিহাদ করার অধিকারও কি রহিত হয়ে গেলো? একজন স্বীকৃতও সর্বজন বিদিত খলীফার বিরুদ্ধে ৫ বছর অনবরত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকে শুধু মতবিরোধ বা মতপার্থক্য বলা কি হাস্যস্পদ নয়?

www.pathagar.com

উভয় পক্ষের যুদ্ধ বিরতির পর দাওমাতুল জান্দালে রাজনৈতিক ফায়সালার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপের ঘটনায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষীয় প্রতিনিধি হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য দ্বারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরখাস্ত হওয়া এবং আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘোষণা দ্বারা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হয়ে যাওয়ার কথা আহলে সুন্নাতের কোনো মনীষীই সমর্থন করেননি। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমৃত্যু খলীফায়ে রাশেদের পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। অপর দিকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন মনোনীত খলীফা (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর) বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ও খেলাফতের দাবীদার হয়ে আবির্ভূত হলেন। মূলতঃ তাঁর এ ভূমিকা রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং যুদ্ধ ঘোষণারই সংজ্ঞায় পড়ে। এ ক্ষেত্রে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা তাঁর কোনো প্রতিনিধির গৃহীত ব্যবস্থা বিশেষত প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপসমূহ প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ দমনেরই আওতায় পড়ে। দু'জনের কাজের ধারা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য বিরাট ও ব্যাপক। এছাড়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত আমলে তাঁর অনুগত শাসন বলয়ের মধ্যে ঢুকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা তাঁর কোনো গভর্নরের সামরিক অভিযান বা আগ্রাসনমূলক তৎপরতা সেতো আরও আপত্তিকর এবং অবৈধ ছিলো।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নিয়োগকৃত গভর্নর ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাসের নিষ্পাপ দু'টি শিশুকে হত্যা করার ঘটনাটিকে জনাব তাকী ওসমানী সাহেব ইচ্ছা করলে অস্বীকার করতে পারেন (যদিও আগে পরের সব ইতিহাস বেত্তা স্ববিস্তারে এ ঘটনার আলোচনা করেছেন)। মিসর, হেযাজ, ইয়ামন, হামাদান প্রভৃতি এলাকা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেগুলো দখলের লক্ষ্যে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের পক্ষ থেকে যথারীতি যেসব সামরিক অভিযানের সূচনা করেছিলেন, জনাব তাকী ওসমানী কি এসব অস্বীকার করতে পারবেন? তার পাল্টা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা তাঁর সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো, সেগুলো কি প্রতিরক্ষামূলক ছিলো না? সুতরাং শরীয়াতের দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের সামরিক আগ্রাসনমূলক কর্মকাণ্ড বিদ্রোহ এবং খলীফার অবাধ্যতারই সংজ্ঞায় পড়ে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপসমূহ ছিলো বিদ্রোহ দমন ও কলহ বিবাদ অবসানের লক্ষ্যে।

'ইসাবা' গ্রন্থে বুসরের ঘটনা নিয়ে মাথা না ঘামানো সম্পর্কিত যে বাক্যটি ইবনে হাব্বান লিখেছেন, জনাব ওসমানী তা দেখলেও এ বাক্যের সাথেই

www.pathagar.com

ইবনে হাযরের কথাটি তিনি দেখতে পাননি। আমি তাঁর না দেখা বাক্যটি এখানে উদ্ধৃত করলাম :

كان معاوية وجهه الى اليمن والحجاز فى اول سنة اربعين وامره ان ينظر من كان فى طاعة فيويهم ففعل ذالك -

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ৪০ হিজরীর প্রথম দিকে বুসরকে ইয়ামন ও হেযাজে পাঠান। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসারী কারও দেখা পেলেই তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে তিনি তাকে নির্দেশ দেন। বস্তুত বুসর তাই করেছিলো।"

জনাব ওসমানীর মনঃপুত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনও প্রায় এ ধরনের কথাই লিখেছেন :

فاراد معاوية صرف عمله الى مصر لما كان يرجومن الاستعانة على حروبه بخراجها .... فقال معاوية بل الرأى ان نكاتب العثمانية بالوعد ونكاتب العدو بالصلح والتخريف ونأتى الحرب بعد ذالك -(تاريخ ابن خلدون ، جلد ٢، صـ١٨١)

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসর দখল করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কারণ, সে দেশের আদায়কৃত শুল্ক যুদ্ধের ব্যয়ভারে সহায়তা করবে ------ তারপর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন : সঠিক পদ্ধতি এটাই হবে যে, আমরা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষীয় লোকদেরকে তো লিখিতভাবে ওয়াদা দিতে থাকবো আর শত্রু পক্ষীয় (আলীর) লোকদের সাথে কখনো সন্ধি কখনো ভয়-ভীতির কথাবার্তা চালিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবো। তারপর যুদ্ধ শুরু করবো।"

—(তারিখে ইবনে খালদুন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা–১৮১)

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বুসর ও অন্যান্য লোকদেরকে কি উদ্দেশ্যে মিসর পাঠিয়েছিলেন উল্লেখিত বাক্যে তা সুস্পষ্ট। এসব অখণ্ডনীয় ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার পরও ওসমানী সাহেব কিভাবে বলতে পারেন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত ছিলেন ? এ ধরনের ঘটনার কথা স্ববিস্তারে প্রাসংগিকক্রমে কেবলমাত্র মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেননি। মাওলানা শাহ মুয়ীনুদ্দীন আহমদ নদভী সাহেবও সিয়ারুস সাহাবা গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

www.pathagar.com

"৪০ হিজরী সনে ধূরন্ধর যুলুমবাজ বুসর বিন আরতাতকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হেজাযবাসীদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণের নির্দেশ দেন। এই যালেম ব্যক্তিটি মদীনাবাসীদের মধ্যে সন্ত্রাস ও আতংক সৃষ্টির লক্ষ্যে কতিপয় বাড়ী ধ্বংস করে দেয়। মদীনায় দমন নীতি চালিয়ে সে মক্কায় উপনীত হয়। মক্কার পরিস্থিতি ঠিক করার পর বুসর ইয়ামন অভিমুখে যাত্রা করে। ইয়ামনের গভর্নর ওবাইদুল্লাহ খবর পেয়ে আবদুল্লাহকে স্থলাভিষিক্ত করে কুফায় চলে যান। বুসর ইয়ামনে পৌঁছে প্রথমেই আবদুল্লাহকে হত্যা করে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভক্তদেরকে নির্বিচারে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। এমনকি গভর্নর ওবাইদুল্লাহর দু'টি নিষ্পাপ শিশুও বুসরের নির্মম হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। ইয়ামনে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর এ রক্ত পিপাসু পাষণ্ড গভর্নর সিরিয়ায় ফিরে আসে।"

এসব অমানুষিক অত্যাচার ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের মোকাবেলা করার জন্যেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জারিয়া ইবনে কুদামাকে পাঠিয়েছিলেন। এবার প্রশ্ন জাগে, যদি ইবনে কুদামাহও নাজরান এবং বসরায় গিয়ে এরূপ যুলুম অত্যাচার করে থাকলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও একইভাবে অভিযুক্ত হতে হবে না কেন ? এ প্রশ্নের জবাব ৩টি। প্রথম, এ পদক্ষেপ আক্রমণাত্মক ছিলো না। বরং এটা ছিলো প্রতিউত্তর বা আত্মরক্ষামূলক। দ্বিতীয়, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুপক্ষীয় লোকদের জান-মালের উপর ইসলাম বহির্ভূত কোনো সীমাতিরিক্ত আচরণ করা থেকে বিরত থাকার জন্যে নিজ বাহিনীকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন, যা জনাব তাকী ওসমানী সাহেবও স্বীকার করেছেন। আর একথা সত্য যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান বিদ্রোহী, তাদের বন্দী নারী পুরুষ ও শিশুদের সাথে আচার-আচরণের যেই বিধি-বিধান অনুসরণের আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছিলেন, আহলে সুন্নাতের আলেম এবং ইসলামী আইনবিদগণ এই সংক্রান্ত সকল আইন বিধিতে সেই আদর্শেরই অনুসরণ করেছেন। তৃতীয়, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রেরিত সেনাপতি জারিয়া ইবনে কুদামাহ জওয়াবী হামলায় তাঁর উপদেশের খেলাফ ইসলামের যুদ্ধনীতি বিরোধী কোনো কাজ করে থাকলেও এ বিষয়ে অবহিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার মতো সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মিলেনি। কেননা একথা ঐতিহাসিক-ভাবে সত্য যে, জারিয়া যে মুহূর্তে নাজরান, মক্কা ও মদীনায় অত্যাচারী বুসরের পশ্চাদ্বাবনে লিপ্ত, ঠিক সে সময়ে ৪০ হিজরী সনেই ইবনে মুলজিম খারেজীর হাতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন।

www.pathagar.com

তাকী ওসমানী সাহেব ইবনে কাসীরের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মাওলানা মওদূদী সাহেব কর্তৃক বুসরকে 'যালিম ব্যক্তি' বলাটা ঠিক হয়নি। কারণ, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই তাঁর সাথীদেরকে বলেছেন—"বুসরের সেনাবাহিনী তোমাদের উপর বিজয়ী হবে, কারণ, নেতার প্রতি তাদের রয়েছে আনুগত্য আর তোমাদের আছে অবাধ্যতা। তোমরা নিজ এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করো আর তারা চায় সংশোধনের মাধ্যমে নিজ এলাকাকে নিরুপদ্রব রাখতে।"

প্রকৃতপক্ষে এ কথাগুলো ছিলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তাঁর সাথীদের প্রতি ভর্ৎসনা স্বরূপ, যা তাঁর সর্বশেষ ভাষণে বলেছিলেন। নিজ সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও ভীরুতা লক্ষ্য করেই তিনি হতাশ ও ভগ্ন হৃদয়ে বক্তৃতায় এসব কথা বলেছিলেন। প্রদত্ত ভাষণে ফাসাদ, অশান্তি ও সংশোধন ইত্যাকার শব্দগুলো নিজের সংগী-সাথীদের আত্মমর্যাদাবোধকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে অভিমানের সুরে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন আমি এইমাত্র উপরে সিয়ারুস সাহাবা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছি যে, 'মক্কার পরিস্থিতি ঠিক করার পর বুসর ইয়ামন অভিমুখে যাত্রা করে।' বলার অপেক্ষা রাখে না এখানে, পরিস্থিতি ঠিক করা কিংবা সংশোধন বা শান্তিস্থাপন যে শব্দই ব্যবহৃত হোক সেটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করার দৃষ্টিভঙ্গিই ছিলো বুসরের ঐসব স্থানে গৃহীত নিপীড়নমূলক পদক্ষেপের আসল উদ্দেশ্য।

মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বুসর যেসব বিষয় ঘোষণা করেছে, তাকী ওসমানী সাহেবও তাঁর কতিপয় সাথী সেই ঘোষণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পেশ করে থাকেন। তাঁদের এ বিষয়টিও কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। বুসর ঘোষণা করেছিলো, 'হে মদীনাবাসীগণ ! মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি আমাকে প্রতিজ্ঞা না করাতেন তাহলে আমি এ শহরের আবাল বৃদ্ধ জনতাকে হত্যা না করে ছাড়তাম না।' আমার খুবই আশ্চর্য লাগে তাকী ওসমানী সাহেব বুসরের এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ নিষ্ঠুর ঘোষণাকে এসব ব্যাপারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দায়িত্বমুক্তি এবং বুসরের নির্দয়তার প্রমাণ স্বরূপ কিভাবে পেশ করতে পারেন ? আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অধীনস্থ লোকদেরকে যুদ্ধ ও খুন-খারাবীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু করতে কঠোরভাবে নিষেধ করাকে তাঁরা এজন্যে দলিল রূপে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অথচ সত্য বলতে কি বুসরের ঘোষণায় প্রমাণিত হয় যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অধীনস্থ গভর্নর এবং অধীনস্থ

www.pathagar.com

কর্মকর্তাগণ মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হেদায়াত ও নির্দেশকে আল্লাহ্ এবং রাসূলের ফরমানের চেয়েও অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। অন্যথায় আল্লাহভীতি ও রাসূলের আনুগত্যের ভার যার হৃদয়ে আমীরের ভয় ও শ্রদ্ধার চেয়ে অধিক প্রবল, সে ব্যক্তি মসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে মদীনাবাসীকে এই বলে হুমকী দিতে পারতেন না যে, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী না করলে আমি এ নগরীর (শিশু ছাড়া) সকলকে হত্যা করতে দ্বিধা করতাম না। খোদ রাসূলের শহর মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিতিই হত্যার তাণ্ডবলীলা থেকে বিরত থাকার জন্যে একজন মুসলমানের জন্যে কি যথেষ্ট নয়? হৃদয়ে আল্লাহর ভয় এবং রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে, এমন ব্যক্তি কস্মিনকালেও এরূপ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। এরূপ জঘন্য ও অমানুষিক কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে অন্য কোনো নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা খোদার উপর খোদকারী নয় কি ? এজন্যে অপরের নিষেধ সূচক কোনো নির্দেশের কারণে বিরত হওয়া কেন, খোদ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশের প্রতি তাকিয়েই তো ইত্যাকার, ক্ষেত্রে ঈমানী চেতনা বলে—সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَـًٔا .... وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ـ(النساء : ٩٢ـ٩٣)

অনুরূপভাবে নবীর এরশাদ হলো ঃ

لايريد احد المدينة بسوء الا اذابه الله فى النار ذوب الرصاص ـ

"মদীনা সম্পর্কে যে কেউ খারাপ ধারণা পোষণ করলে আল্লাহ্ তাকে সীসার মতো আগুনে গালিয়ে দিবেন।"

ومن اخاف اهل المدينة ظلما اخافه الله وعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين ـ

"যে মদীনাবাসীদেরকে অন্যায়ভাবে উত্যক্ত করবে আল্লাহ্ তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করবেন এবং আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষ তাকে অভিশাপ দেবে।"

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে নিষেধ না করলে আমি মদীনাবাসী সকলের মাথা উড়িয়ে দিতাম।"–এর অর্থ এই হলো না যে,

www.pathagar.com

আমীরের নির্দেশ পেলে আমি একাজ করতে বিন্দুমাত্র পরওয়া করতাম না।[১] তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর কর্মকর্তাদেরকে যারা উল্লেখিত কাজসমূহের দায়িত্ব থেকে মুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করেন আর এরূপে উক্তি ও দলীল পেশ করেন, তাদের এহেন ওকালতির ভিত্তি নেহায়েতই দুর্বল। একথা উল্লেখ করলে তারা খুবই নাখোশ হন। এ ধরনের বুমেরাং ধরনের সাফাই সাক্ষী দেয়ার চেয়ে না দেয়াটা যে উত্তম, একথা তারা তলিয়ে দেখেন না।

মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব একথাও লিখেছেন, বিপদের সময় অতিবাহিত হওয়ার পরই বুসরের কতিপয় বাড়াবাড়ি সম্পর্কে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অবহিত হন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ (ইবনে খালদুনের বর্ণনানুযায়ী) বুসরকে গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। ওসমানী সাহেব ক্ষতিপূরণের বিস্তারিত বর্ণনা কিছুই দেননি এবং বিপর্যস্ত অবস্থা কখন থেকে শুরু হয়ে কখন শেষ হলো তারও কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তাবারী ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে জানা যায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত বরং ইমাম হাসানের সাথে সন্ধি চুক্তি হওয়ার পরও বুসরের সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা অব্যাহত থাকে। ৪১ হিজরী সনে ইমরান বিন আবান যখন বসরা দখল করে নেয় তখনও যিয়াদ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থক ছিলো। সে ইরান অঞ্চলে কুর্দী দমনে নিয়োজিত ছিলো। এ সময়ে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আলী সমর্থক হামরান ও যিয়াদ উভয়কেই বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্যে তাদের দমনে বুসরকে পাঠান। বসরায় পৌঁছে বুসর মিম্বারে দাঁড়িয়ে প্রথমেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার ধৃষ্ঠতা দেখায়।[২] তারপর যিয়াদের ছেলেদেরকে গ্রেফতার করে এনে রাজস্ব সহকারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে হাজির হওয়ার প্রতিশ্রুতিপত্রে দস্তখত নেয়। অন্যথায় তার সন্তানদের হত্যা করা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, যিয়াদ তখনও পর্যন্ত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থক, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিজ পিতার সন্তান রূপে স্বীকৃতি দিয়ে এখনও ভাই বানিয়ে নেয়নি। আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু মধ্যস্থতা করে

---

১. বুসর মদীনাবাসীদেরকে এমন এক অন্তিম সময়ে পাইকারীভাবে হত্যার হুমকি দেয় যখন গোটা শহরে একজন লোকও মুকাবিলা করার সাহস দেখাতে পারেনি। তাবারীর ৪র্থ খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় আছে ঃ .... دخل بسر المدينة فصعد منبرها ولم يقاتله بها احد ، فنادى ইবনে আসীরের আল কামেলের ২য় খণ্ডের ১৯২ পৃষ্ঠায় একথাই লেখা আছে।

২. বসরার মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঃ خطب بسر على منبر البصرة فشتم عليا বুসর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করে। তাবারী খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা–১২৮; আল কামেল খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা–২০৭)

www.pathagar.com

বিরাট ঝুঁকি নিয়ে ঐ ছেলেদের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর বুসর তিন বছর পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তৎপর থাকে। একথা সত্য নয় যে, অন্যায় অত্যাচারের শাস্তি হিসাবে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে পদচ্যুত করেছিলেন। সঠিক তথ্য হলো, বুসর ক্ষমতার অপব্যবহার করে যেসব যুলুম নিপীড়নমূলক কাজ করেছিলো সেগুলোর ব্যাপারে তার কোনো প্রকার কৈফিয়ত তলব করা ছাড়াই একের পর এক তাকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হয়।

সাহাবা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা কি আপত্তিকর ?

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত বিষয়ে যাকিছু লিখেছেন তাতে মাওলানা তাকী ওসমানী ও তাঁর মতানুসারীরা বারবার একথা বলে থাকেন যে, নিছক ইতিহাসের তথ্যের উপর ভর করে সম্মানিত সাহাবাদের দোষারোপ ও ভর্ৎসনা করা অবৈধ। খেলাফত ও রাজতন্ত্র বইয়ের অন্যান্য ঐতিহাসিক রাওয়ায়েতসমূহের খেলাফ এ ধরনের অভিযোগই তারা উত্থাপন করে থাকেন। কিন্তু নানান কারণে এ ধরনের অভিযোগ ভ্রান্ত। প্রথম কারণতো হলো, কোনো সাহাবীর ভুলকে ভুল বলে বর্ণনা করা কিংবা তাঁর কোনো কথা বা কাজকে কুরআন-হাদীসের কষ্টিপাথরে যাঁচাই করা দোষের কারণ হতে পারে না। সাহাবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা খণ্ডনের ব্যাপারে শাহ আবদুল আযীয মোহাদ্দিস দেহলভী সাহেবের চেয়ে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আমাদের নিকটবর্তী যুগে আর কেউ ছিলো কিনা সন্দেহ। এ কারণে তাঁকে প্রাণহানির আশংকা সহ বৈষয়িক অনেক বড় বড় বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। তাঁর মাল-সম্পদ যেভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা ভাবলে গা শিহরে উঠে। একথা আমি আগের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। এই মহান ব্যক্তিত্বও যেখানে নিজে সাহাবায়ে কেরামের কুৎসা রটনা থেকে রসনাকে সংযত রাখতে বলেছেন, কিন্তু ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা প্রদান না করে পারেননি। যেমন, তিনি সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভর্ৎসনা ও তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠনকে কবীরা গোনাহ আখ্যায়িত করে এজন্য আমীরে মুয়াবিয়াকে অভিযুক্ত করেছেন। শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভীর এ উক্তি কি একথারই প্রমাণ নয় যে, প্রয়োজনে সত্য উদ্ঘাটনের স্বার্থে ইতিহাসের এ জাতীয় ঘটনার বর্ণনা কারও কুৎসা বা কাউকে গালমন্দ করার সমার্থক নয়। ফতওয়ায়ে আযীযিয়া গ্রন্থে শাহ সাহেবের একটি প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এর একটি জবাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন ছিলো, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মারওয়ানকে গালমন্দ করার প্রমাণ আহলে সুন্নাতদের কাছে আছে কি ? এর জবাবে তিনি মারওয়ানকে শয়তান ও অভিশপ্ত সাব্যস্ত করেন এবং তার

www.pathagar.com

প্রতি আন্তরিক অসন্তুষ্টি পোষণকে সুন্নাতের দাবী গণ্য করে অতপর তিনি লিখেছেন ঃ

"ওলামা, তাফসীরকার ও ফকীহগণ বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ একমাত্র খাতা-ই-ইজতিহাদ তথা ভ্রান্ত চিন্তা প্রসূত ছিলো। কিন্তু হাদীস বিশারদগণ রাওয়ায়েত অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এসব তৎপরতা ব্যক্তিগত স্বার্থের সংমিশ্রণ মুক্ত ছিলো না। হযরত ওসমান জিননুরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে উমাইয়া এবং কুরাইশদের মধ্যে বিরাজমান গোত্রীয় পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব থেকেই আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত হন। পরিণতিতে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী ও কবিরা গোনায় লিপ্ত বলে সাব্যস্ত হন। والفاسق ليس باهل اللعن অর্থাৎ 'গোনাহ্কারীকে অভিশাপ দেয়া যায় না।' তার কাজটিকে খারাপ বলা এবং খারাপ বলে প্রমাণিত করে এ থেকে অন্যদের দূরে থাকার ব্যবস্থা করার যে অনুমতি আছে, ইসলামের তথ্যজ্ঞান সমৃদ্ধ মনীষীদের কাছে তার প্রমাণ স্পষ্ট। আর খারাপ বলার উদ্দেশ্য যদি হয় গালমন্দ ও অভিসম্পাত বর্ষণ করা তাহলে (আল্লাহ রক্ষা করুন) আহলে সুন্নাত জামায়াতের কেউই এর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না। কেননা কাউকে অভিশপ্ত করা হারাম, বিশেষত হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবিয়াতের মর্যাদাপ্রাপ্ত হওয়ায় তার ব্যাপারেতো সম্পূর্ণ হারাম, ফাসেক ও কবীরা গোনাহ্গারের জন্যে মাগফিরাত কামনা করার নির্দেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রমাণিত আছে। (ফতওয়ায়ে আযীযিয়া, কুতুবখানায়ে রহিমীয়া, দেওবন্দ খণ্ড–১, পৃষ্ঠা–১৭৭ ফার্সী। সাঈদ এণ্ড কো! করাচী কর্তৃক উর্দুতে প্রকাশিত ২২৫ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।)

শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রচিত 'তোহ্ফায়ে ইসনা আশারীয়া শিয়া মতবাদ খণ্ডনের ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থে নিম্ন বর্ণিত বাক্য রয়েছে ঃ

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত রায় হলো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতের (রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব) সূচনালগ্ন থেকে ইমাম হাসানের ইমামত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সোপর্দ করার আগ পর্যন্ত তৎকালীন বৈধ ইমাম (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর) আনুগত্য না করার কারণে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে পরিগণিত। ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক ইমামত তাঁর কাছে সোপর্দ করার পরই তিনি বাদশাহ হন। এবার সন্দেহ থাকে, আমীরে মুয়াবিয়া

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রাষ্ট্রদ্রোহী সাব্যস্ত হলেন এবং অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভের সংঘাতে প্রাধান্য লাভ করলেন, এজন্যে কেন তাঁর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করা যাবে না ? এর জবাব হলো, আহলে সুন্নাতের মতে কবীরা গোনাহকারী ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ প্রদান নাজায়েয। একজন রাষ্ট্রদ্রোহী কবীরা গোনায় অভিযুক্ত হলে তাকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ এবং নাজায়েয।"- (তোহফায়ে ইসনা আশারীয়া ঃ অনুবাদ পৃষ্ঠা-২৮৫ নূর মোহাম্মদ, করাচী কর্তৃক প্রকাশিত)

এবার যদি কেউ শাহ আবদুল আযীযের বর্ণিত কথাগুলো উন্মেলিত নয়নে মুক্তমনে পাঠ করে, তাহলে তার কাছে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মকাণ্ডে পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতার মিশ্রণ ও অন্যায় আচরণের দিকটি অস্পষ্ট থাকতে পারে না। অবশ্য আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করা এবং তাঁর উপর অভিশাপ দেয়া থেকে বিরত থাকার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, আর এটাকেই তিনি আহলে সুন্নাতের মত বলে উল্লেখ করেছেন। খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থে আহলে সুন্নাতের এ নীতিই অনুসৃত হয়েছে। তাতে প্রামাণ্য ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহের বিবরণ দেয়া হয়েছে, অন্যায়কে অন্যায় এবং ভুলকে ভুল বলা হয়েছে। গালমন্দ ও অভিসম্পাত করার নীতি কঠোরভাবে পরিহার করা হয়েছে।

হাদীস গ্রন্থাবলী দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সত্যায়ন

এ ব্যাপারে বিশ্লেষণ যোগ্য দ্বিতীয় কথাটি হলো, আমাদের ইতিহাসবিদগণ ঐতিহাসিক রাওয়ায়েতসমূহের মধ্যস্থতায় সাহাবায়ে কেরামের অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত যেসব প্রমাণ উপকরণ একত্রিত করেছেন, সেগুলোর উৎস কেন্দ্র সহীহ হাদীস ও আছারে বিদ্যমান আছে। এগুলো নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন। এ কারণে ইতিহাসের 'জঈফ' ও 'মজরুহ' রাবীদের কাছ থেকেও এ ধরনের ঐতিহাসিক উপকরণাদি গ্রহণ করাকে দোষণীয় মনে করা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মতৎপরতার কথা বলা যায়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ করা এবং এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব ধরনের চাতুর্য ও কলা-কৌশলের আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এ সত্য কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বর্ণনা ও রাওয়ায়েতসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সিয়াহ সিত্তা হাদীসের অত্যন্ত সঠিক সনদ ও রাওয়ায়েতসমূহেও এর দলীল-প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। আমি এখানে এ ধরনের একটি উদাহরণ পেশ করছি। মুসলিম শরীফের ইমারত অধ্যায়ের بيعة الخليفة الاول فالاول পরিচ্ছেদের

www.pathagar.com

একটি হাদীস আবদুর রহমান বিন আবদ রাব্বিল কা'বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আ'স বাইতুল্লায় বসে বর্ণনা করছিলেন, একটি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে একত্রিত করে এক বক্তৃতা দিলেন। এ বক্তৃতায় তিনি আসন্ন কতিপয় ফেতনার ভবিষ্যদ্বাণী করে পরিশেষে বললেন ঃ

ومن بايع اماماً فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء اخرينا زعه فاضربوا عنق الاخر فدنوت منه فقلت انشدك الله انتَ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه سلم ؟ فاهوى الى ذينه وقلبه بيديه وقال سمعته اذناى ووعاه قلبى فقلت له هذا بن عمك معاوية يأمرنا ان ناكل اموالنا بيننا بالباطل ونقتل انفسنا، والله يقول :

"হাতের সাথে হাত মিলিয়ে মনেপ্রাণে কাউকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করার শপথ নিলে তাকে যথাসম্ভব মান্য করা উচিত। এমতাবস্থায় অপর কেউ ইমাম হওয়ার দাবী করলে তাকে ঠেকাও এবং (প্রয়োজনবোধে) তার গর্দান উড়িয়ে দাও। (রাবী আবদুর রহমান বললেন) আমি হযরত আবদুল্লাহর কাছে গিয়ে আল্লাহর কসম দিয়ে বললাম ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন কি ? তখন তিনি তার নিজের কান ও মনের দিকে স্বীয় আংগুল দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ আমার দু' কানে শুনেছি এবং তা গেঁথে রেখেছি। তারপর আমি (রাবী) হযরত আবদুল্লাহকে বললাম ঃ আপনার চাচার ছেলে মুয়াবিয়া অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ করতে এবং নিজেদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ চালাবার জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। অথচ আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَاكُلُوا اَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ اِلاَّ اَن تَكُونَ تِجَارَة عَن تَرَاضٍ مِنكُم وَلاَ تَقتُلُوا اَنفُسَكُم ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُم رَحِيمًا ـ فسكت ساعةً ثُمَّ قالَ اطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله ـ

"হে ঈমানদারগণ ! বাতিল পন্থায় তোমরা পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না। বরং পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও ব্যবসায়িক লেন-দেনের মাধ্যমে তা করো এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করো না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর অবশ্যই মেহেরবান।" (রাবীর কথা) হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার একথায় কিছুক্ষণের জন্যে চুপ থেকে বললেন ঃ

www.pathagar.com

আল্লাহর আনুগত্যের অধীন হয়ে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর আনুগত্য করো, তাঁর আনুগত্যের তাৎপর্য যদি হয় আল্লাহর নাফরমানী করা তাহলে আমীরে মুয়াবিয়ার নির্দেশ অমান্য করো।"

এ হাদীসটি শব্দের সামান্য ব্যতিক্রম সহ সুনানে আবু দাউদের ফিতান অধ্যায়েও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটিতে প্রথম ইমাম এবং দ্বিতীয় দাবীদার ও বিতর্কিত ইমামের কথা যেভাবে বলা হয়েছে তাতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর কথা প্রচ্ছন্নভাবেই বলা যায়। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঝগড়া-ফাসাদের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করেছেন, জনগণের জান-মালের ব্যাপারে নিজে কিংবা স্বীয় সেনাবাহিনী ও আমলাদের মাধ্যমে যে বাড়াবাড়ি করেছেন এবং এ উদ্দেশ্যে যেসব কলা-কৌশল ও নীতিমালা গ্রহণ করেছেন তার সবগুলোই ছিলো নাজায়েয। এজন্যে সকল দায়-দায়িত্বই আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর বর্তায়। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

"রাবীর কথার উদ্দেশ্য হলো, প্রথম স্বীকৃত খলীফার বর্তমানে অপর কারো খেলাফতের দাবী নিয়ে কলহ ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হওয়া হারাম এবং সে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার উপযোগী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে এ হাদীসটি শুনার পর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত বলে রাবীর ধারণা হলো। কেননা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রথমেই খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি তাঁর সাথে শাসন ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হন। সুতরাং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর সেনাবাহিনী ও আমলাদের জন্যে যাকিছু ব্যয় করেছেন, তা কুরআনে বর্ণিত অবৈধভাবে সম্পদ ভোগ এবং মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর খুনাখুনিরই সমার্থক বলে রাবী আবদুর রহমান রায় দিয়েছেন। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর অধীন হয়ে আমীরে মুয়াবিয়ার আনুগত্য করতে এবং আল্লাহর নাফরমানীর ক্ষেত্রে তাকে অমান্য করতে বললেন।"

রাবী আবদুর রহমানের গৃহীত রায়ের সাথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো মতপার্থক্য ছিলো না—রাওয়াতটি একথারও প্রমাণ বৈকি। অন্যথায় তিনি আবদুর রহমানকে অবশ্যই বলতেন—তোমার ধারণা ভুল, এটাতো একটি ইজতিহাদী মতভেদ মাত্র। সুতরাং এ তৎপরতাকে বাতিল

www.pathagar.com

পন্থায় অপরের সম্পদ ভোগ আর মুসলমানদের পারস্পরিক খুনাখুনির পর্যায়ে ফেলা ঠিক নয়। অধিকন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আমর তাঁর বাপের সাথে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধ শিবিরে এসেছিলেন কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। আপনি কেন এসেছিলেন ? একথা কেউ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাপের অমান্য না করার জন্যে আমাকে একবার উপদেশ দিয়েছিলেন। সে কথা স্মরণ করেই বাপের নির্দেশে তাঁর সাথে শিবিরে আসি। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহর নাফরমানী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্ন হলো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল হিসেবে গণ্য করার মতো রাওয়ায়েত এভাবে সহীহ মুসলিম ও সুনানে আবু দাউদে থাকা সত্ত্বেও যদি সেগুলোর বর্ণনাকে অতীতের ইসলামী বিশেষজ্ঞ ইমাম মুজতাহিদগণ গালমন্দ রূপে বিবেচনা না করে থাকেন, তাহলে আমীরে মুয়াবিয়া কিংবা তাঁর কোনো গভর্নরের কোনো ক্রুটিযুক্ত ঐতিহাসিক রাওয়ায়েত বর্ণনা করলে তাতে কেন অন্যায় হবে বা সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে ?

মুসলমান নারীদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করা প্রসংগ

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাই বুসর বিন আবু আরতাত সম্পর্কে আরো লিখেছেন, "আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনাধীন ইয়ামনের হামাদান শহর আক্রমণ করার জন্যে প্রেরণ করেন। সেখানে সে পৌঁছে যুদ্ধবন্দী মুসলমান মহিলাদেরকে ক্রীতদাসী বানিয়ে অত্যাচারের এক জঘন্য নজির স্থাপন করে।" মাওলানা মওদূদীর একথারও সমালোচনা করেন মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব। তিনি বলেন, একথা 'ইস্তেআব' ছাড়া অন্য কোনো ইতিহাস গ্রন্থে নেই কিংবা কোনো ইতিহাসবিদ স্বীয় গ্রন্থে একথা সন্নিবেশিত করা যথার্থ মনে করেননি। রাওয়ায়েতের সনদে মূসা বিন ওবাইদাহ নামের রাবী জঈফ হওয়ায় তার রাওয়ায়েত বৈধ নয়।

ইস্তেআব ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থে একথা না থাকার যে দাবী ওসমানী সাহেব ও অন্যান্যগণ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা 'উসুদুল গাবাহ ফি মাআরিফাতিস সাহাবা' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৮১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে লিখিত আছে।[১] বুসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক ইবনে আসীর বলেছেন, ইয়াহইয়ার বর্ণনা মতে বুসর একজন খারাপ লোক ছিলো। কেননা সে

১. শেষের দিকে এ বিষয়ের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিসদের বর্ণনা অনুযায়ী কবীরা গোনায় লিপ্ত ছিলো। ওবাইদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের দু'টি মাসুম শিশু আবদুর রহমান ও কুসুমকে তাদের মায়ের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এ শোকে মা উন্মাদিনী হয়ে যান। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হেযাজ ও ইয়ামনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থকদেরকে নির্মূল করার জন্যে বুসরকে পাঠিয়েছেন। গ্রন্থকার আরো লিখেছেন ঃ

واغار على همدان باليمن وسبى نساء هم فكن اول مسلمات سبين في الاسلام وهدم بالمدينة دوراً وقد ذكرت الحادثة في التواريخ فلا حاجة الى الاطالة بذكرها ـ

> "এ লোকটি ইয়ামনের হামাদান শহরটি লুটতরাজ করে সেখানকার মহিলাদেরকে ক্রীতদাসীতে পরিণত করে। এ দুর্ভাগা নারীগণই সর্বপ্রথম মুসলমান পরিচিতি বহন করে দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ হন। লোকটি মদীনা শহরটি ধ্বংস করে দেয়। ঘটনা ইতিহাস খ্যাত হওয়ায় এর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।"

আমি মনে করি হাফেজ ইবনে আবদুল বার এবং হাফেজ ইবনে আসীর আল জুবরীর (আল কামেল[১] রচয়িতা) মতো খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ দ্বয়ের যে কোনো একজন কর্তৃক এ ঘটনার বর্ণনাদান দাবী প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট।[২] এরপরও আল বালাগ সম্পাদক সাহেব কিংবা অন্য কেউ এ ঘটনা অস্বীকার করতে চাইলে ফেতনা যুগের গোটা ইতিহাসকেই অস্বীকার করা জরুরী হয়ে পড়বে। তবে এরূপ অস্বীকার দ্বারা সত্যকে চাপা দেয়া যায় না। (ان ما تحذرين قد وقعت) অবশ্য কোনো রাবী জঈফ কিংবা বিতর্কিত হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য বিষয়। এ বিষয়ে আমি প্রথমেই স্ববিস্তারে আরজ করেছি। ঐতিহাসিক আলোচনার প্রতিটি ক্ষেত্রে রাবীর ভালো দিকগুলো জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করা অসম্ভব। আজ পর্যন্ত কেউ এ কাজটি করতে সক্ষম হননি।

---

১. স্মর্তব্য যে, ইবনে আসীর তার ইতিহাস গ্রন্থ আল কামেলের পর 'উসদুল গাবাহ' প্রণয়ন করেন এবং এ গ্রন্থে অধিকতর প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উল্লেখ করেন। তিনি সাধারণত লিখে দিতেন—অবশিষ্ট ঘটনা আমার ইতিহাস গ্রন্থে আছে। ইমাম জাহবীও এ ঘটনার কথা লিখেছেন। -(পৃষ্ঠা-২৪৯ দ্রঃ)

২. ইবনে হাজরও তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

فعل بمكة والمدينة واليمن افعالا قبيحة ولاه المعاوية اليمن وكانت بها اثار غير محمودة

এ ঘৃণ্য ও পৈশাচিক কাজের বিশদ বিবরণ রয়েছে ইসতেআব ও উসুদুল গাবাহ গ্রন্থদ্বয়ে।

www.pathagar.com

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শিরোচ্ছেদ প্রসঙ্গ

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা কেটে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিয়ে যাওয়ার যে রাওয়ায়েত মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উল্লেখ করেছেন, তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তাকী ওসমানী বলেন—এ ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদী সাহেবের উপস্থাপিত রাওয়ায়েতটি সহীহ, তবে এ ব্যাপারে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অভিযুক্ত করাটা কিছুতেই সঙ্গত নয়। কারণ, এ রাওয়ায়েতে হত্যাকাণ্ডটির ব্যাপারে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকার কথা উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্য ওমাইর বিন জারমূযও হযরত যুবাইয়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিয়ে যায়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কেউ শিরোচ্ছেদ করার নির্দেশ দেননি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এরূপ রাওয়ায়েত আছে, তিনি হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কথা শুনে অনুতপ্ত হয়েছিলেন ; কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাহিনীতে এ ধরনের কোনো কথার উল্লেখ নেই। তবে অনুতপ্ত হবার কথা উল্লেখ না থাকাটাই অনুতাপ না করার প্রমাণ নয়।

জনাব ওসমানী সাহেব মস্তক খণ্ডনের উভয় ঘটনার মধ্যে যে ধরনের সাদৃশ্য দেখাবার এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মপন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনায় উভয় ঘটনার মধ্যে বিরাট পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। ইবনে আবদুল বার, ইবনে সায়াদ এবং ইবনে কাসীর প্রমুখ ইতিহাসবিদ ইবনে জারমুয সম্পর্কে যাকিছু লিখেছেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে, এ হতভাগা সৈন্যটি হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা কেটে তাঁর তলোয়ার সহ মাথা নিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌছে। উদ্দেশ্য, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খুশী হয়ে তাকে অযাচিতভাবে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু দেখা গেলো, তিনি এ কাজে মর্মাহত হয়ে নামেমাত্র আফসোস প্রকাশ করেননি বরং তিনি বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে হত্যাকারীকে তার সামনে আসতে নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন ঃ بشره بالنار "তাকে দোযখবাসী হওয়ার খবর শুনিয়ে দাও।" তারপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তলোয়ারটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বললেন ঃ এ তলোয়ার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লামের শত্রু হামলা প্রতিরোধে কতবার ব্যবহৃত হয়েছে। অপরদিকে দু'জন লোক যখন সাহাবী হযরত আম্মারের কর্তিত মস্তক নিয়ে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থিত হলো এবং উভয়ই নিজেকে আম্মার হত্যার কৃতিত্বের অধিকারী বলে দাবী করছিলো, তখন তিনি এ দৃশ্য দেখে কোনো প্রকার দুঃখ প্রকাশ করেছেন বা হত্যাকারীদেরকে শাসিয়েছেন এ সম্পর্কিত আলোচনার কোনো একটি গ্রন্থেই তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ হত্যাকারীদের শাসানো কিংবা তাঁর অনুতপ্ত হওয়া যদি বাস্তব সত্য হতো, তাহলে একথাগুলো প্রকাশ না হওয়ার কোনো সংগত কারণই ছিলো না। মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য ইতিহাস বিষয়ক রাওয়ায়েতে আছে, হত্যার দাবীদার ঐ দু'জন হত্যাকারীকে ঝগড়া করতে দেখে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস বলেছিলেন ঃ তোমাদের দু'জনের প্রত্যেকেই যদি আম্মার হত্যার ন্যায় জঘন্য হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলতে–আমি করিনি, আমার সাথী করেছে তাহলে এটা কতইনা ভালো হতো। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আম্মারের উদ্দেশে বলতে শুনেছি ঃ تقتلك فئة باغية "তোমাকে একটি বিদ্রোহী গ্রুপ হত্যা করবে।" আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে তুমি কেন আমাদের সাথে আসলে ? ইবনে আমর একথার যে জবাব দিয়েছেন তা আমরা আগে উল্লেখ করেছি।[১] আমরা আম্মারকে হত্যা করিনি বরং আলী

---

১. মুসনাদে আহমদের ১১শ খণ্ডের ৬৯২৯নং হাদীসের (আবদুল্লাহ ইবনে আমরের রাওয়ায়েতসমূহের) (দারুল মাআরিফ লাইব্রেরী, মিসর) ভাষা নিম্নরূপ ঃ

فقال معاوية الا تغني عنا مجنونك يا عمرو، فما بالك معنا - قال ان ابى شكافى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اطع اباك ما دام حيا ولا تعصه، فانا معكم ولست اقاتل -

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন ঃ আপনি এ উন্মাদ ছেলেটাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন না কেন ? তারপর আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন ঃ যদি সত্য এটাই হয় তাহলে তুমি আমাদের সাথে কেন এসেছো ? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার পিতা একবার আমার বিরুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলে তিনি পিতার জীবিত কাল পর্যন্ত তাঁর হুকুম পালন করার নির্দেশ দেন। তার অবাধ্য হতে নিষেধ করেন। এ কারণেই আমি আপনাদের সাথে এসেছি। কিন্তু কোনোক্রমেই আমি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বো না।

তাতহীরুল জিনান (নূতন সংস্করণ কায়রো লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা–৩৩) গ্রন্থে ইবনে হাজর এবং ইমাম নাসায়ী খাসায়েসে আলী গ্রন্থের শেষ দিকে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তবে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যে কথা বলেছিলেন সেগুলো এ গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে এভাবে ঃ دحضت من قولك (তুমি তোমার কথা থেকে সরে গেছো) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد গ্রন্থে হাফেজ নূরুদ্দীন হাইসুমী এ ঘটনা উল্লেখ করতঃ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ لاتزال داحضا فى بولك (তুমি নিজের প্রসাবে পড়িয়ে গেছো)।

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সাথে করে নিয়ে এসে হত্যা করেছে। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এমন ধরনের কথাও কোনো কোনো রাওয়ায়েতে পাওয়া যায়। এটা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয় যে, এ ধরনের সব কথা তো রাওয়ায়েতে উল্লেখ হলো কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় আমীরে মুয়াবিয়া কর্তৃক অনুতপ্ত হওয়া ও হত্যাকারীকে শাসানোর প্রসঙ্গটির কোনো প্রমাণ অস্তিত্ব পাওয়া গেলো না। কেননা, সমস্ত ইতিহাসবিদ ও হাদীসবিশারদ জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হন্তাকারীদেরকে বিদ্রোহী গ্রুপ বলে ঘোষণা করেছেন। যদি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হত্যায় অনুতপ্ত হতেন তাহলে একথা রাওয়ায়েতে অবশ্যই উল্লেখ থাকতো। রাওয়ায়েতের মর্মানুযায়ী বুঝা যায়, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যাকারীকে শাসানোর পরিবর্তে হত্যা কাজের প্রতিবাদকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উল্টো শাসিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থাপিত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে উন্মাদ বলে যে ধমক দেন তার উপর ওসমানী সাহেবের কিছু মন্তব্য করা উচিত ছিলো। কেননা সেখানে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য তো উল্লেখ ছিলো, অনুল্লেখ ছিলো না। অধিকন্তু হাদীসটিও ছিলো সহীহ ও সঠিক। হাদীসের কোনো রাবীও রাফেজী কিংবা মিথ্যাবাদী নন, যা ওসমানী সাহেব নিজেও স্বীকার করেছেন।

আমর ইবনুল হামিককে হত্যা ও তাঁর কর্তিত মস্তক নিয়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শন

আমর ইবনুল হামিককের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেশ থেকে দেশান্তরে স্থানান্তরিত করার যে ঘটনা মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব লিখেছেন, ওসমানী সাহেব তা অস্বীকার করেন। ঘটনাটি হলো, যেমন—"ইবনে জারীরের গৃহীত রাওয়ায়েত অনুযায়ী 'মোসেল'-এর গভর্নর আমর ইবনুল হামিককে গ্রেফতার করার পর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখিত নির্দেশ প্রদান করলেন যে, তারা হযরত ওসমানকে যেভাবে বল্লমের দ্বারা ৯টি আঘাত করে হত্যা করেছে, তাদেরকেও অনুরূপভাবে হত্যা করো।"

তাকী ওসমানী সাহেবের বক্তব্য হলো, আল বিদায়া ছাড়া আর কোনো গ্রন্থে আমর ইবনুল হামিককে হত্যা করে মস্তক আলাদা করা কিংবা বিচ্ছিন্ন মস্তকটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিয়ে যাবার উল্লেখ কোথাও নেই। ওসমানী সাহেবের মতে ইবনে জারীরের রাওয়ায়েত খুবই রহস্যপূর্ণ। কেননা রাওয়ায়েতের বর্ণনাকারী আবু মুখান্নাফ শিয়া হওয়া সত্ত্বেও

www.pathagar.com

কর্তিত মাথা ঘুরে ঘুরে দেখানোর দোষ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর আরোপ করেনি।

কিন্তু ওসমানী সাহেবের বক্তব্যটি যেমন সঠিক নয়, তদ্রূপ এ দ্বারা মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেই প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, তাও দূর হচ্ছে না। মরহুম মাওলানা মওদূদীর প্রকৃত প্রশ্ন বা আপত্তিতো হলো, দেহ থেকে কারো মাথা বিচ্ছিন্ন করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর জাহেলী যুগের রীতি মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় তখনই শুরু হয়। অথচ জাহেলী যুগের এ প্রচলিত রীতি ইসলাম মুছে দিয়েছিলো।

আমর ইবনুল হামিককের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং কর্তিত মস্তক আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে পৌছে দেয়ার কথা তাকী ওসমানী সাহেবের ধারণা মতে কেবলমাত্র 'আল বেদায়া' গ্রন্থেই উল্লেখ হয়নি বরং 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে, যার উদ্ধৃতি মাওলানা মওদূদী সাহেব দিয়েছেন। ইবনে হাজার এ গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ৩৪ পৃষ্ঠায় ইবনে হাব্বানের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন–হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর আমর ইবনুল হামিক মোসেল-এ গিয়ে একটি গর্তে লুক্কায়িত থাকা অবস্থায় তাঁকে সাপে দংশন করে। তারপর তিনি লিখেছেন : فاخذ عامل الموصل رأسه وحمله الى زياد فبعث زياد رأسه الى معاوية। মোসেলের গভর্নর আমর ইবনুল হামিকের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। যিয়াদ সে মস্তকটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে পৌছে দেয়। ধরে নেয়া গেলো, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তিত মাথাটি বিভিন্ন স্থানে ঘুরাবার নির্দেশ দেননি, কিন্তু বিদায়া ও তাহযীবুত তাহযীব উভয় গ্রন্থে তো একথার উল্লেখ আছে যে, এ কর্তিত মাথা মোসেল থেকে বসরা ও কুফা এবং সেখান থেকে দামেশকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবার পর্যন্ত পৌছেছিলো। কর্তিত মস্তকের এ সফরের বিষয়টি তাঁর কাছে অজ্ঞাত না থাকাটাই স্বাভাবিক। পরিশেষে গ্রন্থকার লিখেছেন :

وذكر ابن جرير عن ابى مخنف ان عمر والحمق كان من اصحاب حجربن عدى يعنى فلذ الك اريد قتله وحمل رأسه لما مات۔

"এবং ইবনে জারীর আবু মুখান্নাফ থেকে বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনুল হামিক হুজার বিন আদীর অন্যতম সাথী ছিলেন। অর্থাৎ হুজার বিন আদীর সাথে বন্ধুত্বের কারণেই তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করা হয় এবং মৃত্যুর পর তার মস্তিষ্ক নিয়ে যাওয়া হয়।"

www.pathagar.com

সর্প দংশন কিংবা কিসাস যে কারণেই মৃত্যু হোক, লাশের বিকৃতি ঘটানো কোনো অবস্থাতেই ইসলাম সমর্থন করে না। সাহাবাগণ কাফেরদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন, শহীদের কলিজা চিবিয়ে কাফেররা লাশের বিকৃতি ঘটিয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের মৃত দেহকে অবমাননা করতে নিষেধ করেছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেবের চিন্তা ও যুক্তি প্রদর্শনের স্ববিরোধী নীতিতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। একদিকে তিনি খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহীত আচরণকে মতবিরোধ অনৈক্য কিংবা ইজতিহাদী ভুল ইত্যাকার শিরোনাম দিয়ে সাফাই পেশ করছেন, অপরদিকে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় হুজার বিন আদীর গৃহীত নীতিকে সম্পূর্ণ রূপে বিদ্রোহ এবং হত্যাযোগ্য অপরাধরূপে প্রমাণ করার তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। (এ বিষয়ের আলোচনা পরে আসছে) একই চরিত্রের কার্যাবলীকে দু' ধরনের মানদণ্ডে ওজন করার বৈধতা সম্পর্কে কোনো দলীল আছে কি ? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে কোনো সাহাবীকে গালমন্দ করা নিসন্দেহে একটি মস্তবড় গুনাহের কাজ। কিন্তু এর অর্থ আদৌ এটা নয় যে, সাহাবীর কোনো কথা ও কাজ কুরআন-হাদীসের বরখেলাফ হলেও তাকে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক বলতে হবে অথবা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী ঠিক নয়—বললেও গুনাহের কাজ হবে।" তাকী ওসমানী সাহেব আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিটি কাজকে যেভাবে নির্বিচারে সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ কখনো এরূপ চেষ্টা করেননি। শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী সাহেবের এ সম্পর্কিত মত আমি আগেই উল্লেখ করেছি। পরিশেষে মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী সাহেবের হেদায়েতে শিয়া পুস্তিকার ৩০ পৃষ্ঠার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি এ আলোচনার ইতি টানবো। গাংগুহী সাহেব শিয়া মতাবলম্বী কতিপয় ব্যক্তির একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছেন ঃ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংঘটিত যুদ্ধকে আহলে সুন্নাতগণ কখনো ভালো ও জায়েয বলেনি। আহলে সুন্নাতের কোনো গ্রন্থ খুলে দেখুন সর্বত্রই তাঁরা তাঁকে এ ব্যাপারে দোষী বলে থাকেন। কিন্তু এ ধরনের ভুলের কারণে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈমানের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাননি। যেমন তোমরা (শীয়া) এবং তোমাদের পূর্বশুরীরা মনে করে থাকেন। কারণ, আল্লাহ বলেছেন

www.pathagar.com

লক্ষ্য কর ! আয়াতে وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا .... ঃ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত উর্ভয় দলকে মুমিন রূপেই অখ্যায়িত করা হয়েছে। ফাসেকী বা কবীরা গুনাহের কারণে মুসলমান কাফের না হওয়ার ব্যাপারে এরূপ শত আয়াত কুরআনে রয়েছে।

দুই ঃ যিয়াদের অত্যাচার এবং তার বর্ণনাকারী

শুধুমাত্র কয়েকটি কংকর ছোঁড়ার অপরাধে কতিপয় লোককে মসজিদে আবদ্ধ করে যিয়াদ কর্তৃক তাদের হাতগুলো কেটে দেয়ার যে ঘৃণ্য ঘটনার কথা ইতিহাসে বিধৃত হয়েছে সে সম্পর্কে তাকী ওসমানী সাহেব লিখেছেন, এটা ছিলো যিয়াদের ব্যক্তিগত কাজ, সুতরাং এ সম্পর্কে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবগত হওয়া জরুরী নয়।

আমি এর জবাবে লিখেছিলাম, (নিজ প্রশাসনের কোনো গভর্নরের) এরূপ নিষ্ঠুরতা, পাষণ্ডতা ও শরীয়াত বিরোধী অপরাধ সম্পর্কে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনবহিত থাকা অসম্ভব। যিয়াদ এমন এক অত্যাচারী রক্ত পিপাসু গভর্নর ছিলো যার হাতে অনেক নিরপরাধ লোকের জীবন নাশ হতে থাকে। এরূপ অবর্ণনীয় অত্যাচার ও জঘন্য অপরাধ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের অজ্ঞাত থাকা কিংবা জ্ঞাত হয়ে সে ব্যাপারে সামান্যতম ভর্ৎসনা করাটাকেই যথেষ্ট জ্ঞান করা শরীয়াত অনুযায়ী নিষিদ্ধ অপরাধ। কংকর ছোঁড়াকে পাথর মারার রূপ দিয়ে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডদান সংক্রান্ত যিয়াদের অপরাধকে হালকা করে দেখা আর মাযলুমদের কাজকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভয়াবহ করে তোলার যে অবৈধ চেষ্টা তাকী ওসমানী সাহেব করেছেন সে সম্পর্কেও আমি তাকে অবহিত করেছি। কিন্তু ওসমানী সাহেব আমার কথায় কর্ণপাত না করে স্বীয় নীতিতে অটল থেকে আবারো একই কথা বললেন। খুতবা প্রদানের সময় তারা পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করে। তারপর সেসব রাবীদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। যেমন লিখেছেন, "আলী ইবনে আসেমের রাওয়ায়েতসমূহ জারাহ ও তাদীল ধরনের ত্রুটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ইমামদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। একথাও স্বীকৃত যে, তিনি রাওয়ায়েতে অনেক ভুল করে থাকেন কিন্তু সে ভুল তিনি স্বীকার করেন না। ইয়াযীদ বিন হারুন বলেন ঃ مازلنا نعرفه بالكذب "তার মিথ্যা রেওয়ায়েত আমরা অনবরত পেতে থাকি।"

এবার প্রকৃত অবস্থার সঠিক চিত্রটি দেখা যাক। হাফেজ ইবনে হাজর 'তাকরীবুত তাহযীব' ও 'তাহযীবুত তাহযীব' এ উভয় গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাযা এ গ্রন্থত্রয়ের ইমামগণ তাদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থে আলী ইবনে আসেমের রাওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ তাকী সাহেব তাহযীব গ্রন্থের যে জায়গার উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে গ্রন্থকার আরো বলেছেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আলী বিন আল মাদইয়ানী, ইবনে সায়াদ, জাহলীর মত হাদীসের ইমামগণ আলী ইবনে আসেমের শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনে হারুনের কথা উল্লেখ করার ব্যাপারে ওসমানী সাহেবের সাধুতা ও সততা লক্ষ্যণীয়। তিনিতো শুধু এতোটুকু কথা বলে দিলেন যে, এ রাবীর অসত্য বর্ণনার তথ্য আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু এর সাথেই একটু অগ্রসর হয়ে ইবনে হাজর বলেছেন ঃ

وحكى عن يزيد بن هارون فيه خلاف هذا ـ

"আলী ইবনে আসেম সম্পর্কে ইয়াযীদ বিন হারুন থেকে একথার খেলাফ কথাও বর্ণিত আছে।"

শেষ অংশটুকু তাকী ওসমানী সাহেব স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন, এ কারণে যে, ন্যায় অন্যায় যেভাবেই হোক আমাদের কথাকে রদ করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, বরং এরও আগে আলোচনার সূচনায় ইবনে হাজর মুহাদ্দিস ইয়াকুব বিন শাইবার কথা শামিল করে লিখেছেন ঃ

كان رحمه الله من اهل الدين والصلاح والخير البارع وشديد التوقى

"আলী ইবনে আসেম ছিলেন দীনদার, কল্যাণকামী সংস্কার সেবী ও সচেতন রাবী।"

তারপর দু'বার বর্ণিত হয়েছে মুহাদ্দিস ওয়াকীর কথা ঃ

ما زلنا نعرفه بالخير ـ

"আলী ইবনে আসেমকে আমরা ভালো হিসেবেই সবসময় জানতাম।"

এখানে ইমাম জাহলীর কথাও উল্লেখ আছে। তিনি আলী ইবনে আসেম সম্পর্কে ইমাম আহমদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন এবং রাওয়ায়েতের ব্যাপারে তার ভুল হওয়ার কথাও উল্লেখ করলে ইমাম আহমদ জবাবে বলেছেন ঃ হাম্মাদ বিন সালমাহও অনেক রাওয়ায়েতে ভুল করেছেন। তবে তাঁর থেকে রাওয়ায়েত করা কোনো অসুবিধা নেই। সালেহ বিন মুহাম্মদ বলেছেন, আলী আসেম মিথ্যা বলতেন না। তবে স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ না হওয়ায় ভ্রমবশতঃ হাদীসের শব্দাবলী উলট-পালট হয়ে যেতো। কিন্তু তাঁর সব হাদীস সঠিক ও সত্য। (سائر حديثه صحيح مستقيم)

আলী ইবনে আসেম সম্পর্কে তার নিজের ভুল স্বীকার না করার যে কথা বলা হয়েছে সে ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজর মুহাদ্দিস আল আজলীর কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

كان ثقة معروفا بالحديث والناس يظلمونه فى احاديث يسالون ان يدعها فلم يفعل -

"আলী হাদীস রাওয়ায়েতের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। কতিপয় হাদীসের ব্যাপারে লোকেরা তাঁর উপর যুলুম করেছে। তাঁর কাছে এ ধরনের হাদীস রাওয়ায়েত না করার দাবী করলে তিনি তা মেনে নেননি।"

খতীব বোগদাদী এরূপ হাদীসের সংখ্যা বলেছেন মাত্র চার। এগুলো অন্য কারো থেকে বর্ণিত হয়নি।

তাকী ওসমানী সাহেব তাহযীব ছাড়া ইবনে আবু হাতেমের কিতাবুল জারাহ্ ওয়াত তাদীল (৩য় খণ্ড, ১ম অংশ) গ্রন্থের যে দ্বিতীয় উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের একথাও আছে যে, আলী বিন আসেমও অন্যান্যদের মতই একজন মানুষ ছিলেন। তার কখনো ভুল হয়ে যেতো, কিন্তু তার ভুল রাওয়ায়েত ছেড়ে দিয়ে নির্ভুল হাদীসগুলো লিখে নেয়ায় কি দোষ! قد اخطا غيره তিনি ছাড়া অন্যরাও তো ভুল করে থাকেন।

এবার আমি ইমাম যাহবী প্রণীত 'মিযানুল ইতেদাল' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনিও তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাযা গ্রন্থত্রয়ে আলী বিন আসেমের হাদীস গ্রহণ করার কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। তারপর তিনি বলেছেন ঃ كتب منه من لايوصف كثرة তাঁর কাছ থেকে এতোবেশী লোক হাদীস লিখেছেন যা বর্ণনা করা যায় না। তাঁর দরসে হাদীসে ত্রিশ হাজার ছাত্রের উপস্থিতি ঘটতো। এরপর ইমাম যাহবী লিখেছেন, ইবনে আদী আলী বিন আসেম থেকে দু'টি রাওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেছেন, এ দু'টি রাওয়ায়েত বাতিল। এ মন্তব্যের উপর ইমাম যাহবী বলেছেন ঃ حاشا وكلا আলী বিন আসেম কখনো এ রাওয়ায়েত দু'টির রাবী নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এগুলো রাওয়ায়েত করেননি। আবদুল কুদ্দুস নামের একজন মিথ্যেবাদী রাবী এ রাওয়ায়েতগুলো বানিয়ে আলী বিন আসেমের নামের সাথে সম্পৃক্ত করে প্রতারণা করার কথা কেমন করে ইবনে আদীর কাছে গোপন রইলো তাতে আশ্চর্য হতে হয়। পরিশেষে ইমাম যাহবী লিখেছেন, ইবনে আসেম জঈফ হওয়া সত্ত্বেও হাদীস রাওয়ায়েতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সত্য ও সঠিক (فى نفسه صدوق)।

আলী বিন আসেম সম্পর্কে রিজাল গ্রন্থাবলী থেকে আমি যা কিছু ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি তাতে জারাহ্ ও তাদীল বিষয়ের ইমামগণের কাছে ইবনে আসেম পরিত্যাজ্য কিংবা দলীল হওয়ার অযোগ্য কিংবা তাঁর মিথ্যার খবর

www.pathagar.com

অনবরত আসার কথা প্রমাণিত হয় কি ; যেমনটি মুহাম্মদ তাকী সাহেব প্রমাণ করার কসরত করেছেন ? আমাদের আলোচ্য রাবীরও অবশ্যই যাঁচাই-বাছাই হয়েছে, যেমন তারা এর একটি ফিরিস্তিও দিয়েছেন। তবে তাকী ওসমানী সাহেবের সাথে বিভিন্ন সূত্রে পরিচিত লোকদের মধ্যে আরবী ভাষা জানা ও উপরোল্লেখিত গ্রন্থাবলী আত্মস্ত করতে সক্ষম লোকগণ মাযরূহ্ বা বিতর্কিত রাবীদের অটলতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে যেসব কথা লেখা আছে তা সেসব গ্রন্থাবলী খুলে দেখা উচিত। হাদীস রাওয়ায়েতের ভূবনে সব ধরনের ক্ষতি থেকে মুক্ত কতজন রাবী আছে ? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কাযী শোরাইক বিন আবদুল্লাহ্ আল কুফীকে রিজাল শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ বেশী ভুল করা এবং তাঁর বর্ণিত হাদীস অরক্ষিত বলে সাব্যস্ত করেছেন। এতদসত্ত্বেও তার রাওয়ায়েত সিয়াহ্ সিত্তাহ্ এমনকি সহীহ্ বুখারীতেও আছে। মিযানুল ই'তেদাল (ميزان الاعتدال) নামীয় গ্রন্থটি রিজাল শাস্ত্রের একটি মৌলিক গ্রন্থ। বইটি বিশেষতঃ বইয়ের ভূমিকাটি মনোযোগ সহকারে যে কারো পড়া থাকলে সে অবশ্যই জানবে যে, গ্রন্থটিতে মূলত শুধুমাত্র 'যঈফ' ও 'মাজরূহ' রাবীদের অবস্থার বিবরণ দেয়া উদ্দেশ্য। কিন্তু সম্ভবতঃ সিয়াহ্ সিত্তারও কোনো রাবী এ গ্রন্থের উল্লেখ থেকে রেহাই পায়নি। এর কারণ হলো, প্রত্যেক রাবীই অল্প বিস্তর অবশ্যই বিতর্কিত হয়েছে এবং রিজাল শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের কেউ না কেউ রাবীকে জঈফ বলে দিয়েছে। 'মিযান' প্রণেতা ইমাম জাহবী তার ব্যাখা মতে যেসব রাবীদের দুর্বলতা ও দোষ-ক্রটির কথা বলেছেন তাদের অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য। এতদসত্ত্বেও তাদের ক্রটির কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, জবাবে অটলতা ও বিশ্বস্ততা উল্লেখ করে ঐসব রাবীকে রক্ষা করা এবং তাদেরকে সমালোচনার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। এখন মুহাম্মদ তাকী সাহেব এবং আমাদের অন্যান্য সমালোচকগণ যদি কোনো কোনো রাবীর কেবলমাত্র ক্রটিগুলো তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করেন তাহলে এর চেয়ে বড় সত্য গোপন আর কি হতে পারে ?

যা হোক, আলী বিন আসেম যদিও নিষ্পাপ নয়, তাই বলে তাঁর সনদ অগ্রহণযোগ্য এবং তিনি অবশ্যই মিথ্যাবাদী ছিলেন না। রাওয়ায়েত বর্ণনা করার ব্যাপারে যদি তার ভুল হয়ে যেতো তাহলে এ ভুল প্রকৃতপক্ষে হাদীস রাওয়ায়েতের সাথে সম্পর্কিত। হাদীসের শব্দাবলী আগে-পরে হওয়ার ভুল করতে পারেন কিন্তু তিনি কোনো হাদীস বা ঐতিহাসিক ঘটনা বানিয়ে তা বর্ণনা করেননি। বড়জোর কোনো আংশিক ব্যাখ্যায় তিনি কম-বেশী করার ভুল করতে পারেন। যেমন, যিয়াদ যাদের হাত কেটে দিয়েছিলো তাদের সংখ্যা বর্ণনা করার ব্যাপারে তার ভুল হতে পারে (আসলে সংখ্যার রাওয়ায়েতসমূহ

www.pathagar.com

বিভিন্নও বটে) কিন্তু কতিপয় লোক যিয়াদের দিকে কংকর নিক্ষেপ করার অপরাধে মসজিদের দরযা বন্ধ করে যাদেরকে অপরাধী মনে করা হলো তাদের হাত কেটে দেয়ার পূর্ণ ঘটনা তো আর নিজের থেকে বানিয়ে বলা সম্ভব নয়। আমার বক্তব্য হলো, আলী বিন আসেম কিংবা আলী বিন মোহাম্মদ মাদায়ানী (ওসমানী সাহেব যাকে মোহাম্মদ বিন আলী নামে তাঁর গ্রন্থ ও পত্রিকা আল বালাগে বারবার লিখেছেন) প্রমুখ রাবীকে মিথ্যাবাদী ও বিতর্কিত রূপে স্বীকার করে নিলাম, কিন্তু অন্যান্য যেসব মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ যিয়াদের অত্যাচার ও অপরাধকে একটি প্রমাণিত সত্য রূপে গ্রহণ করেছেন তারা সকলেই কি মিথ্যাবাদী ও অসত্যের পূজারী ছিলেন ? যিয়াদের 'ইসমত' কি তাঁদের সকলের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান ? একথার জবাবে আমাকে বলা হয়, যিয়াদ ছিলো আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নর। সুতরাং তাকে কিছু বলো না। কিন্তু যারা যিয়াদের তাণ্ডবলীলার বর্ণনা দিয়েছেন তারা কি জানতেন না যে, তিনি গভর্নর ছিলেন এবং ক্ষমতার এ মসনদে বসেই তিনি এসব কাণ্ড ঘটিয়েছেন ? অনেক ইতিহাসবিদ লিখেছেন, যিয়াদ বসরার গভর্নর হওয়া মাত্র 'হামদ ও দরূদ' ছাড়াই জুমআর খুতবা দেন, যা জনগণের মাঝে "খুতবায়ে বাৎরা" (লেজ কাটা ভাষণ) নামে অভিহিত হয়। প্রদত্ত খুতবায় তিনি জনগণের জান-মাল ও মান-সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করার ধমক দেন যা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত করেন।

শাহ আবদুল আযীযের (র) কথা আমি 'পিতৃ বংশ পরিচয়ের অধ্যায়ে' বর্ণনা করেছি। তিনি লিখেছেন, "সন্দিগ্ধ পিতৃ পরিচয়ের এ যিয়াদ লোকটির কুকীর্তির দিকে চেয়ে দেখুন! সে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছত্রছায়ায় হযরত আলী রাদিয়ল্লাহু আনহুর সন্তানদের সাথে শত্রুতার সূত্রপাত করে।" তারপর তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তোহ্ফায়ে ইসনা আশারিয়ায়' (অনুবাদ ঃ ৪৮৩-৪৮৬) যিয়াদের অত্যাচারের মর্মন্তুদ ঘটনাবলী বর্ণনা করে পরিশেষে বলেছেন ঃ মোটকথা, যিয়াদ এবং তার অচ্যুৎ সন্তানরা বিশেষত হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হন্তা ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্ঠতা গোটা মুসলিম উম্মার প্রতি সাধারণভাবে এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের প্রতি বিশেষভাবে এমন চরম বেদনাদায়ক অবস্থার রূপ নেয়, যা অবর্ণনীয়।

ইমাম নাসায়ী সালাত অধ্যায়ে যালেম ইমামের সাথে সালাত আদায় শীর্ষক একটি পরিচ্ছেদ সুনানে নাসায়ীতে উল্লেখ করেছেন। এ অধ্যায়ে তিনি যিয়াদের বিলম্বে সালাত পড়ানো এবং তাতে লোকদের কানাঘুষার কথা উল্লেখ করে এখানে যে হাদীসটির বর্ণনা করেছেন তাহলো এই—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : الصلوة مع ائمه الجور। এ পরিস্থিতিতে যথা সময়ে সালাত আদায় করে নেয়া উচিত। তারপর যখন নামাযের সময় এ ধরনের শাসকদের স্পর্শে যাবে তখন পুনরায় আবার সালাত আদায় করে নিবে দ্বিতীয়বার পড়তে অস্বীকার করা অনুচিত। ইমাম আবুল হাসান সিন্ধী অস্বীকার না করার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন : خوفا من الفتنه ফেতনা কলহের আশংকায় তা করতে বলা হয়েছে যাতে অনৈক্য অশান্তি সীমা ছাড়িয়ে না যায় অর্থাৎ যদি তুমি বল যে, আমি পড়েছি সুতরাং এখন আর পড়ব না, তাহলে যালেম প্রশাসক তার নিজের ভুল স্বীকার করার পরিবর্তে উল্টো তোমাকেই বিদ্রোহ ছড়ানোর অপবাদে অপরাধী সাব্যস্ত করবে। মুহাদ্দিস ইবনে আসাকীর তাঁর রচিত দামেশকের ইতিহাস গ্রন্থে যিয়াদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, যে কোনো মুসলমান যিয়াদের প্রবৃত্তি ও অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করতো তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। এ ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফের চাইতেও অধিকতর ভয়ংকর। সে হযরত আবু বরযা আসলামী সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'ভূষি' বলে অভিহিত করতো। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদকে হেযাজের গভর্নর রূপে নিয়োগ করতে ইচ্ছা করলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার জন্যে বদদোয়া করেন। অতপর একটি ফোঁড়া যিয়াদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন : "হে সুমাইয়ার ছেলে ! তুমি দুনিয়াও পেলে না আখেরাতও নয়।"

এ প্রশ্ন হলো, যিয়াদের কাজে যদি অভিযোগ করার মতো কিছু না থাকতো এবং তার অত্যাচার অবিচারে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী শুধু গল্পই হতো, তাহলে শাহ আবদুল আযীয ইবনে আসাকীর, ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্য আলেম ও মুহাদ্দিসগণ কিসের উপর ভিত্তি করে তাকে যালেম শাসকদের অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং তারা মন্তব্য করলেন তার ঔদ্ধত্য অবর্ণনীয় ও অকথ্য ? এসব মনীষী কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়াই কি যিয়াদকে জঘন্য অপরাধী রূপে আখ্যায়িত করলেন ?

বুসর বিন আবু আরতাতের অত্যাচার

বুসর বিন আবু আরতাতের যুলুম ও অত্যাচারের ব্যাপারে মরহুম মাওলানা মওদূদী কিংবা আমি যাকিছু লিখেছি তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মুহাম্মদ তাকী সাহেব লিখেছেন, এটা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের নয় বরং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধরত অবস্থার একটি ঘটনা।

www.pathagar.com

এটা একটি আজব মন্তব্য, এ সংক্ষিপ্ত জবাব আমি আগেই দিয়েছি। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসন ক্ষমতায় বসার আগেই স্বীকৃত ও মনোনীত খলীফায়ে রাশেদার মুকাবিলায় যে তৎপরতা দেখিয়েছেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনাধীন এলাকাসমূহের উপর তাঁর সাহায্যকারী ও সমর্থকদের দ্বারা যেভাবে আক্রমণের অব্যাহত তাণ্ডবলীলা চালিয়েছেন এসব তৎপরতাকে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব শব্দ দ্বারা মামুলি ধরনের ঘটনার প্রলেপ দেয়াটা কতদূর বৈধ ? সে সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের যে নীতি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু গ্রহণ করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে সে নীতি আরো অধিক নোংরা এবং অবৈধ বলে চিহ্নিত হয়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনোনীত ইয়ামনের গভর্নর ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাসের দু'টি নিষ্পাপ শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করার ঘটনা প্রায় সকল ঐতিহাসিকই বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর এ ঘটনা সত্য হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন বলে মুহাম্মদ তাকী সাহেব এক আশ্চর্য কথার অবতারণা করেছেন। অথচ গভর্নরের দু'টি শিশুকে (আবদুর রহমান ও ফুসুম) নির্দয়ভাবে হত্যা করার পূর্ণ ঘটনা ইবনে কাসীর স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, "বুসর ইয়ামনে পৌঁছুলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক মনোনীত সেখানকার গভর্নর ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস ভয়ে কুফায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চলে যান, আর তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান আবদুল্লাহ হাদীকে। বুসর ইয়ামনে প্রবেশ করে ভারপ্রাপ্ত গভর্নর, তাঁর ছেলে এবং পরবর্তীতে ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাসের দু'টি নিষ্পাপ নিষ্কলংক শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে।" তারপর ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ

ويقال ان بسرًا قتل خلقا من شيعة على فى مسيره هذا وهذا الخبر مشهور عند اصحاب المغازى والسير وفى صحته عندى نظر -

> "এবং বলা হয়ে থাকে, বুসর ইয়ামন অভিযানে গিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনেক সংগী-সাথী ও সমর্থকদের হত্যা করে। এ ঘটনা ইসলামী যুদ্ধ ও সীরাত প্রণেতা ঐতিহাসিকদের কাছে সুপ্রসিদ্ধ। তবে আমার কাছে ঘটনাটি সন্দেহের উর্ধে নয়।"

বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, এ ঘটনায় ইবনে কাসীরের সন্দেহের স্থলটি হলো ইয়ামনে প্রবেশের আগে পথিমধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংগী-সাথীদেরকে হত্যা করার ঘটনাটি। তবে ইবনে কাসীর যখন নিজেই বলছেন যে, একথা সমগ্র ঐতিহাসিক কর্তৃক বিবৃত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জীবন চরিত রচয়িতাগণ কর্তৃক স্বীকৃত যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহযোগী ও সহায়তাকারী রূপে যাকেই সন্দেহ করা হতো বুসর তাকেই হত্যা করে

www.pathagar.com

ফেলতো। তাঁহলে শুধুমাত্র তাঁর একার সন্দেহ করার কারণে এসব ঘটনার সবকিছু কি করে সন্দেহযুক্ত হতে পারে? ওসমানী সাহেবের রচিত বইয়ের ১৮৯ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি অনুযায়ী এসব ঘটনা বিদায়া গ্রন্থের ২য় খণ্ডে নেই। বরং বিদায়ার ৭ম খণ্ডের ৩২২-৩২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। উৎসুক পাঠক ইচ্ছা করলে নিজেই সেখানে তা দেখে নিতে পারেন।

তাকী ওসমানী সাহেব ইবনে খালদুনের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেই যেখানে এটা লিখেছেন যে, "আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বুসরের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাকে বরখাস্ত করেন।" সে ক্ষেত্রে তাঁর পরস্পর বিরোধী প্রয়াস হলো এই যে, ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বিবৃত এ ধরনের যুলুম-নিপীড়ন থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করছেন এবং বলছেন যে, এরূপ সীমালংঘনের কারণেই বুসরের পদচ্যুতি ঘটে। যালেমকে যুলমির জন্যে শাস্তি দেয়া অথবা অন্তত ভবিষ্যতে তার উপর এ ধরনের কোনো দায়িত্ব অর্পণ না করাই ছিলো যেখানে অত্যাচারজনিত ক্ষতি পূরণের সঠিক পদ্ধতি, সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে অন্যত্র বদলী করার নাম কি করে বরখাস্ত হতে পারে, তাও জনাব তাকীর কাছে একটি জিজ্ঞাসা। একথা আমি আগেও বলেছি যে, কেবলমাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেই নয় বরং হযরত হাসানের সাথে সন্ধিপত্র এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেও বুসরের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো। বসরায় সে খুতবার মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করে। প্রায় ৪৪ হিজরী সন পর্যন্ত সে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাম্রাজ্যের একটি ভিত্তি তৈরী করার কাজে রত থাকে।

এখানেও মুহাম্মদ তাকী সাহেব লিখলেন, ইয়ামনে বুসরের অত্যাচারের বিবৃতিদাতা মূসা ইবনে ওবাইদাহ একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। কেননা আবু হাতেম রাযী ইমাম আহমদের উদ্ধৃতি দিয়ে 'জারাহ ও তাদীল' গ্রন্থে লিখেছে যে, আমার মতে মূসা বিন ওবাইদাহ থেকে রাওয়ায়েত করা হালাল নয়। যেখানে একথাটি লেখা আছে সেখানেই ইমাম সুফিয়ান সাওরী, শোবা এবং ওয়াকীর মতো খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে রাওয়ায়েত করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। ইমাম জাহবী 'মিযানুল ইতেদাল' এবং ইবনে হাজর 'তাকবীর ও তাহযীব' গ্রন্থে ইমাম তিরমিযি ও ইবনে মাযা এ রাবীর হাদীস গ্রহণ করার কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। যেসব মুহাদ্দিস এ রাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে সুফিয়ান সাওরী ছাড়া ইবনে মুবারকের নামও তাহযীব গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। সুতরাং এ রাবীর হাদীস বর্ণনা করা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তাহলো, যে গ্রন্থের ২০৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়েছি সে গ্রন্থটি তাকী ওসমানী সাহেবের ভাই মুহাম্মদ রেজা সাহেব দারুল ইশাআত, মৌলভী মুসাফির খানা, করাচী থেকে ছাপিয়েছেন। সে গ্রন্থের আরো দু'টি উদ্ধৃতি এখানে লক্ষণীয় ঃ

"উমাইয়া শাসকরা ধর্মের ব্যাপারে যেই বড় বেদআতটি চালু করেছিলেন, সেটা হলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুতবায় প্রকাশ্যে গালমন্দ করা। এ ধরনের খুতবা শুনতে জনগণ বিব্রতবোধ করতো। তাই তারা খুতবা শুনার আগেই চলে যেতো। এ কারণে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযের আগেই ঈদের খুতবা প্রদানের দ্বিতীয় বিদআত চালু করেন। ওমর বিন আবদুল আযীয হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে খুতবায় সংযোজিত আপত্তিকর শব্দাবলী বাদ দিয়ে, ঐ স্থলে যোগ করেছিলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ...... "আল্লাহর এ বাণী খুতবায় সংযোজন করার জন্যে তিনি সকল প্রাদেশিক গভর্নরকে নির্দেশ দেন। আজও বাক্যটি খুতবায় পঠিত হয়ে আসছে।"-(পৃঃ ১৪০)

"হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের (রা) খেলাফত আমলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিপ্লব হলো, তিনি শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েই হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগ থেকে যেসব যুলুম নিপীড়নমূলক বিপর্যয় উত্তরোত্তর জোরদার হতে থাকে সেগুলো সংশোধন করার ইচ্ছা পোষণ করেন।"-(পৃঃ ১৮৫)

তাকী ওসমানী সাহেবের আপন ভাই কর্তৃক প্রকাশিত একজন নির্ভরযোগ্য নদভী আলেমের লিখিত এ বইটিতে স্পষ্টতঃ লেখা আছে যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগেই নবীর বংশধরদের অধিকারে হস্তক্ষেপ শুরু হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুতবার মাধ্যমে গালমন্দ করার ঘৃণ্য প্রথার রেওয়াজ দেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগ থেকে যেসব অপতৎপরতা জোরদার হয় হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয শাসনদণ্ড হাতে নেয়ার সাথে সাথেই সেসব অন্যায় প্রথার সংশোধনের পদক্ষেপ নেন। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিংবা আমি এ ধরনের কথা ছাড়া ভিন্নতর কোনো কথা না বললেও কিংবা কঠোর বাক্য প্রয়োগ না করলেও তাকী সাহেবরা নিজের ঘরের খোঁজ না নিয়ে কেবল মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধেই প্রচারাভিযান চালানোকে মহৎ দায়িত্বের অংশ করে নিয়েছেন। তিনি মাওলানার বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযোগ আরোপ করে লিখেছেন, "তার কলম হাজ্জাজের তরবারির ন্যায় ইসলামের মূল ভিত্তিগুলোকেও লক্ষ্য স্থল রূপে বানিয়ে নেয়।" তাকী ওসমানী সাহেব মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে এরূপ ভয়ানক অভিযোগ নির্ভিকচিত্তে বারবার আরোপ করার জবাবে এতকিছু বলার পরও এ আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া ছাড়া আর উপায় কি ঃ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَبَ-

"তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের হুকুম করো আর নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাও ? অথচ তোমরা আল্লাহর কিতাবও পাঠ করো।"

আমর বিন আল হামাকের শিরোচ্ছেদ

আমর ইবনুল হামাকের মস্তক কাটার যে ঘটনা 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থনে আমি বিদায়া ও তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি। এর জবাবে তাকী ওসমানী সাহেব তাবারীতে বর্ণিত ঃ "আমরা আমর ইবনুল হামাকের উপর অত্যাচার করতে চাই না।" আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শুধুমাত্র একথার উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু এটা একটি সংক্ষিপ্ত কথা। কোনো লোক আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর একথা শুনে থাকলে সে শিরোচ্ছেদ থেকে বিরত থেকেছে, কথাটি কিছুতেই এমন পর্যায়ের নয়। শিরোচ্ছেদের এ ঘটনাটি বিভিন্ন মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ বর্ণনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, হাফেজ জালালুদ্দীন সূয়ূতি প্রণীত 'খাসায়েসে কুবরা' (খণ্ড ঃ ২য়, পৃষ্ঠা-৫০১, দারুল কুতুবুল হাদীসা, আল মাদানী প্রেস) গ্রন্থে 'আমর ইবনুল হামাকের' হত্যা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অধ্যায়ে ইবনে আসাকীরের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন ঃ রেফাআ বিন সাদ্দাদ আল বিজলী বর্ণনা করেছেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আমর ইবনুল হামাককে দরবারে তলব করেন, তখন আমিও তাঁর সাথে বের হই। তিনি বলছিলেন—এরা আমাকে খুন করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, মানুষ ও জীন আমাকে খুন করার ব্যাপারে শরীক হবে। রিফাআহ্ বললেন ঃ একথা হচ্ছিলো এমন সময়ে আরোহীদেরকে আসতে দেখে আমি তাঁকে বিদায় বাণী জানালাম। এমন সময় একটি সর্প বের হয়ে আমরকে দংশন করলো। এদিকে আরোহীগণও এসে পৌঁছলো। তারা তাঁর দেহ থেকে মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরিত এই ছিন্ন মস্তকটিই মুসলিম ইতিহাসে তথাকথিত প্রথম 'হাদিয়া'। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূলে দীন বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ খলীল হাররাস গ্রন্থটির বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণা করে একটি ভাষ্য সহকারে প্রকাশ করেন। তিনি ইবনে কুতাইবা রচিত কিতাবুল মাআরিফ গ্রন্থ থেকে তথ্য যোগাড় করে তাতে ভাষ্য সংযোজন করেন। সেটির উদ্ধৃত বক্তব্য হলো ঃ

www.pathagar.com

আমর ইবনুল হামাক রাদিয়াল্লাহু আনহু খুযাআ গোত্রের লোক ছিলেন। হাজ্জাতুল বিদায় তিনি নবী আলাইহিস সালামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সংগ লাভ করেন এবং হাদীস রাওয়ায়েত করেন। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর আক্রমণকারীদের দলে ছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষে যুদ্ধে সহায়তা করেন এবং হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহযোগী ছিলেন। তারপর তিনি 'মোসেল' পালিয়ে যান। সেখানে একটি গর্তে তাঁকে সর্প দংশন করে। মোসেলের গভর্নর তার সন্ধানে লোক পাঠায়। লোকেরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পায়। গভর্নর তাঁর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। যিয়াদ ছিন্ন মস্তকটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে পাঠিয়ে দেয়। ইসলামে এক শহর থেকে অন্য শহরে ছিন্নিত মস্তক নিয়ে ঘুরাঘুরির ন্যায় আপত্তিজনক কাজের এটাই প্রথম উদাহরণ। (وهو اول رأس فى الاسلام حمل من بلد الى بلد)

মোটকথা, একথা সত্য যে, আমর ইবনুল হামাকের ছিন্ন মস্তকটি শহরে শহরে প্রদক্ষিণ করে পরিশেষে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌছে দেয়া হয়। কিন্তু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাতে কোনো অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেননি। আমর বিন হামাক সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণায় প্রভাবিত হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর অন্যায় হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। এটা নিসন্দেহে কবীরা গুনাহের কাজ। কিন্তু তাই বলে তাঁর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অবমাননাকর অবস্থায় শহরে শহরে প্রদক্ষিণ করানো পরন্তু খণ্ডিত মস্তকটি তার শোকসন্তপ্ত বিধবা পত্নীর কোলে নিক্ষেপ করার মতো নিষ্ঠুর আচরণ কোনো অবস্থাতেই ইসলামে সমর্থিত ও পসন্দনীয় কাজ হতে পারে না।[১]

যিয়াদ ও বুসরের অত্যাচারের আরো প্রমাণ

এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা যে, কারও কারও দৃষ্টিতে যিয়াদ ও বুসরের অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা এ কারণে ধরা পড়ে না যেহেতু তারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নর ছিলো। যিয়াদকে তো হাজ্জাজের চেয়েও ভয়ংকর খুনী হিসেবে ইতিহাসবিদগণ চিহ্নিত করেছেন। একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য হাজ্জাজ লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিলো। ইমাম জাহবী সিয়ারুন নুবালা গ্রন্থে যিয়াদ বিন আবিহীর অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

১. বিধর্মী শত্রু পক্ষের লাশের সঙ্গেও এরূপ আচরণ নিষিদ্ধ এবং মানবদেহের প্রতি অবমাননা। কারণ, ইসলামী ফকীহদের দৃষ্টিতে এটি হচ্ছে 'মোসলা' যা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিন্দনীয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে এরূপ বিরুদ্ধবাদী জনৈক নেতার ছিন্ন মস্তক আনয়নকারীকে সাক্ষাত দেননি বরং তাঁকে জাহান্নামী বলেছেন।

www.pathagar.com

كان زياد اسفك من الحجاج لمن يخالف هواه -

"যে লোকই যিয়াদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা করতো তাকে সে হত্যা করতো। হাজ্জাজের চেয়েও সেছিলো অধিক রক্ত পিপাসু।"-(এলামুল নুবালা খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৬)

এ গ্রন্থেরই ২৭৪ পৃষ্ঠায় ইমাম জাহ্বী বুসর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

ولى الحجار واليمن لمعاوية وفعل قبائح - قال احمد بن معين لم يسمع النبى صلى الله عليه وسلم وقد سبى مسلمات باليمن فاهو بالبيع -

"বুসর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে হেযাজ ও ইয়ামনের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে অনেক নিন্দনীয় কাজ করেছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইবনে মুয়ীন বলেন ঃ বুসর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছুই শুনেনি। সে ইয়ামনে মুসলিম মহিলাদেরকে ক্রীতদাসীতে পরিণত করেছে। তাদেরকে প্রকাশ্যে বিক্রি করেছে।"

মুসলমান মহিলাদেরকে ক্রীতদাসীতে পরিণত করার দ্বিতীয় দলীলের পর এটা হলো তৃতীয় দলিল। তারপরও দলীল প্রমাণ দেয়ার প্রশ্নে তাকী ওসমানী সাহেব কি هل من مزيد "আরো চাই"-এর ভূমিকায় অটল থেকে অতিরিক্ত উদ্ধৃতি প্রত্যাশা করবেন ?

www.pathagar.com

৮ম অধ্যায়

হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আদীর হত্যা

এক ঃ রাষ্ট্রদ্রোহিতার ইসলামী আইন

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে স্বাধীন মত প্রকাশের পরিসমাপ্তি শিরোনামে হুজার বিন আদীর হত্যা সম্পর্কে দু' পৃষ্ঠা ব্যাপী যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, ওসমানী সাহেব এর জবাবে ৩০ পৃষ্ঠা ব্যাপী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। ওসমানী সাহেব এ সম্পর্কিত মরহুম মাওলানার লিখিত অনেক কথাই তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথার সারমর্ম হলো—"হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আদী এবং কতিপয় ফেতনাবাজ লোক মুসলিম জাতির মধ্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করতো, তারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার গভর্নর ও পুলিশ কর্মকর্তাদের তিরস্কার করতো। তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতো এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। এক কথায় ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী ছিলো। আর এটা স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি হলো, মৃত্যু দণ্ড।

ইতিহাসে ঘটনার যে বিশদ বিবরণ রয়েছে তাতে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার ঘটনা অস্বীকার করা তাকী ওসমানী সাহেবের জন্যে সম্ভব নয়। তবে আমার জানামতে তাকী ওসমানী সাহেব সম্ভবতঃ প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে সাহাবী হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্রোহী রূপে চিহ্নিত করে রক্তারক্তি বৈধ ও তাঁর হত্যাটাকে ওয়াযিব প্রমাণ পক্ষে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। এ কারণে ইসলামে রাষ্ট্রদ্রোহিতা সংক্রান্ত আইন ও তার উৎস প্রথমে পেশ করা অপরিহার্য। তারপর আমি তাকি ওসমানী সাহেবকে প্রশ্ন করবো—এ উৎসের ভিত্তিতে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথী সংগীদেরকে হত্যা করে রক্তপাত ঘটানো কতদূর শরীয়াতসম্মত ছিলো?

কুরআনের আয়াতসমূহ ও এগুলোর ব্যাখ্যা

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম আমরা কুরআনের দ্বারস্থ হতে চাই। কুরআনের দু'টি আয়াত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা সংশ্লিষ্ট অপরাধের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত। প্রথমটি হলো, সূরা মায়েদার ৩৩নং আয়াত, অপরটি হুজুরাতের ৯নং আয়াত। প্রথম আয়াতটির অনুবাদ এরূপ ঃ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ভূপৃষ্ঠে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিপর্যয় সৃষ্টির কাজে তৎপর থাকে, তাদেরকে হত্যা কিংবা শূলে

www.pathagar.com

চড়িয়ে, ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলানো অথবা হাত পা বিপরীতভাবে কেটে দেয়া অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়া যেতে পারে। জাগতিক জীবনে এটাই হচ্ছে তাদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি আর পরকালে তো তাদের জন্যে ভয়াবহ শাস্তি নির্ধারিত আছেই।"

এ আয়াতে যে অন্যায়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং দুনিয়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার প্রতি ইংগীত করা হয়েছে মুফাসসির ও গবেষক ইমামগণ তার ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তাতে অপরাধের উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয়—লুটপাট করা, হত্যা, রাহাজানী, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, যাতে সমাজের আইন-শৃঙ্খলা ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদ (ফোকাহা) ও মুহাদ্দিসগণের মতে এমতাবস্থায় হত্যার সুনির্দিষ্ট অপরাধে দোষী ব্যক্তিকেই কেবল হত্যা করার শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এরূপ অপরাধ না করলে লঘু অপরাধীকে হত্যা কিংবা ফাঁসী দেয়ার শাস্তি কিছুতেই দেয়া যেতে পারে না। ইমাম ইবনে জারীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো—ছিনতাইকারী, ডাকাত, রাহাজান সশস্ত্র অবস্থায় যারা মুসলিম জনবসতিতে প্রবেশ করে এবং ভীতিপ্রদর্শন তথা সন্ত্রাসী কায়দায় দিবালোকে অস্ত্রের মুখে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টির কাজে লিপ্ত হয়—আয়াতে তাদেরকেই মুহারিবীন বা যুদ্ধরত বলা হয়েছে। তারপর তিনি লিখেছেন ঃ

فَاِنْ قَتَلُوْا قُتِلُوْا وَاِنْ لَمْ يَقْتُلُوْا وَاَخَذُوْا الْمَالَ قُطِعُوا مِنْ خِلاَفٍ -

"যদি তারা হত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত না হলে শুধুমাত্র লুটতরাজ করলে হাত পা বিপরীতভাবে কেটে দিতে হবে।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اذا حارب فقتل فعليه القتل واذا حارب واخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد

"যদি সে যুদ্ধ ও হত্যা করে তাহলে তার জন্যে হত্যার শাস্তি, আর যুদ্ধ করলে সে অবস্থায় গ্রেফতার হলে হত্যার শাস্তি না দিয়ে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হবে।"

অপরাধী হত্যাকারী হলে তাকে হত্যা না করার তাৎপর্যপূর্ণ কতিপয় কথা বর্ণনা করা হলো। একথার সমর্থনে ইবনে জারীর নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

لایحل دم امرئ مسلم الاباحدی ثلاث فاخلال -

একজন মুসলমানকে বিচার ব্যবস্থার অধীন শুধুমাত্র ৩ অবস্থায় হত্যা করা যায়—(ক) হত্যা করার অপরাধ করলে, (খ) বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, (গ) মুরতাদ হলে। তিনি আরো লিখলেন ঃ হত্যার অভিযোগ ছাড়া শুধুমাত্র নিরাপত্তাহীনতা এবং আমদানী রপ্তানী বিপদজনক করে তোলার কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর অনধিকার চর্চারই নামান্তর। এমন কথা কোনো জ্ঞানী লোক কিছুতেই স্বীকার করতে পারে না।

তারপর ইবনে জারীর (র) এমন কতিপয় লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের মতে সমকালীন রাষ্ট্রপ্রধান আয়াতে বর্ণিত যে কোনো দণ্ড প্রয়োগ করার অধিকার রাখে। অপরাধী হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হোক কিংবা না হোক। তবে ইবনে জারীর যুক্তিসহ্ এ রায়ের জোর প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ অপরাধের ধরন অনুযায়ী দণ্ড নির্ণিত হবে। যুদ্ধের সাথে হত্যা কাণ্ড ঘটলে পর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, অন্যথায় নয়।

আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী তাঁর প্রণীত গারায়েবুল কুরআন এ প্রায় একথারই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

هذا المحارب اذا لم يقتل ولم يأخذ المال فقد هم بالمعصية ولم يفعل وهذا الا يوجب القتل -

"এ যোদ্ধা যখন হত্যা করেনি মালপত্র লুট করেনি তখন শুধুমাত্র অপরাধ করার মনোভাব পোষণের ভিত্তিতে তাকে হত্যা করা কোনোক্রমেই ঠিক নয়।"

ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যুদ্ধে যে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে। তাঁর মতেও আয়াতে বর্ণিত দণ্ডসমূহে একটি ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন অপরাধ তেমন দণ্ড প্রয়োগ হবে। হত্যার সাজা মৃত্যুদণ্ড আর লুটতরাজের শাস্তি হবে হাত ও পা কেটে দেয়া। আবু বকর জাস্সাসও নিজের যুক্তির স্বপক্ষে সেই হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে কেবলমাত্র তিনটি কারণে মুসলমান হত্যা বৈধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, নবী (সা) এ তিন অবস্থা ছাড়া মুসলমান হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন ঃ

فانتفى بذلك قتل من لم يقتل من قطاع الطريق -

www.pathagar.com

"এরই ভিত্তিতে যে ডাকাত কাউকে হত্যা করেনি, তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হয়েছে।"

ইবনে জারীর ও আবু বকর জাসসাস যে হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন বুখারী শরীফের কিতাবুদ দিয়াত অধ্যায়ে তার বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

لايحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الا باحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزانى والمفارق لدينه التارك للجماعة ـ

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজর (র) বলেছেন, বিদ্রোহীকেও দলত্যাগীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে তাকে কেবলমাত্র নিজেদের প্রতিরক্ষার প্রশ্নে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে (لايحل قتله الا مدافعة) আয়াতে মুহারাবাহর তাৎপর্যও ইবনে হাজরের মতে এটাই। তিনি একথাও বলেন যে, মুহারাবাহর অধিকতর শাস্তি হলো ঃ

ان قتل قُتل وحكم الاية فى الباغى ان يقاتل لا ان يقصد الى قتله ـ

"যুদ্ধ লিপ্ত ব্যক্তি হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হবে। সূরা হুজুরাতে বিদ্রোহী সংক্রান্ত আয়াতে তাদের বিরুদ্ধে হত্যা না করার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র লড়াই করার নির্দেশ রয়েছে।"

তিনি আরো লিখেছেন, লূত সম্প্রদায়ের অশ্লীল কার্যকলাপ এবং পশুর সাথে সংগম করার কারণে হত্যার শাস্তি সম্পর্কিত হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। আর যদি সহীহও হয় তাহলে এ কাজ ব্যভিচারের পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় হত্যা করা অপরিহার্য হবে। যেসব রাওয়ায়েতে মুসলমান জামায়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যায়ও ইবনে হাজর উপরোল্লেখিত বিবরণই পেশ করেছেন। অথবা অপরাধীকে অবরোধ করে বিদ্রোহ করতে বাধা দেয়াও এর তাৎপর্য সাব্যস্ত করা হয়। (المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীও হাদীসটির ব্যাখ্যায় প্রায় একই কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ কতিপয় আলেম এ হাদীসে বর্ণিত তিন প্রকার লোকের সাথে চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে বিদ্রোহীকে হত্যা করা জায়েয বলেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন ঃ

اجيب عنه بانه انما يجوز دفعه اذا ادى الى القتل فلا يحل تعمُّد قتله اذا ندفع بدون ذالك فلا يقال يجوز قتله بل دفعه ـ

"বিদ্রোহীদের ব্যাপারে একথার জবাব হলো, তার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া জায়েয। যদিও প্রতিরোধের সময় সে নিহত

www.pathagar.com

হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্রোহীর মুকাবিলায় যদি হত্যা ছাড়াও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করা জায়েয নেই। বরঞ্চ তজ্জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।"

কুরআনের সূরা হুজুরাতের ৯ ও ১০নং আয়াতে বিদ্রোহের অপরাধের উল্লেখ রয়েছে। আয়াত দু'টির তরজমা হলো ঃ "ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পারস্পরিক লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে আপোষ করে দাও। এরপরও যদি একটি দল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এরপর যদি তারা লড়াই থেকে বিরত থাকে তাহলে উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে আপোষ করে দাও এবং ইনসাফ করো। মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে।"

আয়াত দু'টিতে শুধু এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিদ্রোহী ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করা। তারপর উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দেয়া। লড়াই শেষ হওয়ার পর আটক বিদ্রোহীকে হত্যা করা কিংবা অন্য কোনো দণ্ড দেয়ার কথা মূলত এ আয়াত দু'টিতে মোটেও উল্লেখ নেই। সুতরাং এ আয়াতের নিরিখে বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলা কোনো অবস্থাতেই ঠিক নয়। ফকীহ ও তাফসীরকারগণ বিদ্রোহ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা ও হুকুম-আহকামের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন তাতে অনুমিত হয় যে, সূরা মায়েদার আয়াতসমূহে কেবলমাত্র সেসব অপরাধীর উল্লেখ রয়েছে, যারা পেশাদারী মনোভাব নিয়ে এবং জাগতিক হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে লুটতরাজ ও সন্ত্রাস করে বেড়ায়। অপরদিকে সূরা হুজুরাতে যেসব বিদ্রোহীর কথা বর্ণিত হয়েছে তারা হলো, সেসব লোক, যাদের মধ্যে জাগতিক স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক কামনা ও বিশ্বাসের চেতনায় অধিকতর ক্রীয়াশীল। যদিও তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হোক বা না হোক। এ ধরনের লোকেরা নিজেদের অবস্থানের পক্ষে সাধারণত কোনো শরয়ী বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে দাঁড়ায় এবং তাদের সাথে চোর ডাকাতদের মতো আচরণ করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। তারপর লড়াই-সংঘর্ষ এক বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যেও হতে পারে। কেননা কোনো জায়গায় কতিপয় সশস্ত্র লোক মার-পিট করে নিরাপত্তাহীনতা ও সন্ত্রাস ছড়াতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণার জন্যে একটি নির্ভরযোগ্য ঐক্যবদ্ধ শক্তির অবশ্যই দরকার হয়। স্বয়ং কুরআনেও

www.pathagar.com

طائفتان শব্দের উল্লেখ আছে। ইমাম নিশাপুরী স্বীয় তাফসীর গারায়েবুল কুরআনে এ জায়গার তাফসীরে লিখেছেন ঃ

اعلم ان الباغية في اصطلاح الفقهاء فرقة خالفت الامام بتاويل باطل بطلانا بحسب الظن لا القطع ...... ولابد ان يكون له شوكة وعدد يحتاج الامام في دفعهم الى كلفة ببذل مال او اعداد رجال فان كانوا فرادًا يسهل ضبطهم فليسوا باهل بغى -

"এটা সুস্পষ্ট যে, ফকীহদের পরিভাষায় বিদ্রোহী বলতে এমন এক দলকে বুঝায় যারা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সমকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের (ইমাম) বিরোধিতা করে। তবে তাদের এ বাতিল ব্যাখ্যা ধারণাপ্রসূত দৃঢ় প্রত্যয়মূলক নয়। এ দলটির বিদ্রোহী সাব্যস্ত হবার জন্যে এটা অপরিহার্য যে, দলের মধ্যে এমন শক্তি ও জনসংখ্যা থাকা প্রয়োজন। যাদেরকে দমন করতে সরকারকে অর্থ ব্যয় ও সংঘবদ্ধ দমন অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হয়। যদি তারা সংখ্যা ও শক্তিতে নগণ্য হয় এবং তাদেরকে সহজেই কাবু করা সম্ভব হয়, তাহলে তাদেরকে বিদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না।"

রুদ্দুল মুহতার নামক গ্রন্থের বিদ্রোহ অধ্যায়ে বিদ্রোহীদের একটি পূর্ণাংগ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

اهل البغي كل فئة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون اهل العدل بتأويل يقولون الحق معنا ويدعون الولاية -

"বিদ্রোহী তারা যারা প্রবল শক্তির অধিকারী। শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য বিস্তারকারী এবং সংঘবদ্ধ। তারা ন্যায়পরায়ণ লোকদের বিরুদ্ধে ব্যাখ্যার ভিত্তিতে লড়াই করবে এবং তাদের লোকেরা একথা বলবে যে, আমরাই সত্যবাদী। আর তারা শাসন ক্ষমতার দাবীদার হবে।"-[রুদ্দুল মুহতার খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৭)

ফিকাহবিদদের বক্তব্য

অনুরূপভাবে রাজনৈতিক অপরাধীগণ শরীয়াতের দৃষ্টিতে নিসন্দেহে অভিযুক্ত। কিন্তু তাদের কিছুটা রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক অধিকারও রয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞগণ এসব অধিকার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এবং আল বালাগ সম্পাদকের মতো তাড়াহুড়ো করে এ ধরনের ফতওয়া জারী করেননি যেমন, একটি সমাবেশ থেকে কিছু শ্লোগান দেয়া হলো,

www.pathagar.com

কোনো অফিসারকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হলো অথবা প্রতিবাদ জানানো হলো আর সাথে সাথে সবাই বিদ্রোহ করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হলো। আর ইসলামে বিদ্রোহের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। ওসমানী সাহেব যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি এটাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া জরুরী মনে করছি যে, বিজ্ঞ ফিকাহবিদগণ ইসলামের বিদ্রোহ আইনের সমগ্র নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবর্তে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর আদর্শ এবং সেই কর্মপদ্ধতির আলোকে বিন্যস্ত করেছেন যা তিনি তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইকারীদের ব্যাপারে অবলম্বন করেন[১] এবং বিরোধী ও প্রতিপক্ষ বাহিনীর মধ্যে আমীরে মুয়াবিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিদ্রোহ আইনের সারকথা হলো, বিদ্রোহী যতক্ষণ পর্যন্ত কেবল নিজের বিকৃত আকীদা-বিশ্বাস অথবা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক শত্রুতামূলক ধারণা ও চিন্তাধারা প্রকাশ করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হত্যা কিংবা বন্দী করা যাবে না। বিদ্রোহী সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত করলে কিংবা হত্যাকাণ্ড শুরু করে দিলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অথবা দমননীতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। ফিকাহবিদগণ অস্ত্র-শস্ত্রের সংজ্ঞাও দিয়েছেন। ইমাম সারাখসী (র) আল মাবসূত গ্রন্থের নবম খণ্ডে ২১০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন ঃ

الخشب والحجر لايكون مثل السلاح

"লাকড়ি, লাঠি ও পাথর অস্ত্রের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না।"

ফিকাহবিদদের মতে অস্ত্র বলতে সেই ধারালো হাতিয়ারকে বুঝায় যা সাধারণতঃ হত্যাকাণ্ডের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কারণেই লাঠি অথবা পাথর কিংবা ভারী কোনো জিনিস দ্বারা কেউ কাউকে হত্যা করলেও তাতে কোনো কোনো ফিকাহবিদদের মতে হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবে না। বরঞ্চ দিয়ত আদায় করতে হবে। কেননা এসব বস্তু দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করা প্রমাণিত হয় না।

ফতহুল কাদীর, শরহে হেদায়ার বিদ্রোহ অধ্যায় এবং ফিকহের অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, কুফার মসজিদে কতিপয় খারেজী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করছিলো। কাসীরুল হাদরামী তাদের এ ভর্ৎসনা শুনছিলেন। তাদের মধ্যে একজন একথাও বলছিলো, আল্লাহর কসম, আমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবশ্যই হত্যা করবো। আল হাদরামী লোকটিকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু

১. হেদায়ার গ্রন্থকার বিদ্রোহ অধ্যায়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লিখেছেন ঃ هو قدوة هذا الباب। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ে আমাদের জন্যে ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শ।

www.pathagar.com

আনহুর কাছে ধরে নিয়ে আসলে তিনি বললেন ঃ লোকটিকে ছেড়ে দাও। আল হাদরামী বললেন ঃ যে আপনাকে হত্যা করার শপথ করলো তাকে কিভাবে ছেড়ে দেয়া যায়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ افا قتله ولم يقتلنى "আমি কি তাকে হত্যা করবো ! অথচ সে আমাকে হত্যা করেনি।" কাসীর বলতে লাগলেন, সে আপনাকে গালমন্দ করছিলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ ইচ্ছা করলে তুমি তাকে প্রতিউত্তর স্বরূপ গালমন্দ করতে পারো, অন্যথায় তাকে ছেড়ে দাও।

বাজ্জার এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্ধৃতি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের একটি বাণী রাওয়ায়েত করেছেন। বাণীটি আবু বকর জাস্সাসও বর্ণনা করেছেন। বাণীটি হলো—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার বিদ্রোহী উম্মতের আহতদের উপর হামলা করবে না এবং যারা গ্রেফতার হয় তাদেরকে হত্যা করবে না (لايرتّ جريحهم ولا يقتل اسيرهم) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জামাল যুদ্ধ ও অন্যান্য জায়গায় এ ধরনের উপদেশ দিয়েছেন। মাবসুত (খণ্ড–১০ পৃষ্ঠা–১২৬) ইমাম সারাখসী বলেন ঃ

كان على رضى الله عنه يحلف من يوسر منهم ان لايخرج عليه قط ثم يخلى سبيله -

"হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বন্দী বিদ্রোহীদের কাছ থেকে আর কখনো বিদ্রোহ না করার অংগীকার নিয়ে ছেড়ে দিতেন।"

ইবনুল আরাবী মালেকী সূরা হুজুরাতের বিদ্রোহ সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আহকামুল কুরআনে লিখেছেন ঃ

لايقتل اسيرهم ولا يتبع منهزمهم لان المقصود دفعهم لاقتلهم -

"বন্দী বিদ্রোহীদেরকে হত্যা করা যাবে না এবং পরাজিতদের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না। কেননা উদ্দেশ্য হলো ওদেরকে প্রতিরোধ করা, হত্যা করা নয়।"

ইমাম শাফেয়ী কিতাবুল উম্মে (খণ্ড–৪, পৃষ্ঠা–১৩৮) বলেছেন ঃ

اهل البغى انما يحل قتالهم دفعالهم مما اراد وامن القتال او امتناع من الحكم فاذا فار قواتلك الحال حرمت دماء هم -

www.pathagar.com

"শুধুমাত্র যুদ্ধাংদেহী মনোভাব কিংবা রাষ্ট্রের বিরোধিতা ঠেকানোর জন্যে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয। তারা এরূপ আচরণ পরিহার করলে তাদের রক্ত প্রবাহিত করা হারাম্।"

আগেই বলা হয়েছে, যারা সংখ্যায় অনেক এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত কেবলমাত্র তাদের উপর বিদ্রোহের আইন প্রয়োগ হবে। তারা যদি ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে শরয়ী ব্যাখ্যা ছাড়া বিদ্রোহ করে বসে এবং মারা যায় তাহলে হানাফী মযহাব অনুযায়ী তাদের জন্যে জানাযার নামায জায়েয নেই। আল মাবসুত গ্রন্থে শহীদের নামায অধ্যায়ে বিদ্রোহী সম্পর্কে বলা হয়েছে (لايغسل ولا يصلى عليه) এ অধ্যায়েই অপরদিকে বর্ণিত হয়েছে যে, হানাফী মযহাব মতে শহীদের নামাযে জানাযা পড়তে হবে। তারপর ওহুদের শহীদদের কথা উল্লেখ করে পরিশেষে হযরত হুজার বিন আদি ও আম্মার ইবনে ইয়াসিরের (রা) উল্লেখও শহীদগণের দলভুক্ত করা হয়েছে। ইমাম সারাখসী বলেন ঃ

ولما استشهد عمار بن ياسر بصفين قال لاتغسلوا عنى دما ولا تنزعوا عنى ثوبا فانى التقى معاوية الجادة وهكذا نقل عن حجر بن عدى -

"সিফফীন যুদ্ধে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণের প্রাক্কালে বলেন, তোমরা আমার যখমের রক্ত ধুয়ে ফেলবে না। আমার পরিধেয় বস্ত্রও খুলবে না। আমি এ অবস্থায়ই আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কিয়ামতের দিন সাক্ষাত করবো। হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এরূপ কথা বর্ণিত আছে।"

পরবর্তীতে গ্রন্থকার খাওয়ারেজ অধ্যায়ে (খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৩১) আরো লিখেছেন ঃ

ويصنع بقتلى اهل العدل ما يصنع بالشهيد فلا يغسلون ويصلى عليهم هكذا فعل على رضى الله عنه بمن قتل من اصحابه وبه اوصى عمار بن ياسر وحجر بن عدى وزيد بن صوحان رضى الله عنهم حين استشهدوا .. ..ولا يصلى على قتل اهل البغى -

"ন্যায়ের স্বপক্ষীয় লোকেরা নিহত হলে শহীদদের মতই তাদের সাথে আচরণ করতে হবে। অর্থাৎ গোসল ছাড়াই তাদের জানাযা পড়তে হবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিহত সাথীদের সাথে এরূপই করেছেন। আম্মার ইবনে ইয়াসির, হুজার বিন আদী এবং যায়েদ বিন সুহান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবীগণ শাহাদাত বরণ করার প্রাক্কালে

www.pathagar.com

এরূপ অসিয়তই করেছিলেন। ------------- আর বিদ্রোহী পক্ষের নিহত লোকদের জানাযা নামায পড়া যাবে না।"

এবার একদিকে শামসুল আয়িম্মা সারাখসী (র) সুস্পষ্ট ভাষায় হুজার বিন আদীকে বিদ্রোহীদের পরিবর্তে ন্যায়পরায়ণ গোষ্ঠীর কাতারে গণ্য করেছেন[১] তাকে শহীদ খেতাবে ভূষিত করেছেন এবং তাঁর নামাযে জানাযা শরীয়াতসম্মত সাব্যস্ত করেছেন। (অথচ তাঁর মতে নিহত বিদ্রোহীদের নামাযে জানাযা দুরস্ত নেই।) অন্যদিকে মুফতি তনয় মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্রোহীরূপে চিহ্নিত করে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করার আপ্রাণ ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। এ কালের মুফতি সাহেবদের ফতওয়াবাজীর প্রতি তাকালে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী 'আহকামুস সুলতানীয়া' গ্রন্থে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে লিখেছেন, বিদ্রোহীদের মধ্যে কেউ চরম বিপর্যয় সৃষ্টির কাজে অংশ নিলে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান তাকে সতর্কতামূলক শাস্তি দিতে পারবেন কিন্তু হত্যা করার অনুমতি নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ী কেবলমাত্র তিন অবস্থা ছাড়া কোনো মুসলমানকে হত্যা করা হালাল নয়। তারপর তিনি বলেছেন, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ এবং মুশরিক ও মুরতাদের সাথে যুদ্ধের মধ্যে আট ধরনের পার্থক্য বিরাজমান। প্রথমত, হত্যা করা নয় বরং বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীর সাথে যুদ্ধ হয়। অপরদিকে মুশরিক ও মুরতাদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা জায়েয। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহী মোকাবিলার জন্য সামনে এলেই পরে হত্যা করা যায়, অন্যথায় নয় কিন্তু মুরতাদ ও মুশরিককে সব অবস্থায় হত্যা করা বৈধ। তৃতীয়ত, আহত বিদ্রোহীকে হত্যা করা জায়েয নেই কিন্তু আহত মুরতাদ ও মুশরিককে হত্যা করা জায়েয। উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দলপতিকে পালিয়ে যাওয়া শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন এবং আহতদের হত্যা না করার ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেন। চতুর্থত, বন্দী বিদ্রোহীদেরকে কেবলমাত্র বন্দী করেই রাখা যাবে কিন্তু মুশরিক ও মুরতাদ বন্দীদেরকে হত্যাও করা যেতে পারে। বিদ্রোহী আর কখনো বিদ্রোহ করবে না এরূপ নিশ্চয়তা থাকলে তাকে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে, অন্যথায় যুদ্ধের আশংকা দূর না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটকে রাখা যাবে। তারপর তাকে মুক্তি দিতে হবে। এরপর আর তাকে আটকে রাখাও

১. স্মর্তব্য যে, ফিকাহবিদদের পরিভাষায় আহলে বাগী ও আহলে আদল শব্দ দু'টি পরস্পর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ন্যায়পরায়ণ নেতা ও তাঁর সাথীদেরকে আহলে আদল এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্তদেরকে আহলে বাগী বলা হয়।

www.pathagar.com

জায়েয নেই। বাকী বিষয়গুলো ক্রীতদাস-দাসী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংক্রান্ত। -('আহকামুস সুলতানিয়া' অনুবাদ ঃ নাফিল একাডেমী পৃষ্ঠা-১০১-১০২ আরবী মাহমুদ প্রেস মিসর পৃষ্ঠা-৫৬)

কাযী আবু ইউলা মুহাম্মদ ইবনুল হোসাইন আল ফাররা তাঁর প্রণীত গ্রন্থ আহকামুস সুলতানীয়ায় 'বিদ্রোহী হত্যা' অধ্যায়ে একই কথার উল্লেখ করেছেন। তিনি ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

وجاز للامام ان يعزر من تظاهر بالعناداد باوتعزيرا، ولم يتجاوزه الى قتل ولا حد لقول النبى صلى الله عليه وسلم "لايحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان وزنى بعد احصان وقتل نفس بغير نفس" (رواه البخارى ومسلم وابوداؤد والترمذى والنسائى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه -

"শাসক বিদ্রোহ প্রদর্শনকারীদের শায়েস্তা করার বৈধতা রাখেন তবে হত্যা বা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন না। কেননা তিন অবস্থা ছাড়া মুসলমানকে হত্যা করা হালাল না হওয়ার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন। প্রথমত, মুসলমান হওয়ার পর কুফরীতে ফিরে যাওয়া ; দ্বিতীয়ত, বিবাহিত নারী পুরুষের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ; তৃতীয়ত, হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

لايقتل اسراهم ويجوز قتل اسرى اهل الحرب والمرتدين -

"বন্দী বিদ্রোহী মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। বন্দী কাফের এবং মুরতাদ হলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে।"

অতপর বিদ্রোহীদের সম্পর্কে তিনি আরো লিখেছেন ঃ

ويعتبر احوال من فى الا سرمنهم فمن امنت رجعته الى القتال اطلق ومن لم تومن منه الرجعة حبس حتى يت بى الحرب ثم يطلق ولا يحبس بعدها -

"বিদ্রোহীদের মধ্য থেকে যাদেরকে বন্দী করা হবে তাদের অবস্থা দেখা হবে। যাদের ব্যাপারে পুনর্বার লড়াই না করার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। আর যাদের ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকবে না লড়াইয়ের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বন্দী করে রাখতে হবে। লড়াই শেষ হলে তারা মুক্তি পাবে। তখন আর তাদেরকে বন্দী রাখা যাবে না।"

www.pathagar.com

ইমাম মাওয়ারদী ও আবু ইউলার বক্তব্যে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান বিদ্রোহীকে হত্যা করা তো দূরের কথা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়াও জায়েয নেই। গ্রেফতারীর পরই মুক্তি দিতে হবে অথবা যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্দী রাখার পর মুক্তি দিতে হবে। ইমাম নববী (র) শরহে মুসলিমের যাকাত অধ্যায়ের 'মুওয়াল্লিফাতে কুলূব' পরিচ্ছেদে খাওয়ারিজ ও বিদ্রোহী বন্দীদের হত্যা করা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

কোন্ কোন্ অবস্থায় মুসলমান হত্যা করা জায়েয

বস্তুত আগের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন-হাদীস শুধুমাত্র এসব অবস্থায় একজন মুসলমানকে হত্যা করার অনুমতি দেয় যখন সে হত্যাকারী, চোর, অথবা ডাকাত হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধ সংঘটিত করে কিংবা বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করে অথবা ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে যায়। ইসলামী ও শরয়ী পরিভাষায় বিদ্রোহ কিংবা বিদ্রোহী বলতে যা বোঝায় তাতে সব ধরনের ফেতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা এবং যে কোনো সন্ত্রাসমূলক তৎপরতার উপর এর সংজ্ঞা প্রয়োগ নয়। বিদ্রোহী বলতে এমন একটি শক্তিশালী সংঘবদ্ধ ভারী দল বুঝায় যারা সন্ত্রাস তথা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং কোনো রাজনৈতিক ও আকীদাগত ইস্যুকে কেন্দ্র করে ন্যায়পরায়ণ লোকদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে যুদ্ধরত থাকে। এ ধরনের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি ইসলামী রাষ্ট্রকে দেয়া জায়েয। যুদ্ধকালীন সময়ে এ ধরনের বিদ্রোহীদের হত্যা করা জায়েয। কিন্তু যুদ্ধের পর আহত, বন্দী ও পলায়নকারীদের হত্যা করা জায়েয নেই। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র এমন বিদ্রোহীকেই বন্দী করার পর হত্যা করা জায়েয যে এ যুদ্ধের আগে ও পরে এমন কোনো অপরাধ সংঘটিত করেছে যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অথবা যে ধুরন্ধর বিদ্রোহীর গোটা দলকে সহজে কাবু করা সম্ভব নয় এবং তাকে জীবিত রেখে যদি তার দলবলকে কাবু করে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব না হয় তবে তাকেও কোনো কোনো ফিকাহবিদের মতে হত্যা করা জায়েয।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেবলমাত্র উপরোল্লেখিত অপরাধের কারণে যদি ইসলামে মৃত্যুদণ্ড জায়েয হয় তাহলে একজন সত্যপন্থী ও ন্যায়বান খলীফা বর্তমান থাকা অবস্থায় খেলাফতের অপর কোনো দাবীদারকে মেরে ফেলা এবং তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া সংক্রান্ত যে হাদীসগুলো বর্ণিত রয়েছে সেগুলোর মর্ম ও তাৎপর্য কি ? হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ এসব হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এমন লোকের বিরুদ্ধে দমন অভিযান ও যুদ্ধ পরিচালনা কর। ইমাম নববী (র) মুসলিম শরীফের কিতাবুল ইমারাত-এ فاضربوا عنق الاخر এরপর লিখেছেন ঃ

معناه ادفعوا الثاني فانه خارج على الامام فان لم يندفع الابحرب وقتال فقاتلوه-

"একজন খলীফা বর্তমান থাকা অবস্থায় যখন অপর কেউ খেলাফতের দাবী নিয়ে দাঁড়ায় তখন তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার অর্থ হলো তাকে প্রতিহত করা। কেননা সে ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। আর যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া তাকে দমন করা সম্ভব না হয় তাহলে তার সাথে যুদ্ধ করো।"

মোল্লা আলী কারী (র) 'ফিকহে আকবর'–এ ইমামের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

والامر بقتله محمول كما صرح به العلماء على ما اذا لم يندفع الا بالقتل-

"খলীফার দ্বিতীয় দাবীদারকে হত্যা করার যে নির্দেশ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে এর তাৎপর্য হলো, হত্যা ছাড়া দমন করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে হত্যা করো। যেমন আলেমগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন।"

এটাই যদি এর তাৎপর্য না হতো তাহলে হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তো দূরের কথা বরং তার মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদানকারী হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে এ দণ্ড পাওয়ার (মায়াযাল্লাহ) উপযুক্ত সাব্যস্ত হতেন। আল্লাহর বিধান নিরপেক্ষ। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব নয় বরং কার্যকলাপের প্রতিই এর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

এ প্রসংগে আরো একটি জটিলতা আছে যার ইংগীত শুরুতেই দেয়া হয়েছে। তাহলো, কতিপয় রাওয়ায়েতে তিন অথবা চার অবস্থা ছাড়াও কতিপয় অন্যান্য অপরাধ সংঘটনকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার নির্দেশও এসেছে এবং যা কার্যকর করার ফতোয়া কতিপয় ফিকাহবিদ দিয়েছেন। এমনিভাবে কোনো কোনো ফিকাহবিদের মতে কতিপয় অবস্থায় শাস্তি হিসেবে ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায়। যাকে তারা রাজনৈতিক হত্যা হিসেবে অভিহিত করেন।

এ জটিলতার জবাব হলো, কতিপয় রাওয়ায়েতে যেসব অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডাদেশ বলা হয়েছে সেগুলো সাধারণত এ তিন অবস্থারই অনুরূপ যার উপর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা সর্বসম্মতিক্রমে ও নিসন্দেহে কুরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। তবে এসব অপরাধ এমন অস্বাভাবিক যৎকিঞ্চিৎ ও কদাচিত সংঘটিত হয় যে, এর উপর ভিত্তি করে শরীয়াত প্রবর্তক এ তিনটির সাথে

www.pathagar.com

এগুলোর উল্লেখ করা যথার্থ কিংবা জরুরী মনে করেননি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মাহরাম কিংবা পশু অথবা মৃতের সাথে অশ্লীল কাজ করা, যাদুটোনা ও গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে কোনো কোনো ফিকাহবিদ মৃত্যু দণ্ডাদেশের প্রস্তাব দিয়েছেন। কেননা এসব কাজ কোনো না কোনো দিক থেকে ঐসব কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে যাদের উপর মৃত্যু দণ্ডাদেশ নির্ধারিত। এমনিভাবে যে অপরাধী শাস্তিযোগ্য অপরাধে বারবার অভিযুক্ত হয় এবং হত্যার চেয়ে লঘু শাস্তি দিয়ে তাকে অপরাধ থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয় যেমন বারবার চুরি ও ডাকাতি করলে পেশাদার অপরাধীকে হত্যা করাও ফিকাহবিদের মতে জায়েয এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় হাদীসেও এ ধরনের অপরাধীকে হত্যা করার বৈধতা পাওয়া যায়।

শাস্তিমূলক হত্যার এসব ধরন এবং তা জায়েয হওয়া না হওয়ার সাথে বিদ্রোহ সংক্রান্ত বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই। ওসমানী সাহেব হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকে বিদ্রোহ করার অপরাধের নিরিখে বৈধ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এ কারণে রাজনৈতিক ও শাস্তিমূলক হত্যা প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করা আমার জন্যে জরুরী ছিলো না। তবুও জটিলতা নিরসন ও পাঠকদের মন-মানসিকতা পরিচ্ছন্ন করার অভিপ্রায়ে এ প্রসংগেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। সেই সাথে আমি একথাও পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে, অধিকাংশ ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিস একজন মুসলমানকে হত্যার ব্যাপারে উপরোল্লেখিত সহীহ হাদীসের আলোকে তিনটি অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমনটি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিজের অবরুদ্ধ অবস্থায় বিদ্রোহীদের সামনে পেশ করেছিলেন। চতুর্থ বৈধ অবস্থা হলো প্রতিরক্ষামূলক হত্যা। অর্থাৎ একজন মুসলমান যদি আক্রমণাত্মক, বিদ্রোহাত্মক অথবা যুদ্ধাংদেহী মূর্তি ধারণ করে সামনে এসে দাঁড়ায় তবে তাকে প্রতিহত করতে গিয়ে যদি সে মারা যায় তাহলে এ হত্যাকাণ্ড বৈধ হবে। জমহুর ফিকাহবিদদের মতে উল্লেখিত অবস্থা ছাড়া একজন মুসলমানের প্রতি জীবন নাশের উদ্দেশ্যে কোনো শাস্তি বা দণ্ডাদেশ আরোপ করা যাবে না। জীবন রক্ষা করে অপরাধের ধরন অনুযায়ী তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কাযী আবু ইউলার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। যা দ্বারা শাস্তিমূলক হত্যার অবৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম মাওয়ারদীও তার প্রণীত আহকামুস সুলতানিয়া গ্রন্থের শাস্তি অধ্যায়ে একথাই লিখেছেন ঃ

لايجوز ان يبلغ بتعزيرانهار الدم-

"শাস্তি আরোপের মাধ্যমে জীবন নাশ করা জায়েয নেই।"

www.pathagar.com

হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা কি শরীয়াতের দৃষ্টিতে অপরিহার্য ছিলো ?

আগের আলোচনা থেকে এ সত্যটি আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো যে, ক্ষমতাসীন সরকারের সমালোচনা করা এবং তার বিরুদ্ধে সব ধরনের প্রতিরোধ ও আন্দোলন এমনকি বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সকল পদক্ষেপ ও শরয়ী আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার (Sedition or Revolt) সংজ্ঞায় পড়ে না। ইসলামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হবার জন্যে কতিপয় শর্ত অপরিহার্য। তন্মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি শর্ত হলো। এক, অপরাধীরা বলপ্রয়োগে রাজসিংহাসন উল্টে দিতে চায়, রাষ্ট্রের প্রতি অনানুগত্যের মনোভাব নিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তছনছ করে দেয়া তাদের উদ্দেশ্য হয় এবং সৎ শাসকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও সশস্ত্র বিদ্রোহ করার অপরাধ করে। দুই, তারা নিজেদের সংখ্যা সাংগঠনিক শক্তি এবং জংগী সাজ-সরঞ্জামের দিক থেকে এতোটা রাজনৈতিক ও বৈষয়িক শক্তির অধিকারী যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ছাড়া তাদেরকে সহজে কাবু করা সম্ভব নয়। এ মৌলিক শর্তগুলোর অবর্তমানে অপরাধীদের উপর বিদ্রোহ আইন প্রযোজ্য হবে না। বরঞ্চ যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝগড়া-ফাসাদ, চুরি-ডাকাতি[১] ইত্যাদি কর্মের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য শরয়ী বিধানের আওতায় তারা অভিযুক্ত হবে। আমার আলোচনায় এর সাথে অপর যে সত্যটি প্রমাণিত হয় তাহলো—ইসলামে স্বয়ং বিদ্রোহ কর্মটি হত্যাকে অনিবার্য করে তোলে না। ইসলাম প্রত্যেক বিদ্রোহীকে গ্রেফতার করে হত্যা করার নির্দেশ দেয় না। বরং নির্দেশ হলো—বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই কর, তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না পিছু হটে যায় তারা ও বশ্যতা স্বীকার করে। লড়াই চলাকালীন সময়ে কোনো বিদ্রোহী নিহত হলে হবে কিন্তু যে আহত, বন্দী অথবা ফেরারী হবে তাকে গ্রেফতার করার পর হত্যা করা জায়েয নেই। এ আলোচনায় প্রসংগতঃ একথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলমানকে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় হত্যা করা জায়েয। প্রথমত, বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ; দ্বিতীয়ত, কাফের ও মুরতাদ হয়ে গেলে ; তৃতীয়ত, অন্যায়ভাবে স্বেচ্ছায় হত্যা করলে। মুহাম্মদ তাকী সাহেব হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্রোহী এবং তাকে হত্যা করা ওয়াযিব প্রমাণের জন্যে যে ত্রিশের অধিক পৃষ্ঠা লিখেছেন আমার এ পর্যন্তকার আলোচনার আলোকে তার জবাবে শুধুমাত্র এটুকু বলে দেয়া যথেষ্ট হতে পারে যে, হযরত হুজার বিন আদী

১. পূর্ববর্তী আলেমগণ তাদের নিজেদের লেখার কোথাও কোথাও বিদ্রোহ, যুদ্ধ, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ইত্যাদি শব্দগুলোকে সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নিরেট বিধি-বিধান ও ফিকহী অধ্যায়ে তাঁরা এ পরিভাষাগুলোর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সেখানে একটির সাথে অন্যটিকে আলাদাভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা তাঁর কোনো সংগীর কোনো কাজকেই বিদ্রোহাত্মক বলা যায় না কিংবা যদি তাঁর কোনো কাজকে বিদ্রোহাত্মক ধরেও নেয়া যায় তবুও গ্রেফতারের পর তাঁকে হত্যা করা ইসলামের দৃষ্টিতে কোনোক্রমেই জায়েয ছিলো না। কিন্তু আমি মনে করি, ওসমানী সাহেব এ দীর্ঘ লেখায় দলীল-দস্তাবেজের যে বহর দেখিয়েছেন এবং হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যাকে জায়েয প্রমাণ করাতে যেভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তা থেকে একেবারে দৃষ্টি এড়ানোও সম্ভব নয়। এ কারণে এবার আমি এর উপরও আমার পর্যালোচনা পেশ করছি।

হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস

ওসমানী সাহেবের এটাও একটা অভিযোগ যে, মাওলানা মওদূদী হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'ঢালাও ভাবে' যাহেদ ও আবেদ সাহাবী বলে দিয়েছেন। অথচ তাঁর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারটি বিতর্কিত। ইবনে সাআদ (র) এবং মাসআব যুবাইর (র) তাঁকে সাহাবী বলেছেন সত্য ; কিন্তু ইমাম বুখারী, ইবনে আবু হাতেম ও ইবনে হাব্বান (র) তাঁকে তাবেঈন হিসেবে গণ্য করেছেন। আবু আহমদ আসকারীর মতে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ তাঁর সাহাবী হওয়াকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করেননি। কিন্তু হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদগণ যা লিখেছেন, সেগুলো সামগ্রিকভাবে সামনে রাখলে ওসমানী সাহেবের ভাষাতেই এটা বলতে হয়, তিনি মুহাদ্দিসগণের লেখার জরুরী অংশ বাদ দিয়ে বড়ই বাস্তব বিরোধী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে বিদায়া ও ইসাবা গ্রন্থদ্বয়ের সন্দেহমূলক কথাগুলো ঠিকই উল্লেখ করলেন কিন্তু তাঁর সাহাবী হওয়ার প্রমাণভিত্তিক কথাগুলো ছেড়ে দিলেন। যেমন বিদায়া গ্রন্থের যে পৃষ্ঠার উদৃতি তিনি দিয়েছেন তার শুরুতেই উল্লেখ আছে ঃ

قال ابن عساكر وفد الى النبى صلى الله عليه وسلم -

"ইবনে আসাকীর বলেছেন ঃ হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আ-লাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হন।"

অনুরূপ মারযাবানী (র)-এর একথাটিও উল্লেখ আছে ঃ

حجر بن عدى وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اخيه هانئ بن عدئ -

"হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ভাই হানী বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ প্রতিনিধি হিসেবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়েছিলেন।"

www.pathagar.com

হাফেজ ইবনে আবদুল বার 'আল ইস্তিআব' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

كان جحر من فضلاء الصحابة ـ

"হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।"

এরপর তিনি ইমাম আহমদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইয়াহইয়া বিন সুলাইমানের উক্তির উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি হলো—হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর মুকাবরার বান্দা ও নবীর উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। ইস্তেআব গ্রন্থে ইবনে নাফে' থেকে বর্ণিত আছে—তিনি হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী হিসেবে গণ্য করে তাঁর থেকে একটি হাদীস রাওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটি হলো ঃ

قال النبى صلى الله عليه وسلم ان قوما ايشربون الخمر يسمونها بغيراسمها ـ

হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবা গ্রন্থে ইমাম হাকেমের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত হুজার এবং তাঁর ভাই হযরত হানী বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রতিনিধিরূপে হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারপর ইবনে হযর (র) আবু বকর বিন হাফসের কথা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাহাবীরূপে গণ্য করে তার থেকে একটি হাদীস রাওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটি হলো ঃ

ان قوما يشربون الخمر يسمونها بابغيراسمها ـ

'উসুদুল গাবাহ' সাহাবায়ে কিরামের জীবনী সম্বলিত তৃতীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে লেখা আছে—হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজারুল খাইর (কল্যাণের প্রস্তর) উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের সাথে হুজুরের পাক দরবারে এসেছিলেন এবং তাঁকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ও বিচক্ষণ সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হতো।

ইমাম হাকেম তার প্রণীত গ্রন্থ আল মুসতাদরাকের ২য় খণ্ডে সাহাবীগণের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ৪৬৮ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন ঃ

مناقب حجر بن عدى رضى الله عنه وهو راهب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একনিষ্ঠ ও ভক্ত সাহাবী হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা।"

www.pathagar.com

ইমাম যাহবী প্রণীত তালখীসে মুসতাদরাক গ্রন্থেও অনুরূপ শিরোনামের একটি অধ্যায় রয়েছে। তিনি হাকেমের এ বর্ণনার সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি।

মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদগণের এসব ব্যাখ্যা বিবৃতির পর একথা কিভাবে সঠিক হতে পারে যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহাবী হওয়াকে সঠিক বলে গ্রহণ করেননি এবং ওসমানী সাহেবের এ অভিযোগই বা কেমন করে যথার্থ হতে পারে যে, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁকে ঢালাওভাবে যাহেদ ও আবেদ[১] সাহাবী বলেছেন? যদি ওসমানী সাহেব খারাপ মনে না করেন তাহলে আমি আরজ করবো যে, তিনি হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহাবী হওয়াকে সন্দেহযুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ সকল শক্তি সামর্থ এজন্যে ক্ষয় করেছেন যে, একজন সাহাবীকে হত্যাযোগ্য অপরাধী প্রমাণিত করার দ্বারা তার এ মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকুক। তার এ রচনার আবেদন বাস্তবিকই সাহাবীর পৃষ্ঠপোষকতার প্রেরণা। আর একথা সুস্পষ্ট যে, একজন সাহাবীর খাতিরে অন্য একজন সাহাবীকে অপরাধী ও হত্যাযোগ্য সাব্যস্তকারী ব্যক্তি তো সাহাবীর পৃষ্ঠপোষকতার পতাকাবাহী হতে পারে না।

হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর অপরাধের তালিকা

ওসমানী সাহেব হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্রোহী প্রমাণ করার জন্যে যেসব অপরাধের তালিকা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সন্নিবেশিত করেছেন এবার আমি সেগুলো একটি একটি করে খণ্ডন করছি। এ ব্যাপারে তার প্রথম অভিযোগ হলো, হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সরকারের বিরোধী ছিলেন এবং তিনি হযরত হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদ্রোহ করার জন্যে বারবার উস্কানী দিচ্ছিলেন। কিন্তু এ জ্ঞানী দু' ভাই কিছুতেই আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সম্মত হননি। হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীদের বিশ্বাস ছিলো আবু তালিবের বংশধরগণ ছাড়া আর কেউ খেলাফতের যোগ্য নয়।

এ অভিযোগের জবাব হলো—কোনো খলীফার সরকারকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ না করা এবং অপর কাউকে তার বিরুদ্ধে উস্কানী দেয়া অথবা কাউকে অপর কারো মুকাবিলায় খেলাফতের উপযুক্ত মনে করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে বিদ্রোহাত্মক অপরাধের সংজ্ঞায় পড়ে না। বিশেষত যখন এ উস্কানীর প্রতি সাড়া দেয়ার ব্যাপারে অপর পক্ষের হতোদ্যম প্রকাশ পায় এবং কার্যত কোনো বিদ্রোহ

১. সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণভাবে কিংবা শর্তহীন বা শর্তসাপেক্ষে সাহাবী হওয়া একটি অদ্ভুত পরিভাষা যা প্রথমেই আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সংঘটিত না হয়। হযরত সাআদ বিন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বায়আত গ্রহণ করেননি এবং তিনি আনসারদেরকে খেলাফতের যোগ্য মনে করতেন। এটা ইতিহাস খ্যাত ঘটনা। কোনো ইতিহাসবিদের বর্ণনা মতে তিনি হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতিতে জুমআ ও পাঞ্জেগানা সালাত আদায় করতেন না। তাদের নেতৃত্বে হজ্জও করতেন না। যদি তাঁদের কোনো সাথীর দেখা পেতেন তাহলে তিনি তাঁর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতেও দ্বিধা করতেন না। কিন্তু কেউ তাঁকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করে বন্দীও করেনি হত্যাও করেনি। ইতিহাসের অপর বিখ্যাত ঘটনাটি হলো হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানিত পিতা হযরত আবু সুফিয়ানকে কেন্দ্র করে যা ইসতি'আব ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বায়আত গ্রহণ করেন তখন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বলতে লাগলেন ঃ এটা কেমন কথা যে, কুরাইশের সবচেয়ে ছোট গোত্রের লোকেরা খেলাফতের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করলো ? হে আলী ! আল্লাহর কসম, যদি তুমি পসন্দ কর তাহলে আমি এ উপত্যকা পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীতে ভরে ফেলতে পারি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন ঃ "তুমি সবসময় ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতা করতে থাকো! কিন্তু তাতে ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।" আমাদের মতামত হলো —আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফত পদের যোগ্য অধিকারী। এ ঘটনা অসংখ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়ে এসেছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে এ ঘটনাটি কয়েকবার উল্লেখ করেছেন। বরঞ্চ তিনি আরো লিখেছেন ঃ

فقد اراد ابو سفيان وغيره ان تكون الامارة فى بنى عبد مناف على عادة الجاهليه فلم يجبه الى ذالك على ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم ودينهم -

"আবু সুফিয়ান ও অপর কয়েকজন চেয়েছিলো, জাহেলী প্রথা অনুযায়ী বনী আবদে মনাফের দখলে প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু হযরত আলী, হযরত ওসমান ও অন্যান্য সাহাবীদের দূরদর্শীতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে তাদের এ ইচ্ছা পূরণ হতে পারেনি।"[১]

এখন ওসমানী সাহেবের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, যদি হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উস্কানী দেয়ার

১. মিনহাজুস সুন্নাহ খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-১৬১, আমীরিয়া প্রেস, মিসর ১৩৩১ইং খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৯, খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-১২৩ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

অপরাধে বিদ্রোহী হয়ে যান তাহলে হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ অপরাধের প্রথম শ্রেণীর অপরাধী নন কি ? এতদসত্বেও খোলাফায়ে রাশেদীনের কেউ এ অপরাধের দরুন তাঁকে পাকড়াও না করার কারণ কি ?

ওসমানী সাহেব হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বিতীয় যে অপরাধ বর্ণনা করেন তা হলো—তিনি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রকাশ্যে গালমন্দ করতেন। অথচ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো গভর্নর কখনো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে এমন ধরনের কোনো কথা বলেননি। কিন্তু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কেবিনেট সদস্যদের প্রত্যেক কথায় তাদের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বায়তকে ভর্ৎসনা করার ব্যাপারে আমি যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তারপরও ওসমানী সাহেব এ দাবী থেকে সরে এসেছেন কিনা জানি না যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো গভর্নর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে কখনো কোনো খারাপ বা মন্দ কথা বলেননি। গালমন্দ করার সূচনা যে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর গভর্নরদের পক্ষ থেকে হয়েছিলো একথা আমি অকাট্য সূত্র দ্বারা প্রমাণ করেছি এবং হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা অপর কোনো ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে রূপই ধারণ করুক না কেন তা ছিলো একটি জবাবী প্রতিক্রিয়া। যদি এ ভর্ৎসনা ও প্রতিবাদের নাম বিদ্রোহ হয় তাহলে খেলাফতে রাশেদার উপস্থিতিতে এবং তাদের শাসনামলে যারা এ কাজ করেছেন তারাইতো সকলের আগে বিদ্রোহী হবেন এবং তাদের অপরাধ জবাবী প্রতিবাদকারীদের তুলনায় অধিকতর কঠিন হবে। আমার বক্তব্য হলো, গালমন্দের সূচনা এবং এর জবাবে যে কেউ ভর্ৎসনা করুক না কেন, তা অত্যন্ত খারাপ করেছে। আজও যারা এ কাজ করে তারা অত্যন্ত খারাপ কাজই করে। কিন্তু এ অপরাধ বিদ্রোহের সমার্থক নয় এবং হত্যাও এর শাস্তি নয়। পূর্ববর্তী আলেমদের কারো মতে রাসূলের ভর্ৎসনাকারীকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্ত্বা ছাড়া অপর কাউকে গালি দেয়া কিংবা বদনাম করা ইসলামে আদৌ হত্যাযোগ্য অপরাধ নয়।[১] হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও মৃত্যুদণ্ড যোগ্য

১. কারো মতে হত্যা ওয়াযিব তো দূরের কথা শাস্তিও ওয়াযিব নয়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশাসনিক সীমানায়ই অবস্থান করে খারেজীরা তাকে গালমন্দ করতো। কিন্তু এতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেননি। ইমাম সারাখসী এ বিষয়ে মাবসূতের ১০ম খণ্ডের ১২৫ পৃঃ লিখেছেনঃ وفيه دليل على ان التعريض بالشتم لايوجب التعزير

"এটা একথার দলীল যে, শাসককে গালমন্দ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়।"

www.pathagar.com

মামলা তৈরী করার সময় ওসমানী সাহেবের এমন কথা বলা যে, অমুক গভর্নরের সামনে তিনি গালমন্দ করেছেন, একটি অপ্রাসংগিক বিষয়। যদি একজন গভর্নর প্রকাশ্যে একজন সাহাবীকে তাও আবার সে সাহাবী কোনো মামুলী সাহাবী নন বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম এবং খোলাফায়ে রাশেদকে তাদের মৃত্যুর পর গালিগালাজ করে যাকে হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনা ও গালমন্দ করার নামান্তর বলেছেন। তাতে কোনো মুসলমান উত্তেজিত হয়ে সমুচিত জবাব দিলে তাকে বিদ্রোহ, তাও আবার হত্যাযোগ্য বিদ্রোহ সাব্যস্ত করার ধৃষ্টতা কেবলমাত্র ওসমানী সাহেবের মতো লোকেরাই দেখাতে পারেন।

হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর তৎপরতা

আমার কাছে এটা সত্যিই বিস্ময়কর মনে হয় যে, হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুফায় অবস্থানকালীন সময়ে বিশৃংখলা ও বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার উপাখ্যান মুহাম্মদ তাকী সাহেব ঠিকই লম্বা চওড়া করে বর্ণনা করলেন কিন্তু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নরদের সেসব কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ঐ সমস্ত তৎপরতার প্রকাশ ঘটে যার ওপর বিদ্রোহের সিল লাগানো হচ্ছিলো। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন মাওলানা মুহাম্মদ তাকী সাহেবের কথানুযায়ী এ রক্ত সাগরে অত্যন্ত সহজভাবে সাঁতার কাটেন, তিনি তার ইতিহাস গ্রন্থে (খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-১১) হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার পরিণতিতে সৃষ্ট ঘটনা প্রবাহ উল্লেখ করতে গিয়ে একথা বলতে বাধ্য হন যে-

كان المغيرة بن شعبة ايام امارته على الكوفة كثيرا ما يتعرض لعلى فى مجالسه وخطبه -

"মুগীরা বিন শুবা কুফার শাসক থাকাকালীন সময়ে তাঁর অধিকাংশ সভায় ও খুতবায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করতেন।"

পরবর্তীতে যিয়াদ সেখানে অসদাচরণ ও যুলুম-নির্যাতনের যে তাণ্ডবলীলা চালায় তা ছিলো নজিরবিহীন ঘৃণ্য কাজ। ওসমানী সাহেব নিজেই কোথাও কোথাও একথা স্বীকার করেছেন যে, যিয়াদ হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বারবার হত্যা করার হুমকি দিতো এবং বলতো আমি যদি কুফার মাটি হুজার থেকে পবিত্র না করি এবং ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে একে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তরূপে গড়ে না তুলি তবে আমার কোনো অস্তিত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। অবস্থার এরূপ অবনতি সত্বেও তাকী সাহেব না জানার ভান করে বললেন,

www.pathagar.com

ঘটনাবলীর সামগ্রিক পর্যালোচনার পর যিয়াদের শরয়ী বিধান বিরোধী কোনো তৎপরতা আমাদের নজরে পড়েনি। যিয়াদের রক্ত পিপাসু অপরাধের চিত্র আমি ইবনে খালদুন সহ অন্যান্য ইতিহাসবিদদের ভাষায় প্রথমেই উল্লেখ করেছি। হাফেজ ইবনে আবদুল বাররও ইসতেআব গ্রন্থে এরকমই লিখেছেন যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন যিয়াদকে ইরাকের গভর্নর বানান তখন সে কর্কশতা ও অসদাচরণের প্রদর্শনী করেছে।-(اظهر من الغلظة وسوء السيرة) (খঃ ১, পৃষ্ঠা-৩৫৫)

ওসমানী সাহেব হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপবাদ দেয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত কলহপ্রিয় ও গালিগালাজ করার দোষারোপ ছাড়াও হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীগণের কুফার গভর্নরের উপর পাথর নিক্ষেপ এবং লাঠি ও পাথর দিয়ে লড়াই করার অতিরিক্ত অপবাদ আরোপ করেন। ঘটনা হলো, এ তৃতীয় অপবাদ প্রমাণ করার জন্যে যে টানা হেঁচড়ার এবং তিলকে তাল করার চেষ্টা করা হয়েছে তার যথোপযুক্ত জবাব না দেয়া অন্যায় হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুযায়ী যিয়াদকে বসরায় অবহিত করা হলো যে, হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসারীরা একত্রিত হচ্ছে ঃ وانهم حصبوا عمرو بن حريث এবং যিয়াদের সহকারী আমর বিন হুরাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তারা পাথর মেরেছে। ওসমানী সাহেব তার গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় এর অনুবাদ করেছেন —"তারা পাথর বর্ষণ করে।" পরিশেষে যেখানেই বিদ্রোহের অপরাধ সংক্রান্ত খণ্ডিত অংশগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সেখানে ওসমানী সাহেব আবারও লিখছেন ঃ "কুফার গভর্নর আমর বিন হুরাইসের উপর পাথর নিক্ষেপ করে।" এ পাথর বর্ষণের কারণে কতিপয় লোক তো অবশ্যই আহত কিংবা নিহত হয়ে থাকবে, ওসমানী সাহেবের উচিত ছিলো সেই সাথে একথাও সংযোজন করা। ঐতিহাসিকগণ যদি একথার উল্লেখ না করে থাকেন তাহলে এতো ঃ

عدم ذکر ہی تو ہے، ذکر عدم تو نہیں

তারপর ওসমানী সাহেব সেসব ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো-এরপর যিয়াদ নিজেই কুফায় এসে দীর্ঘ এক খুতবা দেন।

১. এ বিষয় সংক্রান্ত লেখাসমূহে খুতবাদানের সময় পাথর নিক্ষেপ করার কথা বারবার উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকে পাঠকগণের মাঝে এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, কতিপয় নামাযী পূর্ব পরিকল্পনা মুতাবিক বাহির থেকে পাথর নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেছেন। আসলে সে আমলে মসজিদের মেঝে কাঁচা থাকতো। কাঁচা মেঝের উপর কংকর বিছিয়ে দেয়া হতো। কেউ কেউ উত্তেজিত অবস্থায় এ ক্ষুদ্র কংকরগুলোই নিক্ষেপ করতো। ওসমানী সাহেব একেই পাথর বর্ষণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় নামায ছুটে যাবার আশংকা দেখা দিলে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উপরও পাথর নিক্ষেপ করেন। এরপর যিয়াদ সমস্ত ঘটনা লিখে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবহিত করেন। তিনি হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বন্দী করে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। যিয়াদ পুলিশ অফিসার কর্তৃক তাঁকে তলব করেন কিন্তু তিনি উপস্থিত হতে অস্বীকার করেন। অতপর যিয়াদ অতিরিক্ত লোক পাঠিয়ে তাকে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন ; অন্যথায় তাঁর সাথে লড়াই করার হুকুম দেন। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে লাঠি ও পাথর দিয়ে লড়াই হয়ে যায়।১ কিন্তু হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তিনি কিন্দাহ এলাকায় পালিয়ে যান। এখানেও লড়াই হয় এবং একদল লোক যুদ্ধের কবিতা পাঠ করলেন এভাবে—হে হুজারের গোষ্ঠী ! প্রতিরক্ষা কর, আক্রমণ কর এবং স্বীয় ভাইয়ের পক্ষ থেকে লড়াই করার জন্যে তৈরী হয়ে যাও। এখান থেকেও হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার পালিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। পরিশেষে নিরাপত্তা দেয়ার শর্ত সাপেক্ষে তিনি নিজেই যিয়াদের সামনে উপস্থিত হন।

ওসমানী সাহেব আরো লিখেছেন, হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর অপরাপর সাথীগণ যথারীতি নিখোঁজ হয়ে যায়। জানা নেই, তিনি কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে একথা বলে দেননি যে, পরে তাঁকেও বন্দী করা হয়। অথচ তাঁর লেখার শেষাংশে এ চৌদ্দজনকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার কথা উল্লেখ আছে। যাদের মধ্যে ছয়জনকে মুক্তি দেয়া হয় এবং আটজনকে হত্যা করা হয়।

হযরত হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে বিদ্রোহ করার জন্যে উস্কানী দেয়া এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার জবাবে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর গভর্নরদেরকে গালিগালাজ করার পর হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদ ও তার পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে নীতি গ্রহণ করেন তা যেনো ওসমানী সাহেবের জানামতে

---

১. ইবনে আসীর তার আল কামেল গ্রন্থে এ লড়াইয়ের বিবরণ দিয়েছেন। যিয়াদের পুলিশ বাহিনী লাঠি চার্জ করলে একজন লোক লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সাথীদের জীবন রক্ষা করে। ইত্যোবসরে তিনি কিন্দার গেইট দিয়ে পালিয়ে যান।

(اخذ عمود امن بعض الشرط فقاتل به وحمى حجرًا واصحابه حتى خرجوا من ابواب الكنده الكامل، جلد ٣ صفحه ٢٣٥)

ইতিহাসবিদগণ এ সংঘাতের [illegible] বিবরণ [illegible] তাতে একবার মাত্র তলোয়ার ব্যবহারের কথা [illegible] আছে। আর এ তলোয়ারের আঘাতে একজন লোক মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

www.pathagar.com

বিদ্রোহের অপরাধ পূর্ণাংগরূপে প্রমাণ করার জন্যে সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ কড়িছিলো। আমি ইসলামের বিদ্রোহ আইনের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা আগেই করেছি। আমি বলেছি বিদ্রোহের অপরাধ সাব্যস্ত ও নিরূপণ করার জন্যে জরুরী হলো বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য হবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিপ্লব ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উলটপালট করে দেয়া এবং ন্যায়বান সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতীর্ণ হওয়া। সেই সাথে এটাও অপরিহার্য যে, অপরাধী এমন জাগতিক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং এমন সংগঠিত শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী হবে যে, সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া তাদেরকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। আমার জিজ্ঞাস্য হলো, হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর যার সম্পর্কে ওসমানী সাহেব নিজেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ উক্তি উল্লেখ করেন যে—আমার ধারণা ছিলো না যে, এ বেচারা (হুজার) দুর্বলতার এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যা আমি দেখছি, এবং যার সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের বর্ণনা হলো—যিয়াদের পুলিশ বাহিনীর হাত থেকে পালাবার সময় তিনি বাহনের উপর অপরের সহায়তা ছাড়া ঠিকমত বসতেও পারছিলেন না। এমন বাহন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি এবং মসজিদ কিংবা ঘরে একত্রিত তাঁর কতিপয় সাথীর উপর বিদ্রোহের শরয়ী পরিভাষা প্রয়োগ করা কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হতে পারে ? তারা কি এমন শক্তিশালী ও বশ না মানার মতো সংঘবদ্ধ শক্তি ছিলো যাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার দরকার ছিলো ? আসলে পুলিশ বাহিনী দ্বারা তাদেরকে পরাস্ত করা ও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছিলো তো এ কারণে যে, তারা সংখ্যা ও অস্ত্রের দিক থেকে আদতেই কোনো শক্তিশালী ও প্রতাপশালী দলই ছিলো না।

'ইসতেআব' গ্রন্থে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে মাসরুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে রাওয়ায়েত করেছেন। তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে একথা বলতে শুনেছেনঃ

لو علم معاوية ان عند اهل الكوفة مَنَعَة ما اجترأ على ان يأخذ حجراً واصحابه من بينهم حتى يقتلهم بالشام-

"মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি জানতেন যে, কুফাবাসীদের শক্তি আছে, তাহলে তিনি হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু ও তাঁর সাথীদেরকে কুফাবাসীদের কাছ থেকে গ্রেফতার এবং সিরিয়ায় এনে তাদেরকে হত্যা করার দুঃসাহস করতেন না।"

হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীগণ তো দূরের কথা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতে গোটা কুফাবাসী মিলেও এমন প্রতিবন্ধক শক্তির অধিকারী ছিলো না যাদের প্রতি বিদ্রোহীর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হতে পারে।

www.pathagar.com

কিন্তু আমাদের মুফতী সাহেব তাদেরকে বিদ্রোহী এবং হত্যাযোগ্য ফতওয়া দিয়ে দেন। অধিকন্তুও বিদ্রোহীদের অবস্থা ছিলো এরূপ যে, উল্লেখিত চৌদ্দ ব্যক্তিকে শৃংখলাবদ্ধ করার পর মাত্র দু'জন প্রহরী তাদেরকে ভেড়ার মতো তাড়িয়ে প্রথমে দামেশকে এবং পরে সেখান থেকে মরজে[১] ওজরার জংগলে নিয়ে যায়। সেখানে অর্ধেককে জবাই করে হত্যা করা হয়। কিন্তু তাদের ফেরারী ও নিখোঁজ সাথী কিংবা অন্য কোনো হিতাকাংখী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি এবং হত্যার পরও কেউ টু শব্দ করেনি। এরা এমন বিদ্রোহী যাদের ব্যাপারে একথা বলা হয় যে, এদেরকে হত্যা করা হলে এদের সাথে এক লাখ মানুষকে হত্যা করতে হতো।

এসব 'বিদ্রোহী' ও যিয়াদের পুলিশ বাহিনীর সাথে যে লড়াই টক্কর বাধে এবং এতে সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হয় তাকে মুহাম্মদ তাকী সাহেব রীতিমতো একটি যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন—যেখানে লাঠি ও পাথর ব্যবহার হয়েছিলো এবং যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাও আবৃত্তি হয়েছিলো। একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, এটা এমন এক যুগের ঘটনা যে যুগে প্রত্যেক ঘরে ঘরে তীর-ধনুক, তলোয়ার-বর্শা ইত্যাদি তৈরী থাকতো। উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হলেও হয়েছিলো লাঠি ও পাথর দিয়ে যা আদৌ যুদ্ধাস্ত্র বা আগ্নেয়াস্ত্রের সংজ্ঞায় পড়ে না। এর কারণও পরিষ্কার। হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীরা এ কারণে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন না যে, তাঁরা একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধ করার শক্তি ও নিয়ত কোনোটাই রাখতেন না। অপরদিকে যিয়াদের বাহিনী এজন্যে অস্ত্র সজ্জিত হয়নি যে, তারা এর প্রয়োগ জরুরী মনে করেনি এবং কোনোরূপ হাংগামা ছাড়াই তাদেরকে দমন করতে সক্ষম হয়। এ দমন অভিযান ও ধর পাকড়ের যে ব্যাখ্যা ইতিহাসে বিধৃত হয়েছে তাতে কারো নিহত বা গুরুতরভাবে আহত হওয়ার কথা জানা যায় না। ঘটনা হলো—এরচেয়েও ভয়াবহ হাংগামা ও বিপর্যয় যুগে যুগে হয়ে আসছে কিন্তু সেগুলো কখনো 'বিদ্রোহ' নামে অভিহিত হয়নি। স্বয়ং আমাদের দেশেও জনগণ বিভিন্ন সময় পুলিশ বাহিনীর লাঠি চার্জের জবাব ইট পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে দিয়েছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শ্লোগানও দিয়েছে। তবে কি মুফতিতনয় ওসমানী সাহেব তাদের সম্পর্কেও ফতওয়া দেবেন যে, তারা শরয়ী পরিভাষা অনুযায়ী বিদ্রোহী ও হত্যাযোগ্য ছিলেন? ভাবতে অবাক লাগে যে, শরয়ী বিধানের এসব নব্য ও অদ্ভুত ব্যাখ্যা কোন্ কল্পনাপ্রসূত জ্ঞানের ভিত্তিতে দেয়া হচ্ছে? প্রথমে বলা হলো, প্রশাসক ও গভর্নরদের উপর কিসাস, দণ্ড কিংবা জরিমানার প্রয়োগ নেই যদিও তারা সুস্পষ্ট যুলুম নির্যাতন করুক না

১. মরজে ওজরা সর্বপ্রথম হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বিজিত হয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো, ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, এ প্রদেশে সর্বপ্রথম তিনিই আল্লাহর বাণী উচ্চারিত করেন এবং ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এখানেই তাকে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

কেন। দিয়ত বা জরিমানা অগত্যা দিতে হলে তা প্রশাসক বা কর্তা ব্যক্তির পকেট থেকে নয় বরং দিতে হবে সাধারণ জনগণ তথা রাজকোষ থেকে। এখন আবার বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতা চালায়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, গালমন্দের জবাবে গালমন্দ করে, গ্রেফতারীর জন্য নিজেকে ধরা দেয়ার পরিবর্তে বাধার সৃষ্টি করে কিংবা নিখোঁজ হয় তার অপরাধ বিদ্রোহের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এবং তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমার কথা হলো, যেসব অপরাধকে বিদ্রোহ নাম দেয়া হচ্ছে এবং যার উপর ভিত্তি করে মুসলমান হত্যা করা জায়েয সাব্যস্ত করা হচ্ছে সেসব অপরাধের কারণে তো একজন জিম্মিরও রক্ত ঝরানো ইসলামে জায়েয নেই এবং ইসলাম তাকে নিজ দায়িত্ব থেকে খারিজ করে না। যদি এ ধরনের মুফতি সাহেবদেরকে রাষ্ট্র বা বিচারালয়ের আসনে বসানো হয় তাহলে তারা ইসলামী বিধানকে ছেলের হাতের মোয়া বানিয়ে ছাড়বে এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্রে কাফের ও জিম্মীগণ যে অধিকার ও নিরাপত্তা লাভ করে মুসলমানগণ সেখানে তাও লাভ করতে পারবে না। ওসমানী সাহেবের কাছে আমার আরজ–মেহেরবানী করে আপনার সম্মানিত পিতা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করুন, যদি আজকাল কোনো গভর্নর মুসলিম জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করে এবং কতিপয় মুসলমান এ গালমন্দ সহ্য করতে না পেরে গভর্নরের প্রতি জুতো বর্ষণ করে এবং গভর্নর তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্যে পুলিশ পাঠালে তারা লাঠি ও ইট পাটকেল দ্বারা পুলিশ বাহিনীর মোকাবিলা করে তাহলে কি তারা বিদ্রোহী ও মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধী হয়ে যাবে? মুফতী সাহেব এর জবাবে যে ফতওয়া দেবেন তা মেহেরবাণী করে প্রকাশ করুন।

ওসমানী সাহেবের প্রতি আমার পরামর্শ হলো—পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ ও ১২৪(ক) ধারাটি একটু পড়ে দেখুন। একজন কাফের, বিজাতী এবং বিজয়লাভকারী জাতি একটি পরাজিত এবং বিজিত জাতির উপর প্রয়োগ করার জন্যে এ আইন তৈরী করেছিলো। এ আইনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও আধিপত্যকে সুদৃঢ় করা ও প্রতিষ্ঠিত রাখার পরিপূর্ণ বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো এবং অধীনস্থ জাতির নাগরিক অধিকার অত্যন্ত কম নির্ধারণ করা হয়েছিলো। ১২৪ ধারার অধীনে রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা গভর্নরকে তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধা দেয়া, তাদের ক্ষমতার খর্ব করা এবং তাদের উপর আক্রমণ করা আইনত দণ্ডনীয়। এর সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছর কারাবরণ। তারপর ১২৪(ক) ধারায় সরকার বিরোধী ঘৃণা বিদ্বেষ ও বিশ্বস্তহীনতার চেতনা প্রকাশ ও প্রসারকে বিদ্রোহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এর শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড নয় বরং সর্বোচ্চ শাস্তি

নির্ধারণ করা হয়েছে যাবজ্জীবন কারাবাস। এ ধারার ব্যাখ্যায় একথাও সন্নিবেশিত হয়েছে যে, বৈধ আইনানুগ উপকরণের মাধ্যমে কাজ করে সরকারের পদক্ষেপের উপর সমালোচনা করা এবং এগুলোর পরিবর্তনের দাবী করা অপরাধ নয়। এখন শরয়ী আইনের যে ব্যাখ্যা ও বিবরণ ওসমানী সাহেব করছেন তার আলোকে এ দু'টি ধারার সংস্কার করে তার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে, আল্লাহ আমাদের সকলের উপর রহমত করুক।

انا لله وانا اليه راجعون

گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا کار طفلاں تمام خواہد شد

হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মকদ্দমা ও তার বিবরণ

হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীদের অপরাধসমূহের মূলতত্ব প্রকাশ হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগ মামলা দায়ের করে যেভাবে সাক্ষী সাবুদ পেশ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে ইসলামের দণ্ডবিধান এবং ন্যায় ও ইনসাফের দাবীকে কতটুকু মূল্যায়ন করা হয়েছে তাও তলিয়ে দেখা জরুরী। বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ তাবারীর ৪র্থ খণ্ডের ১৯০ পৃষ্ঠা থেকে ২০৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ ঘটনাই স্ববিস্তারে বিবৃত হয়েছে। ওসমানী সাহেব বারবার এসব পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির প্রতি জরুরী কথা বিলোপ করার অভিযোগ আরোপ করে বলেছেন, আমি সেসব কথা সম্পর্কে সতর্ক করবো। এবার যে অংশগুলো তিনি নিজে বাদ দিয়েছেন এবং আলোচনা ও পর্যালোচনার যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিক তথ্যগুলো এড়িয়ে গিয়েছেন আমিও সেগুলো চিহ্নিত করে দিচ্ছি। তাবারীর ১৯৯ পৃষ্ঠায় একথার উল্লেখ আছে যে, যিয়াদ হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বারজন সংগীকে জেলে পাঠিয়ে এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডেকে বলে ঃ "হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তোমরা যা জানো তার সাক্ষ্য দাও।" কিন্তু সাক্ষ্যদানের সময় হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সাথীদের আত্মপক্ষ সমর্থন করা কিংবা কোনো সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ দেয়ার কথা গোটা আলোচনার কোথাও উল্লেখ নেই।

ইসলামের বিচার পদ্ধতি

আবু দাউদ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعد ان بين يدى الحاكم-

"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচার পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেছেনঃ মামলার বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই বিচারকের সামনা সামনি বসবে।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض حتى تسمع كلام الاخر كما سمعت كلام الاول-

"উভয় পক্ষ তোমার (বিচারক) সামনাসামনি হওয়ার পর প্রথম পক্ষের ন্যায় দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য না শোনার আগে রায় ঘোষণা করো না।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিচারকার্য সম্পাদন সংক্রান্ত যে হেদায়াতনামা পাঠান তা বিভিন্ন ফিকহের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। হেদায়াতনামায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ

سوّ بين الناس فى وجهك ومجلسك حتى لاييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف فى حيفك-

"তুমি জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং বিচারকার্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা কর। তাতে দুর্বলগণ তোমার ন্যায়বিচার থেকে নিরাশ হবে না এবং প্রভাবশালী লোকেরা তোমার কাছে থেকে অন্যায়ভাবে কিছু পাওয়ার আশা করবে না।"

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাদের অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হাদীস ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূলনীতির সম্পূর্ণ খেলাফ। এ ধরনের সাক্ষ্য অপরাধ প্রমাণের মূলভিত্তি হিসেবে আদৌ গণ্য হতে পারে না। অধিকন্তু ইসলামের সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য আলাদাভাবে গ্রহণ করাও জরুরী যাতে তাকে অন্যের সাক্ষ্য দ্বারা প্রভাবিত না হয় এবং তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্যে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় যা অভিযুক্তের জন্য লাভজনক, তাহলে সে যেনো এ লাভ থেকে বঞ্চিত না হয়।[১] কিন্তু যিয়াদের সামনে চার সংগীর সাক্ষ্য ইতিহাসে

---

১. খাসাফ কর্তৃক বিচারকের নীতির উদ্ধৃতি দিয়ে মুঈনুল হুক্কাম গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

لو شهد شاهد وفسر الشهادة ثم شهد الاخر فقال اشهد على مثل شهادة صاحبى لايقبل

একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়ে তার বিশ্লেষণ করার পর অপর সাক্ষী যদি বলে আমি আমার সাথীর অনুরূপ সাক্ষী দিচ্ছি তাহলে দ্বিতীয়জনের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

www.pathagar.com

যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং ওসমানী সাহেবও যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে জানা যায়, সকল সাক্ষী একই সময়ে একই ভাষায় একই সাক্ষ্য দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও যদি ওসমানী সাহেবের আবিষ্কৃত নীতির আওতায় ধরে নেয়া হয় যে, সমস্ত সাক্ষ্য পালাক্রমে অভিযুক্তদের সামনে পেশ করা হয়েছে এবং তাদেরকেও জেরা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে কিন্তু ইতিহাসে গোটা বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে সাক্ষ্যের সেই বিষয় বর্ণনা করা হয় যা সকল সাক্ষীর মধ্যে সাধারণভাবে পাওয়া যায়। তবুও এ সাক্ষ্যে বিদ্রোহের অপরাধ কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ঃ

"হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পক্ষের লোকদের একত্রিত করে খলীফাকে প্রকাশ্যে গালমন্দ করেন এবং আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান। তাঁর বিশ্বাস আবু তালিবের বংশধর ছাড়া অপর কেউ খেলাফতের উপযুক্ত নয়।১ তিনি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গভর্নরকে বের করে দেন এবং আবু তোরাবকে (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর) অপারগ মনে করে তাঁর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং তাঁর শত্রু ও তাঁর সাথে যুদ্ধকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা দেন। যে লোকেরা তাঁর সাথে রয়েছে তাদের নেতা এবং তারা তাঁর মতাদর্শের অনুসারী।"

এ সাক্ষ্যে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে আদী এবং তার সাথীদের যে অপরাধের বিবরণ দেয়া হয়েছে তার উপর আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এসব অপরাধের কোনোটাই এমনকি সকল অপরাধের সমষ্টিও বিদ্রোহের শরয়ী ও পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। অথচ প্রতিটি তৎপরতাকে তার পটভূমি থেকে বাদ দিয়ে অতিরঞ্জিত করে এবং রং ছড়িয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। গভর্নরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ প্রকৃত ঘটনার পরিপন্থী যা কোনো ইতিহাস গ্রন্থে আমার নজরে পড়েনি। গভর্নরকে বের করে দেয়া তো দূরের কথা হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই তাঁর সংগী-সাথীদেরকে নিয়ে কোনোমতে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে আসেন এবং আত্মগোপন করেন। তারপর যিয়াদের কাছে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিজেই হাজির হয়েছিলেন। যা হোক, এ চারজন সাথীর সাক্ষ্য বর্ণনা করার পর ওসমানী সাহেব লিখেছেন ঃ

---

১. প্রকাশ থাকে যে, একথা সর্বসম্মতভাবে সহীহ নয়। কেননা তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে স্বীকৃতি দিতেন এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের প্রতি নয় বরং তাঁর কতিপয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিলো। এ কারণে তাঁর সঠিক অবস্থান এই ছিলো যে, তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পুত্রদের খেলাফতের উপযুক্ত মনে করতেন।

www.pathagar.com

"অতপর যিয়াদ এ চারজন বুযর্গ ছাড়াও অন্যান্য লোকদেরও সাক্ষ্য প্রদানে অংশ নেয়ার ইচ্ছা করলেন। সুতরাং তিনি তাদের সাক্ষ্য লিখে লোকদেরকে একত্র করলেন, তাদেরকে এ সাক্ষ্য পড়ে শোনালেন এবং লোকদেরকে আহ্বান জানালেন যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য প্রদানে শরীক হতে চায়, সে তার নাম তালিকাভুক্ত করাতে পারে। এরপর লোকদের নাম লেখা শুরু হলো, এমনকি সত্তর ব্যক্তি নিজের নাম তালিকাভুক্ত করলো।"

সাক্ষ্য সংগ্রহের এ কর্মপদ্ধতিকে যতো চেষ্টা করেই জায়েযের সীমারেখায় নিয়ে আসা হোক না কেন তবুও আমি একথা না বলে পারছি না যে, সাক্ষ্য গ্রহণের এ পদ্ধতি ইসলামী ন্যায়নীতির মৌলিক ও মানদণ্ডগত চিন্তাধারা থেকে একেবারে নিম্নস্তরের। পরিশেষে রাজনৈতিক সম্মেলন ও জনসভায় বিভিন্ন প্রস্তাবের সম্মতি আদায় করা, হাজিরা খাতায় জনগণের টিপসহি বা দস্তখত নেয়া এবং মুসলমানদের জীবন মৃত্যুর ফায়সালা গ্রহণ করার সময় সাক্ষীদের সাক্ষ্য রেকর্ড করার মধ্যে তো কিছুটা পার্থক্যও স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত। আমাদের ফকীহগণ তো এমন কথাও লিখেছেন যে, কোনো সাক্ষীকে কোনো বিশেষ ধরনের উপদেশ বা শিক্ষা দেয়া যাবে না, যা তার স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। ইমাম সারাখসী (র) তার মাবসুত গ্রন্থে ৯ম খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

ولا ينبغى للقاضى ان يلقن الشهود ماتتم به شهادتهم فى الحدود لانه مامور بالاحتيال لدر الحدّ لاقامته ـ

"বিচারপতির সাক্ষীদেরকে এমন কথা বুঝানো উচিত নয় যাতে তাদের সাক্ষ্য শাস্তিকে পরিপূর্ণরূপে প্রমাণিত করার জন্যে সহায়ক হয়। কেননা বিচারপতির ওপর দণ্ডাদেশ কার্যকর করার পরিবর্তে কোনো অজুহাতে তা পরিহার করারই নির্দেশ থাকে।"

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে আমরা সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, একটি পূর্বলিখিত 'সাক্ষ্য' তৈরী করা এবং প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক এ সাক্ষ্য প্রদানে লোকদের অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানোর মাধ্যমে সাক্ষ্য সংগ্রহ করার এ পদ্ধতি ইসলামী ন্যায়নীতির দাবীকে কতটুকু পূরণ করতে সক্ষম তা ভেবে দেখার ব্যাপার। আজকের এ যুলুম-নির্যাতনের যুগেও যদি কোনো সরকার এ ধরনের তৎপরতা চালায় তাহলে দুনিয়া তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে।

এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, ওসমানী সাহেব একদিকে ইতিহাস গ্রন্থ তাবারী থেকে অনেক অপ্রাসংগিক ও অহেতুক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছেন। অপরদিকে যেখানে উপরোক্ত সাক্ষ্য নেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানকার অত্যন্ত জরুরী কতিপয় অংশ তিনি বাদ দিয়েছেন। ইমাম ইবনে জারীর (র) সেখানে (খঃ ৪ পৃষ্ঠা-২০০) লিখেছেন, প্রথমে একজন সাক্ষীর (আবু বুরদা) সাক্ষ্য নেয়া হয়। পরবর্তীতে যা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

فقال زياد على مثل هذه الشهادة فاشهدوا اما والله لاجهدن على قطع خيط عنق الخائن الاحمق فشهد رؤوس الارباع على مثل شهادته وكانوا اربعة ثم ان زيادا دعا الناس فقال اشهدوا على مثل شهادة رؤوس الارباع فقرأ عليهم الكتاب۔

"অতপর যিয়াদ বললো, এ সাক্ষ্যের মতো সাক্ষ্য দাও। আল্লাহর কসম ! আমি সেই বিশ্বাসঘাতক ও নির্বোধের শিরোচ্ছেদ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। সুতরাং স্থানীয় নেতারা ঐ সাক্ষ্য অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করে আর তারা ছিলো সংখ্যায় চারজন। তারপর যিয়াদ জনসাধারণকে ডেকে বললো, এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যেভাবে সাক্ষ্য দিয়েছে তোমরাও সেভাবে সাক্ষ্য দাও এবং যিয়াদ তাদেরকে লিখিত সাক্ষ্য পাঠ করে শোনায়।"

অন্য কথায় এর সুস্পষ্ট তাৎপর্য হলো, যিয়াদ হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেবলমাত্র গ্রেফতারের পূর্বেই হত্যার হুমকি দিচ্ছিল না (যেমনটি ওসমানী সাহেবও উল্লেখ করেছেন) বরং হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণের সময়ও একজন কসাইয়ের মতো নিজের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার ব্যাপারে প্রকাশ্যে ঘোষণা করছিলো যে, আমি এ নির্বোধ ও প্রতারকের শিরোচ্ছেদ করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবো। আর জনগণকে বলছিলো অর্থাৎ একটি সাক্ষ্য পড়ে শোনাচ্ছিলো যে, তোমরা এরূপ সাক্ষ্য দাও। ইবনে জারীরের (র) বর্ণনামতে পরবর্তীতে সত্তরজন লোক এ ধরনের সাক্ষ্যই প্রদান করে। এসব বিবরণ পাঠ করার পর লোকেরা একথা বলতে বাধ্য হবে যে, বর্তমান যুগের একজন অত্যাচারী ও রক্ত পিপাসু শাসকও সম্ভবতঃ এতোটা নীচে নামতে পারতেন না যতোটা না ওসমানী সাহেবের এ প্রশংসিত গভর্নর নেমেছেন।

ইসলামের সাক্ষ্য আইনের আরো লংঘন

ওসমানী সাহেবের এড়িয়ে যাওয়া তাবারী ও ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখিত আরো একটি ঘটনা হলো, যিয়াদ শুরাইহ বিল হারেস ও শুরাইহ বিল হানী এ দু'জন খ্যাতনামা বিচারকের নামও সাক্ষীগণের নামের মধ্যে সংযোজন করে দেয়। কাযী শুরাইহ এর নিজস্ব বর্ণনা তাবারী ও বিদায়া নেহায়া গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ হয়েছে—'আমি শুধু এ সাক্ষ্য দিয়েছি যে, হুজার রাদিয়াল্লাহু

www.pathagar.com

আনহু একজন ইবাদাত গুজার ও রোযাদার ব্যক্তি ছিলেন।' শুরাইহ্ বিন হানীর কথা উল্লেখ আছে এভাবে—'আমার নাম সাক্ষীদের নামের তালিকায় সংযোজন করা হয়েছে জানতে পেরে আমি তা খণ্ডন করে যিয়াদকে তিরস্কার করি।' শুধু তাই নয় বরং ইবনে জারীর (র) পরবর্তী ২০২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, যিয়াদ যখন হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার সাথীদেরসহ হযরত ওয়ায়েল এবং কাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন শিহাবের প্রহরায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করে এবং সাথে সেই সাক্ষ্য নামাও পাঠায় তখন শুরাইহ বিন হানী রাস্তায় তাদের সাথে মিলিত হন এবং কাসীর (র) এর হাতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামে লেখা একটি বন্ধ চিঠির খাম দেন। কাসীর (র) চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে শুরাইহ তা বলতে অস্বীকার করেন। চিঠিতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো অপসন্দনীয় কথা থাকার আশংকায় তিনি ঘাবড়ে যান এবং চিঠি বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি চিঠিটি হযরত ওয়াইল রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে দিলেন এবং তিনি তা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছে দেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু চিঠি খুলে দেখলেন চিঠিটি শুরাইহ-এর পক্ষ থেকে লেখা—"আমি জানতে পারলাম যিয়াদ হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে আমার সাক্ষ্যও লিখে পাঠিয়েছে। আমার সাক্ষ্য হলো, তিনি সালাত কায়েম করেন, যাকাত দেন, সবসময় হজ্জ ও ওমরা করেন। সৎকাজের আদেশ দেন ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন। তাঁর জানমালের উপর হস্তক্ষেপ করা হারাম।"

এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যিয়াদ প্রতারণা ও মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে কবীরা গোনাহ করেছিলো এবং সাক্ষীদেরকে শেখানো ও পড়ানোর সকল চেষ্টা সত্ত্বেও যখন সে দেখলো যে, কতিপয় সাক্ষী তার মতলব অনুযায়ী সাক্ষ্য দেয়নি তখন সে তাদের পক্ষ থেকে নিজেই মিথ্যা সাক্ষ্য বানিয়ে সংযোজন করে দেয়। যিয়াদের এ অপরাধমূলক তৎপরতা সাক্ষ্যদানের সমগ্র দপ্তরটিকে সন্দেহপূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য করে তোলে। কেননা যে একজন সাক্ষীর উপর মিথ্যা অপবাদ রচনা করতে পারে সে একাধিকের উপরও করতে পারে। ওসমানী সাহেব ইবনে গাইলানকে সন্দেহজনক বিষয়ের সুবিধা প্রদান করে দায়িত্বমুক্ত প্রমাণ করার জন্যে তো অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে অভিযুক্ত সন্দেহজনক বিষয়ে সুবিধালাভের মূলনীতি কোথায় হারিয়ে গেল তা বোধগম্য নয়। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বাস্তব অবস্থা সামনে আসার পরও শুরাইহ কিংবা অন্যান্য সাক্ষীদেরকে অথবা যিয়াদকে ডেকে অভিযুক্তদের

www.pathagar.com

সামনে বর্ণনা শোনা এবং অভিযুক্তদেরও নিজেদের বক্তব্য পেশ ও জেরা করার সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি।[১] বরং যে দু'জন সাক্ষী কয়েদীদের সাথে করে এনেছিলেন তাদের এবং কয়েদীদের ভাষ্যও নিজ মুখে শুনেননি। যিয়াদের পাঠানো সাক্ষ্য ও রিপোর্টের ভিত্তিতে হত্যার সিদ্ধান্ত দেন। অথচ যিয়াদের রিপোর্টের মান একজন তদন্তকারী অফিসারের ডাইরীর চেয়ে বেশী কিছু ছিলো না এবং যতক্ষণ না আদালতী কার্যক্রম অনুযায়ী যথারীতি তা উভয় পক্ষের সামনে প্রমাণ করা না যায় ততোক্ষণ এর ওপর সাক্ষ্য প্রয়োগ যথার্থ হতে পারে না। এটা এক বাস্তব সত্য যে, গোটা ঘটনা প্রবাহে যিয়াদ কিংবা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একবারের জন্যেও অভিযুক্তদেরকে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার কিংবা নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য শোনার অথবা কোনো সাক্ষ্যের ওপর জেরা করার সুযোগ দেননি। বরং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা তাদের পরিণতি সম্পর্কেও জানতে পারেননি। তাবারী গ্রন্থে (খঃ ৪, পৃষ্ঠা-২০৩) আছে—'মারজে আজরা' নামক স্থানে যখন সমস্ত অভিযুক্তকে অবরুদ্ধ করা হয় তখন তারা ইয়াযিদ বিন হুজিয়্যার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে। এতে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর যিয়াদকে বললেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গিয়ে বলো—আমরা আমাদের বায়আতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য শত্রুতা ও মিথ্যা অপবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যিয়াদ এ পয়গাম আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌছে দিলে তিনি উত্তরে বললেন زياد اصدق عندنا من حجر 'আমার কাছে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে যিয়াদই অধিকতর সত্য।'

ওসমানী সাহেব বলছেন যে, যিয়াদ সাক্ষীদের লিখিত বক্তব্য শরয়ীর মূলনীতি অনুযায়ী হযরত ওয়ায়েল ও হযরত কাসীরের (রা) মাধ্যমে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌছে দেয়ার জন্যে প্রদান করে। শরয়ী মূলনীতি মোতাবেক লিখিত বক্তব্য পৌছে দেয়ার তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য নয়। আমার মনে হয় ওসমানী সাহেব সম্ভবত একে কাযীর কাছে কাযীর চিঠি,

---

১. সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের সময় আসামীর উপস্থিতি যেমন অন্যান্য আদালত ব্যবস্থায় অপরিহার্য, তেমনি ইসলামেও তা অপরিহার্য। আসামীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য দেয়া বা বিচারের রায় ঘোষণা করা কতিপয় বিশেষ অবস্থা ছাড়া জায়েয নয়। উপস্থিতি সহ সাক্ষীর জন্য জেরা করার অধিকারও স্বীকৃত। যা ব্যতিরেকে সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হয় না। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর ব্যভিচারের যে মামলা দায়ের করা হয়েছিলো তা হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষীদের জেরার কারণে প্রমাণিত হতে পারেনি বরং উল্টো সাক্ষীদের ওপর মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার শাস্তি আরোপিত হয়। অথচ সাক্ষীদের মধ্যে সাহাবীও ছিলেন। সাক্ষী তো দূরের কথা আসামীর চেহারা দেখাও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু পসন্দ করতেন না। ইমাম যাহাবী 'ইলামুন নাবালা' গ্রন্থে তাঁর কথা উল্লেখ করেন : لااحب ان اراهم।

www.pathagar.com

অথবা সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য ফিকহের এ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ কার্যক্রমকে শরয়ী মূলনীতি অনুযায়ী সাব্যস্ত করতে চান। এ সাক্ষ্য যে কেমন ছিলো এবং বিচার ব্যবস্থার ভাবমূর্তি কতটুকু বজায় রেখে এ সাক্ষ্য লাভ করা হয়েছে তার উপর তো আমি পূর্বেই আলোকপাত করেছি। কিন্তু আমি ওসমানী সাহেবকে একথাও স্পষ্ট বলে দিতে চাই যে, প্রথমত নির্বাহী প্রশাসক অর্থাৎ গভর্নরকে বিচারক সাব্যস্ত করা একটি নতুন আবিষ্কার। অধিকন্তু হানাফী ফকীহগণ এ কথায় ঐকমত্য যে, কাযীর কাছে কাযীর চিঠি। কিংবা সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য দেয়া অফৌজদারী অর্থাৎ দেওয়ানী (Civil) ও আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রেই কেবল গ্রহণযোগ্য। রক্তপণ ও মৃত্যু দণ্ডাদেশ অর্থাৎ ফৌজদারী (Criminal) ব্যাপারে আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। ফিকহ্ সংক্রান্ত যে কোনো কিতাব হাতে নিয়ে তিনি নিজেই দেখতে পারেন। আমি আর উদ্ধৃতি কত দিবো। হানাফী ফকীহগণ এর কারণও বর্ণনা করেছেন, তারা বলেন, একজন কাযীর চিঠি অন্যের জন্যে গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং এমনিভাবে একজন সাক্ষীর অপর সাক্ষীর সাক্ষ্য পেশ করা কিয়াস বিরোধী। একে শুধুমাত্র অনুগ্রহ স্বরূপ জায়েয মনে করা হয়। অন্যথায় এ উভয় অবস্থা সন্দেহের উর্ধে নয়। কারণ লিখিত বিষয় আসল কাযীর না হয়ে অপর কারো হতে পারে কিংবা সাক্ষ্য বর্ণনা করার সময় ভুলও হতে পারে। আর ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য ও বর্ণনা সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্ত হওয়া জরুরী। সুতরাং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যিয়াদের পৌছানো চিঠি এবং সাক্ষ্যের ফিরিস্তি এ মূলনীতি অনুযায়ীও কোনোক্রমেই কোনো আইনগত মর্যাদা কিংবা নির্ভরযোগ্যতা রাখতো না। কিন্তু অতি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মুহাম্মদ তাকী সাহেব আবারও বলছেন ঃ "হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি সম্পর্কে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগেই ওয়াকিফহাল ছিলেন। এবার তাঁর কাছে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা সংক্রান্ত ৪৪টি সাক্ষ্য পৌছে যায়। বিদ্রোহের অপরাধ প্রমাণ করতে এরচেয়ে বড় দলীল আর কি হতে পারে। অপরাধ দিবালোকের মতো প্রমাণিত হয়েছে। আর বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। একথা বলে তিনি উসূলে ফিকহে আরো একটি বিরল অধ্যায় সংযোজন করলেন। আর তাহলো—বিচারের ফায়সালায় কোনো ব্যক্তির অপরাধী হওয়া সংক্রান্ত পূর্ব জ্ঞানও বৈধ পন্থায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এটা এমন একটা বিষয় যা ইসলামী ফিকহে তো দূরের কথা দুনিয়ার কুফরী আইনেও একে ভুল মনে করা হয়।"

এরপর ওসমানী সাহেব লিখছেন ঃ "এতদসত্বেও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কতিপয় সাহাবীর কথায় ছয়জনকে ছেড়ে দিয়ে ৮জনকে

www.pathagar.com

হত্যা করার নির্দেশ দেন।" প্রশ্ন হলো এরূপ দ্বিবিধ ও পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণ কি ? ওসমানী সাহেব এ প্রশ্নের নতুন যে জবাব দিয়েছেন তাহলো, বিদ্রোহীদের হত্যা করা ওয়াজিব নয় শুধুমাত্র জায়েয। সুতরাং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিয়েছেন আর যাকে ইচ্ছা হত্যা করিয়েছেন। এর অর্থ তো এটাই যে, ওসমানী সাহেব আমীরে মুয়াবিয়াকে يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء (যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন)। এ আয়াতের উচ্চ আসনে সমাসীন করাতে চান এবং প্রমাণ করতে চান যে, ব্যাপারটি আদালতের ছিলো না, ছিলো ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার।

আমি এ সত্য সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছি যে, প্রথমত এসব সাহাবী কখনো বিদ্রোহী ছিলেন না। আর বিদ্রোহী হিসেবে ধরে নিলেও গ্রেফতার হবার পর শুধুমাত্র বিদ্রোহের শাস্তি কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুদণ্ড নয়। এখন ওসমানী সাহেবের কাছে আমি জানতে চাই যে, তিনি কথা না ঘুরিয়ে পরিষ্কার করে বলবেন কি, বন্দী বিদ্রোহীকে হত্যা করা তার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড না লঘু শাস্তিদানের হওয়া পর্যায়ভুক্ত ? অপরাধীদের অপরাধ এবং তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য একই রকম হলে কাউকে মুক্তি দেয়া আবার কাউকে হত্যা করার অর্থ কি ? আর যদি বলা হয় হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের দলপতি ছিলেন তাহলে তো শুধুমাত্র তাঁর অপরাধই মারাত্মক ছিলো অন্যদের অপরাধ ছিলো সমান সমান। এরপরও তাদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র কতিপয়কে হত্যার জন্যে বাছাই করা হয়েছে কিসের ভিত্তিতে? ঘটনা হলো বন্ধু-বান্ধব যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করেছে তারাই মুক্তি পেয়েছে। অথচ কিসাস ও হদের (মৃত্যুদণ্ডযোগ্য শাস্তির) ব্যাপারে কারো জন্যে সুপারিশ করা এবং তা মেনে নেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে আদৌ জায়েয নেই। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যিয়াদের রিপোর্টে সাক্ষী হিসেবে যাদের নাম লিখিত ছিলো তাদের কতিপয় লোক সুপারিশ করে কতিপয় অপরাধীকে ছাড়িয়েও নেয়। অমুক ব্যক্তি নিরপরাধ, নির্দোষ এরূপ সুপারিশ করা হয়নি, বরং অমুক আমার নিজস্ব লোক এর ভিত্তিতে মুক্তি দেয়া হয়। আমি মনে করি, একদিকে অপরাধীর খেলাফ সাক্ষ্য দাঁড় করা অপরদিকে তার মুক্তির জন্যে সুপারিশ করা ও তা মেনে নেয়া যার পক্ষে সুপারিশ আসবে না তাকে হত্যা করা রাজতান্ত্রিক প্রশাসনেরই একটি বৈশিষ্ট্য। ইসলামের ন্যায়-নীতির চিন্তাধারার সাথে এরচে' বড় এবং নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে?

আত তাওযীহ ও আত তালবীহ গ্রন্থকারের ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী সাহেবের যদি একথা জানা না থাকে তাহলে আমি তাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু

www.pathagar.com

আনহুকে বিদ্রোহী এবং তাঁকে হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করাতো দূরের কথা কতিপয় পূর্ববর্তী আলেম আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর সাহাবী হত্যার সুস্পষ্ট অভিযোগ আরোপ করেন। আমি এখানে একটি উদাহরণ পেশ করছি। আত তাওযীহ্ ও তার শরাহ্ আত তালবীহ্ দরসে নিযামীর একটি বিখ্যাত পাঠ্য গ্রন্থ। এ মুহূর্তে আমার সামনে ১২৯২ হিজরী সালে নুলকাশূর থেকে প্রকাশিত একটি নতুন সংস্করণ আছে। এতে রাবীর শর্ত ইনকেতা, ইরসাল, সাক্ষ্য ও শপথসহ বিচার সংক্রান্ত হাদীসের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তাওযীহ্ গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

وذكر في المبسوط ان القضاء بشاهدو يمين بدعة واول من قضى به معاويه۔

"মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, একজন সাক্ষী ও শপথের উপর ভিত্তি করে বাদীর স্বপক্ষে ফায়সালা দেয়া বিদয়াত। আর এরূপ ফায়সালা দেয়ার প্রথম ব্যক্তি হলেন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।"

এ ব্যাখ্যায় তালবীহ্ গ্রন্থের গ্রন্থকার লিখেন ঃ

ليس المراد ان ذالك امر ابتدعه معاوية في الدين بناء على خطائه كالبغى فى الاسلام ومحاربة الامام وقتل الصحابة لانه قدورد فيه الحديث الصحيح۔

"এর অর্থ এ নয় যে, এটা এমন কোনো বিদআত ছিলো যা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দীন সংক্রান্ত ব্যাপারে গ্রহণ করেছিলেন এবং যার ভিত্তি তাঁর বিদ্রোহ করা, ক্ষমতাসীন ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সাহাবী হত্যার মতো ভুল ছিলো, সাক্ষ্য ও শপথের উপর বিচারকার্য পরিচালনা করার ব্যাপারে সহীহ্ হাদীস বর্তমান রয়েছে।"

এ পর্যায়ে আল্লামা সাআদ উদ্দীন তাফতাযানী আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি বিদ্রোহ, ক্ষমতাসীন শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং সাহাবী হত্যা করার সুস্পষ্ট দোষ আরোপ করেছেন। সাহাবাই শব্দটি বহুবচন। যার অর্থ হলো, তাঁর মতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বেশ কিছুসংখ্যক সাহাবী হত্যার জন্য দায়ী। হযরত হাকাম বিন আমরের (রা) আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্দীশালায় মৃত্যুবরণের কথা আমি আগেই বলেছি। অপর সাহাবী হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অন্যায়ভাবে নিহত হন। এখন হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু

www.pathagar.com

যদি সাহাবী না হয়ে থাকেন, অথবা বিদ্রোহের কারণে তাঁর হত্যা যথোচিত ছিলো তাহলে ওসমানী সাহেব আমাকে দয়া করে বলুন, তারা তাহলে কোন্ কোন্ সাহাবী ছিলেন আমীরে মুয়াবিয়া যাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলেন ? আল্লামা তাফতাযানী বিদ্রোহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সাহাবী হত্যার কথা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ভুল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে তালবীহ্ গ্রন্থে সাহাবী হত্যার বর্ণনা বিদআত ও ভুল হিসেবে উল্লেখ করা এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যে কারণে দায়ী করা হয়েছে তার অর্থ কি ? গ্রন্থটি ৬শ বছরেরও বেশী সময় ধরে বর্তমান আছে এবং আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে এটি রীতিমতো পড়ানো হয়।

আল্লামা সাআদ উদ্দীন তাফতাযানীর এ ধরনের মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে কতিপয় লোক তার বিরুদ্ধে শিয়া হওয়ার ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করেছেন। আল্লামা সাআদের কথা বাদ দিলেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অপর কতিপয় ইমামের বিরুদ্ধেও তারা নির্বিঘ্নে শিয়া হওয়ার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে যারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হাসান-হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মর্যাদা ও প্রশংসা বর্ণনা করেন অথবা বনী উমাইয়ার অপকর্ম সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। যেমন, ইমাম ইবনে জারীর (র), চার ইমাম, ইমাম নাসায়ী (র), ইমাম হাকামের মতো পূর্ববর্তী ইমামগণও এ অহেতুক অপবাদ থেকে রক্ষা পাননি। আমার পক্ষে মাঝখানে এ বিষয়ের উপর স্ববিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে মোল্লা আলী কারী (র) আল্লামা তাফতাযানী সম্পর্কে তাঁর প্রণীত গ্রন্থ শরহে ফিকহে আকবরে যা লিখেছেন তা আমি এখানে তুলে ধরছি। মোল্লা আলী কারী (র) খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদাগত ক্রমধারা অবলম্বন প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ্ আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে অধিকতর মর্যাদাবান। তবে পরবর্তী যুগের কতিপয় আলেম এ ব্যাপারে মৌনতার ভূমিকা পালন করেছেন এবং শরহে আকায়েদের একজন ব্যাখ্যাতা (আল্লামা তাফতাযানীর প্রতি ইংগীত করে) বলেছেন ঃ

فلاجهة للتوقف بل يجب ان يجزم بافضلية على-

"মৌন থাকার কোনো কারণ নেই ; বরং কর্তব্য হলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অকাট্যভাবে সর্বাধিক মর্যাদাবান মনে করা।"

তারপর বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

ولذا قيل فيه رائحة من الرفض لكنه فرية بلامرية اذ كثرت فضائل على وكما لانه العلية وتوا تر النقل فيه معنى بحيث لايمكن انكاره ولو كان هذا رفضا وتركا للسنة لم يوجد من اهل الرواية والدراية سنى اصلا فاياك والتعصب فى الدين والتجنب عن الحق اليقين۔

"এ কারণেই বলা হয়, তাঁর মধ্যে অর্থাৎ আল্লামা তাফতাযানী (র)-এর মধ্যে দলত্যাগের আভাস পাওয়া যায়। অথচ কথাটি সন্দেহাতীতভাবে একটি মিথ্যা অপবাদ। কেননা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উচ্চ মর্যাদা ও ফযীলত এতোবেশী, যা এমন ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত যে, তা অস্বীকার করা আদৌ সম্ভব নয়। এর নাম যদি দলত্যাগ কিংবা সুন্নাত পরিত্যাগ হয় তাহলে আহলে দেরায়াত ও রাওয়ায়েতের মধ্যে কোনো সুন্নী আদৌ পাওয়া যাবে না। অতএব সাবধান ! দীনের ব্যাপারে গোঁড়ামী পরিত্যাগ করো এবং সত্য বিমুখ হয়ো না।"-[শরহে আকবর, মোল্লা আলী কারী, পৃ, ৭৭]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতিক্রিয়া

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন, হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো একজন ইবাদাত গুজার, নিষ্ঠাবান সাহাবী এবং উম্মতের পুন্যবানদের মধ্যে উচু মর্যাদার অধিকারী এক মহান ব্যক্তির নির্মম হত্যাকাণ্ডে মুসলিম উম্মার সালেহ ব্যক্তিবর্গের অন্তর কাঁপিয়ে তোলে। এদিকে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং খোরাসানের গভর্নর রবী এ খবর শুনে ভীষণ মর্মাহত হন। আমার একথার উত্তরে ওসমানী সাহেব বলেন, ইবাদাত ও যুহদের কথা বলতে গেলে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আদী খারেজীদের চেয়ে সম্ভবত বেশী যাহেদ ও আবেদ নন। তবে কি উম্মতের কেউ একথা বলতে পারে যে, খারেজীরা যেহেতু অতিশয় আবেদ ও যাহেদ ছিলো সে জন্যে বিদ্রোহের কারণে তাদেরকে হত্যা করা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবৈধ কাজ ছিলো ? আসলে ওসমানী সাহেবের পেশকৃত এ দাবী ভিত্তিহীন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে খারেজী অথবা বিদ্রোহীকে বন্দী করতেন তাকে হত্যা করতেন অথবা সুপারিশের ভিত্তিতে কাউকে মুক্তি দিতেন এবং অন্যান্য বন্দীদেরকে হত্যা করতেন ওসমানী সাহেব এসব কথা কি ইতিহাসের আলোকে প্রমাণ করতে পারবেন ? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নীতি আদর্শ সম্পর্কে আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, প্রথমে তিনি খারেজীদেরকে কোনো বাধাই দিতেন না।

www.pathagar.com

তারা নিজেরা যখন লড়াইয়ের সূচনা করতো কেবল তখনই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আত্মরক্ষামূলক লড়াই করতেন। চূড়ান্ত লড়াইয়ের পর তাঁর নির্দেশ ও কাজ হতো বন্দীদেরকে হত্যা না করে বরং ছেড়ে দেয়া। সকল যুদ্ধ ও যোদ্ধার ক্ষেত্রে এ নীতি সমভাবে প্রযোজ্য ছিলো। সিফফীন যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হলো, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বন্দীদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়েছেন শুনে তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে আমরাও বন্দীদেরকে হত্যা করবো না। সুতরাং তিনিও তাঁর বন্দীদের ছেড়ে দেন।

'হে মুয়াবিয়া ! হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যা করার সময় তোমার মধ্যে কি একটুও আল্লাহভীতির উদ্রেক হয়নি ?' হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এ উক্তিটি মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব তাবারী নামক ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে বলে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। অথচ প্রথমে তিনি দাবী করেছিলেন, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেসব গ্রন্থ কিংবা অন্যান্য কোনো কিতাবে একথা খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রকৃত ঘটনা হলো, কেবলমাত্র তাবারী গ্রন্থেই নয় বরং অন্যান্য গ্রন্থেও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপরোক্ত উক্তিটি রয়েছে। যেমন, আল ইসাবা গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজর হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যিয়াদ হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার প্রমাণী জানতে পেয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবদুর রহমান বিন হারেসকে পয়গামসহ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠান। পয়গামটি হলো ঃ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِى حجر واصحابه "হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।" কিন্তু পয়গাম পৌঁছার আগেই হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পাঁচজন সাথীসহ নিহত হন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার একথা আল ইসাবার ৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। এ স্থানের আগে ও পরের অনেক কথা ওসমানী সাহেব উল্লেখ করেছেন; কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, উক্ত গ্রন্থের একথাটিই শুধু তার নজরেই পড়েনি। যা হোক হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এরূপ তীব্র অসন্তুষ্টিমূলক ও অস্বস্তিকর কথা এড়িয়ে ওসমানী সাহেব বলছেন, হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যক্তিগত রায় কি ছিলো এবার তাও শুনে নিন। ইমাম ইবনে আবদুল বার বলেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছিলেন—হুজার ও তাঁর সাথীদের ব্যাপারে আবু সুফিয়ানের যে সহিষ্ণুতা ছিলো তা তোমার কাছ থেকে কোথায় চলে গিয়েছিলো ? তাদেরকে বন্দীশালায় আটক রেখে প্লেগের শিকার হতে দিলেন

www.pathagar.com

কেন ? হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে যথোপযুক্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এটাই ছিলো সবচে' বড় দাবী। মাওলানা মওদূদীর কথানুযায়ী হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীগণ যদি সত্য ভাষণের কারণে অপরাধী হয়ে থাকেন তাহলে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতেও 'জায়াগার'ই ছিলো এই সত্য ভাষণের ন্যূনতম সাজাঘর। ওসমানী সাহেব উপরোক্ত মন্তব্যটি তার ধূর্তামী এবং বাক চাতুর্যের এক বিরল দৃষ্টান্ত। ইবনে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বক্তব্য যতটুকু বর্ণনা করেছেন তাহলো ঃ

فبعثت الى معاوية عبد الرحمن بن الحرث الله الله فى حجر واصحابه

"তারপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবদুর রহমান বিন হারেসকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য পাঠান যে, হুজার ও তাঁর সাথীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।"

এর আগের সব বর্ণনাই ছিলো একটি সাজানো সংলাপ, যা আবদুর রহমান বিন হারেস আর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে হয়। এখানকার একটি বাক্যও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে আবদুর রহমানের বর্ণিত নয়। কেননা এগুলো ছিলো আবদুর রহমান ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যকার প্রশ্নোত্তর পর্বের কথাবার্তা। আর তাহলোঃ

فوجده عبد الرحمن قد قتل هو وخمسة من اصحابه فقال لمعاوية اين عزب عنك حلم ابى سفيان فى حجر واصحابه الاحبستهم فى السجون وعرضتهم للطاعون - قال حين غاب عني مثلك من قومي - قال والله لاتعدلك العرب حلما بعد هذا ابدًا ولا رأيا - قتلت قوما بعث بهم اليك أسارى من المسلمين -

"আবদুর রহমান যখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বার্তা নিয়ে পৌঁছলেন তখন দেখলেন হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর পাঁচজন সাথীর হত্যার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আবদুর রহমান হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হুজার ও তাঁর সাথীদের ব্যাপারে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহিষ্ণুতা আপনার থেকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো ? আপনি তাকে কারাগারে বন্দী করে প্লেগের শিকার হতে দিলেন না কেন ? জবাবে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু বললেন ঃ আপনার মতো স্বগোত্রীয় ব্যক্তি আমার নিকট যখন দূরে এমতাবস্থায় তার পরিণতি

www.pathagar.com

এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহর কসম ! এ ঘটনার পর আরববাসী আপনাকে আর কখনো সহনশীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করবে না। আপনি এমন মুসলমানদের হত্যা করেছেন যাদেরকে আপনার কাছে বন্দী হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো।"

এটা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব আবদুর রহমানের মাধ্যমে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরিত হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার আসল বার্তা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করেন। (আর তা শুধু এতটুকু ছিলো যে, আপনি হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন) কিন্তু ইতিপূর্বে আবুদর রহমান ও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয়, তা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা বলে চালিয়ে দেয়া হলো। অতপর (الاحبستهم فى السجون) কথাটি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বা অপর যারই হোক না কেন এ উক্তি থেকে বক্তার উদ্দেশ্য বের করে নেয়া বিস্ময়কর উদ্ভাবন যে, তার বক্তব্য ও দাবী হলো হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা কিছুটা কঠিন সাজা হয়ে গেছে। বরং তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে জেলখানাতেই তিলে তিলে নিঃশেষ হওয়া অথবা প্লেগ মহামারীর দিকে ঠেলে দেয়াই যথার্থ ও সংগত আচরণ ছিলো। এরূপ কি ঘটে না যে, আমরা কোনো সময় নিজের সম্বোধিত ব্যক্তিকে পরিচালনার জন্যে কিংবা তার উচ্চতর নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বলে থাকি অমুক কাজ করার পরিবর্তে অমুকের বা আমার গলায় ছুরি চালালেই উত্তম ছিলো। স্বয়ং কুরআনেই এর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যখন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো তখন এক ভাই বললো, হত্যা না করে তাকে বরং অন্ধ কূপে ফেলে দাও। এখন এরূপ বর্ণনা রীতির কারণে কি কোনো সুস্থ্য বিবেকসম্পন্ন লোক একথা প্রমাণ করতে পারে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে হত্যার পরিবর্তে কূপে নিক্ষেপ করা ইনসাফেরই কাজ হয়েছে ? এবং বাস্তবে তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করা কোনো জায়েয ও বৈধ কাজ ছিলো ? এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আমার পক্ষে কষ্টকর। তবে একথা সত্য যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহার হত্যার আগে এবং পরেও যেভাবে এ কাজের নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছেন তাতে কাজটি তাঁর খুবই অপসন্দনীয় এবং নিশ্চিতরূপে নাজায়েয হওয়ার কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আমি তাঁর একটি বক্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর অপরাধ আসলে দুর্বলতামূলক ছিলো, যার শাস্তি আকস্মিক মৃত্যু হিসেবে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসর দখল করার পর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাই মুহাম্মদ বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেখানে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করান। আমার মনে হয় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ভাইয়ের মৃত্যুতে স্বাভাবিক দুঃখ পেয়েও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার কারণে এর জোর প্রতিবাদ করেননি এবং হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যা করার কারণে তিনি যে কঠোর ভাষায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন সে ভাষায় করেননি। ইসাবা গ্রন্থের একস্থানে একথা উল্লেখ আছে ঃ

ثم قدم معاوية المدينة فدخل على عائشة فكان اول ما بدأته به قتل حجر فى كلام طويل جرى بينهما -

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলে সর্বপ্রথম তিনি হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন।"[১]

এখন মাওলানা ওসমানী সাহেবের নিরেট যবরদস্তী হলো, তিনি একটি কথার মূল অর্থের বিকৃতি ঘটিয়ে সেটাকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উদ্ধৃতি হিসেবে লিখলেন ঃ এতদসত্ত্বেও মূল বিষয়ে কোনো পার্থক্য সূচিত হবে না। হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সকল অবস্থা অবগত হওয়ার পর তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার অভিমত এই ছিল যে, তিনি বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত। তাকে বড়জোর কারাগারে নিক্ষেপ করে প্লেগ জাতীয় মহামারী দ্বারা আক্রান্ত করাই ছিলো আল্লাহভীতি ও সহিষ্ণুতার সর্বাধিক দাবী। মাওলানা ওসমানী সাহেবের পরের ভাষ্যে ঢুকানোর এহেন কর্মনৈপুণ্যকে এছাড়া আর কিইবা বলতে পারি—কবির ভাষায় ঃ

سخن شناس نرای ور اخاطا ینجاست

(অর্থাৎ এ দোষে তোর জ্বইলা মরি, বন্ধুরে তুই কথা বুঝলি না।)

ঘটনা হলো, এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার শুধুমাত্র একটি কথাই নয় বরং এমন অনেক মন্তব্য আছে, যাদ্বারা তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা ভালোভাবেই আন্দাজ করা যায়। যেমন, বিদায়া গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে ঃ

---

১. উসুদুল গাবার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ,

ولما قدم معاوية المدينة دخل على عائشة رضـ فكان اول ما قالت له فى قتل حجر فى كلام طويل -

www.pathagar.com

لولا يغلبنا سفهاؤنا لكان لى ومعاوية فى قتل حجر شان -

"আমাদের অজ্ঞরা আমাদের উপর বিজয়ী না হলে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার ঘটনায় মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আমার আচরণ ভিন্ন রকমই হতো।"

ইমাম তাবারী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার অপর একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ

لولا انالم نغير شيئا الا الت بنا الامر الى اشد مما كنا فيه لغيرنا قتل حجر

"অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের পদক্ষেপ যদি বর্তমান অবস্থার চেয়ে খারাপের দিকে মোড় না নিত তাহলে আমরা হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দিতাম না।"

অন্যান্য সাহাবীদের প্রতিক্রিয়া

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া অন্যান্য লোকজন এ ঘটনায় যে গভীর শোক ও মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন তার গুরুত্ব হ্রাস করার জন্যে ওসমানী সাহেব বলছেন, মাওলানা মওদূদী কুফা ও সিরিয়া থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থানরত খোরাসানের গভর্নর রবী এর সংক্ষিপ্ত কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ শত শত মাইল দূরে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার খবর পৌছতে পারলে এ শক্তিশালী যুদ্ধ ও বিদ্রোহের খবর কেন পৌছতে পারলো না। যা হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিলো। হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীগণ যদি সত্যি সত্যিই কোনো বিদ্রোহ কিংবা লড়াই সংঘটিত করতেন তাহলে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার মতোই লড়াইয়ের খবরও দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তো এবং রবী-হারেসী বিদ্রোহ দমন হওয়ায় এবং বিদ্রোহী কৃতকর্মের শাস্তি পাওয়ায় আফসোস করার পরিবর্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো। মাওলানা ওসমানী সাহেব এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভূমিকাকে যেভাবে ক্রটিপূর্ণভাবে পেশ এবং খোরাসানের গভর্নরের উক্তিকে সংক্ষিপ্ত বলে তা অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করার যে চেষ্টা চালিয়েছেন সেদিকে একবার দৃষ্টি দিন। অপরদিকে তার প্রিয় ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের এ বর্ণনা মিলিয়ে দেখুন ঃ

ارسلت عبد الرحمن الى معاوية يشفع فيهم ...... واسفت عائشة لقتل حجر وكانت تثنى عليه -

www.pathagar.com

"হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথীদের পক্ষে আবদুর রহমানকে সুপারিশকারী রূপে পাঠান এবং হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যায় দুঃখিত হন এবং প্রায়শঃ তাঁর প্রশংসা করতেন।"

এখন একথা আমাদের বোধগম্য নয় যে, তারা যদি সত্যিই বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত ছিলেন তাহলে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁদের জন্যে সুপারিশ ও সমবেদনা প্রকাশ করাকে কেমন করে জায়েয মনে করলেন এবং তাঁরা অপরাধ স্বীকার কিংবা অপরাধের জন্যে তাওবা ও অনুতপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও তাদের হত্যার পর কিভাবে তিনি তাদের প্রশংসা করলেন ? অন্তত তাদের অপরাধের রহস্যতো উম্মুল মু'মিনীনের কাছে কখনো না কখনো প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিলো। হত্যার কিছুদিন পর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাত হলে তিনি কৈফিয়ত তলবের সুরে কথা বলেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলেন, আমি কি করবো ! যিয়াদ তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে ছিলো অনমনীয়। তিনি একথা বলেননি যে, এ লোক বিদ্রোহী ছিলো, এ কারণে তাকে হত্যা করা ঠিক হয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য অবগত না থাকার কারণে আপনি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

খোরাসানের গভর্নর রবী বিন যিয়াদের উদ্ধৃতি মাওলানা মরহুম মওদূদী সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করলেও এর অর্থ এ নয় যে, এর বিস্তারিত বর্ণনা ইতিহাসে উল্লেখ নেই। ইবনে খালদুন ঘটনাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

فلما بلغ الربيع بن زياد بخراسان قتل حجر سخط ذالك وقال لاتزال العرب تقتل بعده صبرا ولو انكر واقتله منعوا انفسهم من ذالك لكنهم اقروا فذلوا - ثم دعا بعد صلوة جمعة لايام من خبره وقال للناس انى قد مللت الحيوة وانى داع فامنوا ثم رفع يديه وقال اللهم ان كان لى عندك خير فاقبضنى اليك عاجلا وامن الناس ثم خرج فما تواترت ثيابه حتى سقط فحمل الى بيته ومات من يومه -(تاريخ ابن خلدون ، جلد ٣، ص ١٤)

"খোরাসানের রবী বিন যিয়াদের কাছে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার খবর পৌঁছলে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগলেন, আজকের পর থেকে আরবের লোকেরা এভাবেই নিরপরাধ লোকদেরকে বেঁধে বেঁধে হত্যা করতে থাকবে। যদি তারা এ হত্যা কাণ্ডের প্রতিবাদ করতো তাহলে

www.pathagar.com

নিজেদেরকে এ পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারতো ; কিন্তু তারা এ হত্যাযজ্ঞকে মেনে নেয়। ফলে তারা হীন ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়ে। এ সংবাদের কয়েক দিন পর জুমআর দিনে দুআ করার প্রাক্কালে তিনি লোকদেরকে বললেন, জীবনের প্রতি আমার অনীহা এসে গেছে। আমি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করছি। তোমরা আমার সাথে আমীন বলো। তারপর তিনি হাত তুলে বলতে লাগলেন ঃ 'হে আল্লাহ্ ! তোমার কাছে আমার জন্য কল্যাণ থাকলে তুমি আমাকে তোমার কাছে শীঘ্র নিয়ে নাও।' উপস্থিত লোকেরা আমীন বললেন। অতপর তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে কাপড় সামলানোর সময় পর্যন্ত পেলেন না অমনি বেহুশ হয়ে পড়ে যান। ধরাধরি করে তাঁকে ঘরে নেয়ার পর সেদিনই তিনি ইনতেকাল করেন।"

মাওলানা মওদূদী যে কথা সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছিলেন এই হলো তার বিস্তারিত বিবরণ, এটি যেন তার বাস্তবের জীবন ছবি।[১] অনুরূপভাবে মাওলানা হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কেও লিখেছেন, 'এ খবর শুনে তিনিও ভীষণ ব্যথিত হয়েছিলেন।' কিন্তু মাওলানা ওসমানী একথার উপর কোনো বিশুদ্ধ আলোচনা করেননি। হতে পারে উদ্ধৃতিও সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ঘটনা হলো, হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অত্যন্ত বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়ার কথা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইসতেআব গ্রন্থকার বলেছেন ঃ

كان ابن عمر فى السوق فنعى اليه حجر فاطلق حبوته وقام وقد غلبه النحيب-

"ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাজারে ছিলেন। হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার খবর পেয়ে নিজের চাদর ঢিলে করে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং মনের অজান্তে সশব্দে কেঁদে ফেলেন।"[২]

আল ইসাবার গ্রন্থকার হাফেজ ইবনে হাজর (র) লিখেছেন ঃ

كان ابن عمر تخبر عنه فاخبر بقتله وهو بالسوق فاطلق حبوته وولى وهو يبكى

"হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। অতপর তিনি বাজারে থাকাকালীন সময়ে তাঁর হত্যার খবর পান। এরপর তিনি নিজের চাদর খুলে ক্রন্দনরত অবস্থায় বাজার থেকে ফিরে আসেন।"

---

১. তাবারীর ৪র্থ খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় শব্দের সামান্য পার্থক্য সহ একথাই বর্ণিত হয়েছে।

২. উসদুল গাবায় হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা বর্ণনা করতঃ এরূপ কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী (র) এ প্রসংগে হাসান বসরীর (র) একটি উক্তিও উল্লেখ করেছেন। যেখানে তিনি হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন। মাওলানা ওসমানী সাহেব বলেছেন, এ উক্তির শেষ বাক্যটি মাওলানা মওদূদী সাহেব উল্লেখ করেননি। অন্যথায় থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়তো। বাক্যটি হলো ঃ .... ويلا له من حجر واصحاب حجر ওসমানী সাহেবের ভাষায় বাক্যটির তরজমা হলো—হুজার ও তার সাথীদের কারণে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর ভয়ানক আযাব হবে। এহেন ভুল তরজমা করার পর তিনি বলেন, কথাটা লেখার সময় আমার কলম যদিও থর থর করে কেঁপে উঠেছিলে, কিন্তু তবু আমি লিখতে বাধ্য এজন্য হলাম যে, এ বাক্যগুলোর দ্বারাই রাওয়ায়াতের মূল রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। হাসান বসরীর (র) দ্বারা কি কোনোভাবেই এটা আশা করা যায় যে, তিনি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ ধরনের নির্মম ও অসংলগ্ন ভাষা ব্যবহার করতে পারেন ?

আমি ওসমানী সাহেবকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, হযরত হাসান বসরী (র) যিনি এ ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন অথবা তাবারী ও ইবনে আসীর (র) যারা এসব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তারা আরবী ভাষা এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা সম্পর্কে ওসমানী সাহেবের অপেক্ষা অধিকতর অবগত ছিলেন। .... فويل للمصلين ..... يويلتى اعجزت ..... يويلتى ءالد ..... শব্দের অর্থ ভয়ানক শাস্তি নয় বরং খারাপ, মন্দ এবং অনুতাপ বুঝায় শব্দটি যদিও আযাব অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কুরআনে উল্লেখিত বাক্যগুলোর মধ্যে ويل শব্দের মর্মার্থ আযাব নয় বরং দুঃখ-কষ্ট। শাহ্ আবদুল কাদের (র) ও অন্যান্য অনুবাদকগণ কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত ويل শব্দের তরজমা সাধারণত খারাজ কিংবা এ জাতীয় অর্থের অন্য শব্দ দ্বারা করেছেন। ইমাম রাগিব (র) বলেছেন ঃ

ويل، قبح وقد يستعمل على التحسر ومن قال ويل اد فى جهنم فانه لم يردان ويلا فى اللغة هو موضوع لهذا -

ويل শব্দের অর্থ মন্দ ও অনিষ্ট। আবার কখনো কখনো ও শব্দটি আফসোস ও হতাশা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর যারা ويل শব্দের অর্থ জাহান্নামের উপত্যকা বর্ণনা করেছেন তার অর্থ এ নহে যে, আভিধানিকভাবে শব্দটি এ অর্থই বহন করে।

অভিধানে (কামুসে) উল্লেখ আছে ঃ

www.pathagar.com

الويل، حلول الشرويهاء الفضيحة او هو تفجيع -

ويل -এর অর্থ দুঃখ দুর্দশা আসা। ة (ويلة) যোগ হলে অর্থ হয় অপমান নয়তো এর অর্থ হয় মুসিবত বা দুঃখ কষ্ট।

কয়েকটি হাদীসেও ويل শব্দের অর্থ মন্দ বা খারাপ হিসেবে উল্লেখ হয়েছে। যেমন ঃ

ويل للذى يحدث فيكذب، ويل لامتى من علماء السوء -

"কথায় কথায় যারা মিথ্যা বলে তাদের জন্যে পরিতাপ আমার উম্মতের মন্দ পরিণাম মূলত দুষ্ট আলেমদের কারণেই।"

এখন এটা 'বালাগ' সম্পাদকের ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য, নাকি তার বাকচাতুর্যের চমক ধরে নেয়া যায় যে, তিনি ويل শব্দের মৌলিক আভিধানিক অর্থ বাদ দিয়ে হযরত হাসানের কথাকে অযথা কদম অর্থের রূপ দিয়েছেন। আবার এর ওপর তিনি যুক্তির প্রাসাদ দাঁড় করাচ্ছেন এবং নিজের কলমকে অকারণে কাঁপিয়ে তুলছেন।

সম্পাদক সাহেব এর সাথে আবারো পুরানো অভিযোগের অবাঞ্ছিত কাসুন্দি ঘাটছেন যে এ রাওয়ায়েতটিও আবু মুখান্নাফের। আর তা হাসান বসরীর উপর আরোপিত একটি মিথ্যা অপবাদ বৈ নহে। কেননা আবু মুখান্নাফ মূলত শিয়া দলভুক্ত, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শত্রু এবং হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর জোর সমর্থক। এ দ্বারা আবু মুখান্নাফের পক্ষে ওকালতী করা আমার প্রয়োজনই পড়ে না। আমি আগেও বলেছি, যেসব রাওয়ায়েতের কারণে আবু মুখান্নাফের সমাদর হচ্ছে নির্ভরযোগ্য রাবীদের অধিকতর বিশুদ্ধ রাওয়ায়েত সহীহ হাদীস গ্রন্থে বর্তমান আছে। উপরোক্ত .... ويلاله من حجر রাওয়ায়েতটির কথাই ধরা যাক। ইসতেয়াবের ২৫৭ পৃষ্ঠায় মুসনাদে আহমদের একটি রাওয়ায়েত আছে। যার সনদে আবু মুখান্নাফের নাম নেই। এ রাওয়ায়েতে হযরত হাসান সূত্রে বর্ণিত আছে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন—হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজার বিন আদীকে হত্যা করেছেন। অতপর হযরত হাসান বলেন ঃ

ويل لمن قتل حجرا واصحاب حجر -

"যে হুজার ও তাঁর সাথীদের হত্যা করেছে তার পরিণাম অত্যন্ত ক্ষতিকর ও পরিতাপজনক।"

উসদুল গাবা গ্রন্থকার হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত হাসান সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

كان الحسن البصري يعظم قتل حجر -

"হাসান বসরী (র) হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডকে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা মনে করতেন।"

উসুদুল গাবায় মুহাম্মদ বিন সিরীনের একথাও উল্লেখ আছে যে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে প্রাণ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দু' রাকাআত নফল নামায সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ হযরত খুবায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ নামায পড়েছেন এবং তারা উভয়ই ছিলেন উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী (وهما فاضلان)। ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বিদায়া ও নেহায়া ৮ম খণ্ডের ৫৩ পৃষ্ঠায় একটি সুস্পষ্ট রাওয়ায়েত বর্ণিত আছে—হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার মর্মান্তিক খবর শুনতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর জানাযা পড়া হয়েছে কি ? তাঁকে বেড়ি ও বাঁধনসহ সমাহিত করা হয়েছে কি ? হ্যাঁ সূচক জবাব পেয়ে হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! হত্যাকারীদের উপর তাঁর দলিল কায়েম হয়ে গেছে (حجهم والله)। হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাবী ছিলো, জানাযা নামায পড়ার অর্থই হলো তিনি বিদ্রোহী কিংবা মুরতাদ ছিলেন না, ছিলেন একজন সাচ্চা মুসলমান এবং জান-মালের নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী একজন বৈধ নাগরিক, যাকে হত্যা করা অমার্জনীয় অপরাধ। একদিকে উম্মতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উক্তিসমূহ লক্ষ্যণীয়, অপরদিকে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত সম্পর্কে ওসমানী সাহেবের ধৃষ্টতাপূর্ণ ও হামবড়া মন্তব্যের প্রতি চোখ দিলে সে চিত্র ভেসে উঠে, তার ছবি, তার ছায়া বড় করুণ, অতি শরমের। ওসমানী সাহেবের মতে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ঘৃণিত খারেজীদের মতোই ছিলো হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাকওয়া ও ফযীলতের অবস্থা। এরপর তাদের মনোহারী দাবী হলো, বুযর্গানে দীনের সম্মান প্রদর্শনে তাদের নিজেদের ভূমিকা অগ্রনায়কের পক্ষান্তরে অন্যরা কেবল বিদ্রূপ আর অপমান করেই বেড়ায়।

প্রসঙ্গক্রমে আবু মুখান্নাফের কথা যখন এসেই গেল, তখন চিত্তাকর্ষক সত্য কথার উল্লেখ করা যথার্থই মনে হয়। হযরত হুজার বিন আদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট রচনা করতে গিয়ে ওসমানী সাহেবকে কেবলমাত্র আবু মুখান্নাফের রাওয়ায়েত অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে। যদিও রাবী হিসেবে তাঁর নাম খুব কমই নেয়া হয়েছে। অবশ্য শেষের দিকে আগাম কৈফিয়ত হিসেবে ওসমানী সাহেব লিখেছেন ঃ আবু মুখান্নাফের অধিকাংশ রাওয়ায়েত গ্রহণ করায় আমার উপর প্রশ্নের অবতারণা চিত্রিত নহে। তবে এর জবাব

www.pathagar.com

হলো—আবু মুখান্নাফ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভক্ত, সমর্থক। সুতরাং নীতিগতভাবে তাঁর সে সকল রাওয়ায়েত গ্রহণ করাই সঙ্গত বিধি যা হুজারের বিপক্ষে আলোকপাত করে। এর দ্বারা অনায়াসে বুঝা যায় —হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিদ্রোহী আচরণ অস্বীকার করা এতোই অবাস্তব যে, আবু মুখান্নাফ তার একনিষ্ঠ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও সেসব ঘটনাবলী স্বীকার করতে বাধ্য হন।

কথায় বলে নিজের পসন্দ অনুযায়ী ধারণা গড়ে উঠে। আমার তো মনে হয়, ওসমানী সাহেব আবু মুখান্নাফের রাওয়ায়েতের ২০ পৃষ্ঠাব্যপী যে দীর্ঘ ফিরিস্তি জড়ো করেছেন, তাতে তার রাজদ্রোহী অপরাধ প্রমাণে বিন্দুমাত্রও সহায়তা করে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বরং لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ বাক্যের যথার্থ প্রয়োগ পাত্রই সাব্যস্ত হতে পারেন। আমি বলি আবু মুখান্নাফের রাওয়ায়েত গ্রহণ করতে আপনার এতো সব ঝুট-ঝামেলার আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন কি ? আর নিয়ম-নীতি ও তার দায়-দাবীর আচ্ছাদনে নিজেকে জড়িয়ে কথা বলারই বা স্বার্থকতা কোথায় ? আপনি বরং সরল অংকে একথা স্বীকার করে নিননা কেন যে, ঐতিহাসিক আলোচনায় (مجروح) ক্রটিযুক্ত রাবীদের রাওয়ায়েতের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। খেলাফত ও রাজতন্ত্র কিংবা অপর কোনো ঐতিহাসিক রাওয়ায়েত সম্বলিত গ্রন্থের রাবীদের উপর রিজাল শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীর সাহায্যে সমালোচনা করা কঠিন কিছু নহে। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর প্রমাণ সিদ্ধ আলোচনা করা কিংবা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গিয়ে মাঝখানে কোনো দুর্বল অথবা বিতর্কিত রাবীর রাওয়ায়েত সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা অসম্ভব কথা।

আপনার দাবী অনুযায়ী আবু মুখান্নাফ হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থক। বেশ, তাহলে আপনার প্রতি আমার জিজ্ঞাসা—মেহেরবানী করে সলফ তথা পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্য থেকে এমন কতিপয় লোকের নাম গণনা করে দিন যারা হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থক ছিলেন না ; বরং তাঁর শত্রু ছিলেন। আমার জানামতে এমন কোনো ইতিহাসবিদ, মুহাদ্দিস কিংবা ফকীহ নেই যিনি হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আপনার মতো বিদ্রোহী হত্যাযোগ্য ও খারেজী সাব্যস্ত করেছেন। সকলেই নিছক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করাটাই যথেষ্ট মনে করেছেন। সকলেই তাঁর ফযীলত ও মুস্তাজাবুদ্দাওয়া হওয়ার কথা লিখেছেন এবং তার জন্যে রহমত ও আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের দুআ করেছেন। এর অতিরিক্ত কেউ কিছু লিখে থাকলে সেটা মূলত আমীরে মুয়াবিয়া

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু ও যিয়াদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগযোগ্য ধরে নিতে হবে। হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে নহে। এ ব্যাপারে আমার ধারণা যদি ভুল হয় এবং হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দোষিতা ও বিদ্রোহ সংক্রান্ত ইসলামের দণ্ডবিধান পর্যায়ে আমার দেয়া ব্যাখ্যা সঠিক না হয় তাহলে মেহেরবানী করে আমার ভুল সংশোধন করে দেয়া হোক। উপরন্তু একথাও স্পষ্ট করে দিন যে, আপনার শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁর শহীদে কারবালা পুস্তকে হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ব্যাপারে আবু মুখান্নাফের যে রাওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন, সেগুলো কি হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থক হিসেবে করেছেন নাকি তাঁর বিরোধী হিসেবে ? দ্বিতীয়ত, আবু মুখান্নাফ ইয়াজীদের সমর্থক ছিলেন নাকি দুশমন ? এ পর্যায়ে বরং কারবালার ঘটনা বর্ণনায় তার রাওয়ায়েত পরিহার করে যাওয়াই ছিলো শিষ্টাচার ও নৈতিকতার আবেদন।

পরবর্তী ইতিহাসবিদগণের অভিমত

হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত ও তাঁর সাহাবী হওয়া সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি যদিও কতিপয় উক্তির উল্লেখ করেছি তথাপি আলোচনার শেষ পর্বে এ বিষয়ে আরো কিছু উদ্ধৃতির উল্লেখ করতে চাই। একজন রাষ্ট্রদ্রোহী মৃত্যুদণ্ডযোগ্য ব্যক্তি ও সন্ত্রাস প্রিয় তাবেয়ীকে একজন হকপন্থী উঁচুমানের সাহাবীরূপে পেশ করেছেন বলে ওসমানী সাহেব মাওলানা মওদূদীর উপর যে মুখরোচক অপবাদ আরোপ করেছেন তা যেন সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে।

কুয়েতের সরকারী প্রকাশনী থেকে ইমাম যাহাবী রচিত العبر فی خبر من غبر শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর ১ম খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায় হিজরী ৫১ সনের ঘটনাবলীর উল্লেখ করে গ্রন্থকার বলেছেন ঃ

وفيها قتل بعذراء حجر بن عدی الكندی واصحابه بامر معاوية ولحجر صحبة ووفادة وجهاد وعبادة ـ

"আজরা নামক স্থানে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে এ বছর সঙ্গীসাথীসহ হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হন। হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি এক প্রতিনিধি দলের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ আল্লাহ ভক্ত বুযুর্গ এবং তিনি জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছেন।"

www.pathagar.com

হিজরী ১৩৫৬ সনে ইদারাতুল মুনরিয়া কর্তৃক ইবনে আসীর প্রণীত تاريخ الكامل لابن اثير শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের সংশোধনকারী ও টীকাকার উস্তাদ আবদুল ওহাব আল নাজ্জার এর ৩য় খণ্ডে ২৪১ পৃষ্ঠার টীকায় লিখেছেন ঃ

ان هؤلاء الناس الذين قتلتهم الاهواء السياسية كانوا اقوى على الحق واقوم قيلا من معاوية الذى يريق دماء هم على صراحتهم وعدم ادهانهم فى دينهم -

"হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিহত তাঁর সাথীগণ নিজেদের কথা ও কাজে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা অধিকতর সত্য নিষ্ঠ ছিলেন। দীনের ব্যাপারে আপোস রফার পরিবর্তে তিনি স্পষ্ট ভাষণের আশ্রয় নিতেন, যে কারণে তাদের হত্যা করা হয়।"

মাওলানা শাহ মুঈনউদ্দীন আহমদ নদভী সিয়ারুস সাহাবা গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে (২য় সংস্করণ) ৪৪ পৃষ্ঠা–৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরী নবম সনে ইসলামের ছায়াতলে আসেন একথা জোর দিয়ে বলা যায়। কেননা কেন্দার প্রতিনিধি দল এ বছরই মদীনায় এসেছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন -------।"

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদকে যখন ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন তখন থেকেই অশালীন আচরণ ও রুক্ষ্ম মেজাজের দরুন হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার বিরোধিতা শুরু হয়। একদিন কুফার জামে মসজিদে যিয়াদের বক্তৃতা এত দীর্ঘ সময়ব্যাপী চলতে থাকে যে, নামাযের সময় প্রায় শেষের পথে এসে যায়। হুজার ও তাঁর সাথীরা সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তার প্রতি কাঁকর ছুড়ে মারে। যিয়াদ এ সামান্য ঘটনাটিকেই অতিরঞ্জিত করে ও রং ছড়িয়ে খলীফার কাছে লিখে পাঠান। তাঁর বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ আনা হয় তাহলো—অদূর ভবিষ্যতে এরা এমন গোলযোগ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে যার প্রতিরোধ ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না।[১] আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছয়জনকে মুক্তি দেন আর হযরত হুজার সহ ছয়জনকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। উপদেশমূলক ও অন্যান্য কিছু কথা বলার পর জল্লাদের তরবারির আঘাতে তাঁর খণ্ডিত দেহ খুন রাঙা মাটিতে গড়াগড়ি খেতে দেখা গেলো।

১. যিয়াদের অসম্পূর্ণ অংশ মাওলানা তাকী সাহেব চমৎকার কায়দায় পূরণ করেছেন।

www.pathagar.com

হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড মামুলী ঘটনা ছিলো না। বংশগত ঐতিহ্য এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর একনিষ্ঠ সমর্থনের কারণে তিনি কুফাবাসীদের শ্রদ্ধার পাত্র ও ভক্তির প্রাণ পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। এ হৃদয় বিদারক ঘটনার পর কুফার বিশিষ্ট নগরবাসী এর প্রতিকার পদক্ষেপের আশায় হযরত হাসানের দরবারে উপস্থিত হয়। শুনে তিনি মর্মাহত হন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষে বায়য়াত নেয়ার কারণে তার পক্ষে কিছু করার সুযোগ ছিলো না।

হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর আহলে বায়তের নজরেও বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন। যে কারণে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর গ্রেফতারের খবর শুনামাত্র আবদুর রহমান বিন হারেসের মাধ্যমে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এ মর্মে সংবাদ পাঠান—হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদের ব্যাপারে তিনি যেন আল্লাহকে ভয় করেন। কিন্তু খবর পৌছার আগেই তাঁর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে গেছে। তারপরও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর তীব্র নিন্দা করেছেন। এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিজস্ব লোকেরাও এ হত্যাকাণ্ডকে সুনজরে দেখেনি। এমনকি তাঁর আপনজন খোরাসানের গভর্নর রবী বিন যিয়াদ পর্যন্ত এ খবর শুনে এমনি মর্মাহত ও অভিভূত হয়ে পড়েন যে, এই বলে দোয়ার হাত তোলেন—হে আল্লাহ ! তোমার দরবারে রবীর ফিরে যাওয়া কল্যাণকর হলে এ মুহূর্তে তাকে তুমি ডেকে নাও। বিষাদ মাখা কোন্ অন্তর নিয়ে তিনি এ দোয়া করেছিলেন, তা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর সে দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। এ ব্যাপারে উম্মত জননী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার অন্তরও ক্ষতবিক্ষত ছিলো। সুতরাং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সে বছরই হজ্জে আসেন। মদীনা উপস্থিত হয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার খেদমতে হাজির হলে তিনি বললেন ঃ হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদের হত্যার ব্যাপারে তোমার অন্তরে আল্লাহর ভয় কি বিন্দুমাত্র অনুভূত হয়নি ? হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় বংশীয় ঐতিহ্য ও মর্যাদা ছাড়াও সাহাবীদের মধ্যেও তিনি উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার লিখেছেন, হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও বয়স্কদের মধ্যে গণ্য হতেন। প্রাণদণ্ডের পূর্বে দু' রাকাআত নফল নামায সম্পর্কে প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মদ বিন সিরীনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেনঃ এ দু' রাকাআত নামায খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়েছিলেন। তারা উভয়ে মর্যাদার শীর্ষস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

www.pathagar.com

এ ইতিহাসবিদই তার অপর গ্রন্থ তারিখে ইসলামের ২য় খণ্ডে (৫ম সংস্করণ) ১৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শাসনামলে মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ভর্ৎসনা ও তিরস্কার বর্ষণের ঘৃণ্য প্রথা চালু করেছিলেন। এর অনুসরণে তাঁর কর্মকর্তাগণও এ প্রথা সুষ্ঠুরূপে আদায় করতেন। নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হযরত মুগীরা বিন শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী। কিন্তু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যেয়ে এহেন ঘৃণ্য বেদআত থেকে তিনিও নিজেকে বাচাতে পারেননি। হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর দলের লোকেরা স্বভাবতই এ দ্বারা মর্ম যাতনার শিকার হয়ে পড়তেন। জবাবে মুগীরা ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দু' চার কথা মন্দচারি বলে মনের দুঃখ লাঘব করতেন। --- যিয়াদের সময়কালেও এ প্রথা চালু থাকে। সাথে সাথে হুজার বিন আদীর প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডও অব্যাহত থাকে। হযরত হুজার বিন আদী উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী ছিলেন। ফলে তাঁর হত্যাকাণ্ডে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।"

দেওবন্দের অন্যতম বুযুর্গ মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী তাঁর 'তাদবীনে হাদীস' গ্রন্থের ৪২৩ পৃষ্ঠায় হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একজন সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর শাহাদাতের ঘটনা বিবৃত করেছেন। বিবরণের শেষে তিনি লিখেছেন ঃ

"হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কুফায় গ্রেফতার করে সিরিয়া পাঠিয়ে দেয়ার খবর মদীনায় পৌছামাত্র হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অনতিবিলম্বে দূত পাঠিয়ে কোনো অবস্থায় তাঁকে হত্যা না করার সুপারিশ করেন। কিন্তু দূত পৌছার পূর্বে তাঁর শাহাদাতের হৃদয় বিদারক কাণ্ড ঘটে যায়। এ ঘটনা দ্বারা হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উচ্চমর্যাদার আন্দাজ করা কষ্টকর হওয়ার কথা নহে।"

'তারীখে মিল্লাত' গ্রন্থের লেখক মাওলানা কাযী যয়নুল আবেদীন মিরাঠীও হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকে মর্মান্তিক ঘটনা বলে অভিহিত করে প্রায় অভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।-(তারীখে মিল্লাত, ৩য় খণ্ড, ২২-২৬ পৃষ্ঠা)

মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (র) তাঁর প্রণীত সিরাতে আয়েশা গ্রন্থের ১৫০-১৫১ পৃষ্ঠায় (৪র্থ সংস্করণ) লিখেছেন ঃ

"হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একনিষ্ঠ সমর্থক এবং কুফাস্থ উলুবী দলের শীর্ষ স্থানীয়

www.pathagar.com

নেতা ছিলেন। কতিপয় লোকের সাক্ষী সুবাদে কুফার গভর্নর তাদের সকলকে গ্রেফতার করে দামেশক পাঠিয়ে দেন। হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামনের কেন্দব গোত্রীয় লোক ছিলেন। কুফা ছিলো আরবের বড় বড় গোত্র ও বংশের কেন্দ্রভূমি। স্বয়ং কুন্দা গোত্রীয় লোকরাও এখানে বর্তমান ছিলো। এদতসত্ত্বেও স্বগোত্রীয় হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রক্ষার ব্যাপারে কেউ বিন্দুমাত্র চেষ্টা চালায়নি। তদপুরি সে সময় সাহাবাগণের মধ্যেও হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ছিলো অতি উচ্চমানের। তাই গোটা দেশবাসী মর্মান্তিক এ ঘটনা শুনেছে, তবে অসন্তুষ্টি ও মনোবেদনার সাথে। গোত্রীয় প্রধানগণ তাঁর পক্ষে সুপারিশ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সুপারিশ গৃহীত হয়নি। মদীনায় এ খবর পৌঁছলে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সুপারিশ করে নিজের পক্ষ থেকে একজন দূত পাঠান। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, দূত পৌঁছার আগেই হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দুনিয়া থেকে বিদায় করা হয়েছে নির্মম নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায়। অতপর এক পর্যায়ে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে সাক্ষাত করতে আসলে সর্বপ্রথম তিনি যা বলেছেন তাহলো—"মুয়াবিয়া ! হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে তোমার ধৈর্য কোথায় ছিলো ? তাকে হত্যা করার সময় আল্লাহর ভয়-ভীতি কি তুমি হারিয়ে ফেলেছিলে ?" আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, "এ ব্যাপারে আমার কোনো দোষ নেই। মূলত দোষ তাদের যারা তাঁর বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিয়েছিলো।" অপর রাওয়ায়েতে আছে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন ! কোনো দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব তখন আমার কাছে বর্তমান ছিলো না। প্রখ্যাত তাবেঈ মসরূক (র) বর্ণনা করে পরবর্তীতে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আক্ষেপের সুরে প্রায় সময় বলতেন ঃ আল্লাহর কসম ! মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যদি জানা থাকতো যে, কুফাবাসীর মধ্যে কিছুমাত্র সাহসীকতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত আছে, তাহলে হুজারকে তাদের মাঝখান থেকে গ্রেফতার করে সিরিয়ায় নিয়ে হত্যা করার দুঃসাহস আদৌ দেখাত না। কিন্তু হেন্দা তনয় ভালো করেই বুঝে নিয়েছে যে, সে জাতীয় বীরপুরুষ আর বেঁচে নেই। আল্লাহর কসম ! কুফা এককালে সাহসী ও আত্মমর্যাদাশীল আরব প্রধানদের আবাস ভূমি ছিলো। লবীদ চমৎকার বলেছেন ঃ

ذهب الذين يُعاش في اكنافهم   وبقيت في خلف كجد الاجرب

لاينفعون ولا يرجى خيرهم   ويعاب قائلهم وان لم يبعث

"যাদের ছায়াতলে নিরাপদে জীবন কাটানোতে তারা আজ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। তাই তাদের এমন অধঃপুরুষের সমাজ পরিবেশে

www.pathagar.com

বেঁচে আছি, যাদের অবস্থা চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ন্যায়। তাদের কাছ থেকে কল্যাণের আশা করা অর্থহীন প্রয়াস। এমনকি তাদের সাথে কথা বলাটাও দোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

মজার ব্যাপার হলো ঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণের এ জাতীয় লেখার ইতিহাসের পাতায় পাতায় শোভা বর্ধন করে থাকা সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীগণ সাহাবায়ে কিরামের মান-মর্যাদা রক্ষাকল্পে এবং তাঁদের গুণগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কলম ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কিন্তু খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের বিরুদ্ধে অপরাপর হযরতগণ নিজেদের শক্তির মহড়া প্রদর্শনের পর মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব সম্প্রতি মুত্তাকীয়ানা শান আর বুযুর্গীর পূর্ণ চমক নিয়ে পরিশেষে মাঠে এসেই গেছেন। এরি মধ্যে তার লেখাসমূহ পাক-ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসা পত্র সহ প্রকাশিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ যখন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো যে, এ ধরনের কথা তো নিকট অতীতের এ দেশীয় আলেমগণ তাদের রচিত উর্দু গ্রন্থে আরো কঠিন আরো কঠোর ভাষায় লিখেছেন ঃ তার পক্ষ থেকে জবাবে কখনো বলা হলো লেখা হয়ে থাকবে, তবে আমি সেগুলো পাঠ করিনি। আবার কখনো বললেন ঃ তাদের লেখায় ফেতনার আশংকা নেই ; কিন্তু মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির লেখায় ফেতনা-ফাসাদ দারুনভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো বললেন, অপরের ভুল কথায় তার অপরাধ লাঘব হওয়ার কি কারণ ? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই—দারুল মুসান্নিফীন এবং স্বয়ং আপনার ভাইয়ের স্বত্বাধিকারী দারুল এশাআত থেকে দীর্ঘ দিন যাবত গোটা উপমহাদেশ কয়েক সংস্করণসহ শত সহস্র সংখ্যায় প্রকাশিত ও প্রচারিত গ্রন্থরাজি থেকে চোখ ফিরিয়ে কোমর বেঁধে আর আদা পানি খেয়ে কেবল মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির গ্রন্থ চর্চায় আপনার এ আত্মনিয়োগ প্রাণান্তকর এহেন কয়-কুশিশের আসল রহস্য কি ? এর মূল হেতু কোন্ গভীরে লুকিয়ে আছে হিম্মত করে বলে দিলে মন্দ ছিলো না। যে কথা একজনের মুখে ফেতনামুক্ত, নির্মল পরিষ্কার, প্রতিবাদ কিংবা সমালোচনার প্রশ্নই আসে না। অথচ সে একই কথা আরেকজনের মুখ থেকে বের হলো আর অমনি দেশ ও জাতি ফেতনায় তলিয়ে যাওয়ার সূক্ষ্ম অথচ শানদার প্রচারনার দর্শন ও যৌক্তিকতা কোন্ দেমাগের উদ্ভাবন ? সেটা আমাদের বোধগম্য নহে। বলা বাহুল্য দেওবন্দের মুফতী কেরামের খেদমতে তাদেরই আকাবেরীনের কোনো কোনো লেখার উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ফতোয়া চাওয়া হয়েছে। মুফতী সাহেব মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির লেখা মনে করে বিনা দ্বিধায় লেখক কাফের ফতওয়া দেয়ার ন্যক্কারজনক ঘটনা

www.pathagar.com

একাধিকবার কি সংঘটিত হয়নি ? পরবর্তীতে প্রকৃত ঘটনার উপর থেকে অবাঞ্ছিত পর্দা সরে গিয়ে আসল চেহারায় যখন বেরিয়ে এলো, তখন অতি হাস্যকর পন্থায় নিজেদের কর্মকাণ্ড ধামাচাপা দেয়ার মহান খেদমত (!) আঞ্জাম দেয়া হয়েছে। নদওয়ার আলেমগণ যদি হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে كشته رسم যুলুম নির্যতানের শিকার এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কার বর্ষণের ঘৃণ্য প্রথা জারী করা ও তাঁর গভর্নরগণের সে প্রথার যথাযথ অনুসরণ করার কথা লিখে, হযরত মাওলানা থানভী (র) যদি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কার করা হতো আর রাফেজীরা ছিলো হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুগামী দল ; তাহলে ঐ সকল বুযূর্গদের প্রতি এ জাতীয় মন্তব্যের সুতীক্ষ্ণ সূচালো বাণ নিক্ষেপের ঘটনা কোথাও শুনা যায় না। তাঁদের এহেন বাণ বাক্য উপেক্ষা করে কেবল মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একই মন্তব্য নিয়ে যদি বাক-বিতণ্ডার ঝড় তোলা, তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার উৎসাহ তালকীন তদুপরি তাওবা ইস্তেগফার নসীহত-উপদেশের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে এমতাবস্থায় মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে একথা বলা ছাড়া অধিক কি বলতে পারি যে,

وجودك ذنب لايقاس بذنب

"তোমার জীবিত থাকাই অপরাধ, যে অপরাধের তুলনা নেই।"

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনার এক পর্যায়ে আনুসঙ্গিক বিষয় হিসাবে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রসঙ্গে কয়েক লাইনে কিংবা এক আধ পৃষ্ঠায় কিছু লিখেছেন তার উপর মাওলানা ওসমানী সাহেব বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরকে নূর দ্বারা ভরে দিন। মর্যাদার শৈল চূড়ায় উত্তরণে তাঁর পক্ষে কত শত উপকরণই না যোগাড় হয়ে আসছে। আমি আরজ করতে চাই, আল্লাহ যেন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ের করবকে জান্নাতী নূরে নূর মণ্ডিত করে দেন। হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত, মর্যাদা ও ইসলামের খেদমতের দৃষ্টিতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নিম্ন পর্যায়ের আদৌ ছিলেন না। তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে কাফেরদের বিরুদ্ধে তরবারির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অংশ নিয়েছেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সীসাগালা দক্ষিণ বাহু রূপে সার্বক্ষণিক সহচর

www.pathagar.com

হিসাবে কাজ করেছেন। তাই এহেন হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যা জায়েয এবং তিনি প্রাণদণ্ড পাওয়ার যোগ্য অপরাধী বলে যারা দাবী করে, আমার প্রশ্ন—সাহাবী বিদ্বেষী সে সকল বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিজেদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড থেকে তাওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে অনুশোচনায় বিদগ্ধ হওয়াই সঙ্গত আচরণ নয় কি ?

কবির ভাষায় ঃ

توبہ فرمایاں چرا خود توبہ کمتر می کنند

অর্থাৎ "অপরকে যারা তাওবার উপদেশ বিলোয়, বাস্তবে ও কার্যক্ষেত্রে তাওবার ধার নিজেরা তারা কমই ধারে।"

দুই ঃ ওসমানী সাহেবের অতিরিক্ত দলীলসমূহ

হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যা কাণ্ডের উপর আমি স্ববিস্তারে আলোচনা করেছি। আমার ধারণা ছিলো, ওসমানী সাহেব এ নিয়ে অধিক অগ্রসর হবেন না। কিন্তু হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আবারো বিদ্রোহী ও হত্যাযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে তার তৎপরতা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। তিনি লিখেন, তার অধীনে বিরাট এক শক্তিশালী দল ছিলো, যে দলটিকে বশে আনার জন্যে যিয়াদের মতো গভর্নরকেও অপরিসীম বেগ পেতে হয়েছে। এ দাবীর সমর্থনে তিনি কিছু দলিলও উপস্থিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে প্রমাণসিদ্ধ ও যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা না করে থাকলে তার প্রতিটি দলীলের সঙ্গত ও যথাযোগ্য জবাব দেয়া আমার পক্ষে কোনো ব্যাপার ছিলো না। তা সত্ত্বেও সে সবের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আমি জরুরী মনে করি। ওসমানী সাহেবের দাবী অনুসারে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কুফার তিন হাজার লোক ছিলো। তাদের উপর নির্ভর করে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্ররোচিত করেন। এদিকে যিয়াদ হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় বিভিন্ন গোত্রের লোক নিয়ে একটি পূর্ণ সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। এখন ওসমানী সাহেবের প্রতি আমার প্রশ্ন, শত সহস্র বিদ্রোহী ও হত্যাযোগ্য অপরাধী সমৃদ্ধ এ দলের মধ্য থেকে কতজন লোক যিয়াদ বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করে নিহত হয়েছে এবং কতজন আহত হয়েছে, ১২/১৪জন ছাড়া কতজন গ্রেফতার হয়েছে এবং আটকাবস্থায় তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে ? কুফায় এ ধরনের হাজার হাজার অনুসারীতো হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুরও ছিলো ; বস্তায় বস্তায় চিঠি লিখে যারা তাঁকে

www.pathagar.com

এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। তাবারী ও অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, পত্র লেখকদের মধ্য থেকে ১২ হাজার সশস্ত্র লোক মুসলিম বিন আকীলের হাতে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থনে দস্তুর মত বায়আতও গ্রহণ করেছিলো। এ ধরনের মৌখিক বচন বুলি দ্বারাই যদি বিদ্রোহের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় কিংবা একেই যথেষ্ট মনে করা হয়, তাহলে তো কুফার সকল অধিবাসীই বিদ্রোহী ও হত্যাযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মহামান্য ইয়াযিদের এটা এক দারুণ অনুগ্রহ যে, কেবল মুসলিম বিন আকীল ও হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ তাঁর পরিজনদের হত্যা করে বাকীদের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তিনি হাজার হাজার হত্যাযোগ্য অপরাধীর জীবন বাঁচিয়ে শুধুমাত্র মুসলিম বিন আকীল ও আহলে রাসূল হুসাইনকে হত্যা করেছেন। উপরন্তু এ দ্বারা ইয়াযিদ প্রাকারন্তরে ওসমানী সাহেবের সে উদার নীতির উপরই আমল করেছেন, যে নীতি বলে কুফার প্রতিটি লোক রাজদ্রোহী ও হত্যাযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও মাত্র কয়েকজনকে হত্যা করে বাকীদের কারাগারে আটক রেখে প্লেগের মুখে ঠেলে দেয়া যায় কিংবা পরিশেষে তাদেরকে মুক্তিও দেয়া যায়।

যুদ্ধ এবং গভর্নরকে বহিষ্কারের অলীক কাহিনী

ওসমানী সাহেব একথাও লিখেছেন, যিয়াদকে এই মর্মে চিঠি লেখা হয়েছিলো যে, কুফাকে রক্ষা করতে হলে যথাশীঘ্র আপনার এখানে চলে আসা অপরিহার্য। ওসমানী সাহেবের জানা উচিত, হযরত মুসলিম বিন আকীলের কুফা পৌছার খবর দিয়ে এ ধরনের পত্র ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকেও লেখা হয়েছিলো। কিন্তু তাতে কি হযরত মুসলিম কিংবা অপর কোনো ব্যক্তির বিদ্রোহ প্রমাণিত হতে পারে? অপরদিকে অবস্থা এই ছিলো যে, ইবনে যিয়াদ যখন মুসলিম বিন আকীল ও হানী বিন ওরওয়ার মস্তক ছিন্ন করে ইয়াযিদের কাছে পাঠিয়ে দেয়, তখন কুফাবাসীরা টু শব্দ পর্যন্ত করেনি। হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর গ্রেফতারের সময়ও একই অবস্থা বিরাজমান ছিলো। দারে সাদের বৈরুত থেকে প্রকাশিত তাবাকাতে ইবনে সাদ ৮ম খণ্ড, ২২তম পর্বের বরাত দিয়ে কুফা রক্ষা করার আবেদন জানিয়ে যিয়াদের প্রতি লিখিত যে পত্রের কথা ওসমানী সাহেব তার বইয়ের ৬৬ ও ১৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, তা মূলতঃ তাবাকাতে ইবনে সাদের উক্ত সংস্করণের ৬ষ্ঠ খণ্ড ২১তম অংশের ২১৭-২১৮ পৃষ্ঠায় বর্তমান আছে। স্মরণ করা যেতে পারে, ইবনে সাদ হুজার রাদিয়াল্লাহ আনহুর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম লিখেছেন, হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু জাহেলিয়াতের পর ইসলামী যুগের সন্ধান লাভ করেন এবং আপন সহোদর হানী বিন আদীর সাথে প্রতিনিধিরূপে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

www.pathagar.com

খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন। একথা হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহাবী হওয়ার আরো একটি সুস্পষ্ট দলীল ওসমানী সাহেব যা স্বীকার করতে নারাজ। অতপর ইবনে সাদ তাবারীর প্রায় অনুরূপ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এ বিষয়ের উপর ইতিপূর্বে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শত সহস্র যে সকল অনুসারী কুফার জন্যে বিপদের তথাকথিত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তাদের সম্পর্কে তাকী ওসমানী সাহেব বিদায়ার ৮ম খণ্ডের ৫৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। সেখানে এ সকল সাথীদের বিদ্রোহমূলক তৎপরতার কথা এতটুকু উল্লেখ আছে যে, তারা হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসা-যাওয়া করতো এবং তার সাথে মসজিদে নামায আদায় করতো। যিয়াদ সম্ভবতঃ ১৪৪ ধারা জারী করে এ ধরনের দলকেও অবৈধ ও আইন বিরোধী সংস্থা ঘোষণা করেছিলো। আর যারা এ দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো তাদেরকে বিদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে দিয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে ওসমানী সাহেব তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৪-১৯৬ পৃষ্ঠার আরো একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত আলে-াচনা গত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ আছে যে, যিয়াদ হামাদান, তামীম, হাওয়াযেন প্রভৃতি গোত্রীয় লোকদের প্রতি হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গ্রেফতার করে আনার নির্দেশ দিয়েছিলো। হুজার স্বীয় সাথীদের সংখ্যা অল্প দেখে (فنظر الى قلة من معه من قومه) তাদেরকে সেখান থেকে চলে যেতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম ! যারা তোমাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে আসছে তাদের সাথে মুকাবিলা করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া আমার ইচ্ছা নয়। অতপর তারা যার যার পথে চলে যায়। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুও আপন অনুসারীদেরকে প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছিলেন।

আমি একথাও লিখেছিলাম যে, যিয়াদের নিয়োজিত নগরপতিকে শহর থেকে বহিষ্কারের যে ঘটনা যিয়াদ তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে তা আমি কোনো ইতিহাসেই পাইনি। প্রকৃত ঘটনা বরং এর বিপরীত ছিলো। কারণ, হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু তো নিজেই নিজের প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে পলায়নরত ছিলেন। ওসমানী সাহেব এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ তাবারীর দেয়া তথ্য মতে ৭০জন সাহাবী ও তাবেঈন এ ঘটনার সাক্ষী দিচ্ছেন। ইতিহাস গ্রন্থে ঘটনা উল্লেখের তাৎপর্য কি তা আমাদের জানা নেই। ওসমানী সাহেব সম্ভবত আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য বুঝার চেষ্টাই করেননি। কিংবা মনে হয় জেনে শুনেই তিনি আগের মতো আরেকবার ভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টায় সক্রিয় আছেন। অমুক অমুক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে যে, হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু নগরপতিকে বের করে

www.pathagar.com

দিয়েছেন—যিয়াদ একথা কাগজে লিখে দিলেই ঘটনার সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করে না। কারণ অসত্য ভাষণ ও বানোয়াট কথায় যিয়াদ এতোই পারদর্শী ও সুনিপুণ কুশলী ছিলো যে, তার প্রতি দুর্বলতা ও আনুকূল্যানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মালে গনীমাতের আলোচনায় যিয়াদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ওসমানী সাহেব শেষ পর্যায়ে বলতে বাধ্য হলেন—আমীরের পক্ষ থেকে সম্ভবত সে নিজেই এ মিথ্যা চিঠি তৈরী করে নিয়েছিলো। যথা উক্ত শাহাদাত নামায় হযরত শুরাইহির নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা সাক্ষী রটনা করে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়েছিলো, কাযী শুরাইহ তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং রটনা আখ্যা দিয়ে নিজেই লিখেছেন—হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা কিংবা খর্ব করা হারাম ও নিষিদ্ধ। তার রায় সম্বলিত সে পত্র সে সকল লোক মারফতই তিনি খলীফার বরাবরে পাঠিয়েছিলেন যিয়াদের বানোয়াট চিঠি ও নথিপত্র যারা বহন করে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে নিয়ে গিয়েছিলো। তদুপরি অপর কোনো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র বলে প্রমাণ হওয়া জরুরী যে, বহিষ্কৃত নগরপতি লোকটি কে, কোন্ শহর থেকে বহিষ্কার করা হলো, তিনি কোথায় গেলেন এবং জোর করে বের করে দেয়ার পর ফিরে এসেছিলেন কিনা। যার বহিষ্কৃত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি কুফারই প্রশাসক হতে পারেন। আর কুফার তৎকালীন প্রশাসক ছিলেন আমর বিন হোরাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু। ওসমানী সাহেব তার কিতাবের ৭১ পৃষ্ঠায় হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আমীরুল মু'মিনীনের গভর্নরকে বের করে দেয়া হয়েছে মর্মে সাক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। যিয়াদের দেয়া সাক্ষ্যনামার তালিকায় কুফার তৎকালীন গভর্নর ইবনে হুরাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামও শামিল ছিলো। এখন কথা হলো যাকে শহর থেকে বহিষ্কার করা হলো তিনিই আবার সাক্ষ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার। কেননা বহিষ্কৃত ব্যক্তিই যিয়াদের সামনে এসে গভর্নরকে বের করে দেয়ার সাক্ষী দিয়ে গেল আর যিয়াদ তা সরল বিশ্বাসে লিখেও নিলো, কুয়াশায় আচ্ছন্ন এহেন জটিল বাক্যের বিশুদ্ধ মর্ম উদ্ধার করতে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তাই এই অস্পষ্টতার নিরসনে আর কুহেলিকা জাল ভেদ করণে প্রমাণ সিদ্ধ ও যুক্তিগ্রাহ্য শক্ত শক্ত হাতিয়ার তথা দলীল নিয়ে ওসমানী সাহেবকেই এগিয়ে আসতে হবে—বহিষ্কৃত গভর্নর এ নগরেরই ছিলেন নাকি অপর কোনো শহরের ? উপরন্তু আলোচ্য গভর্নরের নামসহ তার ব্যক্তিত্বও তাকে স্পষ্ট করতে হবে। যিয়াদের বানোয়াট সাক্ষ্যনামায় নগর ও গভর্নরের নাম পরিচয় গোপন ও অজ্ঞাত থাকার মূল রহস্য উন্মোচন করা হবে তার অপর দায়িত্ব। কেননা কিতাবের বিবরণ কেবল এতটুকু যে, আমীরুল

www.pathagar.com

মু'মিনীন কর্তৃক নিয়োজিত গভর্নরকে শহর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সাক্ষী ও সাক্ষ্য রটনায় সিদ্ধহস্ত যিয়াদের কলাকৌশলও শিল্প নৈপুণ্য চমৎকারই বলতে হয়।

অপরাধীদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ

হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ কোনো অবস্থাতেই প্রয়োগ হতে পারে না এবং এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি যে নেই ইতিপূর্বের আলোচনায় একথা আমি প্রমাণ করেছি। হাদীস, সাহাবাকেরাম এবং ইমামগণের উক্তি উল্লেখ করে আমি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, যদি কোনো মুসলমান বিদ্রোহ করে তাহলেও পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে হত্যাকাণ্ডে জড়িত প্রমাণিত না হলে গ্রেফতারের পর তাকে হত্যা করা আইনসিদ্ধ নহে। কিন্তু ওসমানী সাহেব এখনো তার মতে অনড় যে, হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহী ছিলেন। আর বিদ্রোহী সম্পর্কে যদি আশংকা থাকে যে, মুক্তি দিলে সে আবার সংঘবদ্ধ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের খেলাফ বিদ্রোহ করতে পারে, তাহলে সর্বস্তরের ফকীহগণের ঐকমত্যে তাকে হত্যা করা বিধিসম্মত কাজ। এবার আমি আলোচনার ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে বলতে চাই—দূর কিংবা অদূর ভবিষ্যতে "বিদ্রোহ করতে পারে" কেবলমাত্র এ আশংকা এবং এ সন্দেহের অজুহাত বলে আটক প্রত্যেক বিদ্রোহীকে হত্যার বৈধতা স্বীকার করে নেয়া হলে স্বভাবত প্রশ্ন এসে যায়, উত্তম কথা—তাহলে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বন্দী তাঁর অপরাপর অনুসারীদের হত্যা না করার রহস্য কি ? হত্যা না করে কেন তাদের রেহাই দেয়া হলো ? হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কেবল এতটুকুই বলেছেন—ইনিই দল নেতা, তাকে ছেড়ে দিলে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। কিন্তু বাকীদের অর্ধেককে হত্যা করার সময় তাদের বিপদজনক হওয়ার কথা এবং আর অর্ধেককে মুক্তি দেয়ার সময় তাদের বিপজ্জনক না হওয়ার কথা কোনোটাই বলা হয়নি। তাদের এ ঈপ্সিত মুক্তি বলতে গেলে আমীর অমাত্যবর্গের মুখ দেখে সুপারিশেরই ফলশ্রুতি। অথচ ঘটনা হলো, অবশিষ্ট কয়েদীগণও সমভাবে অপরাধী ও বিপজ্জনক কিংবা সমভাবে নিরপরাধ ও অক্ষতিকর ছিলো। আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো, তাই অর্ধেক তাদের স্বজনদের সুপারিশে মুক্তি পেয়ে যায় এবং ছাড়া পেয়ে চুপচাপ ঘরে বসে থাকে। তারা কোনো বিদ্রোহী দল ও সংগঠনের সাথে জড়িত হয়নি কিংবা কোনো সন্ত্রাসেরও সৃষ্টি করেনি। মূলতঃ বিদ্রোহী কোনো দল এখন ছিলোই না, এটা বরং ওসমানী সাহেবের কলমপুরের চমকিলা আবিষ্কার বৈ নহে। তাই কল্পিত সন্ত্রাসী দলের বিপ্লব ভয়ে শংকিত হওয়া যায়, মনোবিকারে আক্রান্ত হওয়া যায় কিন্তু তাকে

www.pathagar.com

বাস্তবে রূপ দেয়া যায় না। বিশৃংখলার আশ্রয় না নিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের জনবিচ্ছিন্ন অবস্থায় নীরব ভূমিকাই প্রমাণ করে যে, তাদের প্রতি বিদ্রোহের অভিযোগ ছিলো মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

আমি একথাও লিখেছিলাম যে, ওসমানী সাহেবের মতে বিদ্রোহীকে হত্যা করা যদি ওয়াযিব না হয়, শুধুমাত্র জায়েয হয়, তাহলে ব্যাপারটি ন্যায়-ইনসাফের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে নিছক ইচ্ছার আওতায় এসে যায়। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিলো—যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি—একই অপরাধে অভিযুক্তদের সাথে দু' রকমের আচরণ আদৌ সঠিক সঙ্গত বিবেচিত হতে পারে না যে, যাকে ইচ্ছা হত্যা কর, যাকে ইচ্ছা মুক্তি দাও। আমার কথা না বুঝেই ওসমানী সাহেব তার গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় কতিপয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করে যাকে ইচ্ছা হত্যা করা আর যাকে ইচ্ছা ছেড়ে দেয়ার ইমাম বা বিচারকের অনুকূলে অবাধ স্বাধীনতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। প্রথমত ইমাম বা শাসকের বৈষম্যমূলক এখতিয়ার থাকা সম্পর্কে আমার ঘোর আপত্তি ; তা সত্ত্বেও আমার মতে এ দৃষ্টিকোণ থেকেও হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথীগণ সকলেই হয় শাস্তি না হয় মুক্তি পাওয়ার উপযোগী ছিলেন ; অবশেষে একথা কি করে জানা গেল ও প্রমাণিত হলো যে, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে হত্যা দ্বারাই বিরোধী শক্তি নির্মূল হওয়া সম্ভব ছিলো। তাদেরই তৎপরতায় আইন-শৃংখলার অবনতি হওয়ার আশংকা ছিলো এবং তারা কোনো দলের সাথে মিলিত হয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিতো। পক্ষান্তরে যাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো তাদের দ্বারা এ জাতীয় বিপর্যয় ঘটার কোনো আশংকাই ছিলো না।

হাদীসে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার নিন্দাবাদ

আমি একথাও লিখেছি যে, হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহী এবং তাকে হত্যা করা ওয়াযিব হওয়া সম্পর্কে কোনো মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ কিংবা ফকীহের এমন কোনো উক্তি আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। ইতিহাসের যে সমস্ত অধ্যায়ে এর বিবরণ উল্লেখিত রয়েছে, সেখানেও এ জাতীয় বর্ণনা আমি পাইনি। বিদ্রোহ, সংঘর্ষ, জীবন চরিত ইত্যাকার ফিকাহ বিষয়ক আলোচনার কোথাও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। অধিকন্তু খারেজী সম্প্রদায়, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডে জড়িত জনগোষ্ঠী এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত বিরুদ্ধবাদীদেরকে খ্যাতনামা বহু আলেম বিদ্রোহীরূপে চিহ্নিত ও আখ্যায়িত করেছেন। ইতিহাসের বিদ্রোহ অধ্যায়ে যার সুস্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমার জানামতে মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেবই সর্বপ্রথম হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা জায়েয ও বৈধ

www.pathagar.com

বলে ফতওয়া দেয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। অন্যান্য বুযুর্গগণ এহেন দুঃসাহস থেকে সংযমী ভূমিকা কেন নিলেন সে কথা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে আমি মনে করি কোনো কোনো রাওয়ায়েতের সুস্পষ্ট ইংগিত অনুযায়ী মরজে আজরায় ঘটিতব্য হত্যাজনিত মর্মান্তিক ঘটনার প্রতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টি এর অন্যতম কারণ। আলোচনার শুরুতেই এ সমস্ত রাওয়ায়েত আমার সামনে ছিলো ; কিন্তু আমার ধারণা ছিলো সম্ভবত এগুলোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে না এবং ওসমানী সাহেব তাঁর ভূমিকার পুনর্বিবেচনায় প্রয়াসী হবেন। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখন আমি এ ধরনের কয়েকটি রাওয়ায়েত উল্লেখের প্রয়াস নিতে চাই। তাতে সম্ভবত তাদের কিছুটা শিক্ষণীয় উপাদান ফুটে উঠবে। অহেতুক যারা একথার উপর অনঢ় হয়ে আছেন যে, যদি হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাহাবীরূপে স্বীকার করা হয় এবং তাকে হত্যা করাও জায়েয না হয় তাহলে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অবাঞ্ছিত দোষারোপের কালিমা জড়িয়ে যায় এবং তাতে মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে আমার জিজ্ঞাস্য, গোটা আলেম সমাজ যার অমানবিক নির্যাতনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেই বুসরও কি সাহাবীর ব্যাপক সংজ্ঞার আওতাভুক্ত ছিলেন না ? যে আমর বিন আল হুমুক আপনার স্বীকৃত মতেও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ৯টি আঘাত করার কারণে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুও কিসাস স্বরূপ তার গায়ে ৯টি আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনিও কি সাহাবী ছিলেন না ? এ সকল ঘটনাবলী আলোচনার অন্তরালে সাহাবীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার অনুভূতি যদি প্রচ্ছন্ন না থাকে, দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ যদি কেঁপে না উঠে, ঈমানের রাজপ্রাসাদ ধসে না পড়ে, উপরন্তু সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতা আহত হওয়ার উপক্রম যদি দেখা না দেয়, তাহলে প্রশ্ন আসে—আপনি তবে কেবল আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অথচ অভিনব এক আকীদা-বিশ্বাস উদ্ভাবন করে রেখেছেন কি ? খলীফা রাশেদের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ আর পরিশেষে তাকে নির্মম হত্যা অপেক্ষা মারাত্মক অপরাধ ও ঘৃণিত পাপ আর কি হতে পারে ? তা সত্ত্বেও আপনাকে মেনে নিতে হচ্ছে—এ ঘটনা অপর এক সাহাবী দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। অথচ এ ঘটনা কুরআন-হাদীসের কোথাও বর্ণিত নেই। সুতরাং কেবল ঐতিহাসিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই আপনার একথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে, একজন সাহাবী তার আমীর ও খলীফায়ে রাশেদের পূত-পবিত্র খুনে আপনার হাত রাঙিয়েছেন। এ ঘটনা স্বীকার করে নিতে আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে এ সত্য ও বাস্তবতা মেনে নেয়ার জন্যও আপনার মন-মানসিকতাকে শক্ত-সবল করে নিতে হবে

www.pathagar.com

যে, আম্বিয়াগণের পরে সৃষ্টির সেরা সাহাবায়ে কেরামের দ্বারাও বড় গোনাহ হতে পারে এবং তা বর্ণনা করাও দোষের কিছু নহে। আপনাকে আরো স্বীকার করতে হবে যে, তাকওয়া-পরহেযগারী, মান-মর্যাদা, জ্ঞান-গরিমা ও বিবেক-বিবেচনায় সকল সাহাবী একই মান-অভিন্ন পর্যায়ের ছিলেন না। যদিও সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো মানব গোষ্ঠী তাদের চেয়ে উত্তম ও উন্নত ছিলো না।

এখন আমি হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যার নিন্দা সূচক রাওয়ায়েতসমূহ উল্লেখ করতে চাই। হাফেজ ইবনে কাসীর (র) বেদায়া ও নেহায়ার ৬ষ্ঠ খণ্ডে সেসব ঘটনা, মুজিযা ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহ একত্রিত করেছেন যেগুলো নবুয়াতের দলীল রূপে গণ্য করা যায়। উক্ত খণ্ডের ২২৫ পৃষ্ঠায় ماروى في اخباره عن مقتل حجر بن عدى واصحابه এ শিরোনামের একটি অধ্যায় আছে। এতে এই মর্মে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি বর্ণিত আছে। "হে ইরাকবাসী ! তোমাদের মধ্যকার ৭জন ব্যক্তিকে আজরা নামক স্থানে হত্যা করা হবে। তাদের এ হত্যাকাণ্ড আসহাবুল উখদূদের মতোই অন্যায় ও অবৈধ আকারে সংঘটিত হবে।" আবু নুআইম সূত্রে এখানে এ ঘটনারও উল্লেখ আছে—যিয়াদ বিন সুমাইয়াহ মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা উল্লেখ করলে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতি কাঁকর নিক্ষেপ করেন। অতপর মরজে আজরা তাঁর হত্যাকাণ্ডের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর ইবনে কাসীর ইমাম বাইহাকীর মন্তব্য উল্লেখ করেন ঃ

لايقول على مثل هذا الا انه يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

> "হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের কথা অর্থাৎ হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শোনা ছাড়া বর্ণনা করতে পারেন না।"

ইবনে কাসীর আরো লিখেছেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে যান তখন তিনি বললেন ঃ আজরার ঘটনা অর্থাৎ হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করতে কোন্ বিষয় আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো ? হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন ঃ আমার দৃষ্টিতে তার প্রাণ নাশের অন্তরালেই জড়িত কল্যাণ নিহিত আর মুক্ত জীবন তাকে ছেড়ে দেয়ার পরিণামে জাতীয় বিপর্যয়ের আশংকা

www.pathagar.com

উপেক্ষা করার মত নহে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন বলতে লাগলেন ঃ

سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : سيقتل بعذراء ناس يغضب اللّه لهم واهل السماء ـ

"আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আজরা নামক স্থানে এমন কতিপয় লোকের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হবে, যাদের কারণে (হত্যাকারীদের প্রতি) আল্লাহ ও আকাশস্থ ফেরেশতাগণ অসন্তুষ্ট থাকবেন।"

ইমাম সূয়তি (র) খাসায়েসে কুবরা ২য় খণ্ডের ৫০০ পৃষ্ঠায় ঃ

اخباره صلى اللّه عليه وسلم بالمقتولين ظلما بعذراء ـ

"আজরায় অন্যায়ভাবে নিহত লোকদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী" শিরোনামে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এ অধ্যায়ে ইয়াকুব বিন সুফিয়ান, বাইহাকী এবং ইবনে আসাকীরের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে কথপোকথনের কথা উল্লেখ করতঃ নবী আলাইহিস সালামের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু শব্দে বর্ণনা করেন। এর টীকায় কিতাবুল মাআরিফের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা আছে—হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুনিয়াত তথা উপনাম ছিলো আবু আবদুর রহমান তিনি প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। তিনি কাদেসীয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সিফফীন ও উষ্ট্রযুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর ৫৩ হিজরী সনে মরজে আজরায় হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে হত্যা করান।

ইমাম ইবনে হাজমের কতিপয় রচিত গ্রন্থের সমষ্টি (جوامع السيره) 'জাওয়ামিউস সীরাহ' শিরোনামে আহমদ মোহাম্মদ শাকের, এহসান আব্বাস এবং ডাঃ নাসিরুদ্দীন আল আসাদ প্রমুখদের সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে اسماء الخلفاء والولاة ذكرمددهم "আসমাউল খেলাফ ওয়াল উলাত ওয়াযিকরা মুদাদিহিম" শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত রয়েছে। এ বইয়ের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা ইবনে হাজম শুধুমাত্র ৫টি লাইনে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

وفى ايامه حوصرت القسطنطينيه وقتل حجر بن عدى واصحابه صبراً

www.pathagar.com

بظاهر دمشق ـ من وهن الاسلام ان يقتل من رأى النبى صلى الله عليه وسلم من غير رده ولا زنى بعد احصان ـ ولعائشة فى قتلهم كلام محفوظ

"হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে কনষ্টিনটিনোপল অবরুদ্ধ হয় এবং হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সাথীদেরকে হাত-পা বেঁধে দামেশকের উপকণ্ঠে হত্যা করা হয়। যে সাহাবী নবী আলাইহিস সালামের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাঁকে মুরতাদ হওয়া কিংবা বিবাহোত্তর জীবনে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ ছাড়া হত্যা করা ইসলামের দুর্বলতা, শক্তিহীনতারও ক্রমাবনতির পরিচায়ক। নিহত বুযূর্গদের সম্পর্কে উম্মত জননী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতিক্রিয়া ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে।" এর টীকায় হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদের হত্যা করার ব্যাপারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বাণী শুনিয়েছিলেন তারও উল্লেখ রয়েছেঃ

يقتل بعدى اناس يغضب الله لهم واهل السماء

"আমার পর আমার উম্মতের কিছু লোক নির্মম হত্যার শিকার হবে যাদের কারণে (হত্যাকারীদের প্রতি) মহান আল্লাহ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণ অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হবেন।"

ইবনে আসাকিরের ব্যাখ্যা

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আসাকীর তার প্রণীত তারিখুল কবীর শীর্ষক দামেশকের গ্রন্থে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, তিনি ছিলেন সাহাবী। খতীবে বোগদাদী সূত্রে একই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার পর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেন : لقد بلغنى انه سيقتل بعذراء سبعة رجال يغضب الله واهل السماء لهم "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি 'আজরা' নামকস্থানে সাত ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে যাদের কারণে আল্লাহ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণ (হত্যাকারীদের প্রতি) ক্রোধান্বিত হবেন।" এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেই বলেছেন সে কথা বলাই বাহুল্য। এখানে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর একথারও উল্লেখ আছে যে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোন্ অপরাধে আমি হত্যা করেছি তা আমারও জানা

www.pathagar.com

নেই। (اني لا اعرف باى ذنب قتلته) তাঁর এ উক্তি দ্বারা হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দোষ হওয়ার প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়। অপর পক্ষে এ হত্যাকাণ্ডের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ পর্যায়ে অনুতপ্ত হয়েছিলেন সেদিকেও ইংগিত বহন করে। কোনো কোনো ইতিহাস গ্রন্থে এ ধরনের আরো মন্তব্য পাওয়া যায়। যেমন—তাবারী ও ইবনে সিরীনের বরাত দিয়ে লেখা আছে, আমরা একথা জানতে পেরেছি যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্তিমকালের বিদায় লগ্নে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, হে হুজার ! তোমার সাথে আমার সাক্ষাতের দিনটি মনে হয় দীর্ঘই হবে। যা হোক, আমরা আশাকরি আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন। তাই পরিতাপের সাথে বলতে হয়, আহা! তাকী ওসমানী সাহেব হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডকে সঠিক ও বৈধ প্রমাণ করার পরিবর্তে তিনিও যদি স্বীকার করে নিতেন "কাজটি ভ্রান্তিকরই ছিলো। আল্লাহ্ দাতা ও দয়ালু ; তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিবেন"—তাহলে এটা হতো সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অকপট স্বীকৃতির বাস্তব নিদর্শন। ইবনে আসাকির ইবনে মাকুলার উদ্ধৃতিসহ আরো লিখেছেন, অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো রাওয়ায়েত বর্ণিত নেই। (لايصححون لحجر ايه) মোহাম্মদ তাকী সাহেব এ প্রসঙ্গে البدايه-এর বরাত দিয়ে اكثر المحدثين لايصححون له صحبة অধিকাংশ হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহাবীয়ত অস্বীকার করার সপক্ষে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের যে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন তার তুলনায় ইবনে মাকুলার আলোচ্য উক্তি অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা, হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য মুহাদ্দিস যেভাবে বিবরণ দিয়েছেন তাতে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। অবশ্য তাঁর সূত্রে মাধ্যম বিহীন মরফু কোনো হাদীস (مرفوع) বর্ণিত না হওয়া স্বতন্ত্র কথা। হাদীস রাওয়ায়েতকারী সাহাবীর সংখ্যা তো বড়জোর ১ হাজার। অথচ সাহাবীদের সংখ্যা হলো এক লাখেরও উপর। তাই বলে তাদের সাহাবীয়ত শুদ্ধ ও স্বীকৃত হবে না ? ইবনে আসাকীরের উল্লেখিত ইবনে মাকুলা ছিলেন অতি উচ্চমানের মুহাদ্দিস। তাঁর রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে "আল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ মিনাল আসমা ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব" (كتاب المؤتلف والمختلف من الاسماء والكنى والانساب) শীর্ষক গ্রন্থটি সমধিক প্রসিদ্ধ। খাইরুদ্দীন যারকুলীও তাঁর লেখা আল আ'লাম (الاعلام) গ্রন্থে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একজন সাহসী বীর সাহাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

www.pathagar.com

হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথীদের মধ্যে যারা হত্যা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন আরকাম বিন আবদুল্লাহ আল কিন্দী ছিলেন তাদের একজন। ইবনে আসাকীর ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে তার অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে লিখেছেন, আমি লোকদেরকে সাধারণভাবে একথা বলাবলি করতে শুনেছি যে, হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যা এবং যিয়াদকে নিজের ভাই ঘোষণা করা ছিলো অবমাননাকর ব্যাপার যা কুফাবাসীদের উপর অবতীর্ণ হয়। অতপর তিনি হযরত হাসান বসরী (র)-এর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন যাতে তিনি আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর চারটি সুনির্দিষ্ট করেছেন। সে ৪টি ভুলের অন্যতম হলো হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড। খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে, কাজেই পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এ সকল উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মুহাদ্দিস, ইমামগণের উক্তি ও মন্তব্য থাকা সত্বেও যদি তাকী সাহেব হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকে জায়েয এবং ইজতেহাদী বিষয় বলতে চান, অনুরূপ প্রত্যেক সাহাবী মুজতাহিদ এবং তাঁদের প্রতিটি কাজই ইজতেহাদ আখ্যা দিয়ে পূর্বমতে অটল থাকাই তিনি সুবিধা ও সঙ্গত মনে করেন, তাহলে তাকে স্পষ্ট ভাষায় এবং জোর গলায় বলার অনুশীলন করতে হবে যে, সাহাবী আমর বিন আল হামাক যিনি বর্শার আঘাতে হযরত ওসমানের শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও ঝাঁঝরা করে ফেলেছিলেন এটাও তাঁর ইজতেহাদী ছিলো কিনা ? জাতীয় সংশোধন এবং বিপর্যয় রোধকল্পে এহেন পাশবিক অত্যাচার বৈধ ও জায়েয কিনা ? সে জবাবও তাকে সুস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণে আনতে হবে। স্মরণ রাখা দরকার ভুল ভুলই ; ইজতিহাদের নামে তার গায়ে শুদ্ধের আবরণ চড়িয়ে দিলেই সেটা জাতে উঠে যায় না।

মাবসুতের কথা

আগের আলোচনায় আমি মাবসুতের বরাত দিয়ে ইমাম সারাখসীর কথা উল্লেখ করেছি। তিনি হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্রোহীর পরিবর্তে ন্যায়পরায়ণ রূপে গণ্য করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুকে শাহাদাতের মৃত্যু বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ তাকী সাহেবের বাহারী মনোভাব আর নীতি নৈতিকতার চলমান গতি বুঝে সাধ্য কার ? আল্লামা সারাখসীর জবাবে তার কথা হলো—হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর গতিবিধি-কর্মতৎপরতা মূলত বিদ্রোহের অনলে প্রজ্জ্বলিত ছিলো ; কিন্তু ব্যক্তিগত চিন্তাধারার আলোকে সম্ভবত এটাকে তিনি স্বতন্ত্র কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আওতায় ফেলে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যেরূপ (مجتهد مخطى) ভুল ইজতিহাদের আবর্তে জড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতা করেছিলেন। এ কারণে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু

www.pathagar.com

আনহু নিজকে হয়তো ন্যায়পরায়ণ মনে করতেন এবং ইমাম সারাখসী এ কারণেই তার জন্যে শাহাদাত শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কথা শ্রদ্ধার সাথে আলোচিত হওয়া উচিত বলে মনে করতেন। তাকী ওসমানী সাহেব আগাগোড়া যে ধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা উল্লেখ করেছেন তার গ্রন্থের পূর্ণ বিষয়বস্তু পাঠকমাত্রই তা সঠিকভাবে অনুমান করতে পারেন। এতদসত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যায়ে এসে হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে অনুগ্রহ কেবল এটুকু দেখিয়েছেন যে, তাঁকে একজন ব্যাখ্যাকার ও মুজতাহিদ হওয়ার প্রচ্ছন্ন ধারণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও লিখেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি বিদ্রোহীরই কাতারে ছিলেন ; যদিও নিজেকে তিনি হকপন্থী মনে করতেন। বস্তুতঃ এটাও তার ধারণা প্রসূত কথাই। যা হোক ওসমানী সাহেবের এ অনুগ্রহ ও সুধারণাইবা কম কিসে ?

তবে ওসমানী সাহেবের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু মূলত হকপন্থী ছিলেন না। আর ইমাম সারাখসীও তাকে হকের উপর মনে করতেন না। বরং ইমাম সারাখসী তাকে শুধুমাত্র এ কারণে শহীদরূপে মৃত্যুবরণকারী আখ্যায়িত করেছেন যে, তাঁকে গোসল ছাড়াই সমাহিত করার ওসিয়ত তিনি আগেই করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইমাম সারাখসী এখানে ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারী নিহতদের গোসল ছাড়া দাফন করা এবং অন্যায় পক্ষ অবলম্বনকারী নিহতদের গোসল দিয়ে দাফন করার বিষয় বর্ণনা করেছেন। কারণ, অন্যায় পক্ষ অবলম্বনকারী নিহত লোকেরা শহীদ নয় যদিও তাদের উপর সাধারণ মুসলমানের মতোই সালাতে জানাযা পড়তে হয়। অতপর ইমাম সারাখসীর মতে তিনি যদি বিদ্রোহীই ছিলেন তাহলে এ ক্ষেত্রে হযরত আম্মার বিন ইয়াসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত যায়েদ বিন সওহান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওসিয়ত উল্লেখ করাই তার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। যেহেতু তাঁরা সত্য ও হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের সাথে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিষয় আলোচনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং জটিলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, তিনি যদি প্রকৃতই বিদ্রোহী ছিলেন তাহলে তাঁর ওসিয়ত উল্লেখ করার যোগ্যই ছিল না এবং দলীল হিসাবে এর কোনো গুরুত্বও থাকে না। মুহাম্মদ তাকী সাহেব অপর এক দর্শনের আলোকে বলতে চেয়েছেন হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যদি হকপন্থী স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে তাঁর বিপরীতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্রোহী চিহ্নিত না করে উপায় থাকে না। অথচ এটাও একটি ভুল উদ্ভাবন। কেননা একথা কেবল এখনি সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হতে পারে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি অন্যায় পথে বিদ্রোহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতেন। কিন্তু

www.pathagar.com

খলীফা যদি কাউকে জোরপূর্বক বিদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে হত্যা করে দেয়, তাহলে নিছক ন্যায়বানের হাতে নিহত হয়েছে বলেই তাকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করা যুক্তির ভাষা হতে পারে না। বনু আব্বাস ও বনু উমাইয়ার খলীফাগণ যে সকল খারেজীদেরকে হত্যা করেছেন নিসন্দেহে তারা বিদ্রোহী দলভুক্ত ছিলো। কিন্তু তাদের তলোয়ারের আঘাতে নিহত লাখো নিরপরাধ মুসলমান জনাব তাকী সাহেবের এহেন অভিনব দলীলের ভিত্তিতে বিদ্রোহী সাব্যস্ত হওয়ার আদৌ কোনো যুক্তি নেই শুধু এ কারণে যে, তাদেরকে বিদ্রোহী মানার পরিবর্তে ন্যায়পন্থী স্বীকার করা হলে খলীফাগণ ন্যায় ও হকের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যান।

যিয়াদের পক্ষে সাফাই

জনাব মুহাম্মদ তাকী সাহেব যিয়াদের সাফাই গাইতে এতোই ব্যস্ত যে, তিনি আলোচনার শেষে আবারো লিখেন ঃ মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খুতবার মধ্যে যিয়াদ কর্তৃক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কার করার সম্পর্কে যে সমস্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, সেগুলোতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি নহে ; বরং ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের প্রতি অভিশাপের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। আমি একথা আগেও উল্লেখ করেছি যে, যিয়াদ এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য গভর্নরগণ এমনকি স্বয়ং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও দাবী করতেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসমান হত্যাকারীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। যেহেতু প্রয়োজন মুহূর্তে তিনি ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যে যথাযথ এগিয়ে আসেননি, আবার হত্যাকারীদের বাঁধাও দেননি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইতিহাসবিদগণ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে এক বাক্যে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও স্পষ্ট যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুই ছিলেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের প্রতি বনু উমাইয়াদের তিরস্কার ও গালী-গালাজের মূল লক্ষ্যবস্তু। এসবের ইশারা-ইংগিত যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুরই প্রতি একথা কারো অবিদিত ছিলো না। অধিকন্তু তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম উল্লেখ করে গালমন্দ করে বেড়াতো। আল বিদায়া ৬ষ্ঠ খণ্ডের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে এই মাত্র আমি দেখিয়েছি যিয়াদ মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম বিদ্রূপাত্মক এমনি বিশেষ ভংগিতে উল্লেখ করেছিলো। হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে যার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সংযমের চরম মুহূর্তে এক পর্যায়ে তিনি বক্তা যিয়াদের প্রতি কাঁকর নিক্ষেপ করে বসেন। এখানে এ বাক্য দ্বারা বর্তমান খুতবাসমূহের ন্যায় ذكر

www.pathagar.com

زیاد بن سمیة علی بن ابی طالب علی المنبر হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা করাই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুই যিয়াদের মুখে কাঁকর ছুঁড়তে যাবেন কোন্ কারণে ? মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার আলোচনায় বিদায়ার যেসব পৃষ্ঠার (খণ্ড ৮; পৃষ্ঠা–৫০) বরাত দিয়েছেন সেখানে একথার উল্লেখ আছে যে, যিয়াদ কুফায় তার দেয়া প্রথম খুতবায় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলতের বর্ণনা করে এবং তাঁর হত্যাকারী ও সহযোগীদেরকে অভিশপ্ত করে (من قتله او اعان علی قتله) যদিও সরাসরি এতে কারো নামের উল্লেখ নেই, কিন্তু অভিশাপের মূল লক্ষ্যবস্তু যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুই সে কথা বলাই বাহুল্য। উল্লেখিত নিজের কথা ওসমানী সাহেবের সম্ভবত মনে নেই, যেখানে আপন বইয়ের ৬৪ পৃষ্ঠায় প্রথমবার তিনি যিয়াদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণের প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছিলেন। সেখানে তিনি হযরত মুগীরা বিন শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে বলা হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তির উদ্ধৃতি টেনেছেন। যথা–হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষায় ঃ

قد اصبحت مولعا بذمر امیر المؤمنین وتقریظ المجرمین۔

> "ওসমানী সাহেবের ভাষায় যার মর্ম ঃ "(হে মুগীরা !) মনে হয় তুমি আমীরুল মু'মিনীনের (হযরত আলীর) নিন্দাবাদ আর অপরাধীদের (হযরত ওসমানের) প্রশংসা করতে দারুন আগ্রহী।"

এখন কথা হলো, জনাব ওসমানী সাহেব আলোচ্য বাক্যে উল্লেখিত আমীরুল মু'মিনীন ও মুজরিমীন শব্দ দু'টির সাথে যথাক্রমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংযোজন, পরিবর্ধন অধিকন্তু সম্পৃক্তি ক্রিয়া ব্যাকরণে বা অলংকার শাস্ত্রের কোন্ বিধান মতে সম্পন্ন করেছেন, সে ব্যাখ্যা তাকে দিতে হবে। জবাবে সম্ভবত তিনি বলতে চাইবেন— বক্তার পূর্বাপর ইংগিত-ইশারার ভিত্তিতে আমার এ সংযোজন। উত্তম কথা— তাহলে (فما جوابکم هو جوابنا) "আপনাদের জবাব যে ধরনের আমাদের উত্তরও একই প্রকৃতির।" অর্থাৎ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী এবং হত্যাকাণ্ডে সহায়তাদানকারীদের প্রতি যিয়াদসহ বনু উমাইয়া নিয়োজিত অপরাপর গভর্নরদের অভিসম্পাত ও তিরস্কার বর্ষণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিলেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। অধিকতর স্পষ্ট কথায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হতো তাদের গালী-গালাজ আর অভিসম্পাতের সর্বনাশা মহড়া। এতো গেলো শেরে খোদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তাদের বেনামী গালমন্দের এক চিত্র। অপর দৃশ্যে সনাম অভিসম্পাতেও যে তারা পিছিয়ে থাকতো সে চিন্তা না করাই ভালো।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

ইয়াযীদের নামে বাইয়াত গ্রহণ

এক ঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন

বিভিন্ন দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হযরত হুজার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড বৈধ প্রমাণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টার পর জনাব তাকী ওসমানী সাহেব ইয়াযীদের নামে বাইয়াত গ্রহণকে জায়েয ও বৈধ সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টার একবিন্দুও ত্রুটি করেননি। মাওলানা ওসমানী সাহেবের অবস্থা সত্যিই বড় বেদনাদায়ক যে, তিনি মরহুম মাওলানা মওদূদীর ভ্রান্তি প্রমাণের আবেগে বিশ্বের সামনে ইসলামী বিধি-বিধানের বিকৃতি সাধনে কি পরিমাণ তৎপর হয়ে উঠেছেন, সে অনুভূতি সম্ভবত হারিয়ে ফেলেছেন। প্রথমে তিনি ইসলামী সরকারের প্রশাসন ও বিচার বিভাগের এমনি এক অভিনব চিত্র তুলে ধরেছেন যে, শাসন ক্ষমতায় আসীন কর্তৃবর্গ যুলুম-অত্যাচার, ন্যায়-অন্যায় যা ইচ্ছা করুন, তাতে তাদের জবাবদিহির বালাই নেই এবং তারা ধরা ছোয়ার উর্ধে। পরে তিনি ইসলামের বিদ্রোহ আইন এবং ইসলামের নাগরিক অধিকারের এ ব্যাখ্যা পেশ করেন যে, সরকার সন্ত্রাসীদের যাকে ইচ্ছা বিদ্রোহী সাব্যস্ত করে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়েই হত্যা করার সর্বময় ও একচ্ছত্র অধিকারী। অতপর ইয়াযীদের অভিষেক তথা বাইয়াত গ্রহণ ক্রিয়া সঠিক ও বৈধ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ওসমানী সাহেব বলেন, গোটা মুসলিম জাতির সর্বসম্মত ও প্রতিষ্ঠিত ঐকমত্য হলো—বর্তমান খলীফা কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান। সৎ উদ্দেশ্যে খেলাফতের যোগ্য ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর অধিকারী বিবেচনা সাপেক্ষে স্বীয় পুত্র বা অপর কোনো আত্মীয়কে ওলী আহদ বা পরবর্তী খলীফা মনোনীত করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে খলীফার উদ্দেশ্যের উপর আক্রমণ করার কারো অধিকার স্বীকৃত নহে। অন্য কথায় এর সুস্পষ্ট তাৎপর্য হলো, খেলাফত 'আলা মিনহাজুন নবুওয়াত' (নবী প্রদর্শিত ধারা অনুযায়ী রাজ্য চালনা) এবং রাজতন্ত্র ইসলামে সমভাবে জায়েয ও বৈধ। অতএব মুসলিম জনগোষ্ঠী যে ধরনের ও যে প্রকৃতির ইচ্ছা সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাতে আপত্তির কিছু নেই।

ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি ও এতদসংক্রান্ত দৃষ্টিভংগী এত ব্যাপক, এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, তার উপর বিশদ আলোচনার জন্যে সীমিত প্রবন্ধের পরিবর্তে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। কুরআন, রাসূলের আদর্শ ও খেলাফতে রাশেদার নীতির আলোকে এসব বিষয়ের বিশদ পর্যালোচনা ছাড়া ইসলামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি ও দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট হতে পারে না এবং ওসমানী সাহেবের ভূমিকার ত্রুটি পুরোপুরি বুঝে আসাও সম্ভব নহে। কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত পরিসর এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায়। এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তাঁর রচনাবলী বাজারে দুর্লভ নহে। সেগুলোর উপর নজর বুলিয়ে নিতে পাঠকবৃন্দের প্রতি আমার অনুরোধ আশা করি অবান্তর হবে না। বিশেষ করে তাঁর রচিত ও বহুল আলোচিত 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থের প্রাথমিক পরিচ্ছেদগুলো এ বিষয়েরই আলোচনায় সমৃদ্ধ। মাওলানা ওসমানী সাহেব সমালোচনার সূচনা লগ্নে এগুলোর প্রতি তার সন্তুষ্টির কথাই প্রকাশ করেছেন। কাজেই স্মরণ শক্তি সজীব-শাণিত করার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয়বার সেখানে চোখ বুলিয়ে নিলে আমার মতে অসমীচীন না হবারই কথা। পরবর্তীতে আপনাদের খেদমতে এ বিষয়ের উপর আমি কতিপয় জরুরী আবেদন করবো।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খলীফা নির্বাচন

এ সত্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান আমীর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমান কর্তৃক নির্বাচিত কিংবা মনোনীত আমীর ছিলেন না ; তিনি আপন চেষ্টা কিংবা শক্তি বলে ইমারতের আসন লাভ করেননি। বরং তাঁকে আল্লাহ তাআলা নিজেই নবুওয়াত দান করেন এবং তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহ প্রদত্ত নবুওয়াত ও রিসালাতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো। ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা কে হবেন এবং মুসলমানদের নেতৃত্বের এ গুরুত্বপূর্ণ পদ কিভাবে ও কোন্ পদ্ধতিতে পূরণ করা হবে, সমকালীন পরিবেশে সে জটিল বিষয়টিই ছিলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামে যদি কোনো আমীরকে এ অধিকার প্রদান করা হতো যে, তিনি তাঁর বংশের কাউকে স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করবেন এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই স্থলাভিষিক্তের পক্ষে শপথ নিয়ে নেবেন, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর বংশে এহেন যোগ্য ব্যক্তির অভাবও ছিলো না। তাই এ নীতি ইসলামের দৃষ্টিতে পসন্দনীয় হলে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজের সূচনা করার সবচেয়ে বেশী হকদার ছিলেন। কিন্তু সবার জানা এবং এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের ঐকমত্য যে, তিনি এমন কাজ করেননি ; শুধু তাই নয় বরঞ্চ নিজ বংশ বহির্ভূত অন্য কারো নাম ঘোষণা করে তার সপক্ষে বাইয়াতও তিনি নেননি। এ বিষয়ের নির্ভরযোগ্য রাওয়ায়েত সূত্রে প্রমাণ হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে বেশ চিন্তান্বিত ছিলেন এবং এ বিষয়ে উম্মতকে একটি যথাযথ নির্দেশিকা দিতে আগ্রহীও ছিলেন। তাঁর বাণীর

www.pathagar.com

আলোকে এ তত্ত্বও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, যদিও খেলাফতের গুরত্বপূর্ণ পদের জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক দৃষ্টিতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁকে প্রথম খলীফা নিয়োগ করতে তাঁর আকাংখাও ছিলো কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি মনোনয়ন দানের (Nomination) পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল ছিলো এক মর্মান্তিক ঘটনা এবং পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করা ছিলো জাতির জন্যে গুরুতর দায়িত্ব এবং কঠিন পরীক্ষার বিষয়। এ বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়াও ছিলো অনিবার্য যার প্রতিক্রিয়া আজ অবধি জাতীয় পর্যায়ে বিরাজমান। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত রায় কায়েম করা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরামগণের সামনে উহাকে একটি নীতিগত বিধান, ওসিয়ত কিংবা প্রস্তাব আকারে পেশ করেননি। যাতে আবহমানকাল থেকে বিশ্বজুড়ে অভিষিক্ত করণের প্রচলিত রীতি ও বংশগত ঐতিহ্যের অবসান ঘটে এবং মুসলিম জাতি নিজ দায়িত্বে নেতা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ও উচ্চমান সম্পন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে সিয়াহ্ সিত্তার কিতাবে একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে। আমি বুখারীর 'রোগ ও চিকিৎসা' অধ্যায়ের একটি হাদীসের জরুরী অংশ এখানে পেশ করছি। এতে বর্ণিত আছে—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগযন্ত্রণা বেড়ে গেলে তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন :

لقد هممت اواردت ان ارسل الى ابى بكرو ابنه واعهد ان يقول القائلون او يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون او يدفع الله ويأبى المؤمنون -

"আমার ইচ্ছা ছিলো আবু বকর ও তাঁর ছেলেকে ডেকে তাদের নেতৃত্বের সপক্ষে বাইয়াত নেই ; যাতে অভিযোগকারীগণ অভিযোগ এবং নেতৃত্বাভিলাষীগণ আশা করতে না পারে। পরক্ষণেই আমার মনে হলো —এর প্রতিকারে আল্লাহই যথেষ্ট আর মু'মিনরা এর প্রতিরোধ করেই নিবে। অথবা আল্লাহ দমিয়ে দেবেন আর মু'মিনগণ তা সামলিয়ে নেবে।"

হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বুখারী ও অন্যান্য সহীহ হাদীস গ্রন্থের একাধিক স্থানে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত المؤمنون শব্দটি একথার অকাট্য প্রমাণ যে, খলীফা অধিকাংশ মুসলমানের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত রায়ের ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়া উচিত এবং ইসলামে আমীর নির্বাচনের আদর্শ, অনুসরণীয় ও উত্তম পদ্ধতি এটাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ইচ্ছা জাতি

www.pathagar.com

যথার্থভাবে পূরণ করে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পসন্দনীয় পদ্ধতিতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা নির্বাচন করে।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খলিফা নির্বাচন

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর মুসলমানদের ২য় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্বাচন নিসন্দেহে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাবানুযায়ী বাস্তবায়িত হয়। এর দ্বারা কেউ কেউ ইয়াযীদের নামে বাইয়াত গ্রহণ এবং বংশানুক্রমিক ও গোষ্ঠীগত প্রভুত্ব জায়েয ও বৈধ প্রমাণ করতে চান। অথচ বাস্তবের আলোকে এর একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। কারণ, উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের কতিপয় দিক একেবারে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। ১ম পার্থক্য হলো, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে পরবর্তী খলীফা ঘোষণা করে তার নামে বাইয়াত নেননি। বরং জীবনের শেষ মুহূর্তে ও অন্তিমকালেই কেবল তাঁর মনে স্থলাভিষিক্তের ধারণা বদ্ধমূল হয়। শেষের কয়েকদিন রোগের তীব্রতায় তিনি মসজিদেও যেতে পারেননি। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তাঁর ওসিয়াতনামা লেখা শুরু করার সময় এতোটা দুর্বল হয়ে পড়েন যে, শ্রুতলিপি লেখাতে গিয়ে তিনি কিছুক্ষণ চেতনা হারিয়ে ফেলেন। অপরদিকে ইয়াযীদের নামে বাইয়াত গ্রহণের তৎপরতা ও পদক্ষেপের সূচনা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের চার বছর পূর্বে ; বরং তারও আগে একান্ন হিজরীতেই শুরু হয়ে যায়। উপরন্তু এ আন্দোলন সিরিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং মারওয়ান ও যিয়াদ প্রমুখের বদৌলতে তা মক্কা, মদীনা, বসরা ও কুফায় অত্যন্ত তৎপরতার সাথে অব্যাহত ছিলো। আর জনসাধারণের কাছ থেকে ব্যাপক হারে বাইয়াত গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা চলতে থাকে। এ জটিলতা লক্ষ্য করে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় দূরদর্শী ও সচেতন লোক পর্যন্ত বলে দিলেন, একই সাথে দু'টি বাইয়াতের শৃংখল গলায় ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। অবশ্য আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর যে কেউ খলীফা রূপে স্বীকৃত হবে তার পক্ষে বাইয়াত নিতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না।

দ্বিতীয় স্বতন্ত্র দিক হলো, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসিয়তনামা লেখানোর কয়েকদিন পূর্বে শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবর্গ, চিন্তাবিদ, জ্ঞানী-গুণী ও শূরা সদস্যদের সাথে যথাযথ পরামর্শ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং তাবাকাত গ্রন্থকার ইবনে সাআদ তাঁর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে وصية ابى بكر শিরোনামে লিখেছেন, তিনি আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু-আনহু, হযরত ওসমান

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবুল আওআর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সাঈদ বিন হোদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য কতিপয় মুহাজির ও আনসারদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন। সকলেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষে ইতিবাচক রায় প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে অবশ্য কেউ কেউ হযরত ওমরের কঠোর প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। এর জবাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কাছে আমার একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, একজন উত্তম ব্যক্তির নামই আমি প্রস্তাব করেছি। (অপর কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, তিনি বললেন—ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কঠোরতা মূলত আমার নম্রতার ফলশ্রুতি। আমার স্থলে দায়িত্বভার নিজের কাঁধে এসে গেলে, আপনা থেকে কোমল হয়ে যাওয়া তার পক্ষে বিচিত্র নহে।) অতপর সাধারণ জনসভায় তাঁর ওসিয়তনামা পড়ে শুনানো হয়। আর কোনো প্রকার চাপ ও বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ তা মেনে নেয়ার কথা প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে শূরার (পরামর্শ পরিষদ) অস্তিত্ব এবং নেতৃপরিষদের অবকাঠামো কার্যতঃ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। ইয়াযীদের বাইয়াত গ্রহণ প্রক্রিয়া যেভাবে সম্পন্ন হয় তা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওসিয়াত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ও স্বতন্ত্র ধাচের ছিলো। এ বিষয়ের আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে।

তৃতীয় যে কথাটি উল্লেখ করার মতো তাহলো, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে বংশগত আত্মীয়তার কোনো যোগসূত্র ছিলো না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসিয়ত করার সময় এদিকে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন যাতে করে অভিযোগ ও অপবাদ উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ অবশিষ্ট না থাকে। ইমাম ইবনে জারীর (র) তাঁর গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৬১৫ পৃষ্ঠা) লিখেছেন ঃ

اشرف ابو بكر على الناس من كنيفه واسماء ابنة عميس ممسكته وهو يقول اترضون بمن استخلف عليكم ؟ فاني والله ما الوت من جهد الرائي ولا وليت ذاقرابة واني قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا فقالوا سمعنا واطعنا ـ

"হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানালা দিয়ে জনগণের দিকে ঝুঁকেন (এ সময় তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে ওমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে ধরে রেখেছিলেন।) তিনি বলছিলেন, নির্বাচিত ও আমার মনোনীত খলীফার প্রতি তোমরা কি সন্তুষ্ট ? আল্লাহর কসম ! আমি গভীর চিন্তা-ভাবনা

www.pathagar.com

করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এ ব্যাপারে আমি কোনো ত্রুটি করিনি। বিশেষত খেলাফতের এ গুরুপদে আমার রক্ত সম্পর্ক কোনো আত্মীয়কে আমি অধিষ্ঠিত করিনি। আমি ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফারূপে প্রস্তাব করেছি। সুতরাং তোমরা তার কথা শুনবে ও পালন করবে। উপস্থিত জনতা বললো, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।"

বিপরীতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটাত্মীয় অর্থাৎ স্বয়ং নিজ পুত্রকে খেলাফতে অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত কায়েম করেন, যা অনাগত ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্যে চিরাচরিতভাবে একটি উদাহরণ ও দলীল সাব্যস্ত হতে পারে। ইবনে আসীর (র) বলেছেন ঃ

معاوية اول خليفة بايع لولده فى الاسلام -

"মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম খলীফা ইসলামে যিনি আপন সপক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করেন।"–(আল কামেল, খণ্ড-৩ ; পৃষ্ঠা–২৬৩)

অতপর মুসলমানদের মধ্য থেকে বাইয়াতের নির্বাচনী ও শূরা ভিত্তিক পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যে, একজন শাসক তার পরবর্তীতে দুই দুই, তিন তিনজনের পক্ষে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ করতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখনো নাবালেগ এমনকি মাতৃগর্ভ থেকে জগতের মুখ দেখারও সুযোগ পায়নি। এমনিভাবে নাবালেগ ও গর্ভস্থ ভ্রূণের নামে জোর করে শপথ নেয়া হয়। বাইয়াতের ফর্মূলা অনুযায়ী শপথ গ্রহণকারীকে বলতে হতো—যদি আমি এ শপথ ভংগ করি তাহলে আমার স্ত্রীর উপর তালাক মোগাল্লাজা আপতিত হবে। এ জাতীয় জবরদস্তীমূলক বাইয়াত ও বলপূর্বক তালাকের বিরুদ্ধে ইমাম মালেক (র) নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বজ্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা দেন, এর কোনো মূল্য নেই, এ তালাক কার্যকর হবে না।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খলীফা নির্বাচন

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পালা আসে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কোনো সময় বলা হয়ে থাকে, তিনি খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে পূববর্তী দু'জন অগ্রগামীর তুলনায় মধ্যবর্তী একটি ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাহলো, তিনি কোনো পরবর্তী খলীফারূপে কোনো একক ব্যক্তিত্বের নাম প্রস্তাবের পরিবর্তে একটি পরামর্শ ও নির্বাচনী পরিষদ গঠন করেন। যাতে তারা খলীফার নাম প্রস্তাব করে মুসলমানদের সামনে পেশ করবেন। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়,

www.pathagar.com

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদ্ধতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা মনোনয়ন পদ্ধতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। সহীহ মুসলিমের امارة। অধ্যায়ের لاستخلاف। পরিচ্ছেদে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত আছে, আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর পরবর্তী খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে জনগণ তাঁকে পরামর্শ দেয়। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন ঃ যদি আমি স্থলাভিষিক্তের নাম প্রস্তাব করি, তাহলে এটা হবে এমন লোকের কাজ যিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু)। আর যদি আমি তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে যাই তাহলে এটাও হবে এমন মহান ব্যক্তিত্বের অনুসরণ যিনি আমার তুলনায় উন্নতির শৈল চূড়ায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। পিতার কথার ধরন দেখে আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

فعرفت انه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف -

"অর্থাৎ তার মুখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লেখ শুনেই আমি বুঝে নিলাম—খলীফা মনোনীত করা তাঁর আদৌ ইচ্ছা নেই।"

তারপরই মুসলিম শরীফের অপর রাওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আপন সহোদরা হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করছেন না একথা কি তুমি জান ? হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, তিনি এরূপ করবেন না ; হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তিনি এরূপই করছেন। তখন হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কসম করে বললেন ঃ তিনি এ ব্যাপারে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কথা বলবেন। প্রথম দিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলার সাহসই করতে পারলেন না ; ২য় দিন তিনি পিতার কাছে আরজ করলেন, লোকেরা বলছে, খলীফা হিসাবে আপনি নাকি কারো নাম প্রস্তাব করার পক্ষপাতী নহেন। আপনার রাখাল যদি তার বকরী পাল স্বাধীনভাবে অরক্ষিত ছেড়ে দিয়ে আসে, তাহলে এক সময়ে দেখতে পাবেন সেগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে। তদ্রূপ মুসলিম জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তাদের দেখাশুনা-তত্ত্বাবধান তো আরো জটিল ব্যাপার। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাথে একমত হন। কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে রেখে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা স্মরণ করে সে একই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এতে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

www.pathagar.com

فعلمت انه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم احدا وانه غير مستخلف۔

"সুতরাং আমার বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, তিনি কাউকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকক্ষ মনে করেন না এবং তিনি কাউকে খলীফা মনোনীত করার পক্ষপাতী নহেন।"

এসব রাওয়ায়েত বিশেষতঃ হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশ্লেষণের আলোকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ ব্যাপারে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তুলনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শকে বেশী প্রাধান্য দিতে আগ্রহী এবং এ কারণেই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খলীফা নির্ধারণ করতে বিরত থাকেন। অবশ্য তিনি খেলাফতের জন্যে নাম প্রস্তাব করার দায়িত্ব এমন সাহাবীদের উপর সোপর্দ করেন যারা (আশারায়ে মুবাশশারা) শুভসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তারা ইসলামী সমাজের গুলবাগের সৌরভ ও মধ্যমণি ব্যক্তিত্ব রূপে পরিগণিত ছিলেন। দশজন শুভসংবাদ প্রাপ্তদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু ওবায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিপূর্বে জান্নাতবাসী হয়ে গেছেন। তৃতীয়জন তিনি নিজে (হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু) জান্নাতবাসী হওয়ার প্রস্তুত হয়ে আছেন। অবশিষ্ট ৭জন জীবিত সাহাবীর মধ্য থেকে ৬জনকে তিনি নির্বাচনী বোর্ডের সদস্যরূপে মনোনীত করেন। কিন্তু ৭ম সাহাবী হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেবলমাত্র এ কারণে বাদ দেন যে, তিনি তাঁর চাচাতো ভাই এবং ভগ্নিপতি ছিলেন। অন্যথায় তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্বে ঈমান এনে ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। এটা কেবলমাত্র আমারই অনুমান নহে ; বরং পূর্ববর্তী বহু আলেমও একথা লিখেছেন যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাকওয়া ও আল্লাহভীতির কারণে তাঁকে আলাদা রাখেন ; কেননা তিনি ছিলেন তাঁর নিকটাত্মীয়। সহীহ মুসলিমের যেসব রাওয়ায়েত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মুসলিম শরীফের كتاب الصلوة، باب نهى من اكل الثوم -এ একটি রাওয়ায়েত আছে। উক্ত রাওয়ায়েতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি স্বপ্নের কথা বিবৃত হয়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় একথা বুঝা গেছে যে, তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। উক্ত ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, কেউ কেউ আমাকে স্থলাভিষিক্ত মনোনয়নের কথা বলে থাকে। অথচ আমি মনে করি আল্লাহ তাআলা তার দীন ও খেলাফতকে নষ্ট হতে দিবেন না। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেনঃ

www.pathagar.com

الستة عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن ابى وقاص وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وان كان من العشرة لانه من اقاربه فتورع عن ادخاله كما تورّع عن ادخال ابنه عبد اللّه رضى اللّه عنهم -

"যে ছয়জন সাহাবীর নাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তাব করেছিলেন তাঁরা হলেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু, যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ। তিনি হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আশারায়ে মুবাশশারা হওয়া সত্ত্বেও এ বোর্ডে শামিল করেননি। কারণ, তিনি ছিলেন তার নিকটাত্মীয়। একইভাবে স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকেন।"

এমনিভাবে বুখারীর كتاب الحدود والمحاربين، باب رجم الحبلى من الزنا অধ্যায়ে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার জানতে পারেন জনৈক ব্যক্তি বলছিলো—আমি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর অমুকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, এ ধরনের লোকদের আমি হুশিয়ার করতে চাই। অতপর বললেন ঃ

هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امورهم ..... ليس منكم من تقطع الاعناق اليه مثل ابى بكر من بايع رجلا غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذى بايعه تغرة ان يقتلا -

"এরা এমন লোক যাদের ইচ্ছা জনসাধারণের অধিকার খর্ব হোক, অথচ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় জনপ্রিয় হবে, সে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকেই বাইয়াত নেবে, এরূপ বাইয়াতকারী এবং বাইয়াত গ্রহণকারীদের ভূমিকা গ্রহণযোগ্য নয় ; বস্তুত তারা উভয়ই যেন নিজেকে হত্যার জন্য পেশ করছে।"

কতিপয় অন্যান্য রাওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় যে, কিছু লোক হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচনী বোর্ডে শামিল করার দাবী করলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সে দর্শক হিসেবে থাকতে পারবে কিন্তু খেলাফতে তার কোনো অংশ থাকবে না। ওমর কোনো মতে দায়মুক্ত হয়ে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলে আমার বংশের জন্য সেটাই হবে সৌভাগ্যের বিষয়।

www.pathagar.com

বুখারীতে ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি এভাবে বর্ণিত আছে ঃ

يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيئ -

"তোমাদের সভায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাজির থাকবে, কিন্তু নেতৃত্বে তার কোনো অংশ থাকবে না।"

হাদীসটির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজর (র) লিখেছেন ঃ

اما سعيد بن زيد فهوا ابن عم عمر فلم يسمه عمر فيهم مبالغة فى التبرى من الامر -

"সাঈদ বিন যায়েদ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাচাতো ভাই ছিলেন; সুতরাং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নাম ঘোষণা করেননি। ইমারত বা দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেয়া তাঁর অধিকতর সতর্কতারই পরিচায়ক।"

এ পর্যায়ে আল মাদায়েনীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

عدّ عمر سعيد بن زيد فيمن توفى النبى صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض الا انه استثناه من اهل الشورى لقرابته منه -

"হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেসব সাহাবীর মধ্যে গণ্য করেছেন যাদের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর সময় সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পরামর্শ সভা থেকে বাদ দেন। কেননা তিনি ছিলেন তাঁর নিকটাত্মীয়।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) منهاج السنه নামক গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

عمر قد اخرج من الامر ابنه ولم يدخل فى الامر ابن عمه سعيد بن زيد وهو احد العشرة وهم من قبيلة بنى عدى -

"এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আপন চাচাতো ভাই সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নেতৃত্বের প্রার্থী হওয়া থেকে বাদ দিয়ে দেন। অথচ সাঈদ আশারায়ে মোবাশশারার অন্যতম ছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন বনী আদী গোত্রীয় অর্থাৎ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বগোত্রীয়।"

www.pathagar.com

তারপরই ইবনে তাইমিয়া (র) লিখেছেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বগোত্রীয় কাউকে কোনো সরকারী পদে নিয়োগ করেননি। কেবলমাত্র একবার এরূপ করেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁকেও (গভর্নর) বরখাস্ত করেন। প্রাগুক্ত গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় একথাটিই বিবৃত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ই তাঁদের জীবদ্দশায় কোনো স্বজন ও প্রিয়জনকে পদে অধিষ্ঠিত করেননি, তাঁরা কাউকে স্থলাভিষিক্তও করেননি ; অথচ তাঁদের আত্মীয় ও সন্তানদের মধ্যে মর্যাদাবান সাহাবীও তখন বর্তমান ছিলেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গঠিত নির্বাচনী বোর্ডের সদস্যগণ পারস্পরিক পরামর্শের পর খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব হযরত আবদুর রহমান বিন আউফের উপর ন্যস্ত করেন। তাবারী ও অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দায়িত্ব আদায়ের জন্যে জনমত যাঁচাই করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে পর্দানশীন মহিলাদের কাছ থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। মদীনাবাসী, ছাত্র জনতা, বহিরাগত হাজীদের মতামত জ্ঞাত হোন। পরিশেষে তিনি অনুমান করেন যে, জনগণ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অধিক আগ্রহী। সুতরাং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতেই সাধারণ বাইয়াত হয়।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খলীফা নির্বাচন

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বীয় বংশ বনী উমাইয়ার ব্যাপারে ছিলেন উদার মুক্তপ্রাণ। মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য কিতাবে তাঁর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যদি আমার হাতে বেহেশতের চাবি থাকতো তাহলে আমি আমার বংশের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলকেই সেটি দিয়ে দিতাম, যাতে তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে।[১] তাঁর বংশের কতিপয় লোক অবরোধের সময় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বগোত্রীয় কোনো ব্যক্তির সমর্থনে খলীফা বানানোর ওসিয়ত করেননি।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর একদল সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একত্রিত হয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। এ ব্যাপারে তাদের অধিক পীড়াপীড়ির পর তিনি বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আহলে শূরা ও আহলে বদর আমার

---

১. মুসনাদে আহমদের مرديات عثمان-এ আছে ঃ

قال عثمان، لو ان بيدى مفاتيح الجنه لاعطيتها بنى امية حتى يدخلوا من عند اخرهم-

www.pathagar.com

খেলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত আমার খেলাফত স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাবারীর ৩য় খণ্ডের ৪৫০ পৃষ্ঠায় তাঁর মন্তব্য উল্লেখ আছে ঃ

فان بيعتى لاتكون خفيا ولا تكون الا عن رضا من المسلمين -

"আমার বাইয়াত গোপনে হতে পারে না। সুতরাং এর জন্যে মুসলমানদের সাধারণ সমর্থন জরুরী।"

তারপর তিনি সকলকে মসজিদে নববীতে একত্রিত হওয়ার পরামর্শ দেন এবং মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের অধিকাংশই তাঁর হাতে খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর পুত্র হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি যা বললেন, তা (খণ্ড ৪ ; পৃষ্ঠা, ১১২) তাবারীতে নিম্নবর্ণিত ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

ما امركم ولا انهاكم - انتم ابصر -

"আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশও দেই না কিংবা নিষেধও করি না। তোমরা নিজেরাই আমার চেয়ে উত্তম ফায়সালা করতে পারো।"

সুতরাং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর যারা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন এবং যারা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে বের হয়েছিলেন তাদের সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে তাঁকে খলীফা হিসাবে বরণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো ইচ্ছা বা হেদায়েতের আদৌ কোনো দখল ছিলো না।

ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার ব্যাপারে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেলাফতে রাশেদার কর্মনীতি এবং সাহাবায়ে কেরামদের এটাই ছিলো সংক্ষিপ্ত কর্মপদ্ধতি। সাংবিধানিক এ প্রমাণিত ধারা ও বিধানের আলোকে মযবুত ও অকাট্য ভাষায় প্রমাণ হয় যে, একমাত্র জনমতের ভিত্তিতেই মুসলমানদের খলীফা নির্বাচিত হবেন। কারো জোরপূর্বক খলীফা হওয়ার চেষ্টা করা আর নিজের কোনো স্বজনের পক্ষে গদ্দিনশীন হওয়ার ফায়সালা করে নিজের জীবদ্দশায় তার স্বপক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করা আদৌ কোনো উত্তম ও পসন্দনীয় কাজ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আলেমগণের ইজমা তথা ঐকমত্যের

www.pathagar.com

মর্ম কেবল এটুকুই যে, শক্তি বলে অবৈধ উপায়ে কোনো লোক বা দল ক্ষমতায় এসে গেলে আর পরিবর্তন করাতে ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দেয়, এমতাবস্থায় নিরুপায় হালতে তাকে মেনে নেয়া যেতে পারে এবং মেনে নেয়া আপাতঃ কর্তব্য। উপরন্তু এভাবেও খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু একথায় আদৌ ঐকমত্য হয়নি যে, এটি ইসলামের এক বৈধ ও স্বীকৃত পদ্ধতি। খেলাফত চাই পরামর্শ (শূরা) ভিত্তিক, চাই নির্বাচনে হোক অথবা অন্য পদ্ধতিতে হোক বস্তুত উভয় ইসলামের দৃষ্টিতে সমান ও অভিন্ন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে।

নিয়তের বিশুদ্ধতা

এ নীতিগত ও ভূমিকা স্বরূপ আলোচনার পর এবার আমি মাওলানা ওসমানী সাহেব মরহুম মাওলানা মওদূদীর যে উক্তি সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেছেন, তার উল্লেখ করতে চাই। খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় বাক্যটি মাওলানা মওদূদীর ভাষায় ঃ

"ইয়াযীদের নামে বাইয়াত গ্রহণের প্রথম পর্ব সঠিক প্রেরণা ও বৈধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। বরং একজন বুযুর্গ (হযরত মুগীরা বিন শোবা) স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অপর বুযুর্গের (হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর) ব্যক্তি স্বার্থের কাছে আবেদন করে এ প্রস্তাবের জন্ম দেন এবং তা উভয় বুযুর্গই একথা এড়িয়ে যান যে, তারা এভাবে উম্মতে মুহাম্মদীকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছেন।"

উপরোক্ত মন্তব্যের উপর মাওলানা তাকী সাহেবের বক্তব্য হলো, জমহুর উম্মতের অভিজ্ঞ আলেমগণ সর্বদা একথা বলে আসছেন যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কাজ নৈতিক চিন্তা ও বাস্তব আমল পর্যায়ে মূলতঃ সঠিক প্রমাণিত হয়নি। কারণ, এর ফলে জাতির সামষ্টিক কল্যাণ ব্যহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু তাই বলে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিয়তের উপর আক্রমণ করা এবং তাঁর উপর ব্যক্তি স্বার্থের অভিযোগ করার কারো অধিকার স্বীকৃত হতে পারে না। বস্তুত এ ব্যাপারে তিনি সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এবং যাকিছু করেছেন তা শরীয়াতের গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই করেছেন। এর জবাবে আমার প্রথম আরজ, মাওলানা ওসমানী সাহেব মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেবের ভূমিকার প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে তাঁর সাবলীল শব্দ ও মোলায়েম বর্ণনা রীতিকে অনর্থক কঠোর ও বিরূপ বাক্যে রূপান্তরিত করে দেন। কোনো কাজ সঠিক আবেগের ভিত্তিতে না হওয়া এবং তার কর্তার উদ্দেশ্য সৎ না হওয়া কিংবা তার উদ্দেশ্য সন্দেহ মুক্ত

www.pathagar.com

হওয়া এ উভয় অবস্থা সমান নহে। এমনিভাবে কারো ব্যক্তি স্বার্থের কাছে আবেদন করা এবং কারো স্বার্থপর হওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কথাটা ঠিক এরূপ যে, আমি যেমন বললাম—কোনো কোনো সাহাবী দ্বারা চুরি, মদ্য পান, কিংবা ব্যভিচার সংঘটিত হয়েছে আর ওসমানী সাহেব আমার কথাটি ব্যক্ত করলেন এভাবে—সাহাবীগণ চোর, মদ্যপ ও ব্যভিচারী ছিলেন। কিংবা তিনি বললেন, মুসলমানগণ শিরক ও বিদআত করে চলছে আর আমি তার কথাটিকে রূপ দিলাম এভাবে-মুসলমান সাধারণভাবে মুশরিক ও বিদআতী হয়ে গেছে। এভাবে এক কথায় অন্য কথার রূপান্তরিত হয়ে ভিন্নরূপ ধারণ করে থাকে।

এতদসত্ত্বেও যদি আবেগ ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং কোনো কাজ আন্তরিকতার ভিত্তিতে না হওয়ার তাৎপর্য সঠিক নিয়তের অভাবই মেনে নেয়া হয়, তাহলেও প্রসঙ্গত মৌলিক যে প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলো, মানুষের নিয়ত প্রতিটি সহীহ্ হওয়া না হওয়া তার প্রতিটি মানবীয় কর্মের অন্তরালে সৃষ্টি হয় নাকি বিশেষ কোনো কাজ এমনও রয়েছে, যার মধ্যে নিয়তের শুদ্ধ কি অশুদ্ধ অনিবার্য আকার মেনে নিতে হবে ? উপরন্তু সেসব কর্মের ভিতর দিয়েই সহীহ্ নিয়ত অথবা অখাঁটি নিয়তের উপর আমার সাধ্যমত চিন্তা এবং নানা রকম প্রতিফলন প্রকাশিত হয় ? এ প্রশ্নের সমাধানে আমি সাধ্যমত চিন্তা-গবেষণা করেছি। انما الاعمال بالنيات اور لكل امرء مانوى এসব হাদীসের উপর হাদীসবেত্তাগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেগুলোও চর্চা করেছি। এ ব্যাপারে আমি যা বুঝেছি তাহলো, নিয়ত থাকা না থাকা কিংবা নিয়ত সরল-দুর্বল হওয়ার প্রশ্ন কেবলমাত্র ইবাদাত ও নৈকট্যলাভের সাথে সম্পর্কিত কাজসমূহের কিংবা অন্ততঃ শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে। যেমন, যদি কেউ সালাত আদায় করে অথবা যাকাত দেয় কিংবা হজ্জ করে অথবা আল্লাহর রাহে জান ও মাল কুরবানী করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে নিয়ত থাকা না থাকা কিংবা নিয়ত সবল-দুর্বল ও ভুল-নির্ভুল হওয়া মৌলিক অর্থে গুরুত্ব রাখে। আর এটা সর্বদিক থেকেই যুক্তিগ্রাহ্য। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে নিয়তের ভালো মন্দ হওয়া আকাশ-পাতাল ব্যবধান। দু'টি কাজ আপাতঃ দৃষ্টিতে সমান। অথচ এর একটির অপরটির পরিণতি জান্নাত ; অপরটি সম্পূর্ণরূপে বৃথা হতে পারে ; বরং উল্টো জবাবদিহিমূলক ও পাকড়াওযোগ্য হতে পারে। এ কারণেই এ ধরনের কাজ যারা করেন তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখার শিক্ষা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে এবং অনুমান ভিত্তিক আলোচনা করা থেকে বারণ করা হয়েছে ; যদিও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে নিয়ত বিষয়টিকে আলোচ্যসূচীতে আনার ব্যাপারে কোনো কঠোর নিষেধাজ্ঞাও বর্ণিত নেই।

www.pathagar.com

যেসব কাজ ইবাদাতের আওতায় আসে না এবং যেগুলো শরীয়াত সম্মত হওয়া কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং শরীয়াতের আলোকে ভুল কিংবা অপসন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলোতে নিয়ত কিংবা আবেগ সহীহ্ হওয়া না হওয়ায় কোনো পার্থক্য নেই। তদুপরি যখন এ ধরনের কাজ আলোচ্যসূচীতে আসে তখন অবশ্যম্ভাবী রূপে নিয়ত বা আবেগের কথাও আলোচনায় এসে যায় যার আওতায় সেসব কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের বিতর্কিত কাজ যখন আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে স্থান পায়, তখন সেসব কাজের ভালো-মন্দের উপর আলোচনা করার সময় সে আবেগ-অনুভূতি কোনো এক পর্যায়ে বর্ণনায় অবশ্যই এসে যায় যা কাজটি কার্যকর করে থাকে এবং বাস্তবতার দিক থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের কাজে যদি আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কথা উল্লেখ হয়ে যায়, তাহলে উল্লেখকারীর মুখ একথা বলে বন্ধ করা সঙ্গত হবে না যে, তুমি নিয়তের উপর অবাঞ্ছিতভাবে হামলা করছো এবং এ অধিকার তোমার স্বীকৃত নহে। যদি ভুল কাজকে ভুল আবেগের উপর নির্ভরশীল সাব্যস্ত করার নাম নিয়তের উপর হামলা হয় এবং গুনাহ্ হয় তাহলে তো কোনো ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক কিংবা ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর আলোচনাকারী এমন মুসলমান খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যে, এহেন কাজ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব এ পর্যন্ত যাকিছু লিখে আসছেন সেগুলোর প্রতি চোখ বুলিয়ে নিলে তার ভাষায় নিয়তের উপর হামলা করার অভিযোগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মতো একাধিক নমুনা সেসব লেখায় পাওয়া যাবে। মানুষের কাজ ও যান্ত্রিক কাজের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য হয়ে থাকে। আর এটাও এক বাস্তব সত্য যে, অপসন্দনীয় আচার-আচরণ সাধারণত অন্ধ আবেগেরই ফলশ্রুতি।

নিয়তের উপর হামলা

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো কোনো ভূমিকা ও পদক্ষেপ বংশগত গোঁড়ামী ও স্বজনপ্রীতি থেকে মুক্ত ছিলো না—শাহ্ আবদুল আযীযের (র) এ উক্তি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। হযরত সাদ বিন ওবাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত ইবনে তাইমিয়ার (র) উক্তিও আমি উল্লেখ করেছি। পূর্ববর্তী বুযুর্গদের এমন অনেক কথা পেশ করা যেতে পারে যারা কতিপয় সাহাবীর কর্মকাণ্ডের এমন ভাষায় সমালোচনা করেছেন যা আবেগ তাড়িত বলা ছাড়া উপায় নেই। যেমন, হাফেজ ইবনে আসাকীর (র) হযরত ফুজাইল বিন আয়াজের (র) একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন, যা ইবনে কাসীর (র) বিদায়ার ৮ম খণ্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি হলো ঃ

www.pathagar.com

معاوية من الصحابة، من العلماء الكبار ولكن ابتلى بحب الدنيا ـ

"হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবী এবং বিজ্ঞ আলেমদের অন্যতম ; কিন্তু দুনিয়ার মহব্বতে তিনি জড়িত হয়ে যান।"

এবার ইচ্ছা করলে ওসমানী সাহেব এটাকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর স্বার্থপরতার অভিযোগ এবং নিয়তের উপর অনধিকার আক্রমণ বলতে পারেন। কিন্তু ওসমানী সাহেবের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, হযরত ফুজাইল একদিকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুত্তাকী ও তাপস হিসেবে আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে গণ্য ছিলেন ; অপর দিকে এতোটা নির্ভরযোগ্য ও সত্যানুরাগী ছিলেন যে, বুখারী, মুসলিম, সুনান, মুসনাদে শাফীসহ সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থে তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ বর্ণিত রয়েছে।

মাওলানা ওহীদুজ্জামান হায়দরাবাদী তাইসিরুল বারী (তরজমা ও তাশরীফুল বুখারী) গ্রন্থের কয়েক জায়গায় আমীরে মুয়াবিয়া সম্পর্কে লিখেছেন, আহলে বাইতের প্রতি তার মনোভাব পরিচ্ছন্ন ছিলো না। এমনিভাবে শাহ আবদুল আযীযও (র) লিখেছেন, حرکات اخالی ازشائبه نفسانی نبود [তাঁর (হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর) কার্যকলাপ নফসানী খাহেশের গন্ধমুক্ত ছিলো না।] বাহ্যতঃ বাক্যগুলো খুবই কঠোর ; সম্ভবত ওসমানী সাহেব তাঁকেও নিয়তের উপর আক্রমণকারী বলে আখ্যায়িত করবেন। কিন্তু এসব কথাকে নিয়তের উপর আক্রমণ বলে তাদের ভাষা ও কলম থেকে নিঃসৃত উক্তি অনভিপ্রেত মনে করা এ কারণে জায়েয নেই যে, ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থরাজিতে এমন কতিপয় ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যা বর্তমান অবস্থাকে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করে। উদাহরণ স্বরূপ হযরত আলী ও তাঁর পরিবারস্থ লোকদেরকে গালমন্দ করার প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায়। এ ঘৃণ্য প্রথা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরও জারী থাকে। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় চলে যাওয়ার পর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নর মারওয়ান প্রত্যেকটি খুতবায় তাঁদের উপস্থিতিতে যেভাবে তাদেরকে অভিশপ্ত করতেন তাতে মনকে পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ সত্যও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত থেকে অব্যাহতি ঘোষণা দেয়ার পরও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেননি ; অবশেষে তাঁর শাহাদাতের পরই কেবল সে বৈরীভাবের অবসান ঘটে। আবু হানীফা দিনুরী الاخبار الطوال গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।

www.pathagar.com

وانتهى خبر وفاة الحسن الى معاوية، كتب به اليه عامله على المدينة مروان فارسل الى ابن عباس وكان عنده بالشام فعزه واظهر الشماتة بموته فقال له ابن عباس لاتشتمن بموته فو الله لاتلبث بعده الا قليلا۔

"হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর খবর আমীরে মুয়াবিয়া নিয়োগকৃত মদীনার গভর্নর মারওয়ান তাঁর কাছে পৌঁছে দেন। তিনি শামে আগত হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে এনে সমবেদনা প্রকাশ করলেন, অপরদিকে তাঁর মৃত্যুতে খুশীও হলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন ঃ হাসানের মৃত্যুতে আপনার আনন্দের কিছু নেই। আল্লাহর কসম ! তারপর আপনারও বেশীদিন জীবনের আশা না করাই ভালো।"

সুনানে আবু দাউদের كتاب اللباس، باب فى جلود النمور -এর হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

وقد المقدام بن معد يكرب الى معاوية بن ابى سفيان فقال معاوية للمقدام اعلمت ان الحسن بن على توفى فرجّع المقدام فقال له فلان اتعدّها مصيبة ـ فقال له ولِمَ لاارها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجره فقال هذا امنى وحسين من على ـ فقال الاسدى جمرة اطفاها الله۔

"মিকদাদ বিন মাআদিকারাব হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসলে তিনি বললেন ঃ হাসানের মৃত্যু খবর জান কি ? মিকদাদ একথা শুনে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَجِعُوْنَ পড়লেন। একজন লোক (হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলে উঠলেন ঃ তুমি কি এ মৃত্যুকে একটি মুসিবত মনে করছো ? মিকদাদ জবাবে বললেন ঃ কেন এরূপ মনে করবো না ? অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিজের কোলে বসাতেন এবং বলতেন এ হচ্ছে আমার এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হচ্ছে আলীর। বনী আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি (যিনি হযরত মিকদাদের সাথী ছিলেন) বললেন, (হাসান) একটি জ্বলন্ত অংগার ছিলেন যা আল্লাহ তাআলা নিভিয়ে দিলেন।"

এ রাওয়ায়েতের যেখানে 'অমুক' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে সেখানে মুসনাদে আহমদে মুয়াবিয়া উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন, মাওলানা শামসুল হক আউনুল মাবুদ গ্রন্থে একথাটির ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ

www.pathagar.com

والعجب كل العجب من معاوية فانه ماعرف قدر اهل البيت حتى قال ما قال ـ فان موت مثل الحسن بن على رضى الله عنه فى اعظم المصائب وجزى الله المقدام ورضى عنه فانه ماسكت عن تكلم الحق حتى اظهره وهكذا اشان المومن الكامل المخلص ..... فقال الاسدى طلبا لرضاء معاوية وتقربا اليه ـ انما قال الاسدى ذالك القول الشديد السخيف لان معاوية رضى الله عنه كان يخاف على نفسه من زوال الخلافة ـ

"হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর একথা অতিশয় বিস্ময়কর। তিনি আহলে বাইতের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেননি বলেই এ জাতীয় উক্তি করা তাঁর দ্বারা সম্ভব হলো। হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু অবশ্যই মস্তবড় বিপদ ছিলো। আল্লাহ মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মঙ্গলদান করুন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। কেননা, তিনি সত্য কথা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি বরং প্রকাশ্যে তা বলে দিয়েছেন। কামেল, মুমিন ও নিষ্ঠাবান লোকের এটাই পরিচয়। বনী আসাদের লোকটি যাকিছু বলেছে তা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুশী ও তাঁর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই বলেছেন। সে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে এরূপ নিকৃষ্ট ও নীচ কথা এ কারণে বলেছে যে, ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্তমানে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার শংকায় শংকিত ছিলেন।"

সুনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যা বজলুল মাজহুদ গ্রন্থে মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় একথাই লিখেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

فقال الاسدى طلبا الرضاء معاوية وتقربا اليه فقال المقدام حين سمع ما قال فى ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمراعاة معاوية اما انا فلا ابرح اليوم حتى اغيظك واسمعك فيه ما تكره كما اسمعتنى ما اكره ـ

"আসাদী হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তুষ্টি লাভ ও তাকে খুশী করার জন্যে একথা বলেছিলেন। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতির শানে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুশী করার জন্যে কটূক্তি করার কথা শুনলেন তখন তিনি আমীরে মুয়াবিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাকে রাগান্বিত না করে আজ আমি এ স্থান থেকে প্রস্থান করবো না এবং আপনি আমাকে

www.pathagar.com

যেভাবে আমার অপসন্দনীয় কথা শুনিয়েছেন, আমিও আপনাকে অনরূপ নাপসন্দের কথা শুনাবো।"

উক্ত হাদীসের অপর অংশে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হলফসহ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূল পুরুষদেরকে রেশমী কাপড় ও সোনা ব্যবহার করতে কি নিষেধ করেননি ? আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার পরিবারের লোক এসব নিষিদ্ধ জিনিস ব্যবহার করে থাকে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আউনুল মাবুদ গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

فان ابناءك ومن تقدر عليه لايحترزون عن استعمالها وانت لاتنكر عليهم وتطعن فى الحسن -

"আপনার ছেলে ইয়াযীদ ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষ লোকেরা এসব জিনিস ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে না, আপনিও তাদেরকে নিষেধ করা থেকে নির্লিপ্ত। অথচ হাসানের প্রতি অশোভন উক্তি ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের বেলায় আপনি সোচ্চার।"

ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থের এসব রাওয়ায়েত এবং এগুলোর ব্যাখ্যায় যেসব কথাবার্তা বলা হয়েছে আল বালাগ সম্পাদকের মতে সম্ভবত এগুলোর সবই নিয়তের উপর হামলার সমার্থবোধক। তবে সত্য ঘটনা হলো, এগুলোকে নিয়তের উপর হামলা নাম দিয়ে শরীয়াতের ছত্রছায়ায় নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়। প্রকৃতপক্ষে এতে নিয়ত নয় বরং একটি অযৌক্তিক ও অসঙ্গত কর্মপন্থার অবতারণা করা হয়েছে। স্মর্তব্য যে, কাজটি যখন পসন্দসই ছিলো না তখন যে নিয়ত বা যে আবেগের কাজটি নির্ভরশীল হবে সে আবেগ যদি প্রাসংগিকভাবে আলোচনায় এসে যায় এবং সেটাকে যদি ভুল কিংবা অপসন্দনীয় বলা হয় তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে ? কোনো ভুল কিংবা আপত্তিজনক কথা বা কাজের ভুলের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার অন্তর্নিহিত কার্যকরী ইচ্ছা বা আবেগের প্রতি সাধারণভাবে ইশারা-ইংগীত করার উপর যদি নিষিদ্ধ মনে করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, ভুলকে ভুল বলাটাও অন্যায়। বস্তুত ভুলকে ভুল হিসাবে যখনই চিহ্নিত করা হবে, কোনো এক পর্যায়ে তার নেপথ্য প্রেরণাদায়ী শক্তির আলোচনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেই যাবে। এ থেকে বাঁচার কোনো উপায় চিন্তাই করা যায় না।

এতদসত্ত্বেও আমি মনে করি, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের যেসব কথা

www.pathagar.com

ও কাজের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের আলোকে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন তা অত্যন্ত শালীন ও ভদ্রভাষায় করেছেন। তাঁদের নিয়তের উপর সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে তাঁদেরকে স্বার্থবাদী ও বদনিয়ত ইত্যাদি বেদবীমূলক শব্দ প্রয়োগ থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এটা কেবল মুহাম্মদ তাকী সাহেবেরই কৃতিত্বপূর্ণ ও সফল কারচুপি বলতে হয়—সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার মহান (!) লক্ষ্যে নিজের পক্ষ থেকে বানোয়াট শব্দ উৎপাদন করতঃ মাওলানা মওদূদীর সাথে সম্পৃক্ত করার কাজ তিনি উত্তমরূপে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ খেলাফত ও রাজতন্ত্র বইয়ের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত মাওলানা মওদূদী (র)-এর বক্তব্য তুলে ধরা হলো ঃ

"ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে যারা তৎকালীন খলীফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলো তাদের একাজ শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ ছিলো না, অনুরূপ কৌশলগত দিক থেকেও ভ্রান্তিপূর্ণ। একথা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, তাঁরা নিজেদেরকে সত্য পক্ষাবলম্বনকারী ও হক মনে করে এবং সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এ ভুলটি করেছিলেন। তবে আমি এটাকে নিছক ভুল মনে করি ; এটাকে ইজতিহাদী ভুল হিসেবে স্বীকার করতে আমার যথেষ্ট দ্বিধা আছে।"

কুধারণায় আক্রান্ত নহেন এমন যে কোনো ন্যায়পরায়ণ, উদার, মুক্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত লোক একথা বলতে পারবে না যে, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির এ বক্তব্য শরীয়াত বা শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করেছে। এ ধরনের উক্তি বলে তিনি কোনো সাহাবীর বদ নিয়ত প্রমাণ করতে চান কিংবা তাদের ন্যায়পরায়ণতায় আঘাত হানার ইচ্ছা পোষণ করেন। আহলে সুন্নাত আলেমগণের আকীদা কি এই যে, সাহাবীগণ ভুল থেকে মুক্ত ও পূত-পবিত্র তাদের দ্বারা কোনো ভুল হওয়া আদৌ সম্ভব নয় এবং তাদের প্রত্যেক কথা ও কাজের উপর ইজতিহাদের অর্থ প্রয়োগ হতে পারে ?

আলোচনার সারমর্ম

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে একথা স্পষ্ট পরিষ্কার যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্য থেকে কেউই নিজের কোনো প্রিয়জন কিংবা আত্মীয়ের স্বপক্ষে বাইয়াত গ্রহণের দৃষ্টান্ত উম্মতের সামনে পেশ করেননি। একথাও পরিষ্কার হলো যে, ইবাদাত, নৈকট্যশীল কাজ, কিংবা শরীয়াতসম্মত উপায়ে সম্পন্ন কার্যাবালীতে নিয়ত থাকা না থাকা এবং নিয়ত সঠিক হওয়া না হওয়ার প্রসংগটি মৌলিকভাবে গুরুত্বের দাবী রাখে। কিন্তু যেসব কাজ ইবাদাতের পর্যায়ে নয় এবং যেগুলো শরীয়াত ও

www.pathagar.com

সুন্নাত সম্মত হওয়া প্রমাণিত নয় সেগুলোতে নিয়ত সঠিক কিংবা ভুল হওয়ায় তেমন কোনো বিশেষ পার্থক্য সূচিত হয় না। এ ধরনের কাজে সঠিক প্রেরণা ও বিশুদ্ধ নিয়ত চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করুক চাই না করুক, ব্যক্তি স্বার্থের অনুকূলে হোক, চাই জাতীয় স্বার্থের পক্ষে সেগুলোর সাথে মতপার্থক্য থাকা কিংবা সেগুলোকে ভুল সাব্যস্ত করার অধিকার কোনোক্রমেই খর্ব করা যায় না। এ ধরনের কাজের উপর উম্মত বরেণ্য আলেমগণ ও নেক্কার লোকগণ সর্বদা পর্যালোচনাধর্মী মন্তব্য করে আসছেন এবং আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে তাদের আবেগ প্রেরণাও যুগ যুগ ধরে আলোচিত হয়ে আসছে। এগুলোকে নিয়তের উপর হামলা কিংবা কুধারণা নামে আখ্যায়িত করে নিষিদ্ধ কিংবা নিন্দনীয় সাব্যস্ত করা সঙ্গত হতে পারে না। নিয়তের উপর আক্রমণ বলা তখনই কেবল যথার্থ হতে পারে যখন কোনো ইবাদাত ও সৎকর্মকেও অকারণে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে চিহ্নিত করা হয়। অন্যথায় ভুল কাজ ভুলই—যদিও সেটা ভালো নিয়ত ও সৎ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

ইয়াযীদের বাইয়াতের ব্যাপারে ওসমানী সাহেবের পরিবর্তিত ভূমিকা

এবার আল বালাগের সম্পাদক সাহেব ইয়াযীদের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন ঃ এর সাথে যতটুকু সম্পর্ক তাতে ইয়াযীদের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ বিষয়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সক্রিয় ভূমিকা-অভিমত বাস্তবের প্রেক্ষাপট ও পরিণতির দিক থেকে সঠিক ছিলো কিংবা ভুল সেটা নিয়ে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেবের সাথে আমাদের মতপার্থক্য নেই। উম্মতের হকপন্থী ও বিজ্ঞ আলেম সমাজ সবসময় বলে আসছেন, বাস্তবের প্রেক্ষাপট, চাহিদা ও বিশুদ্ধ রায়ের ক্ষেত্রে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ পদক্ষেপ সঠিক ও অর্থবহ প্রমাণিত হয়নি। যে কারণে উম্মতের সামগ্রিক কল্যাণ ব্যাহত হয়। বস্তুত এতোটুকু কথা তো তার মতেও স্বীকৃত যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজ রায়, কৌশলগত ও পরিণতির দিক থেকে সঠিক ছিলো না। আর উম্মতের ব্যাপক কল্যাণের পরিপন্থী ছিলো।

অতপর তিনি বলছেন, "আমাদের সাথে মাওলানার মতপার্থক্য এ বিষয়ে যে, মাওলানা এ পদক্ষেপকে রায় ও কৌশলগত দিক থেকে ভুল সাব্যস্ত করেই ক্ষান্ত হননি বরং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিয়তের উপর সরাসরি অপবাদ দিয়ে একথার উপর জোর দেন যে, এর অন্তরালে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করাই ছিলো তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এতে করে এর অন্তরালে গোটা জাতিকে তিনি বিলীন করে দেন।" সম্মানিত সম্পাদক সাহেবের দ্বিতীয় অভিযোগের

www.pathagar.com

জবাব আমি ইতিপূর্বেকার আলোচনায় প্রদান করেছি। ২য় বার এতোটুকু নিবেদন করা যথেষ্ট মনে করি যে, মাওলানা যদিও নিয়তের উপর দোষারোপ করেননি তথাপি একথা যখন স্বীকৃত সত্য যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজ রায়, কৌশল ও পরিণতি এ তিন দিক থেকেই ছিলো ভুল এবং সামগ্রিক কল্যাণের পক্ষে অনিষ্টকররূপে প্রমাণিত, তখন আবেগ ও নিয়ত সঠিক হওয়া না হওয়া কিংবা স্বার্থপরতার উপর নির্ভরশীল হওয়া না হওয়ার মধ্যে কার্যত কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না। অধিকন্তু মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে কথা বলেছিলেন প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো ঃ তিনি একথা উপেক্ষা করে যান যে, এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীকে কোন্ পথে যে ঠেলে দিচ্ছেন। একথার অর্থও এটা নয় যে, ব্যক্তি স্বার্থের পদতলে জেনে শুনেই তিনি জাতীয় স্বার্থ বিলীন করে দেন। বরঞ্চ উদ্দেশ্য শুধু এই যে, এ জাতীয় পদক্ষেপের পরিণামে গোটা জাতি খেলাফতের স্থলে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র এবং বংশগত বাদশাহীর শিকার হয় এবং একথা আজ চরম সত্য যার অস্বীকৃতি কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আপনি নিজে বিজ্ঞ ও শীর্ষ পর্যায়ের আলেমদের উক্তি কি বর্ণনা করেননি যে, তাঁর এ পদক্ষেপ সঠিক তো ছিলোই না বরং অনিষ্টকর প্রমাণিত হয়েছে ?

এরপর ওসমানী সাহেব বলছেন, "আমাদের পরবর্তী আলোচনার সারমর্ম এটা নয় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ পদক্ষেপ বাস্তবতার দিক থেকে একশ ভাগ ঠিক এবং মূলত সম্পূর্ণ সঠিক ছিলো। কিংবা তিনি যাকিছু করেছেন তার সবই ছিলো অভ্রান্ত।" একথায় বাহ্যত মনে হয়, মাওলানা ওসমানী সাহেব তাঁর পূর্ব ভূমিকার সংশোধন করে বর্তমানে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহী যে, এ পদক্ষেপের ষোলআনা নহে কিছু অংশ ঠিক এবং সম্পূর্ণ সঠিক হওয়ার পরিবর্তে কোনো এক পর্যায় পর্যন্ত ভ্রান্ত ছিলো। অথচ প্রথমে এ কাজকে তিনি বিনা ব্যতিক্রমে ও সামগ্রিক অর্থে অন্যায় সাব্যস্ত করেছেন, এমনকি এটা যে, জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং সামগ্রিক কল্যাণ বিরোধী কাজ ছিলো, সে ব্যাপারে আলেমদের সর্বসম্মত ঐকমত্য বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য কথায় তাঁর মতেও পদক্ষেপটি মৌলিক অর্থেই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিলো।

পরবর্তী আলোচনায় তিনি শতকরা হিসাব থেকেও ধীরে ধীরে সটকে পড়েন। অবশেষে তিনি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি বিশ্বস্ততার সাথে ইয়াযিদকে খেলাফতের যোগ্য মনে করে থাকেন তাহলে তাকে মনোনয়ন দান করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ জায়েয ছিলো। তিনি আরো লিখেছেন, ইয়াযীদের যে ঘৃণিত চিত্র মন-মানসে বিরাজিত তার মূল কারণ হলো কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা। কিন্তু যে সময়ে তাকে মনোনয়ন

www.pathagar.com

দেয়া হয় তখন আজকের মতো মিথ্যাচার মহলেও তার এ পরিচিতি ছিলো না। তখন তো সে ছিলো একজন সাহাবী এবং ক্ষমতাসীন খলীফা তনয়। তার বাহ্যিক অবস্থা, সওম ও সালাতের পাবন্দী, বংশগত পবিত্রতা এবং তার সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে এমত কায়েম করার যথেষ্ট সুযোগ ছিলো যে, সে খেলাফতের যোগ্যতর পাত্র ছিলো।

মনোনয়ন প্রদান জায়েয ও নাজায়েয হওয়া

ইয়াযিদের ফযীলত ও মর্যাদা স্ববিস্তারে বর্ণনা করার পর আল বালাগ সম্পাদক সাহেব মনোনয়ন দান প্রসংগটির শরীয়াত সম্মত মর্য্যাদার উপরও আলোচনা করেছেন। উক্ত আলোচনার কতিপয় জরুরী অংশের গুরুত্ব বিবেচনা করতঃ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি, সেই সাথে আমার নিবেদনও পেশ করছি। মাওলানা ওসমানী সাহেব বলছেন, একথার উপর উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন খলীফা যদি কারো মধ্যে খেলাফতের শর্তাবলী বর্তমান লক্ষ্য করেন, তাহলে তাকে মনোনয়ন প্রদান করা তার জন্যে জায়েয যদিও সে তার পিতা, ছেলে কিংবা নিকটাত্মীয় হয়ে থাকুক। বিস্তারিত জানার জন্যে ازالة الخفاء খণ্ড–১ম, পৃষ্ঠা–৫ দেখুন।

শাহ ওলীউল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি

ওসমানী সাহেবের এ উদ্ধৃতির পর ازالة الخفاء থেকে আমি শাহ ওলীউল্লাহ্ সাহেবের এ সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করছি। শাহ সাহেব প্রথমতঃ খেলাফতের জন্যে জরুরী ১০টি শর্তের কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন খলীফার মুসলমান, জ্ঞানী ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ইত্যাদি। তন্মধ্যে ৮ম শর্ত হলো আদালত তথা ন্যায়পরায়ণ গুণের অধিকারী হওয়া। তিনি عدالت -এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ

مجتنب از کبائر، غیر مصر بر صغائر و صاحب مروت باشد، نہ ہرزہ گرد و

خلیع العذار-

"কবীরাহ গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা, সগীরা গুনাহ বারবার না করা, শালীনতা মণ্ডিত হওয়া আর বখাটে প্রকৃতি ও চঞ্চলমতি না হওয়া।"

অতপর তিনি লিখেছেন, এসব শর্ত কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হলে তাকে খেলাফতের যোগ্য মনে করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় জনগণ যদি তাকে খলীফা বানিয়ে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাহলে তিনি খলীফায়ে রাশেদ হবেন। তিনি আরো লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

وغیر مستجمع ایں شروط را اگر خلیفہ سازند، ساعیانِ خلافت او عاصی گردند لیکن اگر تسلط یابد حکم او فیما یوافق الشرع نافذ باشد برائے ضرورت کہ برداشتن او از مسندِ خلافت اختلاف امت پیدا کند و ہرج مرج پدید آرد۔

"কিন্তু যদি জনগণ এমন লোককে খলীফা নির্বাচিত করে যার মধ্যে এসব শর্ত অনুপস্থিত, তাহলে তার খেলাফতের পদ লাভে সাহায্যকারীগণ গুনাহগার রূপে চিহ্নিত হবে। তবে যদি সে ক্ষমতায় এসে যায় তাহলে জরুরী ভিত্তিতে তার শরীয়াতসম্মত নির্দেশ কার্যকর হবে। কেননা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা বিশৃংখলা, অনৈক্য ও বিপর্যয়ের কারণ হওয়া বিচিত্র নহে।"

এরপর শাহ সাহেব খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৪টি পদ্ধতির কথা বলেছেন। ১ম পদ্ধতি, তাঁর মতে রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দ্বারা নির্বাচন। অর্থাৎ রাজ্যের আলেম, বিচারপতি এবং প্রখ্যাত লোকদের বাইয়াত গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া বাইয়াত নিলো এবং যে গ্রহণ করলো তার বাইয়াত মূলতঃ অর্থহীন উভয়েই মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধী। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত ১ম পদ্ধতি অনুযায়ী হয়। ২য় পদ্ধতি হলো, খলীফা খেলাফতের শর্তাবলী সম্পন্ন কাউকে মুসলমানদের কল্যাণ সামনে রেখে মনোনয়ন দানের প্রস্তাব উত্থাপন করতঃ জনগণকে একত্রিত করে তাদের সামনে প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম ঘোষণা করে দিবেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত এ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। ৩য় পদ্ধতিতে, পরামর্শ পরিষদ গঠিত হওয়া। এ পরিষদের ধরন হলো, খলীফা এমন একটি বোর্ডের উপর খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করবেন, যে পরিষদের সব সদস্যদের মধ্যেই খেলাফতের শর্তাবলী পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান। খলীফার মৃত্যুর পর সে পরিষদ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কোনো একজনকে খলীফারূপে মনোনীত করবেন। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ পদ্ধতিতে খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পর পরিষদের বৈঠক বসে এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩য় খলীফার নাম ঘোষণা করা হয়।

খুলাফায়ে রাশেদীনদের আমলে গৃহীত তিনটি পদ্ধতির কথা বর্ণনা করার পর শাহ সাহেব চতুর্থ পদ্ধতি ইস্তেলা (জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করা) এর কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষায় ঃ

www.pathagar.com

چوں خلیفہ بمیرد، شخصے متصدی خلافت گردد بغیر بیعت واستخلاف ہمہ را بر خود جمع سازد باستیلاف قلوب یا بقہر ونصب قتال خلیفہ شود ولازم گردد بر مردمان اتباع فرمانِ او در آنچہ موافق شرع باشد۔ وایں دو نوع ست، یکے آنکہ مستولی مستجمع شروط باشد وصرف منازعین کند بصلح وتدبیر از غیر ارتکاب محرمے وایں قسم جائز است ۔ ورخصت در انعقادِ خلافتِ معاویہ ابن ابی سفیان بعد حضرت مرتضیٰ وبعد صلح امام حسن ہمیں نوع بود۔ دیگر آنکہ مستجمع شروط نباشد وصرف منازعین کند بقتال وارتکاب محرم دآں جائز نیست وفاعل آں عاصی است لیکن واجب است قبول احکام او چوں موافق شرع باشد ...... وایں انعقاد بنا بر ضرورت است۔

"ক্ষমতাসীন খলীফার মৃত্যুর পর যখন কোনো লোক খেলাফতের মসনদ দখল করে নেয় এবং বাইয়াত ও প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়া জনগণকে স্বেচ্ছায় কিংবা তলোয়ারের জোরে নিজের পক্ষাবলম্বী বানিয়ে নেয়, তখন সে খলীফার স্বীকৃতি পাবে। এমতাবস্থায় তার শরীয়াতসম্মত হুকুম আহকাম পালন করা জনগণের জন্যে অপরিহার্য বিবেচিত হবে। জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের এ পদ্ধতি আবার দু' রকম। প্রথম প্রকার হলো, বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীর মধ্যে খেলাফতের সব শর্ত বর্তমান থাকা এবং সন্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করে খেলাফতের অপরাপর দাবীদারকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া। এ অবস্থাও জরুরী ভিত্তিতে জায়েয। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু এবং হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্ধির পর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত এ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ২য় প্রকার হলো, ক্ষমতাসীন ব্যক্তির মধ্যে খেলাফতের শর্তাবলী বর্তমান না থাকা এবং হত্যা ও হারাম পন্থায় প্রতিপক্ষকে দমন করা। এ পদ্ধতি নাজায়েয এবং এর ফলে ক্ষমতাধর ব্যক্তি গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। তবে শরীয়াতসম্মত তার বিধি-নিষেধ পালন করাও ওয়াযিব। এ পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন খেলাফত জরুরী ভিত্তিতে জায়েয।"

শাহ্ সাহেবের শেষ বর্ণিত ক্ষমতা দখলের দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে তিনি পরে বলেন, আবদুল মালেক বিন মারওয়ান এবং বনী আব্বাসী প্রথম খলীফাগণ

www.pathagar.com

এ পদ্ধতিতে মনোনীত হন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত লাভ সম্পর্কে শাহ্ সাহেব দু' ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ আলেমদের মতে মুহাজির ও মদীনার আনসারগণ বাইয়াত গ্রহণ করার পরই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইয়াতের ব্যাপারে সিরিয়াবাসীদের প্রতি যে সমস্ত চিঠি লিখেন সেগুলো এর বৈধতার প্রমাণ। দ্বিতীয় মত হলো, শূরার মাধ্যমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত তখনই অনুষ্ঠিত হয়ে যায় যখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর নাম প্রস্তাবাকারে আসে। তবে এ উক্তিটি দুর্বল।

এখন শাহ্ সাহেবের এ আলোচনায় যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তাহলো, তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল মালেক, বনী আব্বাস প্রমুখ সকলের খেলাফত চার পদ্ধতির আওতায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করলেন কিন্তু ইয়াযীদের খেলাফত কিংবা শাসন ক্ষমতা লাভের কথা উল্লেখ করতেই তিনি পাশ কাটিয়ে যান। এর এক অর্থ এটাও নেয়া যায় যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মৃত্যু কিংবা অসুস্থ হওয়ার বহু পূর্বে যেভাবে আপন পুত্রকে মনোনয়ন দান করেন এবং তজ্জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন তাতে এ কার্যক্রম সম্পূর্ণ নাজায়েয ছিলো এবং ইয়াযীদের খেলাফত বৈধ হওয়ার কোনো সঠিক ও জায়েয ভিত্তি ছিলো না। এ কারণেই হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খেলাফতের বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করেন এবং হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সচেতন, পরহেযগার ও আপোষকামী বুযুর্গও এই বলে অস্বীকার করে দিলেন যে, একই সময় দু'টি বাইয়াতের শৃংখল ঘাড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে না। বরং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর মদীনার গভর্নর ওলীদ বাইয়াত হওয়ার জন্যে তাকে বারবার চাপ দিতে থাকলে তিনি বললেন, অন্যান্য সকলেই বাইয়াত গ্রহণ করলে আমিও করে নেব। এতদসত্ত্বেও যদি আল বালাগ সম্পাদক কিংবা তার অপর কোনো সমমনা লোক একথা বলেন যে, শাসন ক্ষমতালাভের জন্যে সাধারণ বাইয়াত গ্রহণ করে জনগণকে সেটা মানতে বাধ্য করা সঠিক এবং এটা খেলাফত বৈধ হওয়ার পক্ষে একটি ভিত্তি ও দলীল হতে পারে, তাহলেও ইয়াযীদের ক্ষমতালাভের কার্যক্রম শাহ সাহেবের বর্ণিত পদ্ধতি অর্থাৎ জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের আওতায় আসতে পারে। কারণ, স্বয়ং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে শাহ সাহেব ৪র্থ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন যা কেবলমাত্র জরুরী ভিত্তিতেই জায়েয। অধিকন্তু খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এ শেষ পদ্ধতিকেও তিনি দু' ভাগে বিভক্ত

www.pathagar.com

করেছেন। তন্মধ্যে ২য় প্রকার হলো, যবরদস্তী ক্ষমতালাভকারী শাসকের মধ্যে খেলাফতের সবগুলো শর্ত বর্তমান থাকা এবং প্রতিপক্ষকে হত্যার মাধ্যমে নির্মূল করে দেয়া। এ পদ্ধতি শাহ্ সাহেবের মতে নাজায়েয এবং এর অধিকর্তা ও প্রবর্তক পাপাচারী বলে চিহ্নিত। এবার বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ নিজেরাই ফায়সালা করতে পারেন যে, ইয়াযীদের ক্ষমতালাভের অনুসৃত নীতি শাহ্ সাহেবের এ আলোচনা কতটুকু সমর্থন করে এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সেটাকে কতটুকু জায়েয ও সঠিক পদ্ধতি সাব্যস্ত করে। শাহ্ সাহেবের উদ্দেশ্য কি এরূপ হতে পারে যে, খোলাফায়ে রাশেদীন যে পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন এবং বনি আব্বাস ও বনি উমাইয়ার খলীফাগণ যেভাবে খেলাফতের মসনদে আরোহণ করেছেন সে সকল নীতি ও পদ্ধতি একই মানের এবং অভিন্ন ধরনের পসন্দনীয় ছিলো ? আমি বুঝতে পারছি না যে, মাওলানা ওসমানী সাহেব 'এযালাতুল খেফা' এর এক জায়গায় উদ্ধৃতি কোন্ সাদৃশ্যের কারণে দিয়েছেন।

ইমাম মাওয়ার্দীর দৃষ্টিভঙ্গি

মাওয়ার্দী প্রণীত الاحكام السلطانه -এর ৮ম পৃষ্ঠা হলো মাওলানা ওসমানী সাহেবের ২য় উদ্ধৃতি। ইমাম মাওয়ার্দী শুরুতে নিসন্দেহে একথা প্রকাশ করেছেন যে, কাউকে মনোনয়নদান করা খলীফার জন্যে জায়েয ; যেমন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মনোনয়ন দান করেন ; আর মুসলমানগণ তা মেনে নেয়। কিন্তু তাঁর এ অভিমত ছিলো তাঁর বিষয়বস্তুর নিছক ভূমিকা স্বরূপ। এ বিষয় সম্পর্কে তাঁর পরবর্তী বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

فاذا اراد الامام ان يعهد بها فعليه ان يجهد رأيه في الاحق بها والاقوم بشروطها فاذا اتعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه فان لم يكن ولداً ولا والدا جاز ان ينفر دبعقد البيعة له وبتفويض العهد اليه وان لم يتشر فيه احدا من اهل الاختيار-

"ইমাম মনোনয়ন দান করার ইচ্ছা করলে কে ইমামত বা নেতৃত্বের জন্যে সবচেয়ে বেশী যোগ্য এবং কার মধ্যে খেলাফতের শর্তাবলী পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান তা খুব ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। স্বীয় প্রজ্ঞা ও মেধার সাহায্যে গভীর চিন্তা-সাধনার পর যখন কাউকে মনোনয়ন দান করার দৃঢ় সংকল্প নেন, তখন তাকে যাঁচাই করতে হবে লোকটি কে ? যদি সে ইমাম বা খলীফার ছেলে কিংবা পিতা না হয় তাহলে তিনি একাকী নিজের ইচ্ছা মতো তাকে মনোনয়ন দান করতে তার জন্যে জায়েয যদিও তিনি শূরার সদস্যদের মতামত গ্রহণ না করে থাকেন।"

www.pathagar.com

এখানে লক্ষ্য করার মতো প্রধান কাজ হলো, ইমাম মাওয়ার্দীর মতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্ণয়ের জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন কেবলমাত্র এমন ব্যক্তির সপক্ষে হতে পারে, যে খেলাফতের জন্যে সর্বাধিক উপযুক্ত এবং যার মধ্যে খেলাফতের শর্তাবলী পরিপূর্ণ রূপে বিরাজমান। ওসমানী সাহেবের এ লেখা নিছক ভ্রান্তিকর এবং তা শাহ ওলীউল্লাহ (র) ও ইমাম মাওয়ার্দীর সাথে সম্পৃক্ত করা সম্পূর্ণ ভুল যে, এ বিষয়ে উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ক্ষমতাসীন খলীফা সদুদ্দেশ্যে কারো মধ্যে খেলাফতের শর্তাবলী পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান লক্ষ্য করা অবস্থায় তাকে মনোনয়ন দান করা তার জন্যে বৈধ ও জায়েয ; যদিও সে খলীফার পুত্র কিংবা পিতা হোক না কেন। মনোনয়নের জন্যে কেবলমাত্র খেলাফতের শর্তাবলী বর্তমান থাকাই যথেষ্ট নয়। (ইয়াযীদ যদিও এগুলোরও অধিকারী ছিলো না) বরং মনোনয়নের যোগ্যপাত্র হওয়ার জন্যে ইমাম মাওয়ার্দীর মতেও সে ব্যক্তি খেলাফতের শর্তাবলীতে সর্বাপেক্ষা অধিক গুণাবলী সমৃদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইমাম মাওয়ার্দী শুরুতেই এসব শর্তের (আদালত ইলম, ইজতিহাদ ইত্যাদি) কথা বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু তিনি একথাও বলেছেন, খেলাফত বৈধ ও সিদ্ধ হওয়ার প্রধান পদ্ধতি হলো ইখতিয়ার অর্থাৎ নির্বাচন।

বস্তুত একথার উপর ঐকমত্য হওয়ার দাবী সঠিক নয় যে, ক্ষমতাসীন খলীফা যদি ছেলে কিংবা আত্মীয়ের মধ্যে খেলাফতের শর্তাবলী পেয়ে যান, তাহলে স্বেচ্ছায় মনোনয়ন বলে তাকে খেলাফতের উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত করে দেবেন। ইমাম মাওয়ার্দী নিজে এখানে তিনটি মতের কথা বর্ণনা করেছেন। একটি হলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত খলীফা নির্বাচকদের (ELECTORS) পরামর্শ গ্রহণ না করবেন এবং তারা প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে মনোনয়ন লাভের উপযুক্ত বলে ঘোষণা না দিবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত খলীফা নিজের পক্ষ থেকে মনোনয়ন দানের অধিকারী বিবেচিত হবেন না। কারণ, কাউকে মনোনয়ন দান করা প্রকৃতপক্ষে মনোনয়ন লাভকারীর পক্ষে প্রশংসা করা কিংবা অন্য ভাষায় সাক্ষ্য দেয়ার নামান্তর। আর এটা জাতির জন্যে এক ধরনের হুকুমের (সিদ্ধান্ত) পর্যায়ভুক্ত। পিতা বা পুত্র কিংবা উভয়ের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া কিংবা কোনো ফায়সালা দেয়া শরীয়াত মতে কারো জন্যেই জায়েয নেই। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক মূলতঃ পারস্পরিক আকর্ষণধর্মী বিধায় স্বাভাবিকভাবে ও আপাতঃ দৃষ্টিতে এতে স্বজনপ্রীতি ও অন্যায় পক্ষপাতিত্বের অপবাদ জড়িয়ে যায়—যা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। দ্বিতীয় মত হলো, পিতা-পুত্র একে অপরকে মনোনয়ন দেয়া জায়েয। কেননা আমীরের নির্দেশ জাতির উপর কার্যকর হয়ে থাকে এবং ক্ষমতাসীনের পদমর্যাদা বংশগত মর্যাদার উপর প্রাধান্য লাভের যোগ্য। তবে এ দৃষ্টিভংগির অসারতা ও দুর্বলতা সুস্পষ্ট খলীফা পদে পুত্রের পক্ষে প্রস্তাব দেয়া

www.pathagar.com

মূলতঃ উক্ত পদে নিজেকে প্রার্থী হিসাবে পেশ করারই নামান্তর। উভয় ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও ব্যক্তি স্বার্থের অপবাদের পাত্র রূপে গণ্য হওয়ার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। ইমাম মাওয়ার্দীর মতে তৃতীয় ধারা হলো, খলীফা নিজের ইচ্ছা মতো পিতাকে মনোনয়ন দিতে পারে, কিন্তু ছেলেকে নয়। কারণ, মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ পিতার পরিবর্তে সন্তানের প্রতি বেশী হয়ে থাকে এবং পিতা সাধারণত ছেলের জন্যেই সম্পদ আহরণ করে থাকে।

ইমাম মাওয়ার্দীর সম্পূর্ণ আলোচনা সামনে রাখা হলে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহলো, খেলাফত বৈধ ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান পদ্ধতি হলো নির্বাচন এবং সাধারণ বাইয়াত। রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের জন্যে দু'টি শর্ত জরুরী। ১ম শর্ত, ক্ষমতাসীন খলীফা গোটা জাতির পরিসংখ্যান নিয়ে যার মধ্যে খেলাফতের শর্তাবলীর অনুবর্তন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রাপ্ত হবেন তাকে মনোনয়ন দিবেন। ২য় শর্ত, কেবলমাত্র কতিপয় আলেম নয় বরং সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠের বিবেচনায় নির্ধারিত যে, নির্বাচক মণ্ডলী কিংবা শূরা সদস্যদের পরামর্শ ব্যতিরেকে ছেলেকে মনোনয়ন দান জায়েয নয় এবং তাদের সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করতে হবে যে, খলীফা তনয় গোটা উম্মতের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী ও শর্তাবলীর অনুসরণে সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী এবং খেলাফতের জন্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

কাযী আবু ইয়ালার দৃষ্টিভঙ্গি

ওসমানী সাহেব এরপর কাযী আবু ইয়ালা প্রণীত الاحكام السلطانيه গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। যাতে তিনি বর্ণনা করেছেন—ছেলে কিংবা পিতাকে মনোনয়ন দান করা খলীফার জন্যে জায়েয, তবে শর্ত হলো তার চরিত্রে খেলাফতের গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য গ্রন্থের ৪র্থ পৃষ্ঠায় এসব শর্ত ও গুণাবলীর কথা আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন ঃ অথচ আল বালাগের সম্পাদক সাহেব সেগুলোর উল্লেখ সযত্নে এড়িয়ে যান। তাতে বলা হয়েছে কুরাইশী, ন্যায়বান ইত্যাকার শর্তের সাথে ৪র্থ বৈশিষ্ট্য হলো ঃ افضلهم فى العلم والدين অর্থাৎ ভাবী রাষ্ট্র নায়কের ইলম ও দীনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও দক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই কথা ইমাম মাওয়ার্দীও অন্য ভাষায় বলেছেন। কিন্তু কি কারণে ওসমানী সাহেবের কলম থেকে কথাগুলো দু' দু'বার ছুটে গেলো, সে রহস্য বুঝা গেলো না। যদি তিনি নিয়তের উপর হামালার অর্থ মনে না করেন তাহলে আমি আরজ করবো এটা সম্ভবত এজন্য যে, ইয়াযীদের মতো পুত্রকে সমকালীন যুগে খেলাফতের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলীর পরিপূর্ণ ধারক-বাহক কিংবা ইলম ও দীনের ব্যাপার সর্বোত্তম রূপে স্বীকার

www.pathagar.com

করতে তিনি নিজেও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। ইয়াযীদের মতো ব্যক্তিত্বকে এরূপ সুমহান শীর্ষ আসনে সমাসীন করা অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজই বটে ; মাহমুদ আব্বাসীদের মতো লোকদেরই কেবল এ কাজ মানায় ভালো। তবুও এটা কম কথা নয় যে, ইয়াযীদের মনোনয়ন এবং খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়াকে সম্পূর্ণ সঠিক ও জায়েয প্রমাণ করার লক্ষ্যে ওসমানী সাহেব আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পরন্তু কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার সুবাদে ইয়াযীদের চরিত্রে ও খ্যাতিতে যে কলংকের দাগ অংকিত হয় তা মুছে ফেলার প্রাণান্তকর চেষ্টাও করেছেন। আল্লাহ তাঁকে যথাযথ পুরস্কার দান করুন।

ইবনে খালদুনের ভূমিকা

ইয়াযীদের মনোনয়ন বৈধ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ইযালাতুল খিফা এবং الاحكام السلطنيه গ্রন্থদ্বয় ছাড়া মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেব ইবনে খালদুনের মুকদ্দমা গ্রন্থের ৩৭৬-৩৭৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিও (দারুল কিতাব, বৈরুত) দিয়েছেন। আমি এ বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই বর্ণনা করেছি, আল্লামা ইবনে খালদুন ইমামত ও খেলাফত এবং খেলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিতকরণ এবং বাইয়াত ও মনোনয়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর যাকিছু লিখেছেন, তার একাধিক বিষয় বিতর্কিত পর্যায়ের। এতদসত্ত্বেও মনোনয়নের ব্যাপারে তিনি যাকিছু লিখেছেন, সেগুলো উপরোক্ত মন্তব্যসমূহ থেকে খুব বেশী পার্থক্য নয়। তার কথায় এ দাবী সঠিক প্রমাণিত হয় না যে, খলীফা ইচ্ছা করলে নিজের খুশীমতো খেলাফতের শর্ত পাওয়া সাপেক্ষে নিজ পুত্র কিংবা কোনো আত্মীয়কে মনোনয়ন দান বৈধ হওয়ার ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইবনে খালদুন বলেন ঃ

ولا يتهم الامام فى هذا الامر وان عهد الى ابيه او ابنه لانه مامون على النظر لهم فى حياته فاولى ان لا يحتمل فيها تبعة بعد مما ته خلافا لمن قال باتهامه فى الولد والدالدا ولمن خصص التهمة بالولدون الوالد -

এ কথায় পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, ইবনে খালদুন এক উক্তিতে পিতা-পুত্রের পারস্পরিক মনোনয়ন দানকে আপবাদের অনিবার্য কারণ রূপে স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয় উক্তিতে তিনি পিতা নয় কেবলমাত্র পুত্রকে মনোনয়ন দান করা অপবাদজনক বলেছেন। অবশ্য ইবনে খালদুন এসব কথার সাথে মতপার্থক্য করে নিজের মত বর্ণনা করেন যে, এরূপ কাজের দ্বারা ইমাম অভিযুক্ত হতে পারে না। কেননা ইমাম যদি জীবদ্দশায় তাদের সাথে আজীবন সদ্ব্যহারের দরুন অভিযোগের যোগ্য না হন, তাহলে মৃত্যুর পর হওয়ার কারণ

www.pathagar.com

কি ? এরূপ যুক্তির দুর্বলতা সহজেই আন্দাজ করা যায়। জীবদ্দশায় যদি খলীফা আপনজনদের খাতির করেন, তাই বলে মরণের পরও তাদেরকে একেবারে খেলাফতের মনোনয়ন দিয়ে যাওয়া কোন্ যুক্তি বলে অনিবার্য হতে পারে ? মনোনয়ন দান পদ বিশেষ আর আত্মীয়দেরকে এ পদে সমাসীন করা পার্থিব জীবনেই সেখানে অভিযোগ মুক্ত নয়, সে ক্ষেত্রে পর-জীবনে চলে যাওয়ার পর তা দোষমুক্ত থাকার কি যৌক্তিতা থাকতে পারে ? অথচ খলীফা নিজেই এখন আর খলীফা নহেন। এখানে ইয়াযীদের মনোনয়নের ব্যাপারে ইবনে খালদুন অতিরিক্ত যাকিছু লিখেছেন তা ওসমানী সাহেব পরবর্তীতে নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাহলো ঃ

"হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে অন্য কারো পরিবর্তে স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে মনোনয়ন দান করার আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার কারণ ছিলো জাতির ঐক্য ও কল্যাণ সাধন। বনী উমাইয়ার আমীর-উমারাগণও একথায় একমত হয়ে গিয়েছিলো। কারণ, তারা নিজেদের ছাড়া অপর কারো উপর সম্মত হওয়ার মত পরিবশেই তখন ছিলো না। আর তখন এরাই ছিলো কুরাইশ নেতৃত্বের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। তদুপরি জাতীয় নেতৃবর্গের অধিকাংশ উমাইয়া বংশের সদস্যভুক্ত ছিলো। এ কারণেই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে প্রাধান্য দেন এবং সর্বোত্তমের পরিবর্তে অনুত্তমের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এর অতিরিক্ত অন্য কিছু চিন্তার পথে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ন্যায়পরায়ণতা ও সাহাবীয়ত প্রধান অন্তরায়।"

ইবনে খালদুন প্রায় অনুরূপ ভাষায় ইতিপূর্বে (২৮তম অনুচ্ছেদ) ইয়াযীদের মনোনয়ন দানের প্রসংগের ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে তিনি খেলাফত রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার কথাও আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

وكذالك عهد معاوية الى يزيد خوفا من افتراق الكلمة بما كانت بنوامية لم يرضوا تسليم الامر الى من سواهم فلو قد عهد الى غيره اختلفوا مع ان ظنهم كان به صالحا -

"এভাবে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেন। তৎকালীন পরিবেশে বনু উমাইয়াগণ অন্য কারো শাসন মেনে নিতে সম্মত ছিলো না বিধায় তিনি জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় শংকিত ছিলেন। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক অপর কাউকে মনোনয়ন দেয়া অবস্থায় বনী উমাইয়াগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী ছিলো। যদিও তাঁর সম্পর্কে তাদের ধারণা উত্তমই ছিলো বলা যায়।"

www.pathagar.com

প্রকৃত কথা হলো, রাজতন্ত্র ও বাদশাহী, খেলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করণ এবং ইমামত ও শাসন ইত্যাকার বিষয়ে ইবনে খালদুন যে দৃষ্টিভংগি পোষণ করতেন তাহলো, রাজতন্ত্র একটি মানব সংঘ ও মানব সমাজের জন্যে একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান আর জোরযবরদস্তী এর অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। নবীগণের আগমনে এ রাজতন্ত্র খেলাফতের কাঠামোতে রূপান্তরিত হয় এবং দীনি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু একটি কার্যকর শক্তি অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব খেলাফতের অন্তরালে বর্তমান থাকে। সুতরাং নবীর আবির্ভাব এবং খেলাফতে রাশেদার পর খেলাফতের সে দায়িত্ব হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর ন্যস্ত হওয়ার সুযোগ ঐতিহ্যবাহী এ রাজতন্ত্র ও পক্ষপাতিত্ব বনী উমাইয়ার বরাবরে স্থানান্তরিত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেটাই তাদের বংশগতভাবে বলদর্পী হওয়ার অনিবার্য বরং জন্মগত দাবীর আদলে রূপান্তরিত হয়। অবশিষ্ট যেসব ঘটনা ঘটে তা ছিলো প্রেক্ষাপটের স্বাভাবিক পরিণতি। খলীফা হিসাবে ইয়াযীদের মনোনয়ন এবং বাইয়াত গ্রহণ সেসব ফলশ্রুতিরই অন্যতম অংশ। আমি এ মূহূর্তে এ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে চাই না যে, শরীয়াত, ইতিহাস ও যুক্তির দৃষ্টিতে এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কতটুকু সঠিক। আমার শুধু এটাই জিজ্ঞাস্য যে, বনী উমাইয়াগণ যখন ১ম থেকে শেষাবধি এতই সংঘবদ্ধতা ও গোত্রবলের নিরংকুশ অধিকারী ছিলো এবং কুরাইশদের নেতৃত্ব দেয়ার মত সংখ্যাগুরু দলও তারাই উপরন্তু জাতীয় জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিলো তাদের লোক; তাহলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট ও বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা করার এমন কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে, যাকে ইয়াযীদের মনোনয়ন দানের পশ্চাতে সংগত অজুহাত হিসাবে দাঁড় করানো যায়?

বলা বাহুল্য কোন এক গোষ্ঠী যখন ক্ষমতার উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তারাই, খলীফাও তাদেরই আপনজন, খলীফা তনয়ও নামাজ-রোযার পাক্কা মুসুল্লী, বংশ মর্যাদায় সে কৌলিন্যের পতাকাবাহী, তদুপরি সুদক্ষ ব্যবস্থাপক ও সংগঠক সুবাদে খেলাফতের একচ্ছত্র হকদার মায় যোগ্যতর, এহেন পরিস্থিতিতে পিতার পর গোটা জাতি অনায়াসে তাকেই খলীফা পদে বরণ করে নিবে—এটাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় মুষ্টিমেয় দু'-চারজন বিরুদ্ধবাদী যদি থাকেও, তাহলে তারা এমন কি কামান দাগাবে? (যার জন্য এত শংকা, এত ভয়, প্রতিরক্ষার এহেন কল্পিত আয়োজন?) এ জাতীয় বিরল বিরোধিতা অনৈক্য ও বিপর্যয়ের শংকিত কারণ কিংবা খেলাফত অনুষ্ঠানের অন্তরায় হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

অতপর ওসমানী সাহেব একই স্থানে হাফেজ ইবনে কাসীর (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এটাও লিখেছেন, যখন হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত

www.pathagar.com

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন, তখন ওলী আহ্দ তথা ভাবী খলীফা হিসাবে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। একথা সত্য হলে প্রশ্ন আসে সে সময় বনী উমাইয়াগণ একথার উপর কেমন করে সম্মত ও রাজী হয়ে গিয়েছিলো ? অথবা একথাও সত্য হতে পারে যে, ইয়াযীদই হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে এ বাস্তব কিংবা ধারণাপ্রসূত অনৈক্যের অবসান ঘটিয়েছেন ?[১] ঘটনা হলো, ইয়াযীদের মনোনয়ন তাঁর খেলাফতের রাস্তা পরিষ্কার করে অনৈক্য দূর করার পরিবর্তে আরো জটিল করে দেয়। বনী উমাইয়া নিজেদের ছাড়া অপর কারো কাছে রাজত্ব সোপর্দ করতে রাজী ছিলো না—ইবনে খালদুন কিংবা ওসমানী সাহেবের একথা যদি সঠিক ধরেও নেয়া হয় তাতেও বনী উমাইয়ার সকলের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র ইয়াযীদই যোগ্য পাত্র ছিলো প্রমাণ করে না। যে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিসাসের দাবী তুলে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু

---

১. যে বিষয়কে ইয়াযীদের খেলাফতলাভের যোগ্যতা হিসেবে ওসমানী সাহেব উচ্চৈস্বরে দাবী করছেন সেটাকেই বিভিন্ন আলেম অভিযোগ তার উপর সুস্পষ্ট ভাষায় উত্থাপন করেছেন। মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী বলেছেন, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পুত্র হতভাগা ইয়াযীদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এ অযোগ্য ও স্বার্থবাদী লোকটি হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিষ প্রয়োগে শহীদ করে ফেলে। কেননা তার আশংকা ছিলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের দুলাল হযরত হাসান খেলাফতের দাবী করে বসলে তাঁর মুকাবিলায় কে তাকে জিজ্ঞেস করবে, কে তার মূল্য দেবে ? কয়েক বছর পর সে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়। এহেন দুরাচারী লোকটির ধর্মহীন হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহ আছে কি ? গ্রন্থের টীকায় তিনি বলছেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত অস্বীকার করে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই খলীফা হতে চেয়েছিলেন। (আকায়েদে ইসলাম, ৯ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২২২, ১৩৫০ হিজরী, দিল্লী, দিল্লী প্রিন্টিং প্রেস)। স্মরণ থাকে যে, আকায়েদে ইসলাম গ্রন্থের সূচনায় মাওলানা কাশেম নানুতবী, মাওলানা হাবীবুর রহমান মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ, মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ সাহেব, দেওবন্দের মুফতি মাওলানা আযীযুর রহমান সাহেব, এবং মুফতি কেফায়েত উল্লাহ প্রমুখদের ভূমিকা রয়েছে।

ইতিপূর্বে আলোচনায় সুনানে আবু দাউদের كتاب اللباس লেবাস অনুচ্ছেদে যে হাদীসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—যাতে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিক্রিয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে—সে হাদীসটির ব্যাখ্যায় মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীও عون المعبود গ্রন্থে লিখেছেন (كان وفاة الحسن رضى الله عنه مسموما سمته زوجته جعدة باشارة يزيد بن معاوية سنة تسع واربعين او بعدها) বিষ প্রয়োগে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু ঘটে। তাঁর স্ত্রী জা'দাহ ইয়াযীদের ইশারায় তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে। এ ঘটনা ৪৯ হিজরী কিংবা তার পরে।

ইবনে হজর (র) الصواعق المحرقة গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠায় (মাইমানীয়া প্রেস, মিসর, ১৩০৭ হিজরী) লিখেছেন, ইয়াযীদ জা'দাহকে এক লাখ দিরহাম (ঘুষ) দিয়ে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিষ প্রয়োগ করায়। বিষ প্রয়োগের এ ঘটনা শাহ আবদুল আযীযও সিররুশ শাহাদাতাইন গ্রন্থে একইভাবে বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

আনহু দাঁড়িয়েছিলেন খোদ তাঁর পুত্রের ঘটনা—যা বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে এবং যা ওসমানী সাহেবও এ আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, তাহলো, ইয়াযীদের মনোনয়ন ঘোষণার পর সাঈদ বিন ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ করেন যে, আপনি স্বীয় পুত্রকে ভাবী খলীফা বানিয়ে দিলেন, অথচ আমার পিতা-মাতা তার পিতা-মাতা অপেক্ষা উত্তম আর আমি তার চাইতে সেরা। একই ইতিহাসবিদগণ একথাও বর্ণনা করেন যে, বশ করার উদ্দেশ্যে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর বানিয়ে তাঁকে খোরাসান পাঠিয়ে দেন। বনী উমাইয়াদের মধ্যে কেবলমাত্র ইয়াযীদই সকলের চোখের মধ্যমণি ছিলো ; যদি তাকে মনোনয়ন না দেয়া হতো তাহলে জাতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে যেতো—এ দাবী এবং ইয়াযীদের মনোনয়ন দানের ব্যাখ্যা কতটুকু যুক্তিসংগত ও সঠিক ছিলো তা এ একটি মাত্র ঘটনা দ্বারা সহজেই আন্দাজ করা যায়। ইবনে খালদুন দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আক্ষেপ ----- ওসমানী সাহেব যদিও আমাদের বলে দিতেন—বনী উমাইয়ার কোন্ কোন্ পদস্থ ও গুণীজন ইয়াযীদকে মনোনয়ন দানের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ ও পীড়াপীড়িতে লিপ্ত ছিলো, তাহলে সেটা মন্দ হতো না।

অধিকন্তু ইবনে খালদুনের একথাও বিস্ময়কর যে, বনী উমাইয়ার আমীর-উমারাগণ ইয়াযীদের মনোনয়ন দানের ব্যাপারে একমত ছিলেন। খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে কিংবা গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব উমাইয়া বংশে তখন বর্তমান ছিলো, অথবা রাষ্ট্র পরিচালনায় উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা হিসাবে দূরদর্শী ও বিচক্ষণ লোক বনী উমাইয়াদের মধ্যে ছিলো কিনা, সে প্রশ্নও গবেষণার বিষয়। অন্যরা তো দূরের কথা খলীফা হওয়ার আগে স্বয়ং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুই তো সে মানের উমারাদের মধ্যে গণ্য ছিলেন না। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র) ইযালাতুল খেফার ১১ পৃষ্ঠায় (বেরেলী প্রেস, ১৩৮৬ ইং) সিরিয়ার ফকীহ আবদুর রহমান আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বললেন : (যখন তাঁরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে খেলাফত পরিত্যাগ করে শূরাতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শামিল করে নতুন করে শূরার বৈঠক ডাকার প্রস্তাব করেন) :

من بايعه خير ممن لم يبايعه واىّ مدخل لمعاوية فى الشورى وهو من

www.pathagar.com

الطلقاء الذين لايجوز لهم الخلافة هو وابوه رؤس الاحزاب فند ما على مسير هما وتابا بين يديه ـ

"যারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষে বাইয়াত নিয়েছে তারা সেই সকল লোক অপেক্ষা উত্তম যারা বাইয়াত গ্রহণ করেনি। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কি যোগ্যতা আছে শূরার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ? সে তো মুক্তি লাভকারীদের একজন যাদের জন্যে খেলাফত মূলতঃ জায়েয নেই। তিনি ও তার পিতা আহযাবের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অতপর তারা উভয়েই নিজেদের আচরণের জন্য অনুতপ্ত হন এবং (আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পৃষ্ঠপোষকতা থেকে) তওবা করেন।"[১]

প্রকৃতপক্ষে ইবনে খালদুনের এ দৃষ্টিভংগী ঐতিহাসিক সত্যতার সম্পূর্ণ খেলাফ। কারণ, বনী উমাইয়া এমন কোনো শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ শক্তির অধিকারী ছিলো না যে, ইয়াযীদের জায়গায় অপর কাউকে মনোনয়ন দিলে কিংবা খলীফা বানানো হলে তারা সেটাকে বানচাল করে দিতে সক্ষম ছিলো। এ উক্তি খেলাফতে ওসমানী সম্পর্কে কোনো কোনো শিয়ার আপত্তির ঢংয়ে উত্থাপিত বক্তব্যের অনুরূপ কথা। তাদের ধারণা, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবর্তে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মূলতঃ গোষ্ঠীগত শক্তির দাপটেই খলীফা নির্বাচন করা হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) তার منهاج السنة (খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা-১৬৬) গ্রন্থে এ দৃষ্টিভংগীর সমালোচনা করে বলেন ঃ

كان عبد الرحمن من ابعد الناس عن الاغراض مع انه شاور جميع الناس ولم يكن لبنى امية شوكة ولا كان فى الشورى منهم احد غير عثمان ـ

"আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু (খলীফার নাম প্রস্তাব করার জিম্মাদারী যার উপর ন্যস্ত ছিলো) লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ ছিলেন। তিনি সকল মুসলমানদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন। বনী উমাইয়ার তখন উল্লেখযোগ্য শক্তির অধিকারী ছিলো না এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া তাদের অন্য কেউ শূরার সদস্য ছিলেন না।"

মনোনয়ন ব্যাপারে ফকীহদের মৌলিক দৃষ্টিভংগি

আমি এ পর্যন্ত যাকিছু আলোচনা করেছি তাতে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, খেলাফতের উপযুক্ত মনে করে সৎ উদ্দেশ্যে পিতা কর্তৃক পুত্রকে মনোনয়ন দান এবং এ কাজ সম্পূর্ণ জায়েয ও গ্রহণযোগ্য বলে শাহ ওলীউল্লাহ, ইমাম

১. এ উক্তি ইযালাতুল খেফার ১১১ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

মাওয়ার্দী এবং আবু ইয়ালা প্রমুখ আলেমগণ আদৌ মত প্রকাশ করেননি। এ ক্ষেত্রে নেক নিয়তি নিয়ে ওসমানী সাহেবের বাক্য চর্চা অর্থহীন। উপরোক্ত আলেমদের কেউ কর্তার নিয়তের উপর আলোচনাই করেননি ; উপরন্তু এটা এ ধরনের আলোচনার ক্ষেত্রও ছিলো না। শাহ্ সাহেব খলীফা মনোনয়ন প্রসঙ্গ নিয়ে সরাসরি আলোচনাই করেননি। অবশ্য তিনি নির্বাচন ধর্মী খেলাফত ও যবরদস্তী খেলাফত লাভের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। মনোনয়ন পদ্ধতির সাথে যদি খেলাফত লাভের কোনো সম্পর্ক না-ই থাকে যেমনটি ওসমানী সাহেব স্বীকার করেছেন, তাহলে শাহ্ সাহেবের বর্ণিত খেলাফত লাভের কোনো পদ্ধতির সাথেই মনোনয়ন দান বিষয়টি সম্পৃক্ত হতে পারে না। আল মাওয়ার্দী ও আবু ইয়ালার আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, শাসন বিষয়ক পারদর্শী ও রাজনীতি সচেতন মহলের বাইয়াত গ্রহণই মূলতঃ খেলাফত লাভের মানসম্মত পদ্ধতি। পক্ষান্তরে তাঁদের মতে খলীফা মনোনয়ন পর্যায়ে দু'টি শর্ত জরুরী। ১ম শর্ত, মনোনয়ন দান প্রক্রিয়ার সর্বসম্মত বিধান হলো, প্রস্তাবিত ব্যক্তির চিন্তা-চরিত্রে খেলাফতের শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় থাকতে হবে। ২য় শর্ত, যা উম্মতের সর্ববাদী সম্মত মতে অপরিহার্য তাহলো, মনোনয়ন প্রাপ্ত ব্যক্তি পুত্র হলে উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং তারা একথারও স্বীকৃতি দিবেন যে, গোটা জাতির মধ্যে খেলাফতের জন্যে পুত্রই একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি।[১] খেলাফতের শর্তাবলী কেবলমাত্র কোনো পর্যায়ে প্রাপ্ত হওয়া এবং পিতা-পুত্রের সম্পর্কে যোগ্যতার মাপকাঠি মনে করা যথেষ্ট নয়। ইবনে খালদুন ইয়াযীদের মনোয়নকে নিসন্দেহে জায়েয বলেছেন এবং এর অপরিহার্যতার ও বিশুদ্ধতার দর্শনও তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এ সত্যও স্বীকার করেছেন যে, এ বিষয়ে তিনটি মত প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি মতের দৃষ্টিতে এ পন্থা অপবাদ ও দোষারোপের উপাদান।

মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহির বিশ্লেষণ

প্রসঙ্গ আলোচনায় একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, মাওলানা ওসমানী সাহেব মাওলানা মওদূদী সাহেবের দু'টি বাক্যাংশ উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াযীদের

১. ইয়াযীদের মনোনয়ন দানের ব্যাপারে এমন সময় বাইয়াত গ্রহণ করা হয় যখন হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবিত ছিলেন। তারা আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অধিকন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের সন্তানগণ (হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ) জীবিত ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সাঈদ বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো বুযুর্গগণ তখনও জীবিত। তাদের সকলকে বাদ দিয়ে ইয়াযীদ কেবলমাত্র এ কারণেই কি যোগ্যতর ছিলো যে, সে ক্ষমতাসীন খলীফার দুলাল এবং পিতার দৃষ্টিতে রাজ্য শাসন বিষয়ে সেই ছিলো অন্যতম পারদর্শী ?

www.pathagar.com

মনোনয়ন দান পর্যায়ে প্রাথমিক তৎপরতায় কোনো সঠিক আবেগ অনুভূতি কেন্দ্রেক ছিলো না। কিন্তু নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও দাবী সুস্পষ্ট করার অভিপ্রায়ে খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থে লিখিত তার অন্যান্য বাক্য তিনি উল্লেখ করেননি। উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য গ্রন্থের ১৪৮ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ঃ

"খেলাফত আলা মিনহাজুন নবুওয়াত (নবী প্রদর্শিত নীতিতে খেলাফত) বহাল রাখার সর্ব শেষ উপায় শুধু এটাই অবশিষ্ট ছিলো যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অবর্তমানে এ পদের জন্যে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের উপর ছেড়ে দিতেন, অথবা বিরোধ অবসান কল্পে নিজের জীবদ্দশায়ই মনোনয়ন দান প্রসংগ চূড়ান্ত করা তাঁর দৃষ্টিতে অনিবার্য মনে হলে মুসলিম জনমণ্ডলি থেকে অভিজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধ ও রাজনীতি পারদর্শী কল্যাণকামী সুধীবৃন্দকে একত্রিত করে খলীফা নির্বাচনের ভার তাদের উপর ন্যস্ত করা কর্তব্য ছিলো যে, পূর্ণ স্বাধীন মতে তাদের বিবেচনায় জাতির মধ্যে মনোনয়ন দানের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি কে। কিন্তু স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে মনোনয়ন দানের ব্যাপারে ভীতি ও লালসার মাধ্যম বাইয়াত গ্রহণ করে তিনি এ সম্ভাবনারও পরিসমাপ্তি ঘটান।"

অতপর একই গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় ইয়াযীদের মনোনয়ন দান প্রসঙ্গ শিরোনামে তিনি লিখেছেন ঃ

"যে দলিলের ভিত্তিতে ইয়াযীদের মনোনয়ন দান জায়েয প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় সেটি নিয়ে আমার সবচেয়ে বেশী বিস্ময়। কোনো কোনো সুধী একথা তো স্বীকার করেন যে, এ পদক্ষেপের পরিণতি অশুভ হয়েছে বটে, তবে তাদের মতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জীবদ্দশায় ইয়াযীদের মনোনয়নের ব্যাপারে বাইয়াত গ্রহণ না করে গেলে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ছিলো। উপরন্তু রোম অধিপতি আগ্রাসী আক্রমণ চালাত, ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়া বিচিত্র ছিলো না। সুতরাং এরূপ ভয়াবহ পরিণতির তুলনায় ইয়াযীদের পক্ষে মনোনয়ন দানের ফলে সৃষ্ট অশুভ পরিণাম তুলনামূলক কমই বলা যায়। আমার জিজ্ঞাস্য, বাস্তবিকই যদি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধারণা করে থাকেন যে, মনোনয়ন দান প্রসংগ অমীমাংসীত থাকা অবস্থায় তাঁর অবর্তমানে মুসলিম জাতি গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে না পড়ুক এ অনুভূতির প্রেক্ষাপটে জীবদ্দশায়ই তিনি ইয়াযীদের স্বপক্ষে বাইয়াত গ্রহণ অপরিহার্য মনে করেছেন, তাহলে কি তিনি এরূপ বরকতময় ধারণা বাস্তবায়িত করার জন্যে এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারতেন না যে, তৎকালীন অবশিষ্ট সাহাবী ও গণ্যমান্য তাবেয়ীদের একত্রিত

www.pathagar.com

করে বলতেন, আমার পরে রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে আমার জীবদ্দশায়ই যোগ্যতর রাষ্ট্রনায়ক বাছাই করে নিন। অতপর তাদের নির্বাচন করা ভাবী খলীফার পক্ষে সকলে বাইয়াত করে নিতো ? এ ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করতে এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিলো কি ? হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক এ পন্থা অবলম্বন করা হলে আপনারা কি মনে করেন তারপরও দেশ গৃহ যুদ্ধে জড়িয়ে যেত, রোমান সম্রাট আক্রমণে সাহসী হতো এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব মুছে ফেলতো ?"

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন এ ধরনের কথা লিখেন তখনো আল বালাগে এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ঘটনা হলো, গ্রন্থটিতে 'আল বালাগ'-এর যাবতীয় অভিযোগের নীতিগত ও ব্যাপকভিত্তিক জবাব বর্তমান আছে। এসব কথা সামনে রেখেই সম্পাদক সাহেব তার সমালোচনামূলক লেখা শুরু করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তিনি ন্যায় ও শিষ্টাচার ধর্মী আচরণের আশ্রয় না নিয়ে ইয়াযীদের মনোনয়ন দান প্রশংসার অন্তরালে নেক নিয়ত, বদনিয়ত, জায়েয ও নাজায়েয ইত্যাকার অপ্রাসংগিক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে অযথা আলোচনা করতে গিয়ে মূল বিষয়বস্তুর উপর একটি হ-য-ব-র-ল অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। ভুল কাজ সৎ উদ্দেশ্যে করা হলে সে ভ্রান্তি কি শুদ্ধ রূপে ধারণ করে নিবে, কিংবা তার পরিণতি কি প্রকাশ পাওয়া থেকে বিরত থাকবে ? কোনো আলেম কিংবা ফকীহ ২/৩টি কাজ সম্পর্কে যদি লিখে দেয় এটা জায়েয এবং ওটাও জায়েয এবং গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যোগ্য, তাহলে এ উভয় কাজ কি সমভাবে মুবাহ কিংবা সওয়াব লাভের কারণ হবে ? যেমন, তালাক দেয়া তো জায়েয ; কিন্তু এর কোনো পদ্ধতি মুবাহ, কোনোটা মুস্তাহাব, আবার কোনোটা নিষিদ্ধ। তালাকের শরীয়াতসম্মত সুন্দর ফলপ্রসু ও সুন্নাত পদ্ধতি হলো, কোনো যুক্তিসংগত শরঈ কারণের ভিত্তিতে পবিত্র অবস্থায় স্ত্রী সংগম ছাড়া এক তালাক রেজঈ দেয়া যাতে ইদ্দত (সময়সীমা) অতিবাহিত হতে পারে। মনে করুন, একজন লোক বিনা কারণে হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীকে একই সময় তিন তালাক দিলো, এমতাবস্থায় ৪ মযহাব বরং জাহেরীদের মতেও মোগাল্লাজা তালাক বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। কিন্তু শুধুমাত্র জায়েয ও বাস্তবায়নের কারণে সেটা মুস্তাহাসান কিংবা অভিযোগের উর্ধে উঠে যাবে কি ? তালাকের চেয়েও স্পষ্টতর উদাহরণ হলো সালাত। প্রত্যেক মুসলমানের ইমামতিতে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা জায়েয। একথায় গোটা মুসলিম জাতি একমত। প্রত্যেক নেককার ও বদকার লোকের ইকতেদা করে সালাত আদায় জায়েয হওয়া খোদ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। সুতরাং সেটাকে জায়েয প্রমাণ করার জন্যে কোনো ফকীহর কথা

www.pathagar.com

পেশ করার প্রয়োজন নেই। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনাবাসীকে অবরোধকারীদের পিছনেও সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মারওয়ান, হাজ্জাজ, ইয়াযীদের মতো লোকদের ইমামতিতে তৎকালীন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীগণ সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু এর তাৎপর্য কি এটাই যে, তাদের সকলের ইমামতি একই পর্যায়ের জায়েয ছিলো ? তাহলে তো আমাদের মুফতি সাহেবদের পরিষ্কার ফতওয়া দেয়া উচিত যে, ছোট্ট ইমামতি ও বড় ইমামতির জন্যে যে কাউকে খলীফা বানিয়ে দেয়া কিংবা মনোনয়ন দানের পরামর্শ দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয ও সঠিক।

মনোয়ন দান কি একটি প্রস্তাবনা মাত্র ?

'আল বালাগ' এর সম্পাদক সাহেব ইয়াযীদের মনোনয়ন দানের উপর আলোচনা পর্যায়ে একথার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন যে, বিজ্ঞ আলেমদের মতে ক্ষমতাসীন খলীফা এককভাবে নিজের ইচ্ছায় কাউকে খলীফা নিয়োগ দিলে সেটা কেবলমাত্র একটি প্রস্তাবনা হিসেবে বিবেচিত হবে যা খলীফার মৃত্যুর পর আমীর-উমারা ও সুধীজন কর্তৃক গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। একথা দ্বারা সম্ভবত এরূপ ধারণা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য যে, বিষয়টি যেহেতু একটি প্রস্তাব মাত্র যা প্রত্যাখান করা সম্ভব, তাহলে এটা নিয়ে এতো হৈ-হাঙ্গামা ও বাদ-প্রতিবাদের কি প্রয়োজন ? এর জবাব হলো, এমন অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো বাহ্যত সম্পূর্ণ সহজ-সরল মনে হয় কিন্তু বাস্তবের ঘরে সেগুলো জটিলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। মনোনয়ন দান একটি প্রস্তাবনা—একথা আমিও স্বীকার করছি ; বরঞ্চ নীতিগত ও শরঈ বিধানের দাবী অনুযায়ী এটা প্রস্তাব আকারে থাকা এবং মুসলিম জাতি এটাকে গ্রহণ ও বর্জন করার ইখতিয়ার থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন খলীফা স্বপদে আসীন থাকাবস্থায় মহা সমারোহে একবার যে ব্যক্তিত্বকে সকলের সামনে খলীফা হিসাবে পেশ করেন তার সমর্থনে বাইয়াত গ্রহণ করেন তাকে হটিয়ে অপর কোনো যোগ্যতম ব্যক্তিকে খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত করা কার্যত সীমাহীন কঠিন। ইসলামের সমগ্র ইতিহাস খুঁজে এমন একটি উদাহরণ পেশ করা দুরূহ হবে যেখানে মনোনয়ন প্রাপ্ত ভাবী খলীফাকে বদলিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে পরামর্শ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে কোনো যোগ্যতর ব্যক্তিকে খলীফা বানানো হয়েছে। নীতিগতভাবে (ওলী আহাদ) মনোনীত খলীফা তো দূরের কথা আইনানুগ নির্বাচিত খলীফাকেও ক্ষমতাচ্যুত করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু একজন অযোগ্য লোকও একবার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং তার জায়গায় একজন যোগ্যতর ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করা অতি দুষ্কর বরং কার্যতঃ তা

www.pathagar.com

অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই উম্মত বরেণ্য মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ইমামদের অনেকেই ফেতনা প্রতিরোধ কল্পে ও জরুরী ভিত্তিতে এ ধরনের লোকের খেলাফত মেনে নিয়েছেন এবং যোগ্যতম ব্যক্তির অবর্তমানে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য লোকের খেলাফত জায়েয মনে করেন। বস্তুতঃ মনোনয়ন দান প্রস্তাব মান্য করা জাতির জন্যে ওয়াযিব হোক কিংবা না হোক, এটা শুধুমাত্র পবিত্র কামনা হোক কিংবা কল্পনা ; কিন্তু এটা হাওয়ায় উড়ন্ত প্রস্তাবনার ফানুস নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা অনাগত খেলাফতের ভিত্তি প্রস্তর সমতুল্য। যদি এখানে বক্রতা দেখা দেয় তাহলে ভবিষ্যতে সঠিক বুনিয়াদের উপর এর ভিত্ রচনা করা বাঘের দুধ দোহানো আর রক্ত সাগরে সাতার কাটা যেন প্রায় একই কথা। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্মম শাহাদাত বরণ করা একথারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিসন্দেহে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উত্তর কালীন খলীফা হিসেবে মনোনীত করে গেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেছেন। কিন্তু তাঁরা এ কাজ করেছেন এ জীবনের শেষ মুহূর্তে অন্তিম সময়ে এবং নিজের কোনো আত্মীয়ের পক্ষে বাইয়াত নেয়া, মনোনয়ন দেয়া কিংবা প্রস্তাব করা থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকেন। যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষ্য ছিলো, এটা আমার অন্তিম সময় যখন একজন পাপী লোকও তাওবা করে থাকে।[১] হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অন্তিম সময়ে যখন আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করা হলো তখন তিনি বললেন, আজকে তোমরা আমাকে আমীরুল মু'মিনীন বলো না। আমি আজ তোমাদের আমীর নই। রাসূলের বাণী অনুযায়ী একজন লোক যখন সুস্থ-সবল থাকে, প্রত্যেক ধরনের লোকদের কাছ থেকে মনোনয়নের সপক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করতে থাকে এবং এ উদ্দেশ্যে শহর-নগর ঘুরে বেড়ায় এমন ধরনের মনোনয়ন আর অন্তিম শয্যায় শয়নকালের ওসিয়ত পূর্ণ মনোনয়নের মধ্যে কি সামঞ্জস্য থাকতে পারে ? এ

---

১. الصواعق المحرقه গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় এবং كنز العمال গ্রন্থে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তিম বাণীর উল্লেখ আছে এভাবে ঃ

هذا عهد ابى بكر فى اخر عهده من الدنيا اخاربها عنها وعند اول عهده بالاخرة داخلا فيها حيث يومن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب ...

এটা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শেষ সময়ের অসিয়ত দুনিয়া থেকে চির বিদায়ের শেষ লগ্নে এবং আখেরাতে প্রবেশের ১ম প্রহর—যে মুহূর্তে কাফেরও ঈমান আনে, পাপীও তাওবা করে এবং মিথ্যাবাদীও সত্য বলে।–(শরহে ফিকহে আকবর কিতাবের ৭৮ পৃষ্ঠায় মোল্লা আলী কারী শব্দের সামান্য পরিবর্তনে প্রায় একই কথার উল্লেখ করেছেন।)

www.pathagar.com

দুয়ের মধ্যে তাৎপর্যগত ও বাহ্যত উভয় দিক থেকেই বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে যদিও (عهد) অসিয়ত শাহী ফরমান ও (استخلاف) পরবর্তী খলীফা নির্বাচন শব্দের ব্যবহার হাদীস গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু ولايت عهد রাজকীয় অসিয়ত এবং ولى عهدى (মনোনয়ন প্রাপ্ত) পরিভাষা পরবর্তীতে প্রচলিত হয় এবং ওলী আহদী যথারীতি অধিকারী স্বত্ব ও অগ্রগণ্য পদবী রূপ ধারণ করে।

ইয়াযীদের খেলাফতের যোগ্যতা

আল বালাগ সম্পাদক ইয়াযীদের মনোনয়ন দানের উপর আলোচনা করতে গিয়ে যেসব পর্যালোচনা করেছেন তন্মধ্যে মনোনয়ন দানের শরঈ মর্যাদা কি, এটা ছিলো প্রথম আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় বিষয় ছিলো ইয়াযীদ খেলাফতের যোগ্য ছিলো কি ছিলো না। কিন্তু ২য় বিষয় আলোচনায় আনার সময় তিনি এটাকে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়াযীদকে খেলাফতের যোগ্য মনে করতেন কি ? শিরোনামে বদলিয়ে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের জন্যে ইয়াযীদের যোগ্যতা আর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিজস্ব মতে তাকে যোগ্য মনে করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এটা কি সম্ভব নয় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমসাময়িক আমীর-উমারাদের অভিমত না জেনেই আপন পুত্রকে যোগ্য কিংবা যোগ্যতর ব্যক্তি মনে করেছেন অথচ বাস্তবে সে ছিলো অযোগ্য অপদার্থের সেরা অপদার্থ ? একথা আগেই বলা হয়েছে যে, সর্বসম্মতি মতে ক্ষমতাসীন খলীফা যদি কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত কিংবা মনোনয়ন দান করার প্রস্তাব করতে ইচ্ছা করেন তাহলে গোটা জাতির মধ্যে খেলাফতের শর্তাবলীর পূর্ণাংগ ধারক বাহক ব্যক্তিকেই বাছাই করা উচিত এবং এ বাছাই ও প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শের ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরূপ ভূমিকার পরই একথা প্রমাণ হতে পারে যে, খলীফা যার নাম প্রস্তাবে আগ্রহী এবং যাকে তিনি স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য মনে করছেন সে জাতি ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতেও সে কাংখিত যোগ্যতার অধিকারী কি না ? প্রস্তাবিত ব্যক্তি খলীফার পুত্র হলে তো প্রতিনিধি পরিষদের উপদেষ্টা বা প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যগণও এমন লোক শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতানুযায়ী যার খেলাফতের শর্তাবলীর অধিকারী অর্থাৎ তাদের ব্যক্তি চরিত্রে খেলাফতের প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত রয়েছে। এমন যেনো না হয় যে, চূড়ান্ত ফায়সালা দেয়ার সময় পিতার মনে সন্তানের মায়া জীবন্ত হয়ে উঠে, ফলে তার বিচার শক্তিকে প্রভাবিত করে ফেলে। এতে কারো ব্যক্তিত্ব কিংবা নিয়তের উপর হামলা করার প্রশ্ন আসা উচিত নয়। আল্লাহর

www.pathagar.com

বাণী ও রাসূলের ইরশাদসমূহ কি এ পর্যায়ে বারবার সাক্ষ্য দিচ্ছে না যে, আমাদের জন্যে সন্তান হলো পরীক্ষার উপকরণ। আমাদের জন্যে তাদেরকে খুবই আকর্ষণীয় করা হয়েছে এবং তারা আমাদের বিপদজ্জনক শত্রু রূপেও প্রতিভাত হতে পারে ? হযরত হাতেব বিন আবু বালতা রাদিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন নিঃস্বার্থ সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংকটময় মুহূর্তে যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য কি মুশরিকদের কাছে শুধুমাত্র সন্তান ও পারিবারিক নিরাপত্তা চিন্তার কারণে ফাঁস করে দেননি ?

সত্য কথা হলো, ইয়াযীদ খেলাফতের যোগ্য কিংবা স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য হওয়াতো দূরের কথা, তার অযোগ্যতা ও পাপাচার এমন নগ্ন ঐতিহাসিক সত্য যার অস্বীকার নিছক অহমিকার নামান্তর। যদি সে খলীফা তনয় না হতো তাহলে সে হতো নিকৃষ্টতর ব্যক্তি খলীফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যার প্রতি কারো দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো কিনা কিন্তু দুর্ভাগ্য রীতিমতো গবেষণার বিষয়। কিংবা সৌভাগ্যক্রমে সে খলীফার ঔরসে জন্ম নেয় আর খলীফা একক মতে তাকে যোগ্য মনে করে বাছাই করেন, ফলে এই লক্ষ্মী ছেলের পাপ-পুন্য আলোচ্য বিষয়রূপে স্থান লাভ করে। এখন কেউ বলছেন—তিনি ছিলেন মস্তবড় আবেদ, যাহেদ ও যোগ্যতম ব্যক্তি। তার আয়াশী জীবন ও অপকর্মের কাহিনী নিছক অলীক কাহিনী মাত্র। কেউ বলছেন—তার পাপাচারে লিপ্ত থাকার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই ; কিন্তু তার এ সমস্ত অপকর্ম আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গোপন ছিলো অথবা গোপন রাখা হয়। আবার কারো মতে মনোনয়ন দানের সময় সম্মানিত পিতা কিংবা অন্যান্য শুভাকাংখীগণ তাকে তিরস্কার করেন, ফলে তার চরিত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়ে কল্যাণের পথে ফিরে আসে। এবার লক্ষণীয়—মাওলানা ওসমানী সাহেব অন্যায়-অবিচার এবং তাকওয়া সংশোধনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা ও ভারসাম্য রক্ষা করলেন এভাবে যে, ইয়াযীদ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিলো তো খুব ভালোই, কিন্তু কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা তার সুখ্যাতি ম্লান করে দেয়। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার ৭২জন সাথীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা যেনো গাড়ীর আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিলো। সৎ ও দক্ষ চালক যাদের নিয়ে ঘটনাক্রমে পরিস্থিতির শিকার হন। ডানে-বামে, আশে-পাশের পরিবেশে এমন কোনো ঘটনা ও উপকরণ বর্তমান ছিলো না যার জন্যে ইয়াযীদকে দায়ী করা যায়। এর নেপথ্য নায়ক হিসাবে তাকে চিহ্নিত করার কোনো উপায় নেই। অথবা ইয়াযীদ চরিত্রের সাথে এর সামান্যতম সম্পর্ক নেই। যদি এটাই কথা হয়, তাহলে স্পষ্ট ভাষায় বলতে আপনার অসুবিধা কোথায় যে, হযরত হুসাইন

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা তাকে বিদ্রোহ বলুন, বাইয়াত না করা বলুন, বাইয়াত ভংগ করা বলুন কিংবা সন্ত্রাস ও বিশৃংখলা পসন্দ বলুন—সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং জবাবদিহিমূলক আচরণ ছিলো ? ইয়াযীদ যখন সত্যবাদী, হিতাকাংখী ও ন্যায়পরায়ণ লোকই ছিলো এবং কারবালা বিষাদময় ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত তার মধ্যে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো, তখন শুধুমাত্র কারবালার ঘটনায় তার চিত্র এহেন কলুষিত এবং তার খ্যাতি ম্লান হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? এমতাবস্থায় সবদোষ তো হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুরই বলতে হয় যে, তিনি সত্য ও ন্যায়পরায়ণের (!) হাতে তাৎক্ষণিকভাবে বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে এমন পন্থা অবলম্বন করলেন যা তাঁকে কারবালা (كرب وبلا) তথা বিষাদপ্রান্তরে পৌঁছে দিলো। ইয়াযীদের যোগ্যতার পক্ষে এহেন দলীল উপস্থাপন করার পর মাহমুদ আব্বাসী ও আপন ভূমিকার মধ্যে আপনি সূক্ষ্ম পার্থক্য সৃষ্টির প্রয়াস নিচ্ছেন তার কোনো মূল্য ও গুরুত্ব আর অবশিষ্ট থাকে না।

ইয়াযীদের সততা ?

ইয়াযীদের কর্মদক্ষতা ও সততা সম্পর্কে যেসব দলিল 'আল বালাগ' সাময়িকীতে দেয়া হয়েছে সেগুলো লক্ষ্যণীয় ও মূল্যায়নযোগ্যই বলতে হয়। প্রথমত উল্লেখ করা হলো, ইয়াযীদের মনোনয়ন দান বিষয়ে হযরত সাঈদ বিন ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিযোগের জবাবে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ তোমার মতো লোকে যদি অমুক মাঠ ভরে যায় তাহলেও ইয়াযীদ তোমার চেয়ে উত্তম ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব। পুত্রের স্বপক্ষে পিতার এ বিবরণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বলা যায়, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদকে সাঈদ বিন ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা উত্তম ও প্রিয়জন বলার অন্তরালে নিহিত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সুস্পষ্টভাবে বলেননি। সন্তান পিতার কাছে স্নেহধন্য হয়ে থাকে, ইয়াযীদ বাস্তবিকই খেলাফতের যোগ্য ছিলো। আপনার একথা এরূপ অস্পষ্টতায় শেষ পর্যন্ত কিভাবে মীমাংসাকারী হতে পারে ?

এরপর ওসমানী সাহেব আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি দুআর কথা উল্লেখ করেছেন। দুআয় নিসন্দেহে তাঁর এ বাসনার কথা উল্লেখ হয়েছে যে, যদি ইয়াযীদ এ পদের যোগ্য হয় তাহলে আল্লাহ যেনো তার বেলায়েত পূর্ণ করে দেন, অন্যথায় তাকে চিরতরে উঠিয়ে নেন। কিন্তু এসব প্রার্থনামূলক বাক্য দ্বারাও ইয়াযীদের মর্যাদা ও যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না। বরং শুধুমাত্র এতোটুকু প্রমাণ হয় যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজস্ব মতে সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তাকে এরূপ মনে করতেন। কিন্তু এ রায় যেমন পূর্বে

www.pathagar.com

বলা হয়েছে—ভ্রান্ত ও অতিরঞ্জিত হওয়া থেকে আশংকামুক্ত হতে পারে না। বালাজুরীর (র) যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তাতে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কেবলমাত্র একথার উল্লেখ আছে যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে সে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারস্থ লোক। আমি বুঝতে পারছি না যে, একথায় ইয়াযীদের ফযীলত ও মর্যাদার কথা কোত্থেকে বের হলো ? কারো (من صالحي اهله) বংশের উত্তম লোকদের একজন হওয়া দ্বারা গোটা জাতির নেতৃত্বদানের যোগ্য হওয়া কি করে প্রমাণ হয়। অধিকন্তু এখানেاصلح অর্থাৎ মর্যাদা জ্ঞাপক শব্দও ব্যবহৃত হয়নি। এর তাৎপর্য যেনো এরূপ যে, ঐ পরিবারে যে কয়জন ভালো লোক আছে, ইয়াযীদও তন্মধ্যে একজন। অতপর হযরত মুহাম্মাদ বিন হানফীয়ার উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমি ইয়াযীদকে নামাযের পাবন্দ ও কল্যাণের অন্বেষীরূপে পেয়েছি। সে ফেকাহের মাসআলা জিজ্ঞেস করে এবং সুন্নাতের অনুসারী। প্রকৃত ঘটনা হলো, মুহাম্মদ বিন হানফীয়া অল্প কিছুদিনের জন্যে শামে গিয়ে ইয়াযীদের কাছে অবস্থান করেন এবং যাকিছু তিনি দেখেছেন তাই বর্ণনা করেছেন।[১] কিন্তু সাহাবায়েকেরামসহ অন্যান্য বুযুর্গানে দীন ইয়াযীদ সম্পর্কে যারা অধিকতর অবগত তাঁদের বর্ণনা মুহাম্মদ বিন হানফিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন, হযরত মিকদাদ বিন মাআদিকারাব আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে যাকিছু বলেছেন সেগুলো সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করেছি। এখানে আমি শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, সালাত আদায় করা এবং ফিকাহের মাসআলা জিজ্ঞেস করা আজকের দিনে নিসন্দেহে মস্তবড় নেককার আলামত, কিন্তু সে সময়ের একজন অতি খারাপ লোকও এরূপ নেক কাজ বিবর্জিত ছিলো না। আবদুল মালেক বিন মারওয়ান এবং তার গভর্নর হাজ্জাজও সওম ও সালাতের পাবন্দ ছিলো এবং ফিকহী মাসায়েল জিজ্ঞেস করতো। বরং মানুষকে বলে বেড়াতো। অথচ এ হাজ্জাজ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী সুনান কিতাবুল ফিতানে সহীহ সনদসহ হিশাম বিন হাসসান থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, হাজ্জাজ ১ লাখ ২০ হাজার লোককে হাত বেঁধে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো।

মাওলানা ওসমানী সাহেব হযরত মুহাম্মদ বিন হানফীয়ার কথা ইবনে কাসীরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা তো করলেন, কিন্তু ইয়াযীদের ফাসেক হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ অন্যান্যদের উক্তি তিনি সযত্নে এড়িয়ে যান। সুবিখ্যাত গ্রন্থ আল

১. এখানে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, মুহাম্মদ বিন হানফীয়ার নীতি হযরত হাসান-হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত যায়নুল আবেদীনের ব্যাপারে সহানুভূতিহীন ও নীরব ভূমিকা পর্যায়ের ছিলো। তোহফা ইছনা আশারিয়ার গ্রন্থকার শাহ আবদুল আযীয এ ব্যাপারে তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

বিদায়ায় ইবনে কাসীর (র) (৮ম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠায়) তার যে বিবরণ দিয়েছেন সেটাকেও তিনি গুরুত্ব দিতে অনীহা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

قلت يزيد بن معاوية اكثر ما نقم عليه فى عمله شرب الخمر وايتان بعض الفواحش فاما قتل الحسين فانه كما قال جده ابو سفيان يوم احد لم يامر بذالك ولم يسؤه ۔

"আমি বলছি, ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কার্যাবলীর সবচেয়ে বেশী অপসন্দনীয় বিষয় হলো তার মদ্যপান এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার সাথে যতটুকু সম্পর্ক তাতে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ এরূপ যেমন তার দাদা আবু সুফিয়ান ওহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, (মুসলমানদেরকে হত্যা ও অংগচ্ছেদন করার) নির্দেশ তিনি দেননি, তবে যা হয়েছে তাতে পরিতাপের কোনো কারণ নেই।"

ওসমানী সাহেব এরপরও ইয়াযীদের খ্যাতি ম্লান হওয়ার কারণ কেবলমাত্র হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডকেই বর্ণনা করেছেন। জানি না, হাররা ঘটনায় যাকিছু ঘটেছে তার সাথে ইয়াযীদের পাপাচার কিছুটা সংশ্লিষ্ট থাকার কথা ওসমানী সাহেবের ধারণায় আছে কি নেই ; কিংবা ঐ ঘটনারও তিনি ইয়াযীদকে অপারগ ও সত্যপন্থীই মনে করেন। ইবনে কাসীর (র) একই খণ্ডের ২২২ পৃষ্ঠায় এ ঘটনার পর্যালোচনায় লিখেন ঃ

وقد اخطأ يزيد خطأ فاحشا فى قوله لمسلم بن عقبة ان يبيح المدينة ثلاثة ايام وهذا اخطأ كبير فاحش مع ما انضم الى ذالك من قتل خلق من الصحابة وابنائهم وقد تقدم انه قتل الحسين واصحابه على يدى بن زياد وقد وقع فى هذه الثلاثة ايام من المفاسد العظيمه فى المدينة النبوية مالا يحد ولا يوصف مما لايعلمه الا اللّه عز وجل وقد اراد بارسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانة وملكه ودوام ايامه من غير منازع فعاقبة اللّه بنقيض قصده وحال بينه وبين مايشتهيه فقصمه اللّه قاصم الجبابره واخذاه اخذ عزيز مقتدر وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَا الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ـ اِنَّ اَخْذَه اَلِيمٌ شَدِيدٌ ـ الاية

"ইয়াযীদ মুসলিম বিন ওকবাহকে মদীনা শরীফ তিন দিনের জন্যে মুবাহ তথা অরাজক অবস্থা সৃষ্টির নির্দেশ দিয়ে চরম পাশবিকতার পরিচয়

www.pathagar.com

দিয়েছে। এটা ছিলো তার যুলুম-অত্যাচারের চরম অধ্যায়। বিশেষত বিপুল সংখ্যক সাহাবায়েকেরাম ও তাঁদের সন্তানদের যখন নির্মম ও পৈশাচিক উপায়ে হত্যা করা হয়। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, এই ইয়াযীদই হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদেরকে ইবনে যিয়াদের হাতে হত্যা করায়। হাররা ঘটনায় এ তিন দিনে নবীর শহর মদীনায় এমন বিভীষিকাময় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় যা সংখ্যায় অগণিত এবং ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। ইয়াযীদের ইচ্ছা ছিলো, মুসলিম বিন ওকবাহকে এ ধরনের কাজের নির্দেশ দিয়ে নিজের রাজত্ব মযবুত করা, ক্ষমতা পাকাপোক্ত করা এবং বিপক্ষ শক্তিকে নির্মূল করে দেয়া। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তার ইচ্ছাকে ব্যর্থ করে দেন, তাকে শাস্তি দেন এবং তার অভিলাষের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। পরন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাকে যালেম ও অত্যাচারীদের মতোই নিঃশেষ করে দেন এবং তাকে পরম পরাক্রমশালী সত্ত্বার কুদরতী হাতে পাকড়াও করা হয়, অন্যান্য যালিম অত্যাচারী গোষ্ঠীকে তিনি যেভাবে পাকড়াও করে থাকেন। বস্তুত তাঁর ধরা অত্যন্ত কঠোর ও কষ্টদায়ক।"

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী সাহেব বারবার বলে থাকেন, ইয়াযীদের পাপাচারের কথা কোনো নির্ভরযোগ্য রাওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে পিতৃত্বের বাৎসল্যে স্থলাভিষিক্ত করেননি। অথচ ইয়াযীদের মনোনয়ন দান সঠিক ও জায়েয প্রমাণ করার চেষ্টাকারী ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনও এ বিষয়ের উপর আলোচনাকালে সর্বত্র তার পাপাচারের কথা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করেছেন। অধিকন্তু ইবনে আরাবীর মতো লোকের তীব্র সমালোচনা করেছেন। কেননা, তিনি ইয়াযীদকে ফাসেক হওয়ার স্থলে ন্যায়বানরূপে স্বীকার করে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা সন্দেহযুক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করেন। স্নেহ মমতার প্রভাবের কার্যকারিতার যতটুকু সম্পর্ক থাকতে পারে তার প্রমাণ স্বয়ং আল বালাগ সম্পাদক সাহেবের উদ্ধৃত ইবনে কাসীর (র) প্রণীত আল বেদায়া গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। আলোচ্য পৃষ্ঠায় আছে—আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় ছিলো, ইয়াযীদ খেলাফতের যোগ্য উত্তরসূরী ; আর এ রায় ছেলের প্রতি পিতৃ স্নেহের আতিশয্যের কারণে ছিলো। অধিকন্তু এ কারণে ছিলো যে, তিনি ইয়াযীদের মধ্যে বংশগত আভিজাত্য, রাজপুত্র সুলভ বৈশিষ্ট্য যুদ্ধশাস্ত্রে পরিজ্ঞাত এবং শাসন পরিচালনায় পারদর্শিতার ছাপ লক্ষ্য করতেন। কিন্তু একথা কে দাবী করতে পারে যে, ক্ষমতাসীন খলীফার পুত্র হওয়া ছাড়া উপরোল্লেখিত অন্যান্য গুণাবলীর ধারক-বাহক অপর কোনো লোক বর্তমানই ছিলো না।

www.pathagar.com

সুতরাং বলা যায় ইয়াযীদের উপর নির্বাচনী দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রকৃত কারণ ছিলো সীমাহীন পিতৃ বাৎসল্য সন্তানের প্রতি মায়ার আধিক্য।

ইবনে হজর মক্কীর উক্তি

ইয়াযীদ ও তার মনোনয়ন দান প্রসংগে পূর্ববর্তী আলেমগণ যাকিছু লিখেছেন তাদের মধ্যে ইমাম ইবনে হজর হাইসুমী মক্কীর কতিপয় উদ্ধৃতি এবার পেশ করতে চাই। তিনি শাফেয়ী মতাবলম্বী একজন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর লিখিত الصواعق المحرقه في الرد على اهل البدعة والزندقه اور تطهير الجنان واللسان عن الخطور وتفوه بثلب سيدنا معاوية بن ابى سفيان গ্রন্থদ্বয় সমধিক প্রসিদ্ধ। 'আল বালাগ'-এর সম্পাদক সাহেব তার আলোচনার ধারাবাহিকতার স্থানে স্থানে এ গ্রন্থদ্বয়ের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সাহাবীদের আদালত তথা ন্যায়পরায়নতার আলোচনায় তিনি ইবনে হাজারের যেসব লেখার উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী পর্যায়ে দিবো, তবে এখানে আমি এতটুকু কথা স্পষ্ট করা জরুরী মনে করি যে, উপরোক্ত গ্রন্থ দু'টি আহলে সুন্নাতদের আকীদা ও নীতিকে খারেজী ও শিয়া নীতির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পেশ করেছে। প্রথম গ্রন্থে খোলাফায়ে রাশেদীনের ফযীলত ও উক্তি সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করা হয়েছে। আর ২য় গ্রন্থটি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ফযীলতের উপর লিখিত যা নাম দ্বারাই বুঝা যায়। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষাবলম্বনে বইটি সংক্ষিপ্ত হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। এবার আলোচ্য তাতহীরুল জিনানের একটি উদ্ধৃতি লক্ষ্যণীয়ঃ

مزيد محبته ليزيد اعمت عليه طريق الهدى داوقعت الناس بعده مع ذلك الفاسق المارق فى الردى، لكنه قضاء انحتم وقدر انبرم فسلب عقله الكامل وعمله الشامل ودهاء الذى كان يُضرب به المثل وزين له من يزيد حسن العمل وعدم الانحرف والخلل - كل ذالك لما اشرا اليه الصادق المصدوق صلى اللّه عليه وسلم انه اذا اراد اللّه انفاذ امره فسلب نوى العقول عقولهم حتى ينفذ ما اراده تعالى - فمعاوية معذور فيما وقع فيه ليزيد لانه لم يثبت عنده نقص فيه بل كان يزيد يدس على ابيه من يحسن له حاله حتى اعتقد انه اولى من ابناء بقية الصحابة كلهم فقدمه عليهم مصرحا بتلك الاولوية التى تخيلها ممن سلط عليه ليحننها له واختياره

www.pathagar.com

للناس عن ذالك انما هو لظن انهم انما اكرهو اتوليته لغير فسقه من حسد او نحوه ـ(تطهير الجنان ٥٤ـ مطبعه ميمنيه، ١٣٠٧هـ

"ইয়াযীদের উপর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাত্রাতিরিক্ত মহব্বত তাঁকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে এবং এই ফাসেক ও বেদীনের সাথে অন্যান্যদেরকেও ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে তাকদীরে যা ছিলো বাস্তবে রূপ নিলো। তাঁর বুদ্ধিমত্তার চিন্তা-বিবেকও প্রবাদ তুল্য প্রশাসনিক দক্ষতা ও পারদর্শিতা বিলোপ করে দেয়া হলো। ফলে ইয়াযীদের পূত-পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কলুষমুক্ত জীবন ছবি তাঁর চোখে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠে। এসব কিছু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ীই ঘটেছে। তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা কোনো নির্দেশ কার্যকর করতে চান তখন বুদ্ধিমানের হিতাহিত জ্ঞান ছিনিয়ে এমন পর্যায়ে আনা হয় যাতে আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা কার্যকর করতে পারেন। সুতরাং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদের জন্যে যাকিছু করেছেন তাতে তিনি ছিলেন অক্ষম অসহায়। কেননা, তাঁর দৃষ্টিতে ইয়াযীদের কোনো দোষ প্রমাণিত হয়নি। বরং ইয়াযীদ তার পিতার সামনে এমন চাটুকার লোক সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেয় যারা তার অবস্থাকে সৌন্দর্যের আবরণে পেশ করতো। ফলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হতে থাকে যে, ইয়াযীদ সাহাবীগণের বর্তমান সন্তানদের চেয়ে উত্তম। সুতরাং তিনি এসব ফযীলতের বিশ্লেষণ ও ভিত্তি করে ইয়াযীদকে সকলের উপর প্রাধান্য দেন। আর ফযীলতের এ চিন্তা মূলত সে সকল লোকের সৃষ্ট আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর যাদের প্রভাব বিরাজমান ছিলো। তাতে তারা ইয়াযীদের উত্তম চরিত্রের কথা সুন্দররূপে তুলে ধরতে পারতো। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন, ইয়াযীদকে উত্তরসূরী খলীফা মনোনয়ন দানে বিরোধিতাকারী লোকেরা তার পাপাচারের জন্যে নয় এবং হিংসা ইত্যাদির কারণে নাপসন্দ করে থাকে। বস্তুত এ ধারণার উপর ভিত্তি করেই আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদকে মনোনয়ন দান করেন।"

–(তাতহীরুল জিনান, পৃষ্ঠা–৫৩, মাইমানাহ প্রেস মিসর, ১৩০৭ হিজরী)

এবার কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার আগে ইয়াযীদের চরিত্র নিষ্কলংক থাকা এবং সবদিক থেকে তার খেলাফতের যোগ্য হওয়ার যে চিত্র ওসমানী সাহেব পেশ করেছেন তা একদিকে রাখুন অপরদিকে ইয়াযীদের ধর্মহীনতা, প্রতারণা, চাটুকারিতা এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরাভূত ও

www.pathagar.com

সরলতার যে চিত্র ইবনে হাজার (র) অংকন করেছেন তা সামনে রেখে বিচার-বিশ্লেষণ করুন। ওসমানী সাহেব এরপরও বলছেন, সবলোক ইয়াযীদের জন্যে ছিলো নিবেদিত প্রাণ। সে ছাড়া অপর কারো খেলাফত চালু থাকুক একথা যেন তারা মানতেই রাজি নয়। কিন্তু ইবনে হজর বলছেন, জনগণ হিংসায় কিংবা অন্য কারণে ইয়াযীদের খেলাফত সহ্য করতে রাজি ছিলো না ; তাই এদেরকে দমন করার লক্ষ্যে ইয়াযীদ তার চাটুকারদেরকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর প্রভাবশালী করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠার একটি উদ্ধৃতি দেখুন ঃ

الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول مجتهدون على الصواب الذى لايجوز لاحدان يعتقده غيره - لكنهم مع ذالك قديقع من احدهم مما لايليق بمقامه فيعذر له بالنسبة اليه كاستخلاف معاوية يزيد - فان مزيد محبة الولد زين له روية كما له واعمى عنه روية عيوبه التى هى اوضح من الشمس فى رابعة النهار - فهذا بحسب كمال معاوية زلة يغفر الله له ولا يجوز التاسى به فيها فمن تاسى به فيها كب على متخريه فى النار -

"সম্মানিত সাহাবীগণের সকলেই এমন পর্যায়ের ন্যায়বান, মুজতাহিদ ও সত্যনিষ্ঠ যে তাছাড়া তাঁদের সম্পর্কে অন্য কোনো ধরনের আকীদা পোষণ করা কারো জন্যে জায়েয নেই। এতদসত্ত্বেও তাদের দ্বারা এমন ধরনের কাজও হয়ে গেছে যা তাদের মর্যাদার সাথে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয় ; আবার সেটা ওজররূপেও পেশ করা যায় না। যেমন, ইয়াযীদকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্থলাভিষিক্ত বানানো এ ক্ষেত্রে পুত্রসুলভ স্নেহ বাৎসল্য ইয়াযীদের গুণকে সুন্দরের আবরণে সুশোভিত করে দেয়। আর দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বলতর দোষ-ত্রুটি তাঁর দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। মর্যাদার তুলনায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজ একটি পদস্খলন ; আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন। তবে এ বিষয়ে তাঁকে অনুসরণ করা জায়েয নেই। যে তাকে এ বিষয়ে অনুসরণ করবে সে মুখ থুবড়ে দোযখে প্রবেশ করবে।"

একই কিতাবের ৬৬ পৃষ্ঠায় ইবনে হাজার বলেছেন ঃ

اننا فرقنا بينه وبين ولده واعطينا كلاً ما يستحقه لانا متعبدون بالادلة من غير عصبية ولا علة - لو كان الامر بالتعصب والمحاباة لما خالفنا معاوية

www.pathagar.com

في ولده الذى قال فيه لولا هواى فيه لرأيت قصدى اى لهديت الى اوسط الامور واعدلها فى استخلاف غيره ـ

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার ছেলের মধ্যে আমরা যথাযোগ্য পার্থক্যের ইনাসাফপূর্ণ সীমারেখা অনুসরণ করেছি এবং উভয়ের ব্যাপারে সে কথাই বলেছি তারা যার হকদার ছিলো। কেননা আমরা কারো পক্ষপাতিত্ব কিংবা অসন্তুষ্টির পরোওয়া না করে কেবলমাত্র দলীল-প্রমাণের অনুসরণে আগ্রহী। যদি আমাদের ব্যাপারটি গোঁড়ামী ও পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে অনুসৃত হতো, তাহলে আমরা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এমন ছেলের ব্যাপারে তাঁর সাথে মতানৈক্য পরিহার করে চলতাম যার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যদি তার প্রতি আমার স্নেহ মমতা না থাকতো তাহলে আমি সত্য পথের সন্ধান পেয়ে যেতাম। অর্থাৎ ইয়াযীদের স্থলে অপর কাউকে স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে উত্তম ও ন্যায়ানুগ পন্থা গ্রহণ করতাম।"

এই ইমাম ইবনে হাজার (রা)-এর কোনো কোনো লেখার উদ্ধৃতি নির্ভর করে আল বালাগের সম্পাদক সাহেব সাহাবীদের আদালত (বিচার বিশ্লেষণ) সম্পর্কে যে মনগড়া দৃষ্টিভংগী ও বিশ্বাস পেশ করার চেষ্টা করেছেন সে বিষয়ের আলোচনা পরে হবে। কিন্তু ইয়াযীদের মনোনয়নের বৈধতার অনুকূলে জাতীয় ঐকমত্যের যে দাবী, ফতওয়া জনাব সম্পাদক সাহেব দিয়েছেন তা সামনে রেখে আমি শুধু এটাই জিজ্ঞেস করতে চাই যে, ইবনে হাজার (র) সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য কি ? তিনি বলেছেন, ফাসেক ও পাপিষ্ঠ ছেলের প্রতি মহব্বতের আতিশয্যে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেন এবং পরবর্তীতে যারা তাঁর অনুসরণ করবে তারা মুখ থুবড়ে দোযখে প্রবেশ করবে। পরন্তু একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ইবনে হাজার (র) নিছক ঐতিহাসিক আলোচনা করেননি বরং তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তুই হলো হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত প্রমাণ করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগ বাতিল প্রমাণ করা। অধিকন্তু অভিযোগকারীদের সন্দেহ ও অভিযোগসমূহ থেকে জনগণের চিন্তা-চেতনা ও ভাষ্য পরিচ্ছন্ন করা। এতদসত্ত্বেও মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যাকিছু লিখেছেন, যে পরিশীলিত ভাষায় লিখেছেন তার চাইতে কঠোর ও স্পষ্টভাবে লিখেছেন ইবনে হাজার (র)। তার নমুনা আমি এখানে উল্লেখ করেছি। এরপরও মাওলানা ওসমানী সাহেব মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব সম্পর্কে মন্তব্যের ঢিল ছুঁড়ে দিলেন যে, তাঁর মতে ইয়াযীদ ঔরসজাত সন্তান হওয়া সুবাদে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মহব্বতের আতিশয্যে তাকে খেলাফতের আসনে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন

www.pathagar.com

বলে এ জাতীয় উক্তি ও মত যারা পোষণ করে, তারা মূলত অন্যায়-যুলুমেরই অনুসরণ করে থাকে।

ইয়াযীদের মার্জনা ?

রোমান যুদ্ধ এবং তাতে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমা করার শুভসংবাদ সম্বলিত যে হাদীস বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ রয়েছে তার সূত্র ধরে কোনো কোনো বুযুর্গ ইয়াযীদের মর্যাদা ও ফযীলত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ আমার কাছে এ শুভসংবাদের উপরও আলোচনা করার আবেদন করেছেন। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ যদি কখনো সময়-সুযোগ দান করেন তাহলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্ববিস্তারে আলোচনার আশা রইল। এখানে আমি তাৎক্ষণিকভাবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের (র) প্রণীত শরহে তারাজুমে বুখারীর একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করছি। সংক্ষেপ হলেও সেটি ব্যাপক ও সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। তিনি কিতাবুল জিহাদ ما قيل فى قتال الروم শিরোনামে বলেছেন ঃ

قوله مغفور لهم تمسك بعض الناس بهذا الحديث فى نجاة يزيد لانه كان من جملة هذا الجيش الثانى بل كان رأسهم رئيسهم على مايشهد به التواريخ والصحيح انه لايثبت بهذا الحديث الاكونه مغفورا له ما تقدم من ذنبه على هذه الغزوة لان الجهاد من الكفارت دشأن الكفرات ازالة اثار الذنوب السابقة عليها لا الواقعة بعدها - نعم لو كان مع هذا الكلام انه مغفور له الى يوم القيامة لدل على نجاته وليس فليس - بل امره مفوض الى اللّه تعالى فيما ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة من قتل الحسين عليه السلام وتخريب المدينة والاصرار على شرب الخمر - ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه كما هو مطرد فى حق سائر العصاة على ان الاحاديث الواردة شان من استخف بابعتره الطاهرة والملحد فى الحرم والمبدل للسنة تبقى مخصصات لهذا العموم لو فرض شموله لجميع الذنوب -(شرح تراجم ابواب صحيح البخارى دائرة المعارف العثمانه ٢٦٨)

“مغفور لهم তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, রাসূলের এ বাণীকে দলীল বানিয়ে কোনো কোনো লোক ইয়াযীদের মুক্তিলাভ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কেননা, সেও অন্যান্য সৈন্যদের সাথে দ্বিতীয় দলের

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত বরং ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী সেনাপতি ছিলো। কিন্তু সঠিক কথা ছিলো, এ হাদীস দ্বারা শুধু এতোটুকু প্রমাণ হয় যে, ইয়াযীদের যুদ্ধের আগে কৃত গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। কেননা, জিহাদ গোনাহের কাফ্ফরা হয়ে থাকে। আর কাফ্ফারা কেবল অতীত বা পিছনের গোনাহ দূরীভূত হওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরের ব্যাপারে নয়। হ্যাঁ, রাসূলের বাণীতে যদি কিয়ামত পর্যন্ত মার্জনার কথা বর্ণিত থাকতো, তাহলে তার মুক্তিলাভ প্রমাণ হওয়ার কথা ছিলো। এরূপ বাক্য যেহেতু হাদীসে উল্লেখ নেই, তখন নাজাত পাওয়ার কথাও প্রমাণ হতে পারে না। বরং প্রসংগটি আল্লাহর উপর সোপর্দ করাই শ্রেয়। এ যুদ্ধের পর সে যে ধরনের পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে অর্থাৎ হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা, মদীনা শরীফের ধ্বংস এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকা। অন্যান্য পাপাচারীদের ন্যায় ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করতে পারেন আবার ইচ্ছা হলে শাস্তিও দিতে পারেন। অন্যান্য গোনাহগারদের দলে তার অন্তর্ভুক্তির কথা মেনে নিলেও তাদের জন্যে নির্ধারিত সাধারণ নীতি (তাদেরকে ক্ষমা ও শাস্তি উভয়টি দেয়ার সম্ভাবনা) ইয়াযীদের বেলায় প্রযোজ্য হওয়ার কারণ নেই ; বরং আহলে বাইতের অবমাননা, হারাম শরীফে পাপাচার অনুষ্ঠান এবং সুন্নাত পরিবর্তন পরিবর্ধনকারীদের জন্যে হাদীসসমূহে যে শাস্তি ও দণ্ডের হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে ইয়াযীদের ক্ষেত্রে সেটাই কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা ষোলআনা।"

অতিরিক্ত যে কথার প্রতি ইংগীত করা আমি যথার্থ মনে করি তাহলো, ঐতিহাসিক রাওয়ায়েতসমূহকে যারা তীব্র ভাষায় অস্বীকার করে ইতিহাসের সাহায্য হিসাবে তারাও যুদ্ধের এ হাদীসকে ইয়াযীদের উপর প্রয়োগ বলে মেনে নিতে বাধ্য। কেননা, হাদীসে ইয়াযীদের কথা উল্লেখ নেই এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার নাম নিয়ে শুভসংবাদ দেননি। অধিকন্তু ঐতিহাসিক বর্ণনায় ইয়াযীদ আলোচ্য সৈন্যদের মধ্যে শামিল ছিলো কি ছিলো না, সে ব্যাপারে কিছুটা মতবিরোধের কথাও উল্লেখ রয়েছে। যদি থেকে থাকে তাহলে প্রথমে সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো নাকি ২য় সৈনিকদের ? কি পর্যায়ে ছিলো, সেকি নিজে গিয়েছিলো নাকি পাঠানো হয়েছিলো ? ইত্যাকার প্রশ্ন যথাস্থানে থেকেই যায়। তবে আমার যা বলার তাহলো, ইয়াযীদের যেসব ভক্ত-অনুরক্ত ইতিহাসকে সাগরে নিক্ষেপ করতে চায়, তাদের এ ক্ষতির দিকেও নজর রাখা দরকার যে, ইতিহাসকে ঘোলা পানিতে ডুবিয়ে দেয়ার পর শুধুমাত্র কুরআন-হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইয়াযীদের ফযীলত ও মর্যাদা উদ্ভাবন করা বড় কঠিন ব্যাপার। কেননা, কুরআন-হাদীস ইয়াযীদের বর্ণনা থেকে পাক-পবিত্র।

www.pathagar.com

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের উক্তিসমূহ

পরিশেষে এ প্রসঙ্গে আমি মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব প্রণীত 'শহীদে কারবালা' পুস্তকের কতিপয় উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে চাই। শ্রদ্ধেয় মাওলানার সুযোগ্য সন্তান তো অবশ্যই গ্রন্থটি পাঠ করে থাকবেন। কিন্তু অন্যান্য পাঠকগণ সম্ভবতঃ গ্রন্থটি পাঠ করেননি। জনাব মুফতী সাহেবের উক্তি শিরোনামসহ নিম্নরূপ ঃ

ইসলামী খেলাফতের উপর এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা১

খেলাফতের ধারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত পৌঁছামাত্রই খেলাফতে রাশেদার রং বিলীন হয়ে রাজতন্ত্রের আকার ধারণ করে। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দেয়া হলো—বর্তমান যুগ নানা জাতীয় ফেতনায় নিমজ্জিত ; আপনি এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে আপনার অবর্তমানে পুনরায় মুসলমানদের মধ্যে তলোয়ারের মরণ আঘাতে ইসলামী খেলাফত টুকরা টুকরা হওয়া থেকে বাঁচতে পারে। অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরামর্শের এ পর্যায় যুক্তিসংগত ও শরীয়াতসম্মতই ছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই উত্তরসূরী খলীফারূপে তাঁর ছেলে ইয়াযীদের নাম পেশ করা হয়। কুফা থেকে আগত কিংবা প্রেরিত ৪০জন তোষামোদী লোক এসে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রস্তাব করলো, আপনার পুত্র ইয়াযীদ অপেক্ষা দ্বিতীয় কোনো যোগ্য ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ আমাদের দৃষ্টিতে বর্তমান নেই। সুতরাং উত্তরকালীন খলীফা হিসাবে তার সমর্থনে বাইয়াত নেয়া দরকার। প্রথম দিকে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুটা ইতস্তত বোধ করতঃ নিজের বিশিষ্ট লোকদের সাথে পরামর্শ করেন। এতে মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ সমর্থন করলেন, আবার কেউ বিরোধিতার মত প্রকাশ করলেন। ইয়াযীদের পাপাচারের কথা তখনো প্রকাশ পায়নি। পরিশেষে ইয়াযীদের সপক্ষে বাইয়াত নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম ভয়াবহ দুর্ঘটনা যার কবলে পড়ে খেলাফতে নবুওয়াত রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ইসলামের ইতিহাসে বাইয়াতে ইয়াযীদের দুর্ঘটনা

জানা নেই চাটুকাররা কিভাবে যে ইয়াযীদের নামে বাইয়াতের শ্লোগানে সিরিয়া ও ইরাকের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললো এবং ছড়িয়ে দেয়া হলো যে, সিরিয়া, ইরাক, কুফা ও বসরার লোকেরা ইয়াযীদের বাইয়াতের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। এবার হেযাযের প্রতি নযর দেয়া হলো। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে মক্কা-মদীনার গভর্নরকে এ কাজ আনজাম

১. সমস্ত শিরোনাম মুফতি সাহেবের প্রস্তাব ক্রমেই লিখিত।

www.pathagar.com

দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। মারওয়ান তখন মদীনার গভর্নর। সে খুতবায় জনগণকে বললো, আমীরুল মু'মিনীন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পন্থানুযায়ী তার পরবর্তী খলীফারূপে ইয়াযীদের সমর্থনে বাইয়াত গ্রহণের ইচ্ছা করেছেন। আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, এটা ভুল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদ্ধতি এটা নয়। বরং এটা কাইসার ও কেসরার নীতি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের সন্তানদের খেলাফত দেননি এবং স্বীয় আত্মীয়দেরকেও প্রদান করেননি। হেযাযের জনগণের আহলে বাইয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। বিশেষত হযরত হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি যাকে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর খেলাফতের যোগ্যতম উত্তরসূরী বলে সংগত কারণেই মনে করা হতো। এ ব্যাপারে তারা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখাতের রায়ের অপেক্ষায় ছিলো যে, তারা কি ভূমিকা নিচ্ছেন। এ সকল মনীষীদের দৃষ্টিতে প্রথমত কুরআন-হাদীসের সে নীতি বর্তমান ছিলো যে, ইসলামী খেলাফত মূলতঃ নবুওয়াতে খেলাফত এখানে উত্তরাধিকারী সূত্রের কোনো দখল নেই যে, পিতার পর পুত্র খলীফা হবে। বরং অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে খলীফা নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফা রূপে ইয়াযীদকে মেনে নেয়ার পক্ষে তার ব্যক্তি চরিত্রও ছিলো বিরাট অন্তরায়। এ সকল মনীষীগণ এ ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করেন এবং তাদের অনেকেই তাতে আমরণ অটল থাকেন। এ সত্য কথন ও ন্যায়ের সমর্থনের পরিণামে মক্কা, মদীনা ও তার আশেপাশে এবং কুফা ও কারবালায় অবাধ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা মুআয্যামায়

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। এখানে এসে প্রথমে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে এনে বললেন ঃ ভাতিজা ! তুমি আমাকে বলতে 'আমীর বিহীন অবস্থায় একটি রাতি যাপন করাও আমার পসন্দনীয় নয়।' এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ইয়াযীদের সমর্থনে খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেছি যাতে আমার পর মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে না পড়ে। গোটা জাতি এ বিষয়ে একমত। অথচ কি আশ্চর্য ! তোমার ভূমিকা এ ক্ষেত্রে বিরোধী মানসিকতায় জড়িত। আমি

www.pathagar.com

তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই, মুসলমানদের ঐকমত্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করো না আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগানো থেকে বিরত থাকবে।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হামদ ও সানার পর বললেন ঃ আপনার আগেও খলীফা ছিলেন এবং তাদেরও সন্তানাদি ছিলো। আপনার ছেলে তাদের ছেলেদের অপেক্ষা বিন্দুমাত্র উত্তম নয়। কিন্তু স্বীয় পুত্রের জন্যে আপনি যা করছেন তারা তাদের ছেলেদের জন্যে সে জাতীয় রায় প্রতিষ্ঠা করেননি ; বরং তারা মুসলমানদের বৃহৎ স্বার্থ সামনে রেখেছেন। আপনি আমাকে জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ভয় দেখাচ্ছেন। সুতরাং আপনি স্মরণ রাখবেন, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ আদৌ আমি হতে চাই না। আমি মুসলমানদেরই একজন। যদি সমগ্র জাতি কোনো পথে অগ্রসর হয়, তাহলে আমিও তাদের মধ্যে শামিল থাকবো।

এরপর আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এ ব্যাপারে কথাবার্তা হয়। তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, আমি কখনো তাকে স্বীকার করে নিতে পারি না। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বলার পর তিনিও অনুরূপ জবাব দেন।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মিলিতভাবে সঠিক পরামর্শদান

পরবর্তীতে হযরত হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখগণ হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে বলেন, স্বীয় পুত্রের সমর্থনে খেলাফতের বাইয়াতের জন্যে চাপ দেয়া কোনোক্রমেই আপনার জন্যে উচিত হবে না। আমরা আপনার সামনে আপনার পূর্বসূরীদের অনুসৃত তিনটি পদ্ধতি পেশ করছি ঃ

(১) আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি অনুসরণে কাউকে নির্ধারণ না করে বরং মুসলমানদের অবাধ মতামতের উপর বিষয়টি ছেড়ে দিন।

(২) অথবা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহীত পন্থানুযায়ী এমন একজনের নাম পেশ করুন, যে আপনার বংশের নয়, আপনার সাথে তার আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক নেই, তদুপরি তার যোগ্যতার উপর গোটা মুসলিম জাতি একমত।

www.pathagar.com

(৩) কিংবা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ছয় সদস্যের কাউন্সিল গঠন করে দিন। আপনার অবর্তমানে উক্ত কাউন্সিল বিষয়টির চূড়ান্ত ফায়সালা করে নিবে।

এছাড়া চতুর্থ কোনো পদ্ধতির কথা আমাদের বুঝে আসে না এবং তা গ্রহণ করতেও আমরা প্রস্তুত নই। কিন্তু মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একথায় জিদ ধরে রইলেন যে, এখন তো ইয়াযীদের হাতে খেলাফতের বাইয়াত সম্পন্ন হয়ে গেছে; সুতরাং এর বিরোধিতা করা আপনাদের জন্যে জায়েয নেই।—[শহীদে কারবালা, দারুল ইশাআত, মৌলভী মুসাফিরখানা, করাচী, পৃষ্ঠা—১১-১৬]

এবার মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মন্তব্যের উপর 'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেব যেভাবে সমালোচনা এবং যে ধরনের সারসংক্ষেপ বের করেছেন যদি অপর কোনো ব্যক্তিত্ব অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করে তাহলে সে বলতে পারে, ইয়াযীদের সমর্থনে বাইয়াত গ্রহণ বিষয়টি এক ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি আর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন তোষামুদ প্রিয় লোক সাব্যস্ত করা নিয়তের উপর হামলার শামিল—যার অধিকার কাউকে দেয়া যায় না। আর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে একথা বলা যে, তিনি স্বীয় পুত্রকে ভবিষ্যতে খেলাফতে অধিষ্ঠিত করার জন্যে প্রোপাগাণ্ডায় নিয়োজিত ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি সাহাবীদেরকে ভয়-ভীতির আশ্রয়ে কথা বলতেও দ্বিধা করতেন না। এভাবে তাঁকে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির দায়ে অভিযুক্ত করার এক স্বচ্ছ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমি মনে করি মরহুম মাওলানার লেখায় এ ধরনের অর্থের রং ছড়ানোর এবং তাথেকে এ জাতীয় ফল বের করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিকর। বরং এ পর্যায়ে তিনি যাকিছু বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক এবং ঐতিহাসিক তথ্যের ধারাবাহিকতায় যথার্থ ও প্রমাণিত সত্য। অবশ্য মাওলানা তাকী সাহেবকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে চাই আর সেটা হলো, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবও (র) যখন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখদের রায় বিনা দ্বিধায় উল্লেখ করছেন যে, কিতাব ও সুন্নাতের নীতি হলো, খেলাফতে ইসলামীয়া খেলাফতে নবুওয়াতেরই অংশ বিশেষ এতে উত্তরাধিকারী সূত্রের কোনো দখল নেই যে, পিতার পর পুত্রকেই খলীফা হতে হবে। মুফতী সাহেবের উক্তি অনুযায়ী ইয়াযীদকে উত্তরকালীন খলীফা হিসাবে মনোনীত করা একটি ষড়যন্ত্র যা ইসলামী খেলাফত এমনকি খোদ ইসলামের জন্যে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ছিলো। তাহলে এর অনুকূলে

www.pathagar.com

বৈধতার প্রশ্ন এবং ঐকমত্যের উপাদান কোথা থেকে আমাদানী হলো আল বালাগ যার প্রমাণ দিতে প্রাণপাত চেষ্টায় নিয়োজিত ? আমি বিস্ময়ে অভিভূত যে, ইয়াযীদের মতো পুত্রের জন্যে খেলাফতের মনোনয়ন দান বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এজমার দাবী করার পর শিয়া আকীদার উপর আপত্তি-অভিযোগের এমন কি কারণ অবশিষ্ট থাকতে পারে ? তাদের দাবীও তো এটাই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেছেন। অতপর এমনি ধারায় পিতার পর পুত্রের প্রতি ইমামতের আসন স্থানান্তরিত হতে থাকে।

আওজাযুল মাসলিক প্রণেতার বর্ণনা

শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র) সাহেব মুআজায়ে ইমাম মালেকের ব্যাখ্যা আওজাযুল মাসলিক নামক গ্রন্থে হাররার অত্যাচারের যে লোমহর্ষক ব্যাখ্যা কিতাবুল মিরাসে উল্লেখ করেছেন তার পূর্ণ মতন (মূল বাক্য) এবং অনুবাদ এখানে তুলে ধরা কলেবর বৃদ্ধির কারণ। তাই তফসীল বাদ দিয়ে সংক্ষেপে আমি শুধুমাত্র অনুবাদ তুলে ধরছি। তিনি বলেছেন ঃ

"ইয়াযীদের যে সেনাবাহিনী মদীনা আক্রমণ করেছিলো তাদের মধ্যে ২৭ হাজার অশ্বারোহী এবং ১৫ হাজার পদাতিক। তিন দিন পর্যন্ত অবাধে চলেছিলো গণহত্যা ও ধর্ষণের পাশবিক উল্লাস। ২ হাজার মহিলা নির্যাতীতা ও ধর্ষণের শিকার হয়। কুরাইশ ও আনসারদের মধ্যে প্রায় ৭শ বিশিষ্ট লোক শহীদ হন। দাস-দাসী, নারী ও শিশু হত্যার পরিমাণ ছিলো ১০ হাজার। এরপর ইবনে ওকবাহ ক্রীতদাস-দাসীর মতো বাইয়াত গ্রহণে লোকদেরকে বাধ্য করে। এ মর্মে যে, তারা তার গোলাম স্বরূপ, ইচ্ছা করলে তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে, ইচ্ছা করলে হত্যা করা হবে। বুখারী সূত্রে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব বর্ণনা করেছেন, এ সংঘর্ষে হুদাইবিয়ার কোনো সাহাবী প্রাণে বাঁচতে পারেননি। মদীনাবাসী প্রথম দিন থেকেই ইয়াযীদের নেতৃত্বের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। তারা ইয়াযীদের মদ্যপান, পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, কবীরা গোনায় জড়িয়ে পড়া এবং মানুষের সম্ভ্রম পদদলিত করার কথা শুনে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আবদুল্লাহ বিন হানজালাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু গাসিলে মালায়েকাহ বলতেন, আল্লাহর কসম ! ইয়াযীদের বিরুদ্ধে আমরা তখনি কেবল অস্ত্রধারণ করি যখন আমাদের আশংকা হচ্ছিলো যে, নাজানি আমাদের উপর পাথর বর্ষিত হয়ে যায়। লোকটি (ইয়াযীদ) উম্মে আওলাদকে বিয়ে করত, মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং নামায ছেড়ে দিতো। ইবনে কুতাইবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হাররার ঘটনার পর কোনো বদরী সাহাবী

www.pathagar.com

জীবিত ছিলেন না। পরিশেষে ওকবা ইবনে ইয়াযীদকে লিখলো, আমরা শত্রুদেরকে খতম করে দিয়েছি। যে সামনে এসেছে তাকেই হত্যা করেছি, যে পালাতে চেয়েছে তাকেও শেষ করেছি আর যারা আহত হয়েছে তাদেরকেও জীবিত রাখা হয়নি।"

–(আওজাযুল মাসলিক–খণ্ড, ৫, পৃষ্ঠা–৪৩৫, সন ১৩৭৬ শাহারানপুর)

দুই ঃ মতপার্থক্যের উপর পীড়াপীড়ি

জনাব মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব ইয়াযীদের মনোনয়ন দান প্রসংগে যে আলোচনা করেছেন আমার পর্যালোচনায় এর দুর্বলতাগুলো আমি স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছি। কিন্তু তিনি আমার কথা রদ করতে গিয়ে আবার লিখলেন, "মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে আমাদের মতপার্থক্য হলো, তার মতে এটা শুধুমাত্র রায়ের সুবিবেচনা প্রসূত ভ্রান্তি ছিলো না। বরং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মুগীরা বিন শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তি স্বার্থই ছিলো এর মূল প্রেরণাদায়ী শক্তি।" আফসোস, ওসমানী সাহেব এখনো শাব্দিক দ্বন্দ্ব ও ভ্রান্তির চক্কর থেকে মুক্ত হতে পারেননি। আমার জিজ্ঞাস্য, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কোথায় লিখেছেন যে, এ ত্রুটি দীনদারী কেন্দ্রিক ছিলো না। দীনদারী গায়ের দীনদারীর এ বিতর্ক তো আপনার কাল্পনিক আবিষ্কারের অবাঞ্ছিত ফলশ্রুতি। বাস্তবে এমনটি হওয়া কি অসম্ভব যে, কোনো লোক স্নেহের আতিশয্যে স্বীয় পুত্রকে গোটা জাতির মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত সাব্যস্ত করে এবং তা একান্ত নিষ্ঠার সাথেই। অথচ বাস্তবে তার পুত্রটি অনুপযুক্তের সেরা। এমনিভাবে স্নেহ ও ভালোবাসা ছাড়া কোনো সময় মানুষের স্বার্থ তার মত ও বিবেচনা শক্তিকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, সে একটি মারাত্মক ভুল করে বসে অথচ তার উদ্দেশ্য ও ধারণা মতে সে একটি ভালো ও কল্যাণধর্মী কাজই করছে। মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেবের দাবী এটাই যার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা তিনি সেখানেই এভাবে করেছেন—ইয়াযীদ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এরূপ মর্যাদার লোক ছিলো না যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র হওয়া থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ তার সম্পর্কে বিবেচনা করবে যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর জাতীয় নেতৃত্বের সে যোগ্যতম পাত্র। আমার বুঝে আসছে না সরল কথাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায়? ইয়াযীদের দোষ-ত্রুটি ও পাপাচার ইবনে হাজার মক্কীর ভাষায় দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার ছিলো। এগুলো যদি পিতার অগোচরে থেকে যায়, তাহলে এর কারণ এছাড়া আর কিইবা হতে পারে যে, সন্তানের বিমল ভালোবাসা এবং তার উদার স্বার্থ চিন্তা মাঝপথে পর্দার আড়াল সৃষ্টি করে রেখেছিলো। ওসমানী সাহেব ইয়াযীদের যোগ্যতা ও পবিত্রতার যে

www.pathagar.com

জোরালো সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন তার সঠিকতা ও সততার অনুমান করার জন্যে কতিপয় আলেমের আরো কিছু মন্তব্য উল্লেখ করা হলো।

মাওলানা আবদুল হাইয়ের ভূমিকা

লক্ষ্ণৌর মাওলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গী মহল্লীর কাছে ইয়াযীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তার সম্বন্ধে কি ধরনের আকীদা রাখা দরকার। জবাবে তিনি বললেন ঃ কোনো কোনো লোক বাহুল্যের আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, ইয়াযীদ যখন সকলের ঐকমত্যে মুসলমানদের আমীর হয়েই গেলো তখন তার আনুগত্য করা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ওয়াযিব ছিলো। কিন্তু তারা জানে না যে, তার খেলাফতের উপর মুসলমানদের ঐকমত্য কখন হলো? সাহাবী এবং আওলাদে সাহাবাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ তার আনুগত্যের বাইরে ছিলো। আর যারা তার আনুগত্য স্বীকার করেছিলো তারাও ইয়াযীদের মদ্যপান, নামায পরিত্যাগ, ব্যভিচার ও মাহরামের হারামকারীর কথা জানতে পেরে মদীনা ফিরে এসে পূর্বকৃত বাইয়াত বাতিল করে দেন। কেউ কেউ বলে থাকে, ইয়াযীদ হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়নি। সে একাজ করতে রাজীও ছিলো না এবং ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বাইতের হত্যার পর সে খুশী হয়নি। অথচ এসব কথা সম্পূর্ণ বাতিল। আল্লামা তাফতাযানী (র) শরহে আকায়েদে নফসীতে লিখেছেন, (তরজমা) সত্য কথা হলো যে, ইয়াযীদ ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডে রাজী ছিলো এবং এ কাজে তার খুশী হওয়া ও আহলে বাইতকে লাঞ্ছিত করার বর্ণনা মর্মগতভাবে মুতাওয়াতির তথা রাওয়ায়েতের পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যদিও এ সবের তফসিলী ব্যাখ্যা খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের। কেউ বলেছেন, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড কবীরা গুনাহ—কুফরী নয়। আর লানত করা আসলে কাফেরদের জন্যে নির্ধারিত। এসব লোকদের বুদ্ধিমত্তা ও বোধগম্যতা সম্পর্কে কি বলবো ! তাদের জানা নেই যে, কুফরী তো একদিকে কেবলমাত্র দু' জাহানের রাসূলকে কষ্ট দেয়ার পরিণাম কত যে ভয়াবহ হতে পারে ?

কারো কারো মতে ইয়াযীদের শেষ পরিণতি কারো জানা নেই। সম্ভবত কুফরী ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পর সে তাওবা করে নিয়েছে এবং এর উপরই তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ইমাম গাজ্জালী এহইয়ায়ে উলূম গ্রন্থে একথারই ইংগীত দিয়েছেন। তবে স্মর্তব্য যে, এ তাওবা এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকার কথাটি কেবল সম্ভাবনা বা ধরে নেয়া পর্যায়ের। অন্যথায় এ নরাধম উম্মতের মধ্যে যেসব কাণ্ড ঘটিয়েছে এমনটি আর কেউ করেনি। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বাইতকে অপমান ও হত্যার পর পুণ্যভূমি

www.pathagar.com

মদীনার ধ্বংস ও মদীনাবাসীকে হত্যা করার জন্যে পাঠায়। হাররার ঘটনায় তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান ও নামায বন্ধ থাকে। তারপর তার সেনাবাহিনী মক্কা চড়াও হয় যার পরিণতিতে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার মূল হেরেমে শাহাদাত বরণ করেন। অতপর এহেন অপকর্মে লিপ্ত থাকাবস্থায় ইয়াযীদের মৃত্যু ঘটে এবং এ পৃথিবী সমহিমায় পবিত্র ও স্বচ্ছ হয়ে উঠে।-(ফতওয়ায়ে মাওঃ আবদুল হাই, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮ শওকত ইসলাম প্রেস, লক্ষ্ণৌ, ১৩০৯ হিজরী। ফতওয়ায়ে মাওঃ আবদুল হাই মোবায়ের, ৭৯ পৃষ্ঠা, কুরআন মহল মৌলভী মুসাফির খানা, করাচী।)

শেখ আবদুল হক (র)-এর অভিমত

শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) তাঁর রচিত 'তাকমীলুল ঈমান' تكميل الايمان গ্রন্থে যাকিছু লিখেছেন তার অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"কোনো কোনো সুন্নী আলেম ইয়াযীদের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেন। আবার কেউ কেউ তার মান-মর্যাদায় অতিরঞ্জনের রং ছড়িয়ে বলেন, অধিকাংশ মুসলমানের উপর যেহেতু সে আমীর মনোনীত হয়ে গিয়েছিলো, তাই তার আনুগত্য করা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উচিত ছিলো। نعوذ بالله من هذا القول ومن هذا لاعتقاد (এরূপ কথা ও আকীদা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্তমানে ইয়াযীদ আমীর হয় কিভাবে আর এ বিষয়ে মুসলমানদের ঐকমত্যই বা ওয়াযিব হলো কিরূপে ? অথচ সে সময় সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের আওলাদগণ বর্তমান ছিলেন। তাঁরা তার আনুগত্য অস্বীকার করার কথা ঘোষণাও করেছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে কতিপয় লোককে জোর করে সিরিয়া পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তারা ইয়াযীদের অপসন্দনীয় কাজ দেখে মদীনায় ফিরে এসে অন্তবর্তীকালীন বাইয়াত বাতিল ঘোষণা করেন। এখানে তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, সে (ইয়াযীদ) আল্লাহর দুশমন, মদ্যপ, নামায বর্জনকারী, ব্যভিচারী, ফাসেক। মাহরাম স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতেও সে বিরত হয় না। আমাদের মতে ইয়াযীদ সবচেয়ে বেশী আতিশয্য ব্যক্তি। এ দুরাচার লোকটি যে অপকর্ম করেছে উম্মতের কোনো লোকের পক্ষে এ জাতীয় কর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং অপর ঈমানদার লোকদের মন- মানসিকতাকে ইয়াযীদের মহব্বত, ভালোবাসা এবং তার সহায়তা ও আশ্রয়দাতাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা থেকে হেফাজত করুন। কেননা এ হতভাগা ও তার সহযোগীরা আহলে বাইতের মান-ইজ্জত,

www.pathagar.com

হক অধিকার পদদলিত করতে সদা সচেষ্ট ছিলো এবং তাঁদের মহব্বত ও ভক্তি বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত ছিলো।"-[তাকমীলুল ঈমান, মাওঃ আহমদ রেজা খানের নোটসহ ১৭৮ পৃষ্ঠা, লাহোর, ১৯৭০ইং]

কাযী জয়নুল আবেদীন সাজ্জাদ তার রচিত তারীখে মিল্লাত (تاریخ ملت) গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি স্বীয় আসনের জন্যে যে ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন সে বাস্তবে এর উপযুক্ত ছিলো না। আসলে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও তাকে উপযুক্ত মনে করতেন না। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা তো স্বতন্ত্র, ইয়াযীদ নিজেও নিজের অবস্থা দৃষ্টে এটাকে অসম্ভব মনে করতো। সুতরাং সর্বপ্রথম এ প্রস্তাব তার কাছে পেশ করা হলে সে চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, এ কাজও কি সম্ভব ?-[তারিখে মিল্লাত, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৫, নদওয়াতুল মোসনিফীন, দিল্লী ১৯৫০ইং)

এবার লক্ষ্যণীয় একদিকে দেশ বরেণ্য আলেম ও পূর্ববর্তী ইমামগণের মন্তব্য যা ইয়াযীদ চরিত্রের এহেন কুৎসিত ও কদর্য চিত্র ফুটিয়ে তোলে, অপরদিকে আমাদের মাওলানা ওসমানী সাহেবের অবস্থান তার মতে ইয়াযীদের অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার তথ্য সঠিক ও প্রমাণিত নয় ; আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সৎ উদ্দেশ্যেই পরবর্তী খলীফা হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং এ মনোনয়ন জায়েয ছিলো। অতপর তিনি আমার এ প্রশ্নেরও অবতারণা করেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নেক নিয়তের সাথে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বাক্য, 'নেক নিয়তের' মধ্যে কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে যে, ইয়াযীদকে উত্তরাধিকারী খলীফা মনোনীত করার আন্দোলন বিশুদ্ধ চেতনার উপর ভিত্তি করে উত্থিত হয়নি। উত্তরে আমি ওসমানী সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে চাই, একটি ভ্রান্ত কাজ শুধুমাত্র 'নেক নিয়তের' দরুন যদি সম্পূর্ণ সঠিক ভিত্তিশীল বলে স্বীকৃতি পায় এবং সমস্ত অভিযোগের উর্ধে উঠে যায় আর মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বাক্য কোনোক্রমেই আপনার মানসিক ফ্রেমে ফিট না হয়, তাহলে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) সাহেবের এ উক্তি কেমনভাবে ফিট হলো যে, কুফা থেকে ৪০জন চাটুকার লোক পাঠানো হলো ; তারা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে দরখাস্ত করলো, আপনার পর ইয়াযীদ অপেক্ষা যোগ্যতর ও রাজনীতি বিশারদ অপর কোনো লোক আমাদের দৃষ্টিতে দেখা যায় না। পরিশেষে ইয়াযীদের স্বপক্ষে বাইয়াত নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে নবুওয়াত আশ্রয়ী খেলাফত রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে ইসলামের প্রথম ভয়াবহ দুর্ঘটনারূপে চিহ্নিত হয়।

www.pathagar.com

ওসমানী সাহেব এবং তাঁর মুরব্বীদের ভাষ্য

ওসমানী সাহেব আমার প্রতিউত্তরে তার সম্মানিত পিতার ভাষ্য এবং অন্যান্য অনেক কথাই তিনি স্বজ্ঞানে হজম করে যান। কিন্তু আপন বলয়ে তার পলায়নের পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে আমি আরো কিছু অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশন করছি। শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) যাঁর একটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি—তাঁর অপর রচনা ماثبت بالسنة নামের গ্রন্থটি আরবী মতনসহ অনুবাদ করে ওসমানী সাহেবের শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ রাযী সাহেব ৬৬ সনে প্রকাশ করেছেন। অনুবাদটির নাম 'মু'মিনের মাস ও বছর।' এ বইটির ভূমিকা লিখেছেন মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব। তাতে তিনি লিখেছেন ঃ

এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির প্রণেতা হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর (র) নামই বইটির নির্ভরযোগ্যতা ও অকাট্যতার জীবন্ত স্বাক্ষর। হাদীস ও রাওয়ায়েতসমূহ এবং এগুলোর নির্ভরশীল ও অনির্ভরশীল যথার্থ যাঁচাই-বাছাইয়ের পর এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ ! স্নেহস্পদ মৌলভী রাযী তার প্রকাশনা 'দারুল ইশা'আত' থেকে বইটি প্রকাশ করেছে। আল্লাহ তাআলা একে কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সকলের জন্যে কল্যাণকর বানিয়ে দিন।

জনাব মুহাম্মদ তাকী সাহেব আল বালাগের ১৩৯১ হিজরী মুহাররম সংখ্যায় আলোচ্য গ্রন্থের পর্যালোচনায় লিখেছেন ঃ

"আমার দৃষ্টিতে গ্রন্থটি প্রতিটি মুসলমানের পাঠ করা উচিত এবং প্রতিটি ঘরে বইটি থাকা বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থটি একই সময়ে সুধীবৃন্দের জন্যে প্রয়োজন আবার সাধারণ মুসলমানদের জন্যেও উপকারী।"

এবার গ্রন্থটির কতিপয় উদ্ধৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

সে বছরই অর্থাৎ ৪৩ হিজরী সনে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদ বিন আবিহীকে সহকারী নিয়োগ করেন। আর এটাই হলো প্রথম কাজ যদ্দরুন নবীর নির্দেশসমূহের বিরোধী তৎপরতা শুরু হয়ে যায়।-(পৃষ্ঠা-৩০)

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অতপর আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে প্রথমবারের মতো তাকেও (ইয়াযীদের বাইয়াতের জন্যে) বললেন। নির্দেশের এক পর্যায়ে হযরত আবদুর রহমান বললেন, আপনার ছেলে ইয়াযীদের মনোনয়ন দান সম্পর্কে আপনি ধারণা করে বসে আছেন যে, আমরা এ বিষয়ে আপনাকে আমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছি এবং

www.pathagar.com

স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছি। আল্লাহর কসম ! আপনার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিকর। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, কোনো কথার উপর মজলিশে শূরায় গোটা মুসলমান ঐকমত্য হয়ে যাক ; অন্যথায়, আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—বিচ্ছিন্নতার দায়-দায়িত্ব আপনাকে বহন করতে হবে।-(পৃষ্ঠা-৩১) হযরত হাসান বসরী (র)-এর বর্ণনা, জনগণের মধ্যে দু'জন লোক ফেতনা-ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, তাদের মধ্যে আমর বিন আস একজন। লোকটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বর্শার মাথায় কুরআন ঝুল্যানোর পরামর্শ দেয় এবং তদানুযায়ী কুরআন লটকানো হয়। ইবনুল ফারা'র উক্তি হলো, খারেজীদেরকে তারা সালিস বানায়। আর এ সালিস এমন ধরনের ছিলো যার চর্চা কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।

২য় ফেতনাবাজ ছিলেন মুগীরা বিন শোবা। তিনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নিয়োজিত কুফার গভর্নর ছিলেন। তাঁর নামে এ মর্মে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফরমান পৌছে, "এ নির্দেশনামা হস্তগত ও পাঠের পর নিজকে বরখাস্ত মনে করে তাৎক্ষণিকভাবে কুফা ছেড়ে আমার দরবারে উপস্থিত হতে হবে।" কিন্তু মুগীরা হুকুমনামা আমলে আনতে বিলম্ব করেন। দরবারে পৌছার পর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে জবাবে তিনি একটি জটিল সমস্যা ও তার সুষ্ঠু সমাধানের দরুন দেরী হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটি কি ছিলো ? মুগীরা জবাব দিলেন ঃ আপনার পর ইয়াযীদের বাইয়াতের পথ পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ সম্পন্ন করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কি ? জবাব দিলেন—জি হ্যাঁ। একথা শুনে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ঠিক আছে, তুমি তোমার গভর্নর পদে ফিরে যাও এবং আগের মতো কর্তব্য সম্পাদন করতে থাকো। এখান থেকে ফিরে এসে যখন তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলিত হন তখন তারা জিজ্ঞেস করলো, বলো, কেমন ছিলে ? মুগীরা বললেন, আমি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পা এমন অজ্ঞতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ করেছি যার মধ্যে সে কিয়ামত পর্যন্ত অবরুদ্ধ থাকবে।[১]-(পৃষ্ঠা-৩২-৩৩)

প্রকৃত অবস্থা হলো, এ দুরাচার, উদভ্রান্ত ইয়াযীদ ২৫ কিংবা ২৬ হিজরী সনে জন্ম নেয়। জনগণের অপসন্দনীয় হওয়া সত্বেও পিতা তাকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে—আল্লামা যাহবীর বর্ণনা, ইয়াযীদ মদীনাবাসীদের সাথে

১. ইহা وضعت رجل معاوية فى غرزعى বাক্যের অনুবাদ। এ স্থানে একটি পরিভাষা প্রয়োগ হয়েছে, মাওলানা ইকবাল উদ্দীন সাহেব এর তরজমা করেছেন এভাবে—আমি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পা কাদায় আটকিয়ে দিয়েছি। (تاريخ الخلفاء) ইমাম সূয়তী নফীস একাডেমী কর্তৃক অনুদিত, করাচী, পৃষ্ঠা-২৩৬)

www.pathagar.com

যে নির্মম ব্যবহার করেছে তাতো করেছেই, তদুপরি এর সাথে যুক্ত হয়েছে তার মদ্যপান ও শরীয়াত নিষিদ্ধ পাপাচারের কদর্য কাহিনী। এ কারণেই জনগণ তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলো এবং তার উপর ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের পরিকল্পনাও তারা নিয়ে ফেলে। আল্লাহ ইয়াযীদকে নিপাত করুন। সে হাররা সেনাবাহিনীকে হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধ করার জন্যে মক্কায় প্রেরণ করে। সে অভিযানে নিয়োগকৃত সেনাপতি মারা গেলে ২য় সেনাপতি নিয়োগ দিয়ে পাঠায়। নবনিযুক্ত সেনাপতি মক্কায় ঢুকে ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবরোধ করে ফেলে। তাঁকে হত্যার জন্যে সে ক্রেনের সাহায্যে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। এভাবে ৬৪ হিজরী সনের সফর মাসে আগুনের লেলিহান শিখায় সে কাবা ঘরের গিলাপ জ্বালিয়ে দেয় এবং কাবা ঘরের ছাদ পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়।-(পৃষ্ঠা-৩৭)

এখন আমি সত্য ও ন্যায়ের ওসীলা দিয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই—পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশের প্রবীনতম মুহাদ্দিস ও দেশ বরেণ্য হকপন্থী ওলামাদের অন্যতম শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস (র) সাহেব যদি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন, ওসমানী সাহেব ও তার পরিবারের সম্মানিত বুযুর্গ এগুলো ছাপিয়ে প্রকাশ করতে দ্বিধা না করেন, বইটির ভূমিকা লিখে সত্যায়িত করে সমৃদ্ধ করে দেন, উপরন্তু যে বইয়ে অমুক অমুক সাহাবী ফেতনার আগুন জ্বালিয়েছেন, মর্মে উক্তি করা আছে সে বই থেকে কোনো আলেম-অনালেম মুসলিম সমাজের কোনো ঘর শূন্য না থাকার পরামর্শ দেন ; তাহলে যিয়াদ কিংবা ইয়াযীদ অথবা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমার বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অত্যন্ত শালীন ভাষায় কিছু মন্তব্য করাতে জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে এভাবে ক্ষেপিয়ে তোলার এবং বিরোধিতা ও শত্রুতার অঙ্গনে এ রকম উস্কিয়ে দেয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? নিত্য নতুন অভিযোগ উৎপাদন এবং মনগড়া ও বানোয়াট ত্রুটি আবিষ্কার দ্বারা আমাদের ঘায়েল করার হেতুই বা কি ? তার জ্বালাময়ী এ বাক্যবাণের কারণ নির্ণয় করা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। প্রবাদ আছে—'আপন চোখে বিরাজমান তাল গাছের খবর নেই, পরের চোখে ভাসমান কুটার খোঁচায় প্রাণ গেলরে বাবা !' ওসমানী সাহেবকে একথায় আশ্বস্ত করছি যে, আপনাদের প্রকাশিত বইয়েও এহেন উক্তির বিষাক্তবান মওজুদ রয়েছে, তাতে আপনাদের কপাল আর কপোল ঘর্মাক্ত হওয়ার কারণ না থাকাই ভালো। কারণ, এসব ঘটনা প্রবাহের উপর যেসব ইতিহাসবিদ কথা বলেছেন তাদের সকলে প্রায় একই সুরের প্রতিধ্বনি করেছেন।

www.pathagar.com

মাওলানা আকবর শাহের মন্তব্য

উদাহরণ স্বরূপ আপনি মাওলানা আকবর শাহ্ খান সাহেব এবং তাঁর রচিত ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থটি দেখুন। এ পর্যন্ত শুধু পাকিস্তানেই বইটির ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। নাফিস একাডেমী করাচী, ১৯৬৬ সনে বইটির শেষ সংস্করণ প্রকাশ করে। বইটির কয়েকটি বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন, যা ৪র্থ সংস্করণ (১৯৬০) ২য় খণ্ড থেকে গৃহীত। ৩৫ থেকে ৩৯ পৃষ্ঠায় ইয়াযীদের মনোনয়ন শিরোনামে লেখক মনোনয়ন কোন্ কৌশলের ভিত্তিতে সফলকাম হয় তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেন। এক জায়গায় তিনি শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস (র) সাহেবের উল্লেখিত হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনার কথা বর্ণনা করেন আর এ ঘটনাটি খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থেও সন্নিবেশিত হয়। পরবর্তীতে আকবর শাহ্ খান সাহেব লিখেন ঃ

"হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জীবদ্দশায় ইয়াযীদের জন্যে বাইয়াত গ্রহণ করা একটি মারাত্মক ভুল ছিলো। সম্ভবত পিতৃ স্নেহের আতিশয্যে এ ভুলটি হয়ে যায়। তবে মুগীরা বিন শোবার ভুল এর চেয়েও মারাত্মক। কেননা, এহেন ভুলের ধারণা এবং এদিকে আকর্ষিত হওয়ার দুঃসাহস মুগীরা বিন শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কূটকৌশলেরই ফলশ্রুতি ছিলো। এ কারণেই হাসান বসরী (র) বলেছেন, মুগীরা বিন শোবা মুসলমানদের মধ্যে এমন এক রীতির প্রচলন করেন যদ্দরুন পরামর্শ করার নীতি রহিত হয়ে যায় এবং পিতার পর পুত্র বাদশাহ্ হতে থাকে।"-(তারীখে ইসলাম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৬)

পরবর্তীতে এক নজরে ইয়াযীদি শাসনামল শিরোনামে তিনি লিখেন ঃ

"তৎকালীন জনগণের আবেগ-অনুভূতি এবং ইয়াযীদের চরিত্রের আন্দাজ এ দ্বারা করুন যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় কর্মকর্তাদের কাছে এই মর্মে সাধারণ নির্দেশনামা জারী করেন যে, জনগণের কাছে ইয়াযীদের গুণাবলী বর্ণনা করো এবং নিজ নিজ এলাকা থেকে প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য লোকদের সমন্বয়ে আমার কাছে প্রতিনিধি দল রওয়ানা করাও। ইয়াযীদের বাইয়াত সম্পর্কে আমি নিজে তাদের সাথে কথা বলতে চাই। প্রতি অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিদের সাথে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু পৃথকভাবে কথা বলেন, খলীফাদের দায়িত্ব, অধিকার, কর্মকর্তাদের আনুগত্য এবং জনগণের কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা করে ইয়াযীদের বীরত্ব, দানশীলতা, জ্ঞান, কুশলতা এবং প্রশাসন ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে উত্তরসুরী খলীফা হওয়ার ব্যাপারে তার স্বপক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করা উচিত বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

তবে মদীনা থেকে আগত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযম নামের একজন সদস্য দাঁড়িয়ে বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি ইয়াযীদকে তো খলীফা পদে বসাচ্ছেন ; তবে একথাও চিন্তা করে দেখা দরকার যে, বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে আপনাকে এ কাজের জবাবদিহি করতে হবে।" মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযমের কথায় অনুমিত হয় যে, জনগণও ইয়াযীদের খেলাফতের উপর সন্তুষ্ট ছিলো না এবং তার খেলাফতের জোয়াল নিজেদের কাঁধে বহন করতে তৈরি ছিলো না। শেষ সময়ে স্বয়ং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে ইয়াযীদ যে ধরনের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে তাতেও তার খেলাফতের যোগ্যতা যে কতটুকু ছিলো তা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়।"-(প্রাগুপ্ত পৃষ্ঠা-৯৩-৯৪)

মাওলানা নজীব আবাদীর ভাষায় আলোচনার সমাপ্তি

"ইয়াযীদ তার বাস্তব জীবনের যে নমুনা লোকদের সামনে পেশ করেছে তার মধ্যে দুরাচার, পাপাচার এবং শরীয়াত বিরোধী কার্যাবলী থাকার ফলে সাধারণভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং বাস্তব জীবন ব্যহত হয়। দুর্বল ঈমানদার লোকগণ শাহী মহলে গুনাহের মহড়া দেখে দুঃসাহসী হয়ে উঠে। ইয়াযীদের এ সকল গর্হিত কাজই মুসলমানদেরকে গান-বাজনা ও মদ্যপানে অনুপ্রাণিত করে ; অন্যথায় ইসলামী বিশ্ব এর আগে এ ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র ছিলো।"

মাওলানা জয়নুল আবেদীন মিরাঠী তাঁর রচিত তারিখে মিল্লাত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ৩৮-৪৬ পৃষ্ঠায় (৩য় সংস্করণ নদওয়াতুন মুসান্নাফীন, দিল্লী, ১৯৫০ হিজরী) ইয়াযীদের মনোনয়নের উপর বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন। তাতে তিনি মুহাম্মদ বিন হাযম ছাড়া অপর কতিপয় সাহাবীর প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। বসরার প্রতিনিধি আহনাফ বিন কায়েসের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"হে আমীরুল মু'মিনীন ! ব্যাপারটি বড়ই জটিল। সত্য বললে আপনার ভয় আর মিথ্যা বললে আল্লাহর ভয়। আপনি নিজেই ইয়াযীদের দিবা-নিশির তৎপরতা প্রকাশ্য-গোপন কার্যাবলী সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত।"

এ গ্রন্থেই হাসান বসরী (র)-এর একথার উল্লেখ আছে যে, "দু' ব্যক্তি বিপর্যয় সৃষ্টির মূল হোতা। একজন আমর বিন আস অপর ফেতনাবাজ মুগীরা বিন শোবা।"

www.pathagar.com

যাহোক, এ ভুল ধারণার অপনোদন হওয়া জরুরী যে, ইয়াযীদের সবগুলো দোষ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পরই প্রকাশ পায় অথবা কোনো কোনোটি প্রথমে থাকলেও তা গোপন ও অজ্ঞাত ছিলো। আমি ইতিপূর্বে সুনানে আবু দাউদের একটি রাওয়ায়েতে উল্লেখ করেছি। তাতে বর্ণিত আছে, হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার ছেলে ইয়াযীদের শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে সাবধান করলেন, তখন তিনি তা খণ্ডন করতে পারেননি। ইয়াযীদের লাম্পট্য যদি এমনি লাগামহীন মেনে নেয়া হয়, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যার নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধনে অপরাগ ছিলেন, তাহলে এহেন অথর্ব অযোগ্য ব্যক্তিকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করা উপযোগী ও বিজ্ঞজনোচিত কাজ বলা যেতে পারে না। কোনো কোনো রাওয়ায়েতে একথারও উল্লেখ আছে যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুকর্মের জন্যে তাকে ভর্ৎসনা করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াযীদের মধ্যে বিরাজিত শঠতা ও অপকর্ম সম্পর্কে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞাত ছিলেন। এবার এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি ইয়াযীদের মনোনয়ন দান সম্পর্কে অভিযোগ উঠে তাহলে প্রত্যেক অভিযোগকারীর মুখ কেবলমাত্র একথা বলে কিভাবে বন্ধ রাখা সম্ভব যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকিছু করেছেন সৎ উদ্দেশ্যে করেছেন; তার নিয়তের উপর আক্রমণ করা যথার্থ নহে।

ইবনে হাজারের অতিরিক্ত ব্যাখ্যাসমূহ

ইয়াযীদকে মনোনয়ন দানের তৎপরতা সঠিক আবেগের ভিত্তিতে আবর্তিত ছিলো না বরং ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে এর উৎপাদন শুধুমাত্র এতোটুকু কথায় যাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায় সালিসীর আলোচনায় একাধিক চালবাজ, প্রতারক, ধোঁকাবাজ, ইত্যাকার অন্যান্য শব্দাবলীর যা অধিকাংশ ইতিহাস-বিদগণের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে তাদের মৌন থাকা আশ্চর্যই বটে। অথচ এসব অধিকাংশ ইতিহাস বেত্তা এসব অবাধে প্রয়োগ করেছেন। এসব মনীষীগণ সাহাবীদের মান-মর্যাদা সংরক্ষণের ব্যাপারে অজ্ঞ কিংবা বধির ছিলেন আর আজকে সর্বপ্রথম কতিপয় বুযূর্গ সাহাবীদের সম্মানে আকীদা-বিশ্বাস আবিষ্কারের চলন্ত ঠিকাদারী গ্রহণ করেছেন ? জটিল প্রশ্ন। আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, ইমাম ইবনুল হজর মক্কী হাইতামীর প্রণীত تطهير الجنان واللسان নামের গ্রন্থটি বিশেষ করে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর গুণাবলী ও তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের জবাবে লেখা হয়েছে। আমাদের প্রতি অভিযোগকারী

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের আলোচ্য গ্রন্থটির উদ্ধৃতি প্রায়শঃ দিয়ে থাকেন। এ গ্রন্থটির দু'টি অতিরিক্ত উদ্ধৃতি আমি উল্লেখ করছি। তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে তিনি আমীরে মুয়বিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

حارب الخليفة الحق الذى معه اكثر الصحابة وقاتله، بل واحتال عليه حتى خلع نفسه بخلع نائبه له عند تحكيم ابى موسى الاشعرى وعمرو بن العاص-

"আমীরে মুয়বিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমতাসীন বৈধ খলীফার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন যার সাথে অধিকাংশ সাহাবী ছিলেন। বরং এ বৈধ খলীফার (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর) বিরুদ্ধে প্রতারণার আশ্রয় নেন। এমনকি হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর বিন আসের সালিসীর সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিনিধি হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করার ঘোষণা দেন, তখন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত রূপে গ্রহণ করেন।"

পরবর্তীতে ইবনে হজর সালিসীর ঘটনা উল্লেখ করে প্রতারণা শব্দটি পুনরায় প্রয়োগ করে লিখেছেন, হযরত আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল প্রকৃতির। সুতরাং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক চাল তাঁর উপর জয়ী হয়। তিনি আরো লিখেছেন ঃ

ولاجل هذا الخداع لم يعتد علىّ واصحابه بذالك الخلع ولا بتلك التولية واجروا الامور على ما كانت عليه قبل التحكيم-

"এরূপ ধোঁকাবাজীর কারণে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীগণ এ বরখাস্তের কোনো পরওয়া করেননি। এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ফায়সালার কোনো গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যার লক্ষ্য ছিলো আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা বানানো। বরং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীগণ খেলাফতের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অন্যান্য কার্যাবলী সালিসী বৈঠকের আগের মতই সম্পন্ন করতে থাকেন।"-[প্রাগুপ্ত পৃষ্ঠা–৫৪ কায়রো, ১৩৮৫ হিজরী)

www.pathagar.com

যদি এসব শব্দ এবং এ ধরনের বর্ণনায় সাহাবীগণের নিয়তের উপর আক্রমণ না করা বুঝায় এবং তাদের শানে বে-আইনী না করা হয়ে থাকে তাহলে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ব্যবহৃত শব্দাবলীর দ্বারা এ সমস্ত অপরাধে কি করে অভিযুক্ত করা যায় ? অথবা এটাও স্বীকার করে নিন যে, ইবনে হাজারও এমন বেআদব এবং সাহাবীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে এহেন মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন যে, অন্যদের মন ও যবান পরিশীলিত করার শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজেই সাহাবীদের অবমাননার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন।

----

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

সাহাবীগণের আদালত

এক ঃ একটি মৌলিক ত্রুটি

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব তার লেখাসমূহে অনুরূপ অন্যান্য কতিপয় বুযূর্গ অত্যন্ত জোরের সাথে দাবী করছেন যে, খেলাফত ও রাজতন্ত্রে আলোচিত ঘটনাবলী দ্বারা সম্মানিত সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতায় দারুণ আঘাত পড়েছে। এ পর্যায়ে সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতার এমন এক চিত্র তুলে ধরা হয় যা নবীগণের ইসমত সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের অনুসৃত আকীদা-বিশ্বাসের সাথে মৌলিক অর্থে কোনোই পার্থক্য নেই। সঠিক কথা বরং, শিয়াগণ যেভাবে তাদের ইমামদেরকে মাসুম বলে বিশ্বাস করে এসব বুযূর্গদের আকীদা-বিশ্বাসও প্রায় একই ধরনের।

এসব অভিযোগকারীদের অপর একটি অভিযোগ হলো, সাহাবীগণই আমাদের কাছে ইলমে দীন তথা কুরআন-হাদীস পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম। কাজেই কবীরা গোনাহে লিপ্ত ইত্যাদি বিশেষণে সাহাবীগণের চরিত্র কলুষিত করে দেয়ার পর কুরআন-হাদীসের রাওয়ায়েতের ব্যাপারে তাঁদেরকে ফেরেশতা সম মাসুম মনে করার কি কারণ থাকতে পারে ? এই আজব যুক্তির মধ্যে যে সকল কপট উপাদান লুক্কায়িত আছে সেগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনার আগে আমি সেসব বুযূর্গদের একটি প্রশ্ন করতে চাই। প্রশ্নটি হলো, তাদের মধ্যে কোনো একজন বুযূর্গও কি আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীস কোনো সাহাবীর কাছ থেকে সরাসরি শুনেছেন কিংবা পড়েছেন ? স্পষ্ট কথা যে, আল বালাগের সম্পাদকসহ অভিযোগকারীগণ কেহই তাবেয়ীনদের কাতারে শামিল নহেন। মাঝখানে বরং রাবীদের এক বিরাট ধারাবাহিকতা (سلسلہ) বিরাজমান। এবার প্রশ্ন জাগে, হাদীস রাওয়ায়েত এবং তাবলীগে দীনের জন্যে আদালতের (ন্যায়পরায়ণতা) যে মাপকাঠি আপনারা সাহাবীদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন গোটা রাবীদের সিলসিলায় তা প্রয়োগ করা হবে কিনা ? যদি না করা হয় তাহলে এ না করার কারণ কি ? আমাদের কারো কাছেই কুরআন-হাদীসের ভাষ্য জিবরাঈল আলাইহিস সালাম কিংবা অহীর মাধ্যমে আসেনি। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিংবা তাঁর সম্মানিত সাহাবীদের সাহচর্য ও সাক্ষাতও পায়নি। বস্তুত সাহাবী এবং তাবেয়ী নহেন, এমন কতিপয় লোকের পরম্পরায় দীনের আমানত আমাদের কাছে পৌঁছেছে। সূতরাং আমার অনুরোধ, মেহেরবানী করে কানুন উড়ায়ে এবং শূন্যালোকে

www.pathagar.com

বিহার করার চেষ্টা না করে দীন রাওয়াতের জন্যে এমন একটি মাপকাঠি ও পরিমাপ গ্রহণ করা দরকার, যার মধ্যে মাঝপথের রাবীগণও পুরোপুরি শামিল হতে পারেন। যারা শুধুমাত্র কুরআনকে দীনের হুজ্জত ও মূল উৎস মনে করে তারা তো উম্মতের ধারা পরম্পরাকে আশ্রয় হিসাবে নিতে পারবে। কিন্তু আমরা যারা হাদীসকেও দীনের উৎসমূল মনে করে থাকি এবং মুতাওয়াতের নয় এমন হাদীস ও খবরে ওয়াহেদ থেকেও দীনের আলো গ্রহণ করে থাকি, তাহলে আমাদেরকে সুস্থ বিবেক ও সঠিক জ্ঞানের সাহায্যে এগুতে হবে। হাদীস বর্ণনাকরীদের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটনার জন্যে পীড়াপীড়ি না করা উচিত যেসব গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া নবীগণ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এ তত্ত্ব কথা শীঘ্রই প্রকাশ করবো যে, আদালতে সাহাবা এবং (الصحابة كلهم عدول) সকল সাহাবা ন্যায়বান হওয়ার আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা ও হাদীস রাওয়ায়েতের প্রসংগক্রমেই এসে যায় ; অন্যথায় জরুরী আকায়েদ ও ঈমানীয়াতের সাথে এ প্রসংগটির সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

আদালতের পরিচয়

এ জরুরী ভূমিকা পেশ করার পর এবার আমি আদালত প্রসংগের ২য় ধারার উপর আলোচনার প্রয়াস নিতে চাই। আদল ও আদালত আরবী শব্দ দু'টি ইনসাফ, কলুষমুক্ততা ও সত্যবাদিতা অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে। কখনো আদল শব্দটি কর্তা বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় ; তখন ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির অর্থে প্রযোজ্য হয়। কুরআনে সূরা মায়েদার ৯৫ ও ১০৬নং আয়াতে উল্লেখিত ذوا عدل দ্বারা দু'জন আদল ওয়ালা সালিস কিংবা স্বাক্ষী উদ্দেশ্য। এসব আয়াতের মূল সম্পর্ক রাওয়ায়েতের জায়গায় শাহাদাত (সাক্ষী) কিংবা হুকুমের সাথে জড়িত। রাওয়ায়েত ও শাহাদাতের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা একজন মহিলার সাক্ষ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ বিপরীতে বুদ্ধিমান অপ্রাপ্তবয়স্ক এ একক মহিলার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য। এতদসত্ত্বেও মুহাদ্দিসগণের মতে একথা স্বীকৃত যে, হাদীসের রাবী আদালত গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতপর একথা জ্ঞাত হওয়া জরুরী যে, মুহাদ্দিসগণ আদালতের কি অর্থ নির্ধারণ করেছেন। যেহেতু আদালতের কোনো অকাট্য ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই সুতরাং উসুলবিদগণ আদালতের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তার মধ্যে কিছু মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। তবে এর মধ্যে সমার্থবোধক একটা যোগসূত্র সহজেই নির্ধারণ করা যায়। আমি সর্বপ্রথম হাফেজ আবু বকর আহমদ খাতীব বাগদাদীর রচিত الكفاية فى علم الرواية।

www.pathagar.com

গ্রন্থের الكلام في العدالة অধ্যায়ের কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি। স্মর্তব্য যে, খাতীব বাগদাদী সম্পর্কে প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে, তারপর আগত সকল মুহাদ্দিস তাঁরই পদাংক অনুসরণে অগ্রসর হয়েছেন। (المحدثون بعده عيال على كتبه) আলোচ্য কিতাবে (দায়েরাতুল মাআরিফ ওসমানীয়া থেকে ১৩৫৭ সনে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-৭৯) হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাবের উক্তি ইমাম যুহরী, ইমাম মালেক এবং পরবর্তী রাবীদের পূর্ণ সনদ সহকারে এভাবে উল্লেখ আছে ঃ

ليس من شريف ولا عالم ولاذي سلطان الا وفيه عيب لابد ولكن من الناس من لاتذكر عيوبه من كان فضله اكثر من نقصه ذهب نقصه من فضله

"এমন কোনো বুযুর্গ, আলেম এবং শাসনকর্তা পাওয়া যাবে না যার মধ্যে অনিবার্যরূপে কোনো না কোনো ত্রুটি বর্তমান নেই। তবে জনগণের মধ্যে যার ত্রুটির চর্চা হয় না এবং ত্রুটি অপেক্ষা যার মর্যাদা অধিক তার সে ত্রুটিসমূহ অধিক মর্যাদার কারণে দূরীভূত হয়ে যাবে।"

অতপর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উক্তি সনদসহ বর্ণিত আছে। যথা ঃ

لااعلم احداً اعطى طاعة الله حتى لم عطها بمعصية الله الايحيى بن زكريا عليه السلام ولا يصى الله فلم يخلط بطاعة فاذا كان الا غلب الطاعة فهو المعدل واذا كان الا غلب المعصية فهو المجروح -

"আমার জানা মতে হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া ছাড়া এমন কোনো লোক নেই, যে আল্লাহর আনুগত্য করে অথচ তার মধ্যে অবাধ্যতার মিশ্রণ থাকে না। আবার এমনো কোনো লোক নেই যে আল্লাহর নাফরমানী করলো অথচ তার সাথে আনুগত্যের রেশ পাওয়া যায় না। সুতরাং যার মধ্যে আনুগত্য প্রবল থাকবে সে আদেলরূপে গণ্য হবে, আর যার মধ্যে অবাধ্যতার আধিক্য লক্ষ্য করা যাবে সে ত্রুটিমুক্ত লোক হিসাবে চিহ্নিত হবে।"

একইভাবে ইবরাহীম মারওয়াযী আবদুল্লাহ বিন মুবারকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁকে রাবীর আদালত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বললেন ঃ

من كان فيه خمس خصال يشهد الجماعة ولا يشرب هذا الشراب ولا تكون في دينه خربة ولا يكذب ولا يكون في عقله شئ -

www.pathagar.com

"যার মধ্যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, জামায়াতসহ নামায আদায় করে, মদ পান করে না, দীনের কাজে ত্রুটি নেই, মিথ্যার আশ্রয় নেয় না এবং ত্রুটিমুক্ত জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। (সে ব্যক্তি আদেল হিসাবে বিবেচিত হবে।)"

"الكفاية গ্রন্থের টীকাকার উপরোক্ত কথার উপর মন্তব্য করে লিখেছেন ঃ ان الحسنات يذهبن السيئات কুরআনের এ আয়াতে একথারই সমর্থন পাওয়া যায়। তারপর তিনি টীকায় নিম্নের কবিতাটি লিখেন ঃ

ومن ذالذى ترضى سجاياه كلها

كفى المرء نبلاً ان تعد معايبه

"এমন কে আছে যার প্রতিটি অভ্যাসই পসন্দনীয়। একজন লোক সম্ভ্রান্ত হওয়ার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি গণনা করা সম্ভব।"

সবশেষে খতীব বাগদাদী স্বীয় পর্যালোচনা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

والواجب عندنا ان لايرد الخبر ولا الشهادة الا بعصيان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به وما يغلب به ظن الحاكم والعالم ان مقترفه غير عادل ولامان عليه الكذب فى الشهادة والخبر - ولو عمل العلماء والحكام على ان لايقبلو اخبر اولا شهادة الا من مسلم برئ من كل ذنب قل اوكثر لم يمكن قبول شهادة احد ولا خبره لان الله تعالى قد اخبر بوقوع الذنوب من كثير من انبيائه ورسله -

"আমাদের মতে ওয়াযিব হলো, সর্বসম্মতিক্রমে যে দোষের কারণে বিচারক ও বিজ্ঞলোকের প্রবল ধারণামতে একজন লোক (গাইর আদেল) ন্যায়বান নয় এবং রাওয়ায়েত কিংবা সাক্ষ্যদানে সে মিথ্যা বলার আশংকা থাকে —শুধুমাত্র এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন রাওয়ায়েত ও সাক্ষ্য রদ হতে পারে। যদি আলেম ও বিচারকগণ সে নীতি অনুসরণ করতে থাকেন যে, মুসলমানদের রাওয়ায়েত বা শাহাদাত তাদের ছোট-বড় সর্ববিদ গুনাহ থেকে নিষ্পাপ না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, তাহলে তো কারো রাওয়ায়েত ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভবই হবে না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বহু নবী রাসূলের গোনায় লিপ্ত হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।"

আদালত ও তার আহকাম সম্পর্কে হাফেজ আল খতীব উপরে যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তাতে রাবীদের আদালত সম্পর্কে এমন একটি চিত্রের সন্ধান পাওয়া

www.pathagar.com

যায়, যা যুক্তি, জ্ঞান ও বর্ণনার আলোকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত এবং বাহুল্য বিবর্জিত। এর বাইরে ভিন্ন কোনো ভূমিকা গ্রহণ করার অবস্থায় কেবলমাত্র সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতায়ই সন্দেহের সৃষ্টি হয় না বরং সাহাবীদের অধস্তন পর্যায়ের লোক সকল এবং তাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে আগত হাদীস ভাণ্ডারও নিরাপদ থাকার উপায় থাকে না। বস্তুত যদি কেউ ন্যায়ের দৃষ্টিতে তাকায় তাহলে আদালতের উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের উপর ওসমানী সাহেবের প্রাসংগিক আলোচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের কোনো মূল্যই বাকী থাকে না। এতদসত্বেও পরবর্তী আলোচনায় এর পর্যালোচনার প্রয়াস নেয়া অবান্তর মনে করি না।

মাওলানা মওদূদী (র)-এর উপর ভ্রান্ত অভিযোগ

আল বালাগে সর্বপ্রথম মাওলানা মওদূদী (র)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যকে অভিযোগের লক্ষ্য ও কেন্দ্র সাব্যস্ত করা হয়।

"এখানে প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, কেউ আদালতের বিপরীত কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ার পরিণতিতে আদালত নামের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে তা থেকে রহিত হয়ে যায় কিনা এবং আমরা মূলতঃ তাকে আদেল হওয়ার অযোগ্য বলবো কিনা তদুপরি হাদীস রাওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তাকে অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করবো কিনা? আমার জবাব হলো, কারো সামগ্রিক জীবনে আদালত পাওয়া গেলে ২/১টি কিংবা কতিপয় ব্যাপারে আদালত বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণে আদালত সম্পূর্ণভাবে তার থেকে রহিত হয়ে যাওয়া অনিবার্য নয় এবং সে আদেল হওয়ার পরিবর্তে ফাসেক রূপেও পরিগণিত হবে না।"

এবার 'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেবের কৃতিত্বের (!) প্রতি লক্ষ্য করুন; বক্তার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ আবিষ্কার সুবাদে তিনি বলেন : মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, সাহাবীগণ কেবলমাত্র হাদীস রাওয়ায়েত করা পর্যন্তই আদেল; অন্যথায় তাঁরা তাদের বাস্তব জীবনে ফাসেক এবং ফাজেরও (নাউযুবিল্লাহ) হতে পারেন। তাহলে তার একথা অনুল্লেখযোগ্য পর্যায়ের ভ্রান্তিকর এবং বিপজ্জনক। একদিকে মাওলানা মওদূদী (র)-এর সতর্ক শব্দগুলো রাখুন তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন যে, কারো আদালত বিরোধী দু-একটি কাজ দ্বারা তার আদেল হওয়ার পরিবর্তে ফাসেক ও ফাজের হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় না। অপরদিকে সম্পাদক সাহেবের ইনসাফের নমুনা লক্ষ্য করুন, তিনি মওদূদী সাহেব (র)-এর কথার ভিতরে নিজের অর্থ ঢুকিয়ে বানোয়াট পোশাকের আড়ালে বলে দিলেন যে, মাওলানা মওদূদী (র)-এর মতে—সাহাবায়ে কেরামগণ তাদের বাস্তব জীবনে ফাসেক এবং ফাজেরও হতে

www.pathagar.com

পারেন। আমি এ ধরনের ভিত্তিহীন ও অলীক প্রমাণের উপর এর আগেও সতর্ক করেছি, যখন ব্যক্তিস্বার্থ শব্দের মধ্যে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর স্বার্থপূজারী হওয়ার মতো জঘন্য অভিযোগ আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছিলো, তখন আমি কতিপয় উদাহরণ এবং মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) সাহেবের লেখা উল্লেখ করে এ ধরনের দলিল ও যুক্তির অসারতা পরিষ্কার করে দিয়েছি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আদালতে সাহাবীর বিষয়টি আবারো সম্পূর্ণ আগের মতোই উপস্থাপিত হয়েছে। কবির ভাষায় দু'আ করা ছাড়া আমার আর কিইবা করার আছে। কবি লিখেছেন ঃ

یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے مری بات
دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور

"হে রব ! সে আমার কথা বুঝেনি বুঝবেও না। তাই আমাকে ভাষা না দিলেও তাকে অন্তত বুঝার শক্তি দাও।"

আরো দুঃখের বিষয় হলো, মাওলানা ওসমানী সাহেব বিকৃত বস্তুকে বিকৃতির উপর নির্ভর করার নীতিতে প্রথমে তো মাওলানা মওদূদী (র)-এর মুখে একথা জোর করে বের করার চেষ্টা করলেন যে, সাহাবীগণ তাদের বাস্তব জীবনে ফাসেক এবং ফাজেরও হতে পারেন। তারপর এ বিকৃত ও কল্পনার ভিত্তিতে ২য় চাদর এভাবে চড়িয়ে দিলেন যে, যদি কোনো সাহাবীকে ফাসেক ও ফাজের রূপে স্বীকার করা হয়, তাহলে হাদীস রাওয়ায়েতের ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (র) তার নির্ভরতা একথা বলে কিভাবে বহাল রাখতে সক্ষম হবেন যে, কখনো কোনো পক্ষ আপন স্বার্থে ও নিজ মতে কোনো হাদীস বানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আদৌ সম্পৃক্ত করেননি এবং নিজেদের স্বার্থের বিপরীত হওয়ায় কোনো সহীহ হাদীসকে অস্বীকারও করেননি। অথচ ফাসেক ও ফাজের তো দূরের কথা মাওলানা মওদূদী (র) এ ক্ষেত্রে ফিসক, কিংবা ফুজুর শব্দ পর্যন্ত প্রয়োগ করেননি। তিনি কেবলমাত্র 'আদালত বিরোধী কাজ' শব্দ লিখেছেন। তিনি বরং ফাসেক হওয়ার কথা উল্টো রদ করে বলেছেন আদালত বিরোধী কাজে জড়িয়ে গেলেই কারো আদেল (ন্যায়বান) হওয়ার পরিবর্তে ফাসেক হওয়া অনিবার্য হয় না।

এ পর্যায়ে মরহুম মাওলানা তার আলোচনার শুরুতে আদালতে সাহাবীর যে সঠিক তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন তা তার নিজের ভাষায় ঃ

"الصحابة كلهم عدول (সকল সাহাবী সত্য ও ন্যায়বান) আমার কাছে একথার তাৎপর্য এটা নয় যে, সাহাবী মাত্রই নিষ্পাপ ছিলেন এবং তাদের

www.pathagar.com

সকলেই সর্ববিদ মানবসুলভ দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাদের কেউ কখনো কোনো ভুলই করেননি। বরঞ্চ আমি উক্ত কথার এ তাৎপর্য গ্রহণ করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস রাওয়ায়েত করা কিংবা তাঁর দিকে কোনো কথা সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোনো সাহাবী সততার গণ্ডি আদৌ অতিক্রম করেননি।"

আদালতে সাহাবীর সঠিক অর্থ

আমার ধারণায় আদালতে সাহাবীর এর চেয়ে সুন্দর ও যথার্থ পরিচয় আর হতে পারে না। আমাদের অনেক খ্যাতনামা আলেম ও মুহাদ্দিসগণ আদালতে সাহাবীর এরূপ পরিচয়ই ব্যক্ত করেছেন। আমি তাদের কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরতে চাই। শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র) একবার 'মুতুন কালামিয়ায়' লিখিত সাহাবীদের নিন্দা করা উচিত নয়, কথার তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। অথচ হাদীসের আলোকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বৈরাচারী বাদশাহ এবং বিদ্রোহী ইত্যাদি বলা হয়। জবাবে শাহ সাহেব বললেন ঃ

"آنچہ در متونِ عقائد مرقوم است کہ صحابی را طعن نباید کرد درست است. اما روایت حدیثے کہ متضمن وجہے از وجوہ طعن در بعضے صحابہ باشد باکے ندارد. بالجملہ غرضِ اصحابِ متون باین ادبِ صحابیت است نہ آنکہ صحابہ کلہم معصوم اند دو جہے از وجوہِ طعن نداشتند...... و آنچہ در کتب اصولیہ مرقوم است کہ الصحابۃ کلہم عدول، پس مراد آنست کہ صحابہ کلہم در روایت حدیث از آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مامون و معتبر اند۔ ہرگز از ایشان کذب در روایت حدیث نشد۔ چنانچہ بتجربہ و تحقیق رسیدہ کہ در مقدمات دیگر از اینہا دروغ گفتہ باشد نہ آنکہ مصدر گناہے نشدہ اند۔ چنانچہ عنقریب گزشت کہ بعضے از اینہا در حضور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارتکاب کبیرہ محدود گشتہ...... الخ

(ফতুয়ায়ে আযিযী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৯-১০১ দেওবন্দ)

www.pathagar.com

ফতুয়ায়ে আযিযী অনুবাদ সাঈদ এণ্ড কোং, করাচী ২১৬-২১৭ পৃষ্ঠায় উক্ত ফারসী বাক্যের অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"ইলমে আকায়েদের মতনসমূহে সাহাবীদের শানে অপবাদ ও নিন্দাচর্চা না করার যে কথা উল্লেখ আছে এবং মতনসমূহে যাকিছু লেখা আছে সে সবই সহীহ। তবে নিন্দার কারণ সম্বলিত হাদীসের কোনো রাওয়ায়েত পাওয়া গেলে যদিও তা কোনো সাহাবীর ব্যাপারে হোক না কেনো আকায়েদের ক্ষেত্রে সেটা দূষণীয় হওয়া অনিবার্য নহে এবং মতন ওয়ালাদের উদ্দেশ্যও এটা নয় যে, সমস্ত সাহাবী নিষ্পাপ মাসুম আর নিন্দার কোনো কারণই কোনো সাহাবীর উপর বর্তায় না। উসুলের গ্রন্থে সকল সাহাবী আদেল হওয়ার যে কথা লেখা আছে তার উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে হাদীস বর্ণন্য করার ব্যাপারে তারা সকলেই ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয়। হাদীসের বেলায় কখনো কোনো সাহাবী মিথ্যা রাওয়ায়েত করেননি। সুতরাং কোনো ব্যাপারে কোনো সাহাবীর অসত্য ভাষণ বাস্তবে প্রমাণিত নহে, তদ্রূপ তাদের কেউ কোনো ধরনের ত্রুটিই করেননি একথাও বাস্তবতার আলোকে প্রমাণিত হয়নি। ইতিপূর্বে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে কবিরা গুণাহের দরুন দণ্ডিতও হয়েছে।"

অনূদিত একই ফতোয়া আযীযিয়ার ৩২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত অপর এক জবাবও লক্ষ্যণীয় ঃ

"আহলে সুন্নাতের আকীদা হলো, সাহাবাগণের সকলেই আদেল বা ন্যায়বান। এ আকীদার ব্যাপারে মরহুম ওলী নেয়ামত উল্লাহ (শাহ আবদুল আযীয সাহেবের শ্রদ্ধেয় শাহ্ ওলীউল্লাহ্) সাহেবের দরবারে একাধিকবার আলোচনা ও গবেষণা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিশেষে সকলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এখানে আদালতের প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, হাদীস রাওয়ায়েতের ব্যাপারে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ সকলেই আদেল। অন্য কোনো ব্যাপারে অকাট্যভাবে তাদের আদেল হওয়ার কথা উদ্দেশ্য নয়। হাদীস রাওয়ায়েতের ব্যাপারে যে আদালতের মূল্যায়ন করা হয় তার উদ্দেশ্যে হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ভাষণ পরিহার করা এবং রাওয়ায়েতের বিকৃতির আশংকা পরিত্যাগ করা। আমরা সকল সাহাবীর জীবন চরিত নিয়ে গবেষণা করেছি। এমনকি সাহাবীদের মধ্যে যারা ফেতনা-ফাসাদ পারস্পরিক বিরোধ ও আত্মকলহে ছিলেন তাঁদের জীবনী সম্পর্কেও খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি, যে কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি এহেন কথাকে তাঁর উক্তি বলার ব্যাপারে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্ক ছিলেন। এ জাতীয় কথা বলাকে তাঁরা সাংঘাতিক গুনাহ মনে করতেন। বস্তুত যে কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়া সাল্লাম বলেননি এবং যার কোনো ভিত্তি নেই সেসব কথা সাহাবীগণ অতি সতর্কভাবে পরিহার করে চলতেন।

জীবনী রচয়িতাগণের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট। এর প্রমাণ হলো—এ আকীদার কোনো চিহ্নই আগেকার আকীদার ও কালাম শাস্ত্রের কিতাবে বর্ণিত নেই। অর্থাৎ এ বিষয়টি পূর্ববর্তী আলেমদের কাছে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য ছিলো। এ কারণে ঐসব কিতাবে বিষয়টির আলোচনার সুযোগই আসেনি এবং আগের গ্রন্থাবলীতে এর উল্লেখও দেখা যায় না। শুধুমাত্র মুহাককিক আলেমগণ উসূলে হাদীসের যেখানে রাবীদের স্তর বিন্যাস করা হয়েছে সেখানে এর উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। অতপর আলেমগণ বিষয়টি সেসব গ্রন্থ থেকে আকীদার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর এটা সে সকল লোকগণই উল্লেখ করেছেন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যারা হাদীস ও কালামশাস্ত্রে মিশ্রণ ঘটিয়ে একাকার করে ফেলেছেন। সন্দেহ নেই যে, উসূল পন্থী আলেমগণের উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত আদালতের উদ্দেশ্য হলো, রাওয়ায়েতের সাথে সংশ্লিষ্ট আদালত। অন্য কথায় এর উদ্দেশ্য হলো—রাওয়ায়েতে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা পরিহার করতঃ বর্ণনা বিভ্রাটের আশংকা থেকে তাকে পরিচ্ছন্ন রাখা। অন্য কোনো অর্থে এর প্রয়োগের অবকাশ যেহেতু গৌণ, কাজেই এ সামগ্রিক বিধানের উপর কোনো আপত্তির প্রশ্নই তিরোহিত হয়ে যায়। والله اعلم

মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ২২৯ পৃষ্ঠায় (আল আমীরা প্রেস মিসর-১৩২১ হিজরী সনে প্রকাশিত) ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন ঃ

الصحابة ثقاة صادقون فيما يخبرون به عن نبى صلى الله عليه وسلم واصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والله الحمد من اصدق الناس حديثا عنه لايعرف منهم من تعمد عليه كذبا مع انه كان يقع من احدهم من الهنات مايقعونهم ذنوب وليسوا معصومين ومع هذا فقد جرب اصحاب النقر والامتحان احاديثهم واعتبروها بما تعتبر الاحاديث فلم يوجد عن احد منهم تعمد كذبة -

"সাহাবীগণ নির্ভরযোগ্য রাবী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁরা যাকিছু রাওয়ায়েত করেন তাতে তারা সকলেই সত্যবাদী। আলহামদুলিল্লাহ ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সাহাবীগণ সকলের চেয়ে অধিক সত্যবাদী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করেছেন এমন একজন সাহাবীরও খোঁজ পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ এ সাহাবীদের মধ্য থেকে কারো কারো দুর্বলতা যে প্রকাশ পায়নি তা নয়।

www.pathagar.com

যেহেতু তাঁরা নিষ্পাপ ছিলেন না। কাজেই তাঁদের কারো কারো দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিংবা অসম্ভব কিছু নহে। এতদসত্বেও হাদীস যাঁচাই বাছাইর ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু ইচ্ছা করে মিথ্যা বর্ণনা করার মতো একজন সাহাবীও তাতে পাওয়া যায়নি।"

তারপর ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার মিম্বারে দাঁড়িয়ে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাও পরীক্ষা করে দেখা হতো এবং বলা হতো, হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে তাঁকে অভিযুক্ত মনে করা যায় না। বুসর বিন আরতাতের জীবনী সম্পর্কে যাকিছু প্রচলিত আছে (مع عرف منه) তা সত্বেও আবু দাউদে তাঁর দু'টি রাওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কেননা নবী আলাইহিস সালামের শানে সাহাবীগণের সার্বিকভাবে সত্য বলা একটি স্বীকৃত বিষয়।

অধ্যাপক আবদুল ওহাব (শরীয়া বিভাগ, আল আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়) تدريب الراوى فى شرح تقريب النوادى নামক গ্রন্থের টীকায় الصحابة كلهم عدول একথার অর্থ বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ

لايقع منهم ذنب اويقع ولا يوثر فى قبول مروياتهم

"সাহাবীগণ গুনায় জড়িত হন কিংবা না হন তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহ গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রভাব পড়বে না।"

অতপর তিনি মুহাদ্দিস ইবনুল আনবারী এবং অন্যান্য আলেমদের কথার সাথে শাহ ওলীউল্লাহ (র)-এর কথাও উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

وقال شاه ولى الله الدهلوى : وبالتتبع وجدنان جميع الصحابة يعتقدون ان الكذب على رسول الله اشد الذنوب ويحترزون عنه غاية الاحتراز -

"গভীর অনুসন্ধানের পর আমরা জানতে পারলাম, সার্বিকভাবে সাহাবীগণ একথায় বিশ্বাসী ছিলেন যে, আল্লাহর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা সাংঘাতিক গুনাহের কাজ। সাহাবীগণ এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।"

(تدريب الراوى ، المكتبة العلميه بالمدينه المنوره، ص ٤٠٢ طبع ١٣٧٩)

মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবর বাদী, ফাজেলে দেওবন্দ তার রচিত গ্রন্থ 'ফহমে কুরআন' এ (পৃষ্ঠা-১৩৪, ১৩৫৯ হিজরী) 'আদালতের উদ্দেশ্যে' শিরোনামে লিখেছেন ঃ

সাহাবীদের আদালতের উদ্দেশ্য কি ? একথা এখানে স্পষ্ট করে দেয়া জরুরী। আসলে উসূলে হাদীসবিদদের পরিভাষায় আদালতের অর্থ-মিথ্যা না

www.pathagar.com

বলা। আমরা সাহাবীগণকে আদেল বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তারা নিষ্পাপ এবং মাসুম। বরং উদ্দেশ্য শুধু এই যে, তাঁদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করা যায় না। অর্থাৎ বলা যাবে না যে, কোনো সাহাবী ইচ্ছা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এমন কথার সম্পৃক্ত করেছেন যা তিনি বলেননি। কোনো মুহাদ্দিস এ দাবী করেননি যে, সাহাবীগণ নবীগণের ন্যায় মাসুম এবং তাদের তাকওয়া ও পরহেযগারীর খেলাফ কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব। আল্লামা ইবনুল আনবারী বলেছেন ঃ

ليس المراد بعد التهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المصية منهم وانما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن اسباب العدالة وطلب التزكية الاان يثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذالك۔

"মিথ্যা ভাষণ থেকে দূরে থাকার অর্থ এ নয় যে, সাহাবীগণ সম্পূর্ণ মাসুম এবং তাদের দ্বারা গুনাহের কাজ হওয়া অসম্ভব। বরং এই যে, শুধুমাত্র আদালতের উপকরণ এবং সাফাই সনদের অনুসন্ধান ছাড়াই তাদের রেওয়ায়েত গ্রহণীয় হবে। তবে অবাঞ্ছিত কাজে জড়িয়ে পড়া প্রমাণিত হলে সেটা স্বতন্ত্র কথা কিন্তু বাস্তবে এর কোনো প্রমাণ নেই।"[১]

মুহাদ্দিস ইবনুল আনবারীর[২] একথা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব তাঁর রচিত منهج الوصول الى اصطلاح احاديث الرسول শীর্ষক গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠায় আদালতে সাহাবী অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন ঃ

"وابن الانباری گفته مراد بعدالت ایشان ثبوت عصمت برائے ایشاں واستحالۂ معصیت بر ایشاں نیست بلکه مراد قبول روایات ایشاں است بغیر تکلف بحث از اسباب عدالت وطلب تزکیه مگر آنکه ارتکاب قادحی ثابت شود وحال آنکه ایں ارتکاب ثابت نشده"

"ইবনুল আনবারী বলেছেন–সাহাবীগণের আদালত তথা সত্যবাদিতার অর্থ–তাঁদের নিষ্পাপ কিংবা তাঁদের পক্ষে কোনো প্রকার গুনায় জড়িত হওয়া অসম্ভব বা অবান্তর হওয়া বুঝায় না। বরং কোনো কারণ কিংবা

১. শাওকানী প্রণীত ارشاد الفحول দ্রষ্টব্য।

২. মুহাম্মদ বিন বাশার আবু বকর বিন আনবারী নামে খ্যাত (মৃত ৩২৮ হিজরী) এবং হাফেজে হাদীসদের অন্যতম। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

www.pathagar.com

যাঁচাই-বাছাই ছাড়াই তাঁদের রাওয়ায়েত বিনাবাক্যে কবুল করে নেয়াই আদালতে সাহাবীর মূলকথা। অবশ্য তাঁদের প্রকাশ্যে কোনো দূষণীয় কর্মে জড়িত হওয়ার কথা জানা গেলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের এ জাতীয় কর্মে লিপ্ত হওয়ার কথা আদৌ প্রমাণিত হয়নি।"

মাওলানা আবুল হাসানাত আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র) প্রণীত مجموعه فتادی গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ১২ পৃষ্ঠায় (১৩০৯ হিজরী সনে শওকতে ইসলাম প্রেস, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত) সাহাবীদের আদালত সম্পর্কিত এক প্রশ্নোত্তর ব্যক্ত হয়েছে ঃ

سوال: در عقیدۂ اہل سنت الصحابة کلهم عدول، مراد از عدالت چیست؟

جواب: این عقیده نه در کتب قدیمهٔ عقائد است نه در کتب علم کلام بلکه این فقره را محدثین در اصول حدیث بمقام بیان تعدیل طبقات رواة می آرند و کسیکه این را در عقائد درج کرده است، از همانجا آورده باشد۔ و مراد از عدالت پرہیز کردن از قصد کذب در روایت است و فی الحقیقت تمام صحابه متصف بعدالت کذائی بودند و کذب علی النبیؐ را اشدّ گناه می پنداشتند۔

প্রশ্ন ঃ আহলে সুন্নতের আকীদা অনুযায়ী "সাহাবীগণ সকলেই আদেল" (الصحابة كلهم عدول) বাক্যে 'আদালত' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ এ আকীদা আকায়েদের কোনো প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত নেই, কালাম শাস্ত্রীয় (তর্ক বিষয়ক) কিতাবেও পাওয়া যায় না। অবশ্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসের মূলনীতির রাবী বা বর্ণনাকারীদের যাঁচাই-বাছাই করন আলোচনায় একথার উল্লেখ করেছেন। কেউ এটাকে আকায়েদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকলে সম্ভবত সেখান থেকেই গ্রহণ করে থাকবেন 'আদালতের অর্থ হলো, রাওয়ায়েত করার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার ইচ্ছা পরিহার করা। প্রকৃতপক্ষে সাহাবীগণ আদালতের গুণে বিশেষিত ছিলেন এবং কোনো মিথ্যা কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করাকে মস্তবড় গুনাহ মনে করতেন। এ জবাবটি ফতওয়ায়ে মাওলানা আবদুল হাই তরজমা পৃষ্ঠা–৮৩ দেখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

الصحابة كلهم عدول। (সাহাবীগণ সকলেই আদেল) কথার সঠিক তাৎপর্য উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায়। তা দ্বারা এ বিষয়ও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মুহাদ্দিসগণ এ নীতি যাঁচাই-বাছাই করার পর প্রণয়ন করেছেন। এ ক্ষেত্রে একথাও স্পষ্ট হওয়ার যোগ্য যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ও একাধিক সাহাবীর নিয়ম ছিলো, তাঁরা কোনো সাহাবীর রাওয়ায়েত গ্রহণ করার আগে তাদের থেকেও অতিরিক্ত সাক্ষ্য অথবা হলফের দাবী করতেন। এতেও প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে (الصحابة كلهم عدول।) সাহাবীগণের সকলেই ন্যায়বান হওয়ার নীতি সামষ্টিকভাবে ব্যাপক ও স্বীকৃতরূপ ধারণ করেনি।

যাহোক, আহলে সুন্নাতের আলেম ও মুহাদ্দিসগণের কাছে দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট ও প্রণিধানযোগ্য। এক, সাহাবীগণের গুনাহখাতা হওয়া সম্ভব এবং বাস্তবে তা হয়েও ছিলো। দুই, সাহাবীদের ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার নীতি হাদীস রাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর অর্থ হলো, কোনো সাহাবী ইচ্ছা করে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্বার সাথে মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করতে পারেন না। এ দু'টি কথার মধ্যে নীতিগত ও বাস্তব দিক থেকে কোনো বিরোধ বা বৈপরিত্য নেই। এরপরও যদি যে কেউ বলে খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা অপর কোনো সাহাবীর প্রতি 'অমুক' গুনাহে সম্পৃক্ত করাতে সাহাবীদের আদালত আহত বা ক্ষুণ্ন হয়ে যায় কিংবা ঈমান ও আকীদা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এ ব্যক্তির ভুল কথায় শুধুমাত্র খেলাফত ও রাজতন্ত্র কিংবা ইতিহাস গ্রন্থাবলীই ত্রুটির আওতায় এসে যায় না এর দ্বারা অনিবার্যরূপে আহত হবে কুরআন সুন্নাতের ভাষ্য হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, আকায়েদ এবং কালাম শাস্ত্রের অগণিত গ্রন্থরাজি এবং খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও লেখকবর্গ। কারণ, এসব গ্রন্থে সে ধরনের কথাই বরং তার চেয়েও কঠোর ভাষা ব্যক্ত হয়েছে যার অনেকগুলোর উদাহরণ আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং পরবর্তী পর্যায়েও আমাকে উল্লেখ করতে হবে।

'আল বালাগ' সম্পাদক একটি সম্পূর্ণ ভুল ও অযৌক্তিক তৎপরতার উপর পীড়াপীড়ির অন্তরালে প্রথমে তো খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থ থেকে ১১টি বিষয়ের এক ধারাবাহিক ও যথারীতি সূচীপত্র বিন্যস্ত করেন এবং প্রত্যেক কাজকে নিজের ইচ্ছা মতো শব্দ প্রয়োগ দ্বারা মরিচ-মসলার প্রলেপ দিয়ে অত্যন্ত ভয়ংকর চিত্রে তুলে ধরেন। অতপর তিনি প্রশ্ন করেন, এ সমস্ত অপরাধকে "দু' একটি কিংবা কতিপয় গুনাহ হয়ে যাওয়া" ভাষায় আখ্যায়িত করে কোনো মতে মাওলানা মওদূদী (র) সাহেব আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত নহেন কি ? মাওলানা তাকী ওসমানী সাহেবের প্রতি আমার কথা হলো—আপনার কাছে খেলাফত ও রাজতন্ত্র বইয়ের যে কপি আছে তার মধ্যে আপনি ইচ্ছা করলে এক, দুই কিংবা কতিপয় এর স্থলে ১১ কিংবা তারচেয়ে বেশী কোনো সংখ্যা সংযোজন করে নিতে পারেন ; কিন্তু তারপরও বাক্য তার আপন

www.pathagar.com

জায়গায় সত্য সঠিক এবং আবর্জনা মুক্তই থেকে যাবে। তবে এটা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার বিষয় যে, মাওলানা মওদূদী (র) যে কথা অত্যন্ত শালীন ও ভদ্রভাবে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েক লাইনে ব্যক্ত করেছেন, আল বালাগ সম্পাদক সাহেব সে সবের আলোচনা দ্বারা প্রত্যেকটির উপর বিশদ আলোচনা করতে এবং সেগুলোর প্রমাণ পেশ করতে আমাকে বাধ্য করেছেন।

হাদীস বর্ণনায় মিথ্যা ভাষণ সাহাবায়ে কেরামদের জন্যে অসম্ভব কেন ?

'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেব এ যুক্তি বারবার উল্লেখ করেছেন যে, একজন সাহাবী যদি ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অমুক অমুক ধরনের গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে পারেন, তাহলে স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে মিথ্যা হাদীস রচনা করতে তাঁর অসুবিধা কোথায় ? দীনি শিক্ষাংগনে মানতিক বা তর্কশাস্ত্র পড়ার সৌভাগ্য তো আমার হয়নি ; তবে যারা ঐসব মাদ্রাসা থেকে সার্টিফিকেট লাভ করেছেন তাদের তো এতটুকু বুঝা উচিত যে, একটি গুনাহ্ যতো বড়ই হোক না কেন তাতে অপর একটি গুনায় জড়িয়ে পড়া অনিবার্য করে তোলে না। তাতে বরং সন্দেহ কিংবা সম্ভাবনার ধারণাই সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ, একজন লোক মদ্য পানে জড়িত হলে মিথ্যা হাদীস রচনা করা তার জন্যে অনিবার্য নয় ; তবে মিথ্যা হাদীস বলার একটা সম্ভাবনা কিংবা সন্দেহ্ হতে পারে বটে। এবার যেহেতু অন্যান্য বিতর্কিত রাবীদের সাথে সম্পর্কিত এ ধরনের সন্দেহ কিংবা সম্ভাবনা দূর করার সুনির্দিষ্ট কোনো উপায় নেই। সুতরাং তাদের রাওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য না হবারই কথা। তবে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে যখন মুহাদ্দিসগণ যথারীতি অনুসন্ধানের পর জানতে পারলেন যে, তাঁরা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যদিও কোনো গুনায় জড়িয়ে পড়তে পারেন, এমনকি কারো উপর মিথ্যা অপবাদও দিতে পারেন, তথাপি তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কোনো মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করা তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। তাহলে ওসমানী সাহেব আবারো কেবলমাত্র কল্পনার তীর নিক্ষেপ করে কিসের ভিত্তিতে যুক্তি পেশ করলেন যে, যে সাহাবী দশ কিংবা বিশটি গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন, তিনি মিথ্যা হাদীস রচনায় অংশ নেবেন না কোন্ কারণে ? সাহাবীদের কবীরা গুনাহে পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ার কথা তো কেউ অস্বীকার করে না। আপনি কি তাহলে নতুন এক রহস্য আবিষ্কার দ্বারা এবং এক অভিনব দলীল সরবরাহ দ্বারা হাদীস অস্বীকারকারীদের হাতে একটি নতুন হাতিয়ার তুলে দিতে উৎসাহী ?

আলহামদুলিল্লাহ ! এ পর্যন্তকার আলোচনায় এ সত্য দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হলো যে, সাহাবীগণ যে ধরনের এবং যতো গুনাহই করুন না কেন ;

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করা তাদের জন্যে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে এখানে এ প্রশ্ন ও এ সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ থাকে যে, বড় বড় গুনাহের কাজে সাহাবীদের জড়িয়ে পড়া যখন সম্ভব এবং বাস্তবে তদ্রূপ হয়েছেও তাহলে কোনো সাহাবী কর্তৃক মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করার ত্রুটি না হওয়ার কারণ কি হতে পারে ? ওসমানী সাহেব ও তার মতো অন্যান্য বুযূর্গদের আলোচনার ধরনে আমার এ উপলব্ধি অমূলক নহে যে, এ সন্দেহের এমন কতিপয় লোকের মনেও দানা বেঁধেছে স্বভাবতই যারা সাহাবীদের রাওয়ায়েতে ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া এবং তাদের নিষ্পাপ (ইসমত) না হওয়ার কথা সমর্থন করতে আগ্রহী। সুতরাং আমি বিষয়টির এদিকটিও মানসিক প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই ঃ

একথা সম্পূর্ণ সত্য ও স্পষ্ট যে, পরম সম্মানিত সাহাবীগণ নবীগণের পর সর্বোত্তম সৃষ্ট মাখলুক ছিলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উর্ধে ছিলেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম সাহচর্য, আদর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ার পরও তাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যেত। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও কৌশলের এ বিষয়ের স্বাভাবিক দাবী ছিলো এবং নবী আলাইহিস সালামেরও একান্ত বাসনা ছিলো যে, সাহাবীদের জীবন চরিত্র থেকে অন্ততঃ একটি ভুলের চির অবসান হওয়া উচিত। আর সেটা হলো, কোনো সাহাবীর ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর রাসূলের প্রতি মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত না করা। অন্য ভুলত্রুটির প্রভাব তো এক ব্যক্তি কিংবা কতিপয় লোক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। কিন্তু সাহাবীদের ভুল হাদীস বর্ণনার কারণে গোটা দীনই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা। এ আশংকা রোধের জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতো চিন্তা করেছেন এবং এর অবসান ব্যাপারে যতোটা গুরুত্ব দিয়েছেন, আমার ধারণামতে শিরকের প্রতিকার ছাড়া অপর কোনো ব্যাপারে সে পরিমাণ প্রয়াস নেননি। তিনি বারবার সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

من كذب عليّ متعمدًا فليتبوّأ مقعده من النار ـ

"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা উক্তি সম্পৃক্ত করবে ; সে যেনো জাহান্নামকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"[১]

দু'শরও অধিক সাহাবী এ বাণীটি বর্ণনা করেছেন। এমনকি মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন, অন্য কোনো হাদীস এ হাদীসটির মোতাতাওয়াতেরের (বর্ণনার ধারাবাহিকতা) সীমায় পৌঁছতে পারেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদীস বর্ণনা করার সময় অধিকাংশ সাহাবী এ হাদীসটি শুনাতেন এবং তাতে তাঁদের চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যেতো এবং শরীর

১. ইলম অধ্যায়, বুখারী অন্যান্য বহু জায়গায় হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে।

www.pathagar.com

শিহরিয়ে উঠতো। মুখ থেকে কোনো ভুল কথা বের হয়ে যাওয়ার ভয়ে বহু সাহাবী অধিক হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন। মুহাদ্দিসগণও এ হাদীসটিই বেশী বেশী বর্ণনা করতেন এবং অনেকে এ হাদীসটি দিয়েই তাঁদের বর্ণনাধারা শুরু করেছেন। অতপর অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে হাদীস বর্ণনা করার পর বলতেন ঃ او كما قال النبى صلى الله عليه وسلم অথবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেরূপ বলেছেন। যাতে অজ্ঞতার কারণে জাহান্নামের শাস্তির পাত্র হতে না হয়।

এ বিষয়ের উপর একটি মাত্র হাদীস নয় বরং একই মর্মে আরো কতিপয় হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন, বুখারীর কিতাবুল জানায়েয এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে হযরত মুগীরা বিন শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ان كذبًا علىّ ليس ككذب على احد ـ من كذب علىّ فليتبوأ مقعده من النار ـ

"আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা অপর কারো সম্পর্কে মিথ্যা বলার তুল্য নয়। যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করলো সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"

বুখারীর কিতাবুল ইলমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لاتكذبوا علىّ من كذب على فليلج النار ـ

"আমার প্রতি মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করো না; যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যা রটনার আশ্রয় নিবে, তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া সুনিশ্চিত।"

এমনভাবে বুখারীর মানাকেবে কুরাইশে ওয়াসেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

ان من اعظم الفرى ان يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل ـ

"সর্বাপেক্ষা মিথ্যা ও জঘন্যতম রটনা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেননি সে কথা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা।"

হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে অপর এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে ঃ

كان اخر ماعهد الينا ان قال سترجعون الى قوم يحبون الحديث عنى ومن قال علىّ مالم اقل فليتبوأ مقعده من النار ـ(الكفايه ص ١٦٦)

"আমাদের প্রতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ ওসিয়ত ছিলো, যারা আমার হাদীস মহব্বত করবে তাদের সাথে সত্বরই তোমাদের

www.pathagar.com

পরিচয় ঘটবে ঃ আমি বলিনি এমন কথা যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পৃক্ত করে প্রচার করবে আমার দিকে সম্বোধন করে বলবে তার ঠিকানা অবশ্যই জাহান্নামে।"

আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাযা, দারেমী, মুসনাদে আহমদ সহ প্রায় প্রতিটি হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ ধরনের অসামান্য সতর্কতা ও কঠোর শাস্তিমূলক সতর্কবাণীর ফলে সাহাবীগণের অন্তর থেকে নবীর উপর মিথ্যা রটনা করার প্রবণতা এমনভাবে দূরীভূত হয় যে, সমগ্র সাহাবীগণের মধ্যে একজন সাহাবীও এ কাজ করেছেন বলে আদৌ খুঁজে পাওয়া যায়নি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অপর কয়েকজন সাহাবী সূত্রে বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে এ মর্মে উক্তি বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছেন ঃ "প্রতি মিথ্যা রটনা সম্পৃক্ত করা অপেক্ষা আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আমাদের জন্য অধিক সহজ।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি বুখারীতে বর্ণিত আছে এবং যেটাকে الكفايه। এর ১০২ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখ করা হয়েছে তাহলো ঃ

فوالله لان اخر من السماء احبّ الىّ من ان اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"আল্লাহর কসম ! রাসূলের প্রতি মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করা অপেক্ষা আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আমার জন্যে অধিকতর সহজ।"

একই কিতাবের ১৭৮ পৃষ্ঠায় হযরত ওয়াকী সাহাবাদের সম্পর্কে হযরত 'আমাশের একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ

كان احدهم لان يخر من السماء احبّ اليه من ان يزيد فيه واوًا والفًا ودالاً

"সাহাবীগণের প্রত্যেকের অবস্থা ছিলো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় ওয়াও অথবা আলিফ অথবা দাল জাতীয় একটি অক্ষরও নিজেদের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে দেয়ার চেয়ে আকাশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যাওয়াকে তাঁরা প্রাধান্য দিতেন।"

মানবসুলভ বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহাবীগণও বড় গুনায় জড়িয়ে যেতেন। সাহাবীদের পরবর্তী যুগের কোনো কোনো রাবী কর্তৃক হাদীসের মধ্যে মিথ্যা বলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তবে এ বিষয়টিকে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের একটি মস্তবড় মোযেজা এবং সম্মানিত সাহাবীদের কারামত মনে করি। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীদেরকে

www.pathagar.com

আমি এ ক্ষেত্রে সমান অংশীদার মনে করি যে, যদিও তাদের থেকে মিথ্যা বলার প্রবণতা দূরীভূত হয়নি অনুরূপ গুনার প্রতি আকর্ষণও সমূলে বিনাশ হয়নি তাসত্ত্বেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা রটনার প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটিত হয়ে গিয়েছিলো। পরিশেষে আমার কথা হলো, বিতর্কের অবাঞ্ছিত ধারা পরিহার করে আসুন, আমরা সবাই মিলে এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি এবং একজন সাহাবী যদি সব ধরনের গুনায় জড়িয়ে যেতে পারেন, তাই তাঁর পক্ষে মিথ্যা হাদীস রটনায় বাধা কোথায় ? জাতীয় সর্বনাশা যুক্তি প্রমাণের উপস্থাপনা আর বিতর্কের কুহেলিকা থেকে মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুলে ক্ষমা চেয়ে নেই।

আদালত কিভাবে ক্ষুণ্ন হয় ?

ইতিপূর্বে আলোচনায় সাহাবীর আদালতের সঠিক ও প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একথাও প্রমাণ করা হয়েছে যে, الصحابة كلهم عدول। কথাটি মুহাদ্দিসগণের একটি পারিভাষিক উক্তি বিশেষ। এর উদ্দেশ্য হলো, সাহাবীগণ সার্বিকভাবে নবীর হাদীস রাওয়ায়েত করার ব্যাপারে ছিলেন খুবই সতর্ক ও সত্যবাদী। তারা হাদীস বর্ণনায় কখনো সামান্যতম মিথ্যার আশ্রয় নেননি। এবার আদালতে সাহাবীর এ নীতি—কেউ এটাকে আকীদা বলতে চাইলে বলতে পারে—ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুণ্ন হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ না কেউ একথা বলে যে, সাহাবীগণও (নাঊযুবিল্লাহ) আল্লাহর রাসূলের দিকে মিথ্যা বা ভুল কথা সম্পৃক্ত করেছেন অথবা একথা না বলে যে, যেহেতু সাহাবীগণও ভুল বা গুনায় জড়িত হয়ে থাকেন এবং হয়েছেনও। সুতরাং মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদেরকেও সন্দেহ করা যায়। এ কারণে সাহাবীদের আদালত এবং তাঁদের বর্ণিত রাওয়ায়েত অন্যান্য রাবীদের মতোই সত্য-মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে যাঁচাই-বাছাই করা জরুরী।[১] মাওলানা মওদূদী (র) সে নীতির আদৌ সমর্থক নহেন। বরং কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রত্যেক সাহাবীকে হাদীস রাওয়ায়েতের ব্যাপারে আদেল বা ন্যায়নিষ্ঠ বলে স্বীকার করেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর

১. যারা উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকাহের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছেন তাদের কাছে এ তত্ত্ব অজানা থাকতে পারে না যে, ঐসব কিতাবের যেখানেই الصحابة كلهم عدول। -এর আলোচনা এসেছে সেখানেই একথা বর্ণিত হয়েছে যে, মুতাযিলাগণ সাহাবীদের রাওয়ায়েত সম্পর্কেও অন্যান্য রাবীদের মতই আদালতে প্রসংগটিকে অনুসন্ধান ও যাঁচাই-বাছাই করার দাবী করেছেন। বিশেষত ফিতনা এবং পারস্পরিক মতপার্থক্যের সময় সে সকল সাহাবী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দলে অংশ নেন, তাদের আদালত যাঁচাই করার প্রয়োজন আছে। তবে আহলে সুন্নাত এ উক্তি নাকচ করে দেন এবং একথাটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

www.pathagar.com

বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হিসাবে তার প্রণীত গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত করেছেন। তারপরও কোন্ যুক্তি বলে এ অপবাদ দেয়া জায়েয হতে পারে যে, খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীতে সাহাবীদের আদালত ক্ষুণ্ন হয়ে যায়?

আল বালাগ সম্পাদক সাহেব মনগড়া পদ্ধতিতে আদালতে সাহাবীর শ্রেণী বিন্যাস করে লিখেছেন, নীতিগত ও বিবেক সম্মতভাবে আদালতে সাহাবীর তিন অর্থ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার অর্থকে নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী আহলে সুন্নাতের নীতি বলে তিনি সাব্যস্ত করেছেন। তার ভাষায় এর তাৎপর্য হলো, সাহাবীগণ মাসুম ছিলেন না এবং তারা ফাসেকও ছিলেন না। অবশ্য এটা সম্ভব যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনো সময় মানবসুলভ দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে ২/১টি কিংবা কতিপয় ভুল করে ফেলেছেন, তবে সাবধান করার পর তারা তাওবা করে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এ কারণে তারা ঐসব ভুলের দরুন ফাসেক হয়ে যাননি। সুতরাং এটা হতে পারে না যে, কোনো সাহাবী গুনাহ্ করাকে নিজের নীতি বানিয়ে নিয়েছেন যদ্দরুন তাকে ফাসেক সাব্যস্ত করা সম্ভব হতে পারে।

মরহুম মাওলানা মওদূদী কিংবা আমি আদালতে সাহাবীর যে তাৎপর্যের কথা বর্ণনা করেছি তার সমর্থনে আহলে সুন্নাতের ওলামা ও মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন উক্তি পেশ করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত আরো করা যেতে পারে। কিন্তু ওসমানী সাহেব তার নিজের বানানো সংজ্ঞার সমর্থনে একটি উদ্ধৃতিও উল্লেখ করেননি। এতদসত্বেও মরহুম মওদূদী সাহেবের কোনো লেখাই আদালতের এ সংজ্ঞার সাথে সাংঘর্ষিক পর্যায়ের নহে। ওসমানী সাহেব প্রথমতঃ বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামগণ যেমন মাসুম ছিলেন না তেমন ফাসেকও ছিলেন না। এখন আমার জিজ্ঞাসা, মাওলানা মওদূদী (র) কোন্ স্থানে তাঁদের কাউকে ফাসেক লিখেছেন? সাহাবীদেরকে কেবলমাত্র মাসুম নয় বলাতে কিংবা তাঁদের কোনো ভুল উল্লেখ করার কারণে আপনি তার উপর এ অপবাদ আরোপ করতে চান কোন্ যুক্তি বলে? যদি এ ধরনের উদ্দেশ্য-বিধেয় একত্র করে আর ইচ্ছামত সমন্বয় ঘটিয়ে অপবাদ আবিষ্কার করা যায়, তাহলে যারা পূত-পবিত্র মহিলাদের চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাদের সম্পর্কে সূরা নূরের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (তারাই ফাসেক) তাদেরও সম্পর্কে বলে দিন যে, হাসান বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মেসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হামনা বিনতে জাহশ (উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার বোন) তারা সকলেই সাজা প্রাপ্তি এবং তাওবা করার পরও ফাসেকরূপেই গণ্য হবেন। বরং তারাই হচ্ছেন ফাসেক। পরিশেষে এটা কোন্ ধরনের দলীল ও যুক্তির অবতারণা? মাওলানা মওদূদী (র) তো আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ফাসেক কিংবা ফিস্‌ক শব্দ

www.pathagar.com

কোথাও প্রয়োগ করেননি। কিন্তু আপনি চাইলে আমি আহলে সুন্নাতের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের চিহ্নিত করে দিতে পারি যারা এ ধরনের শব্দও প্রয়োগ করেছেন। ফিস্‌ক কিংবা বেদআত শব্দ আদৌ গালি, তিরস্কার কিংবা ভর্ৎসনা অর্থবোধক শব্দ নহে। আমি আবদুল আযীয (র) সাহেবের একটি উক্তি আগে উল্লেখ করেছি যাতে তিনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ইংগীত করে বলেছেন ঃ

الفاسق ليس باهل اللعن

"ফাসেক হলেই অভিশাপযোগ্য হবেন এমন কোনো কথা নেই।"

আনুগত্যহীনতার উপর ফিস্‌ক শব্দের প্রয়োগ

এবার অপর একটি উক্তি নিন। কাযী আদুদ্দীন (র) প্রণীত কিতাবুল মাওয়াকিফ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, যার বিষয়বস্তু হলো—আহলে সুন্নাতের আকীদা-বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করা। শরহুল মাওয়াকিফ নামে এ গ্রন্থটির একটি বিরাট ও প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল্লামা সাইয়েদ শরীফ আলী বিন মুহাম্মদ জুরজানী (মৃ, ৮১৬) প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটির শেষ পর্বে ঃ الموقف السادس في السمعيات নামের একটি অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায়ে وجوب نصب الامام শিরোনামের সাহাবীদের তাজীম প্রসংগে আলোচনাক্রমে আল্লামা জুরজানী যা বলেছেন, তার পূর্ণ আরবী বাক্যসহ অনুবাদ পেশ করা দীর্ঘসূত্রিতার ব্যাপার। এ কারণে আমি প্রথম অংশের অনুবাদ এবং শেষাংশের অনুবাদসহ আরবী পেশ করছি। প্রথমে তিনি বলেছেন ঃ

"সকল সাহাবীকে সম্মান করা এবং তাঁদের নিন্দা না করা ওয়াযিব। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁদের সম্মান ও প্রশংসার কথা উল্লেখ করেছেন। তদ্রূপ বহু হাদীসেও তাঁদের প্রশংসার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই ব্যক্তি যে তাদের জীবন চরিত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, তাদের ইতিহাস, দীনি প্রচেষ্টা এবং আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে তাদের নিবেদিত প্রাণ, উৎসর্গীকৃত সম্পদ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করে, তার মনে সাহাবীদের সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তদুপরি তার মনে প্রত্যয় সৃষ্টি হয় যে, বাতিলপন্থীরা সাহাবীদের শানে যেসব অবান্তর কথার ফানুস উড়িয়েছে তার সবই মিথ্যা-ভিত্তিহীন, এ সমস্ত থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত ও পূত-পবিত্র। এমতাবস্থায় সে তাদের নিন্দা ও অশালীন উক্তি করা থেকে সযত্নে বিরত থাকে। কেননা এহেন আচরণ ঈমানের পরিপন্থী আমি এ ধরনের কদর্য ভাষণ থেকে আমার গ্রন্থটি কলংকিত করতে চাই না। যদিও বড় বড় গ্রন্থরাজিতে এসব কথা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে। ইচ্ছা করলে তোমাদের কেউ সেসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করে দেখতে পার। এ পর্যায়ে সাহাবীদের আত্মকলহ ও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের বাস্তব

www.pathagar.com

ঘটনাকে কোনো কোনো মুতাযিলী মূলতঃ অস্বীকারই করে বসেছে। অথচ এ জাতীয় উক্তি অনুভূতি যে নিছক আত্মগর্ব ও অহংকারের নামান্তর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। আর যারা এ ফেতনা ও কোন্দল স্বীকার করেছেন তাদের কেউ কেউ বিবদমান দু' পক্ষের ভুল-ত্রুটি ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে মত প্রকাশে মৌনতা অবলম্বন করেছেন, তারা হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একাংশ।"

অতপর তিনি বলেনঃ

والذى عليه الجمهور من الامّة هوان المخطى قتلة عثمان ومحاربو على الانهما اما مان فيحرم القتل والمخالفة قطعًا الا...... كاالقاضى ابى بكر ذهب ان هذه التخطيه لاتبلغ الى حدا التعسيق ومنهم من ذهب الى التفسيق كاالشيعة وكثير من اصحابنا ـ

"জমহুরে উম্মত অর্থাৎ উম্মতের অধিকাংশ লোক যে নীতি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তাহলো, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দল গুনাহগার ছিলো। কেননা, তারা উভয়ই তৎকালীন ইমাম ছিলেন ; তাদের হত্যা করা এবং তাদের বিরোধিতা করা সম্পূর্ণ হারাম ছিলো। অবশ্য উম্মতের কোনো কোনো আলেম যেমন কাযী আবু বকর বাকেলানীর মতে এ ধরনের গুনাহের কারণে তারা ফাসেকের সীমায় পৌছে যায়নি। আবার তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষ অবলম্বনকারীদেরকে ফাসেক আখ্যায়িত করে থাকেন। যেমন, শিয়া সম্প্রদায় এবং আমাদের সুন্নী আলেমদের অনেক বৃহত্তর অংশ।"-(শরহে মোয়াকিফ, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৭৩-৩৭৪, ১ম সংস্করণ, সাআদাহ্ প্রেস মিসর ১৩২৫ হিজরী)

শরহে মোয়াকিফের এ আলোচনায় কতিপয় দিক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে কুরআন-হাদীসের আলোকে সাহাবীদের ফযীলত ও প্রশংসার কথা বর্ণনা করে সাহাবীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াযিব সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি ঘৃণা, অবমাননা ও সমালোচনার মনোবৃত্তি পরিহার করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অবশ্য সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আমাদের আলেম শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত লোকদেরকে ফাসেকও বলেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ ফাসেক বলা সে পর্যায়ের নিন্দা ও অবমাননার আওতায় আসে না যা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখা হয়েছে এবং আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের

www.pathagar.com

নির্দেশ রয়েছে। অধিকন্তু যে ওয়াযিবের কথা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে তারও বিপরীত নয়। এ আলোচনায় আরো জানা গেলো যে, আহ্‌লে সুন্নাতের একদল লোক এসব দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে মৌন থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে অধিকাংশের মতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারীগণ গুনাহগার ছিলো আর এ গুনাহ আমাদের অনেকের মতে ফাসেকীর সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিলো ; অবশ্য কারো মতে সে পর্যায়ে পৌঁছেনি।

সাহাবীদের প্রত্যেক কাজ ও কথা কি ইজতেহাদ ?

একথা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলেম সাহাবীদের সকলকেই মুজতাহিদও বলেছেন। সুতরাং যেসব সাহাবী ভুল করেছেন, এটা ছিলো তাদের ইজতেহাদী ভুল। যার প্রতিদানে তাঁরা দ্বিগুণ না হোক অন্তত একটি সওয়াবের অধিকারী অবশ্যই হবেন। এ প্রসঙ্গে আমার বিনীত আরয হলো ঃ الصحابة كلهم مجتهدون -একথাটিও কুরআন-হাদীসের কোনো দলিল নয় বরং আলেমগণেরই বর্ণিত উক্তি বিশেষ। প্রথম কথা হলো, সকল সাহাবী ইজতিহাদের অভিন্ন স্তরে ও সম আসনে আসীন ছিলেন না। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে শাহ আবদুল আযীয (র) বলেছেন ঃ

"پس ہرکہ اجتہاد ایشاں را نفی کند درست است زیراکہ در حضور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایشاں را آں مرتبہ حاصل نبود۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در ہیچ مسئلہ بر صحت اجتہاد حکم نفرمودہ اند تا اجتہاد ایشاں معتبر و مفتی بہ تواند شد۔ و ہرکہ ایشاں را مجتہد گفت نیز درست گفت زیراکہ در اخیر عمر بسبب سماع احادیث کثیرہ از صحابہ دیگر بعضے مسائل فقہ دخل می کردند، ہمیں است معنی قول ابن عباس کہ انہ فقیہ۔

(فتاوی عزیزی جلد اول ص۱۰۱ کتب خانہ رحیمیہ دیوبند) –

(ফতুয়ায়ে আযিযী খণ্ড, ১ পৃষ্ঠা-১০১, রহিমীয়া কুতুবখানা, দেওবন্দ)

"যে সকল সাহাবী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ইজতিহাদ করার মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হননি তাঁদের ইজতিহাদ

www.pathagar.com

অস্বীকার করা জায়েয। কারণ, তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে ইজতিহাদ করার ক্ষমতা লাভ করতে পারেননি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো ইজতিহাদী মাসআলাকে সত্যায়ন করেননি যে, তার ইজতিহাদ নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হতে পারে। আর যারা তাঁকে মুজতাহিদ বলেছেন তারাও বলেছেন। কেননা, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ বয়সে বিজ্ঞ সাহাবীদের কাছ থেকে অনেক হাদীস শুনেছেন। যে কারণে কোনো কোনো ফিকহী মাসআলায় তিনি অভিমত ব্যক্ত করতেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি ঃ انه فقيه। (তিনি একজন ফকীহ্)-এর তাৎপর্য এটাই।"-(ফতওয়ায়ে আযিযী, অনুবাদ সাঈদ এণ্ড কোং করাচী, পৃষ্ঠা-২১৮, ১৩৮৭ হিজরী)

এতদসত্ত্বেও যদি এ নীতি মেনেও নেয়া হয় যে, সাহাবীদের সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন তবুও তাদের প্রতিটি কাজ ও কথার উপর ইজতিহাদের অর্থ প্রযোজ্য হতে পারে না। অনুরূপ প্রত্যেক ভুলের উপর ইজতিহাদী ভুল শব্দের প্রয়োগও যথার্থ নহে। যদি এটা হতো তাহলে কোনো কোনো কাজের জন্যে তাঁরা জবাবদিহি ও শাস্তির মুখোমুখী কেন হয়েছেন এবং সেসব কাজের জন্যে তাদের তাওবা ও অনুশোচনার পর্যায়ই বা কেন সৃষ্টি হলো ? আর তাওবার প্রশ্ন দেখা দেয়ারই বা কারণ কি ? বস্তুত যে কাজ ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল তদুপরি প্রতিদান লাভের অনিবার্য কারণ, তার সম্পাদনে জবাবদিহি ও শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। আর তাওবার প্রয়োজন দেখা দেয়া যুক্তিগ্রাহ্য হয় কি করে ? এ সকল প্রশ্ন নিবিড় মনে বিবেচনা করে দেখার দাবী রাখে বৈকি ? সে জন্য তাওবা করারও প্রয়োজন হয় কেন ?

একথা আমি আগেই পরিষ্কার ভাষায় বলেছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইজতিহাদকে প্রতিদানের উপকরণ বলেছেন সেটা হুকুমদাতার হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত। যা কোনো শরঈ হুকুমকে কোনো আংশিক মাসআলার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার কারণে উৎসারিত হয় এবং নসের বিপরীত কিংবা অকাট্যভাবে বাতিলযোগ্য নহে। অন্যথায় জনৈক সাহাবী তো কুরআনের এক আয়াত বলে মদ্য পান হালালই করে বসেছিলেন যার কারণে তার উপর হদ জারী করা হয়েছিলো। উপরে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদ সম্পর্কে শাহ আবদুল আযীয (র) সাহেবের যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার একটু পরই শাহ সাহেব আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেছেন, সে সময় তাঁর ইজতিহাদ এমন পর্যায়ে উপনীত হয়নি যাতে তাঁকে প্রশাসনিক দক্ষ, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও শীর্ষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য করা যায়। পক্ষান্তরে মুহাককিক আলেমগণের মতে হযরত আলী

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত নস তথা কুরআন-হাদীসের দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত।[১] কোন্ সব কাজ ইজতিহাদযোগ্য এবং কোন্ ইজতিহাদে ভুল হলেও প্রতিদান পাওয়া যায় সেটা স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী সহীহ আল বুখারীর كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه অধ্যায় দু'টি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। একটির শিরোনাম হলো ঃ

اذا اجتهدا العامل اراالحاكم فاخطأخلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود

لقو النبى صلى اللّه عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردّ

"যখন কোনো কর্মচারী কিংবা কর্মকর্তা ইজতিহাদ করতে গিয়ে অজান্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেলাফ ভুল করে এমতাবস্থায় তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানযোগ্য হবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমাদের নির্দেশের খেলাফ কাজ করবে তার কাজ প্রত্যাখ্যাত।"

ইমাম বুখারী (র)-এর ২য় পরিচ্ছেদের শিরোনাম হলো ঃ

اجرا لحاكم اذا اجتهد فاصاب اواخطأ۔

"হুকুমদাতার ইজতিহাদ ভুল কিংবা শুদ্ধ হোক তার প্রতিদান।"

মোটকথা, একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, একজন সাহাবীর প্রতিটি কথা ও কাজের উপর ইজতিহাদের পরিভাষা প্রযোজ্য হতে পারে না এবং প্রতিটি ভুলও সেই ইজতিহাদী ভুল হতে পারে না যার প্রতিদান ও সওয়াব পাওয়া হাদীসের আলোকে অনিবার্য।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা সত্য ও সঠিক প্রমাণ করার জন্যে কোনো কোনো আলেম সে সকল হাদীসের আশ্রয় নিয়েছেন যে, হাদীসে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হকপন্থী দু' দলের উত্তম (اولى الطائفتين من الحق) অথবা মুসলমানদের বৃহত্তর দু' দলের (فئتين عظيمتين من المسلمين) অন্তর্ভুক্ত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। যুক্তির ধরন হলো, যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু

১. শাহ সাহেবের ইংগীত হলো ঃ .... الخلافة بعدى ثلثون سنة .... تقتلك فئة باغية (আমার পরে ত্রিশ বছর পর্যন্ত খেলাফত কায়েম থাকবে ----- বিদ্রোহীগণ তোমাকে হত্যা করবে।) ইত্যাকার হাদীসের প্রতি। যেমন তাঁর ও তদীয় সম্মানিত পিতার অন্যান্য লিখাসমূহে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে শাহ্ সাহেবের উক্তির দাবী হলো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত যখন দলিল দ্বারা প্রমাণিত তখন তাঁর খেলাফতের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করাকে কি করে ইজতিহাদ বলা যেতে পারে?

www.pathagar.com

আনহুকে সত্য ও ন্যায়ের অধিকতর নিকটবর্তী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে তখন এর তাৎপর্য হলো—হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দলও প্রায় সমপর্যায়ের সত্যপন্থীই ছিলো, যদিও সত্য ও ন্যায়ের অধিকতর নিকটবর্তী পর্যায়ে তারা পৌঁছতে পারেনি। তবে এটা কোনো মযবুত ও অকাট্য দলীল নয়। কেননা এক ব্যক্তি বা দলের প্রশংসা যদি তুলনামূলক শব্দ (افعل التفضيل) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়, তাহলে তার প্রতিপক্ষ ও বিপরীত কর্মপদ্ধতির গুণ বৈশিষ্ট্য অনিবার্য হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সূরা আল বাকারার ২৩২ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্ণ করে নেয়, তখন তাদেরকে ২য় বিবাহ করতে বাধা দিও না। তারপরই বলা হয়েছে ঃ

ذَالِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ -

"এটাই তোমাদের জন্যে অধিকতর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন নিয়ম।"

এখন এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যদি তোমরা তাদের বিবাহে বাধা দাও তাহলে সেটাও পবিত্র ও পসন্দনীয় হবে। এভাবে সূরা হুদের ৭৮নং আয়াতে হযরত লূত আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন ঃ যদি তোমরা নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো, তাহলে এ কাজ হতে তোমাদের জন্যে অধিকতর পবিত্র (اطهر لكم)। একথার উদ্দেশ্য কি এটা হতে পারে যে, অপর কোনো অস্বাভাবিক বদ অভ্যাসও কোনো পর্যায়ে পবিত্রতার ধারক হতে পারে? একইভাবে সূরা যুখরুফের ২৪নং আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَاءَكُمْ -

এ আয়াতে নবীগণের উপর অবতীর্ণ শিক্ষাকে অধিকতর হেদায়েতের কারণ সাব্যস্ত করাতে মুশরিক এবং তাদের বাপদাদার অনুসৃত নীতি কোনো এক পর্যায়ে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ আদৌ প্রমাণ করে না। এখন বাকী রইলো হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ফযীলত পূর্ণ হাদীসগুলোর কথা। এসব হাদীসে দু'টি বড় দলের সন্ধির শুভ সংবাদ রয়েছে। এখানে সন্দেহ করার কি কারণ থাকতে পারে? যে তাঁর আপোষমূলক নীতির দরুন মু'মিন ও মুসলমান দু'টি দলের পারস্পরিক ঝগড়ার সমাপ্তি ঘটেছিলো। কিন্তু এ হাদীসে কোনো দলের সঠিক ও বেঠিক হওয়ার কথা আদৌ উল্লেখ নেই।

www.pathagar.com

বস্তুত একটি উক্তি আছে যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীগণের ভুল ইজতিহাদী ভুল ছিলো। এক উক্তি আছে, এটা ভুল ছিলো তবে ফাসেক হওয়ার গণ্ডিতে পৌঁছেনি। অপর উক্তি মতে সে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। মরহুম মাওলানা মওদূদী এ সবের মধ্যবর্তী নীতি গ্রহণ করেছেন, (তিনি বলেছেন) এটা ইজতিহাদী ভুল নয় এবং নিয়তেরও ভুল নয় এটা ছিলো নিছক ভুল। এ নীতি অকাট্যভাবে নিরাপদ ও সতর্কমূলক। কেননা, এতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ইশারা-ইংগিতেও ফাসেক হওয়ার কথা আসেনি। ইতিপূর্বে উল্লেখিত উক্তিগুলো যাঁরা ব্যক্ত করেছেন তারা সকলেই আহলে সুন্নাতের লোক বরং আহলে সুন্নতের ইমামরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। আমি বুঝতে পারছি না, বর্তমানে আহলে সুন্নাতের সে কোন্ দলের আবির্ভাব হলো যে, ঐসব কথারই কোনো একটিকে যারা আদালতে সাহাবীর বিরোধী কিংবা আহলে সুন্নাতের নীতি বিবর্জিত মনে করে থাকে। اهم يقسمون رحمة ربك। (আয়াতের ভাষ্যমতে আল্লাহর রহমতকে কি তারা বিভক্ত করতে চায়) 'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেবের একথা কি জানা নেই যে, হানাফী ফিকাহ ও উসূলে ফিকাহের গ্রন্থসমূহে এ উসূলের কথাও লেখা আছে যে, ফকীহ নয় এমন রাবীর হাদীস কিয়াসের খেলাফ হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অতপর মানব রচিত এ নীতির (উসূল) ভিত্তিতে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো মহা সম্মানিত ও অগণিত হাদীসের রাবীদ্বয়ের কোন কোন সহীহ ও মারফু হাদীস কেবল তাঁরা ফকীহ না হওয়ার অজুহাতে বর্জন করা হয়েছে। আমার জিজ্ঞাস্য, এ দু'জন সম্মানিত সাহাবীকে ফকীহ এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য না হওয়া সাব্যস্থ করা الصحابة كلهم عدول وكلهم مجتهدون।-এর তাৎপর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয় কি—যা আপনারা দাবী করে আসছেন ? কোনো সাহাবীর একই সময়ে ফকীহ না হয়েই মুজতাহিদ হওয়া কি সম্ভব ?

তাওবা ও ক্ষমার অপ্রয়োজনীয় আলোচনা

হতে পারে সাহাবায়ে কেরামগণ মানবীয় স্বভাব কারণে কোনো সময় ২/১টি অথবা কতিপয় ভুল করে থাকবেন ; সতর্ক ও জ্ঞাত হওয়ার পর তাঁরা তাওবা করে নিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল বালাগের সম্পাদক সাহেবের উপরোক্ত কথাগুলো বলার কি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো এবং এদ্বারা কি প্রমাণ করে তার উদ্দেশ্য তা জানা নেই। মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব কোথাও কি একথা বলেছেন যে, অমুক সাহাবী কোনো ভুলের জন্যে তাওবা করেননি, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেননি এবং এ ভুল ও তাওবা না করার কারণে (মাআজাল্লাহ) তিনি আদেলের (ন্যায়নিষ্ঠ) সংজ্ঞা

www.pathagar.com

থেকে খারিজ হয়ে গেছেন ? মরহুম মাওলানা শুধুমাত্র সে ভুল ও ভুলের ঐতিহাসিক পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাওবা ও ক্ষমা চাওয়ার প্রসংগ এখানে আলোচনার বিষয়ই নহে এবং তার প্রশ্নও আসে না। কোনো কোনো কাজ সংক্রামক ব্যধির ন্যায়, যার প্রতিক্রিয়ায় গোটা জাতীয় জীবন আক্রান্ত হয়ে পড়ে। শত তাওবা আর যাবতীয় সতর্কতা সত্বেও তার দুষ্ট প্রভাব রোধ করা আওতার বাইরে চলে যায়। 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে যে সকল বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে, সে সমস্ত এ দৃষ্টিকোণ থেকেই। অন্যথায় তাওবার সম্ভাবনা তো প্রতিটি মুসলমানের পক্ষে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাকী থাকেই। বরং শিরক ছাড়া প্রত্যেক মুসলমানের প্রত্যেক ধরনের গুনাহ্ বিনা তাওবায়ও মাফ হতে পারে। যেমনটি আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। অধিকন্তু ক্ষমা ও মার্জনার এ নীতিগত সুযোগ ছাড়া কতিপয় সাহাবীর খাঁটি তাওবার কথা কুরআন-হাদীসেও উল্লেখ আছে। তার সাথে সেসব ভুলের বিবরণ এবং পর্যালোচনাও বর্ণিত আছে। যার কারণে তাওবা করা হয়েছিলো। তাওবার পর সেসব ঘটনা চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলোর উপর পর্যালোচনা কুরআন-হাদীসে এ কারণে জরুরী মনে করা হয়েছে। অন্যরা যেন এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। পরবর্তী লোকেরা এ উদ্দেশ্যেই এগুলোর উল্লেখ করেছেন। যেমন, শুরুতে বলা হয়েছে—ইবনে হাজার (র) যে গ্রন্থ বিশেষ করে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সপক্ষে লিখেছেন তার সূচনা الصحابة كلهم عدول একথা দিয়ে আরম্ভ করে ইয়াযীদের মনোনয়নদানের উপর কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি এতোটুকু পর্যন্ত লিখেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যদিও ক্ষমা করে দেবেন, তথাপি তিনি উম্মতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন সেকথা বলাই বাহুল্য। আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করবে জাহান্নামের আগুনে ঠাঁই তাকে নিতেই হবে। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যে সমরাভিযান চালিয়েছেন তার জন্য তাঁর তাওবার সম্ভাবনা অথবা সুধারণার আশ্রয়ে তার বাস্তবতা স্বীকার করে নেয়া সত্বেও সেটা এক ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধাচারী অন্যান্য সাহাবীগণের তাওবা-অনুশোচনা এবং আপন কৃতকর্ম থেকে ফিরে আসার ঘটনা যেভাবে অকাট্য ভাষায় ও বিশুদ্ধ দলীলে প্রমাণিত রয়েছে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাওবা অনুশোচনার কথা সে আকারে বর্ণিত নেই, প্রমাণও পাওয়া যায় না। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তো উষ্ট্রের যুদ্ধের কথা স্মরণ করে এমনি অঝোরে রোদন করতেন যে, তাঁর উড়না অশ্রুতে সিক্ত হয়ে যেতো। এ কারণেই আহলে সুন্নাতের আলেমগণ এ দু'য়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। উদাহরণ স্বরূপ আল্লামা আবদুল করীম সাহরাস্তনী الملل والنحل

www.pathagar.com

নামক গ্রন্থে ইমাম আবুল হাসান আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

قال لانقول فى عائشة وطلحة والزبير الا انهم رجعوا عن الخطأ وطلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة ولا نقول فى معاوية وعمرو بن العاص الا انهما بغيا على الامام الحق۔

"ইমাম আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি হলো, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আমরা এটাই বলবো যে, তাঁরা নিজেদের ভ্রান্ত আচরণ থেকে ফিরে এসেছেন এবং হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহেশতের শুভ সংবাদ প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। কিন্তু আমরা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর বিন আস সম্পর্কে এছাড়া আর কিছুই বলতে পারছি না যে, তারা একজন সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।"-[আল মেলাল ও নেহাল, খণ্ড-১ ; পৃষ্ঠা-১৪৫, হোসাইন লাইব্রেরী, কায়রো, ১৩৬৮ হিজরী)

ইমাম আবুল হাসান এখানে এক পক্ষের ফিরে আসার কথা যেভাবে উল্লেখ করেছেন, অপর পক্ষের তদ্রূপ করেননি। এর তাৎপর্য এছাড়া আর কিইবা হতে পারে যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভ্রান্তি থেকে ফিরে আসার ব্যাপারটি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফিরে আসার মতো প্রমাণিত নয়।

ভীতি প্রদর্শন ও লোভ দেখানোর অপবাদ কি ভুল ?

আল বালাগে একথাটি বারবার ব্যক্ত হয়েছে যে, খেলাফত ও রাজতন্ত্র বইয়ে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত উল্লেখিত কথাগুলো যদি ঠিক মেনে নেয়া হয় -------- যদি এ চার্জসিট সঠিক প্রমাণিত হয় --- যদি এসব অপরাধগুলোর দায়-দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে তাঁকে ফাসেকী থেকে মুক্ত রাখা যাবে কিভাবে ? এ বর্ণনাভংগি এবং প্রশ্নের ধরনের স্পষ্ট দাবী এই যে, খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যেসব ক্রটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সবই লেখক নিজে বানিয়ে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দায়িত্বে চাপিয়ে দিয়েছেন। আমি যদিও এক এক করে এগুলোর প্রত্যেকটির অখণ্ডনীয় যুক্তিতর্কের মাধ্যমে জবাব দিয়েছি তথাপি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে সেগুলোর পর্যালোচনা পুনরায় দরকার

www.pathagar.com

মনে করি। স্বীয় পুত্রের পক্ষে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ভীতি ও লোভ দেখিয়ে বাইয়াত গ্রহণ, ঘুষ প্রদান এবং ধমক দেয়ার কথা ওসমানী সাহেবের মতে প্রথম অপবাদ। এবার আমি তাঁর সম্মানিত পিতা এবং অন্যান্য আলেম ও ইতিহাসবিদগণের উক্তিসমূহ ব্যক্ত করতে শুরু করে দিলে তাতে কথাও দীর্ঘ হবে এবং ঐতিহাসিক রাওয়ায়েত বলে সম্ভবত সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করা হবে। এ কারণে আমি সহীহ্ বুখারীর কিতাবুল মাগাযির অন্তর্ভুক্ত গযওয়ায়ে খন্দক পরিচ্ছেদের একটি হাদীস তরজমাসহ্ এখানে তুলে ধরছি :

عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسواتها تنطف، قلت قد كان من امر الناس ماترين فلم يجعل لي من الامر شيئ- فقالت الحق بهم فانهم ينتظرونك واخشى ان يكون فى احتباسك عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب- فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد ان يتكلم فى هذا الامر فليطلع لنا قرنه ولنحن احق به منه ومن ابيه- قال حبيب بن مسلمة فهلا اجبته ؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت ان اقول احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام- فخشيت ان اقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عنى غير ذالك- فذكرت ما اعد الله فى الجنان- قال حبيب حفظت وعصمت-

"হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলাম। তিনি মাত্র গোসল সেরেছেন এবং পানির ফোঁটাও তার চুল থেকে ঝরছিলো। আমি তাকে বললাম, মানুষের অবস্থা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। নেতৃত্ব ও খেলাফতের ব্যাপারে আমার কোনো অধিকার রাখা হয়নি। তিনি বললেন, আপনি সত্বর চলে যান, লোকেরা আপনার অপেক্ষায় আছে। আমার আশংকা হচ্ছে যে, আপনি সেখানে উপস্থিত না হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শেষাবধি সমাবেশে প্রেরণ করিয়েই ছাড়েন। লোকেরা যখন খণ্ড খণ্ড দলে বসে গেলো তখন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বললেন, যে কেউ শাসন বিষয় কিংবা ওলী আহদী সম্পর্কে মুখ খুলতে চায় সে যেনো মাথা উঁচু করে দেখায়। নেতৃত্বের জন্যে আমি তার কিংবা তার পিতার চেয়েও অধিকতর যোগ্য। হাবীব বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু (যিনি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ বিবরণ

www.pathagar.com

শুনছিলেন) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোনো জবাব দিয়েছেন কি ? হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ আমি তখন আমার চাদর ঢিলা করেছিলাম ; ইচ্ছা ছিলো তাঁকে বলি শাসন কর্তৃত্বের জন্যে তোমার চেয়ে বেশী উপযোগী সে ব্যক্তি যে ইসলামের খাতিরে তোমার এবং তোমার পিতা আবু সুফিয়ানের সাথে জিহাদ করেছিলেন। পরক্ষণেই আমার আশংকা হলো, একথায় তো বিশৃঙ্খলা আরো বেড়ে যাবে। এমনকি খুন-খারাবীও হয়ে যেতে পারে। আর আমার কথার অন্য অর্থও নেয়া হতে পারে। সুতরাং আমি জান্নাতের প্রতিদানের আশায় চুপ হয়ে গেলাম। (একথা শুনে) হাবীব বলতে লাগলেন, আপনি নিজকে রক্ষা করলেন, বাঁচিয়ে নিলেন।"

এ রাওয়ায়েতটিকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস ফায়সালার ঘটনা আবার অন্যরা ইয়াযীদের মনোনয়ন দান ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। উভয় ঘটনার মধ্যে যার সাথেই এ বর্ণনা সংশ্লিষ্ট হোক বস্তুত এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি সমাবেশে ভয়-ভীতি দেখিয়ে বক্তৃতায় বলছিলেন, আমরাই খেলাফতের অধিকতর হকদার ; আমাদের সামনে মাথা তোলার মতো কে আছে ? হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথার জবাবদানে থেমে গেলেন। থেমে গেলেন একথা জেনে যে, আমার জবাবের ভুল অর্থ করে আমাকে খেলাফতের দাবীদার মনে করে ব্যাপারটিকে খুন-খারাবী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ সাথীদের অন্যতম এবং সমস্ত ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে সম্যক অবগত হাবীবের ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একথা বলা যে, আপনি তো বেঁচে গেলেন, রক্ষা পেলেন, অন্যথায় কথা বললে বিপদ ঘটে যেতো। এ ধরনের কথা-বার্তার ধারা পরিশেষে কত বড় ভয়াবহ অবস্থার পরিচয় বহন করছে তা সহজেই অনুমেয়।

সম্ভবত তারপরও মাওলানা ওসমানী সাহেব একথাই বলবেন যে, ভয় ও লোভের উপকরণ কাজে লাগানোর অভিযোগ প্রথমবার মাওলানা মওদূদী (র) বানিয়ে নিয়েছেন। এজন্যেই তিনি ইয়াযীদের মনোয়ন দান প্রসংগে আলোচনার সময় একটি ঘটনা থেকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত সাঈদ বিন ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথপোকথনের সে অংশটুকু উল্লেখ করেছেন যাতে ইয়াযীদকে উত্তরসূরী খলীফা বানানোর অভিযোগ ছিলো। কিন্তু সে অংশটুকু বিলোপ করে দেন যাতে সে অভিযোগের জবাবে হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খোরাসানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিলো।

www.pathagar.com

হুযারের হত্যা এবং দিয়ত ও ওয়ারিশ

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেবের ধারণা মতে ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসা ছাড়াও মাওলানা মওদূদী সাহেব আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর যেসব অভিযোগ আরোপ করেছেন তাহলো—আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো একজন খোদাভীরু আবেদকে শুধুমাত্র সত্য বলার অপরাধে হত্যা করেন। মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়ার বিদআত জারী করেন এবং দিয়তের আহকাম পরিবর্তন করে অর্ধেক দিয়ত নিজে গ্রহণ করা শুরু করে দেন। আমার আরজ হলো, হযরত হুযার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডকে তো ওসমানী সাহেবও অস্বীকার করতে পারেন না। বাকী রইলো, হত্যার কারণ কি ছিলো এবং হত্যা করা জায়েয ছিলো কি ছিলো না। এ ব্যাপারে আমি যাকিছু লিখেছি তার সন্তোষজনক কোনো জবাব ওসমানী সাহেব কিংবা অপর কেউ আজ পর্যন্ত দেয়নি। এভাবে একথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান কাফেরদের ওয়ারিশ হওয়ার নয়া নীতি চালু করেন এবং অমুসলমানদের দিয়তের (রক্তপণ) অর্ধেক উত্তরাধিকারীদেরকে দেয়ার পরিবর্তে নিজেই নিয়ে নিতেন (কিংবা রাজকোষে জমা করতেন)। এ কার্যক্রম কোনো মাযহাবের দৃষ্টিতেই গ্রহণযোগ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। এমনকি তাঁর অধঃপুরুষ হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয এ নীতির পরিবর্তন জরুরী মনে করেন। এ পদ্ধতি কুরআন হাদীসের খেলাফ হওয়ার কথা আমি ইতিপূর্বে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। আলেমগণ এ পদ্ধতিকে বিদআত নামেও আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কারের অতিরিক্ত প্রমাণ

ইতিপূর্বে আমি সহীহ হাদীসসমূহ এবং মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের তত্ত্বভিত্তিক উক্তিমালার সাহায্যে প্রমাণ করেছি যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর গভর্নর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলে বাইতের প্রতি তিরস্কারে তৎপর ছিলেন। কিন্তু আমার কোনো কথাকেই ভুল প্রমাণ করা ব্যতিরেকে আবারো সেই পুরানো কথাই পুনরায় বলা হলো। মাওলানা মওদূদী (র) আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর যেসব অভিযোগ আরোপ করেছেন তন্মধ্যে মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার বিদআত জারী করা অন্যতম। এ আলোচনায় ওসমানী সাহেব ইবনে হাজার মক্কীর একথাও তাতহীরুল জিনান গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন :

www.pathagar.com

"সাহাবীদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ঘাটাঘাটি করে তাদের ত্রুটি প্রমাণ করা কারো পক্ষেই জায়েয নেই। এ কাজ শুধুমাত্র বিদআতপন্থীদের এবং এমন ধরনের কিছু অনভিজ্ঞ বর্ণনাকারীরা যেখানে যা দেখে তাই বলে বেড়ায় এবং তার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তারা রাওয়ায়েতের সনদ যাঁচাই-বাছাই করে না এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতিও ইশারা-ইংগীত দেয় না। এ ধরনের আচরণ সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। কেননা, এর দ্বারা বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দেয়। আর এ কাজ সাধারণ লোকদেরকে সাহাবীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করারই নামান্তর। অথচ সাহাবীগণই আমাদের কাছে দীন পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম, যারা কুরআন-হাদীস আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন।"

এবার লক্ষ্য করুন, এই ইবনে হাজারই (র) তাঁর প্রণীত গ্রন্থ تطهير الجنان وا اللسان عن الخطور والتقوه بثلب سيدنا معاوية بن ابى سفيان এর ৭৪ পৃষ্ঠায় গাল-মন্দ করার ব্যাপারে কি বলছেন। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

ولما وقع من الاختلاف والخروج عليه نشر من سمع من الصحابة تلك الفضائل وبثها نصحا للامة ايضا ثم لما اشتد الخطب واشتغلت طائفة من بنى امية بتنقيصة وسبه على المنابر ووافقهم الخوارج لعنهم الله بل قالو ابكفرة اشتغلت جهابذة الحفاظ من اهل السنة ببث فضائله حتى كثرت للامة ونصرة للحق ١

"যখন মতবিরোধ দেখা দিলো এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে বিরোধিতা শুরু হয়ে গেলো, তখন যে সকল সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত ও মর্যাদার কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন, তাঁরা উম্মতের কল্যাণার্থে সেসব মর্যাদার কথা প্রচার ও প্রসার করা শুরু করেন। পরে যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করলো আর বনী উমাইয়ার একটি দল মিম্বারে দাঁড়িয়ে তাঁকে গালমন্দ ও তিরস্কার করাকে নিজেদের কর্মপন্থা বানিয়ে নিলো। খাওয়ারিজগণ (আল্লাহর লানত তাদের উপর) বিরোধীদের সাথে যোগ দিলো এমনকি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাফের পর্যন্ত বানিয়ে ছাড়লো। তখন শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশারদ যারা অসংখ্য হাদীসের হাফেজও ছিলেন—হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ফতহুল বারীতে মানাকেব অধ্যায়ে প্রায় একই কথা বলেছেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করার আলোচনায় আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

www.pathagar.com

ফযীলত ও মর্যাদা সম্বলিত হাদীসগুলো এমনভাবে প্রসার ও প্রচার করতে শুরু করলেন যা পরবর্তীতে উম্মতের মধ্যে ব্যাপকহারে প্রচারিত হয় এবং সত্যের সাহায্যের দাবী পূর্ণ হয়ে যায়।"

এখন মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব বলছেন, মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কারের অভিযোগ রটনা করে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর গভর্নরদের বিরুদ্ধে আরোপ করা হয়। অথচ ইবনে হাজার মক্কী—যার কথা ওসমানী সাহেব উল্লেখ করেছেন—স্বীয় গ্রন্থে তিনি নিজে একথা একটি স্বীকৃত সত্য ঘটনা রূপে বর্ণনা করছেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে বনি উমাইয়া ও খাওয়ারিজরা একে অপরের সহযোগী হিসাবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর তিরস্কারে প্রধান ভূমিকা পালন করতো। এটাও স্মর্তব্য যে, জনগণের প্লাটফরম এবং মিম্বার আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর গভর্নরদেরই অধিকারে ছিলো। আর যে মতানৈক্য, প্রতিবাদ এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে হৈ চৈ, বিশৃঙ্খলার কথা এখানে উল্লেখ রয়েছে সেটা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় এবং তাঁর শাসনামলেই সৃষ্টি করা হয়েছিলো।

খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থে তিরস্কার গালি-গালাজ প্রমাণ করার জন্যে যেসব রাওয়ায়েত উপস্থাপনা করা হয়েছে তন্মধ্যে মারওয়ান প্রতি শুক্রবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কার করার কথাটি খণ্ডন করার জন্য আল বালাগ দারুন শক্তি ব্যয় করেছে এবং একেকজন রাবীর চুলচেরা সমালোচনা করেছে। যদিও আমি এর বিস্তারিত জবাব যথাস্থানে দিয়েছি তথাপি ইবনে হাজার (র)-এর গ্রন্থ তাতহীরুল জিনান থেকে মারওয়ান সম্পর্কে আরো একটি রাওয়ায়েত উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন ঃ

فى رواية للبزار لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلّم ويسند رجاله ثقاة ان مروان لما ولى المدينة كان يسب عليًا على الخبر كل جمعة ثم ولى بعده سعيد بن العاص فكان لايسب، ثم اعيد مروان فعاد للسب وكان الحسن يعلم ذالك فسكت ولا يدخل الا عند الاقامة فلم يرض بذالك مروان حتى ارسل للحسن فى بيته بالسب البليغ لابيه وله ومنه ماوجدت مثلك الامثل البغلة يقال لها من ابوك فتقول أمّى الفرس "فقال للرسول" ارجع اليه فقد له والله لاامحر عنك شيئا مما قلت باني اسبك ، ولكن موعدى وموعدك الله ـ فان كنت كاذبًا فالله اشدّ نقمة

www.pathagar.com

قد اكرم جدى ان يكون مثلى مثل البغلة - فخرج الرسول فلقى الحسين فاخبروه بذالك السب - بعد مزيد تمنع وتهديد من الحسين ان لم يخبره، فقال بل وينامل بابيك وقومك واية ما بيني وبينك ان تمسك منكبيك من لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... وبسند حسن ان مروان قال لعبد الرحمن بن ابى بكر رضى الله عنهما انت الذى نزل فيك والَّذِى قَالَ لِوَالِدِيهِ افٍّ لَّكُمَا ...... فقال له عبد الرحمن كذبت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اباك -

"বাজ্জারের রাওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তাআলা নবী আলাইহিস সালামের ভাষায় হাকাম ও তার পুত্র মারওয়ানের উপর অভিসম্পাত করেছেন। নির্ভরযোগ্য রাবীদের সনদ সহ বর্ণিত আছে, যখন মারওয়ানকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করা হয় তখন সে প্রতি শুক্রবারে মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কার বর্ষণ করতো। সাঈদ বিন আস গভর্নর হওয়ার পর এ কাজ থেকে বিরত থাকেন। মারওয়ান ২য় বার গভর্নর হলে সে আবার তিরস্কার করা শুরু করে দেয়। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব জানতেন, কিন্তু মৌনতা অবলম্বন করতেন এবং ইকামতের সময় মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতেন (যাতে পিতার প্রতি বর্ষিত অশ্রাব্য কথা শুনতে না হয়)। কিন্তু মারওয়ান এতেও সন্তুষ্ট ছিলো না। সে দূতের মাধ্যমে তাঁর এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি গালিগালাজ হযরত হাসানের ঘরে পৌঁছে দিতো। এসব অশ্রাব্য কথার মধ্যে একটি ছিলো, 'আমার কাছে তুমি সেই গাধার মতো যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার পিতা কে ? তখন সে বলে আমার মা তো ঘোড়ী।' হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে দূতকে বললেন ঃ তুমি তার কাছে ফিরে গিয়ে বলো, আল্লাহ্র কসম ! আমি তোমাকে ভর্ৎসনা দিয়ে তোমার গুনাহ্ হালকা করতে চাই না। আল্লাহ্র দরবারে তোমার আমার সাক্ষাত হবে। যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর। আল্লাহ্ আমার প্রাণ প্রিয় নানাজানকে (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে মর্যাদা দান করেছেন তা আমার গাধার মতো হওয়া অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। দূত বের হলে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার দেখা হয়। সে তাঁকেও ভর্ৎসনা সম্পর্কে অবহিত করে। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তাকে ধমকালেন। খবরদার ! তুমি আমার কথাও মারওয়ানকে পৌঁছাতে যেন ভুলে না যাও।

www.pathagar.com

পরক্ষণেই বললেন, হে মারওয়ান ! তুমি স্বীয় পিতা এবং তার গোষ্ঠীর মান-মর্যাদা সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখ। তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক ! তোমার আমার পার্থক্য তো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিসম্পাত কাঁধে নিয়ে তোমাকে ঝুলতে হয়। নির্ভরযোগ্য সনদসহ একথাও বর্ণিত আছে, মারওয়ান হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, তুমি সে লোক যার সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াত "যে তার পিতা মাতাকে (অবজ্ঞার সুরে) বলে—তোমাদের জন্য উফ্ তথা আক্ষেপ" নাযিল হয়। আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার পিতাকে বরং অভিসম্পাত করেছেন।"

মারওয়ানের এ সমস্ত অকথ্য ও অশ্রাব্য ভাষার পূর্ণ ঘটনা অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ ছাড়াও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) তারিখুল খুলাফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং অপরাপর একাধিক আলেম সে কথা বর্ণনা করেছেন।

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বাইতের প্রতি তিরস্কারের সূচনা একটি ঐতিহাসিক সত্য কথা। আর একথাও স্বীকৃত যে, এ ক্ষেত্রে মারওয়ানের ভূমিকাই ছিলো প্রধান ও অগ্রগামী। ইবনে হাজার (র) ছাড়া অন্যান্য কতিপয় ইতিহাসবিদ একথা সবিস্তারে বলেছেন যে, হযরত সাঈদ বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনার গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করে মারওয়ানকে এপদে অধিষ্ঠিত করার অন্তর্নিহিত কারণ হলো—হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিরস্কার করার কাজে অংশগ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। ইবনে কাসীর আল বিদাআ ৮ম খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লিখেছেন :

ولاه المدينة مرتين وعزلها مرتين بمروان بن الحكم وكان سعيد هذا لايسبّ عليا ومروان يسبه-

"আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দু'বার মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং দু'বারই মারওয়ানের পরিবর্তে তাকে বরখাস্ত করেন। কারণ, সাঈদ বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কার করতে রাজী ছিলেন না আর তিরস্কারে মারওয়ান ছিলো পরম উৎসাহী।"

এ উক্তি মারওয়ানের অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারের সাথে একথারও প্রমাণ যে, যে গভর্নর তিরস্কার ও গালমন্দ করতে প্রস্তুত ছিলো না তাকে বরখাস্ত করে

www.pathagar.com

এমন লোককে নিয়োগ করা হতো যে এমন ধরনের কাজ সম্পন্ন করতে প্রস্তুত ছিলো। অধিকন্তু হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে গালমন্দ না করার নেতিবাচক উক্তি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কার করা তৎকালে একটি সাধারণ প্রথা হয়ে গিয়েছিলো। অন্যথায় হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইলম, তাকওয়া, দীনদারী এবং বিপ্লবী কর্মতৎপরতা ছিলো সমধিক খ্যাত। তিনি বনী উমাইয়ার একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পালক পুত্র হওয়া সত্ত্বেও উষ্ট্র ও সিফ্ফীন যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকেন। পরিশেষে তাঁর সম্পর্কে এ স্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিলো যে, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কার করতে আদৌ রাজি ছিলেন না।

ইবনে তাইমিয়া (র)--এর উক্তিসমূহ

আল বালাগ সম্পাদক সাহেব আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার এ উক্তিও উল্লেখ করেছেন যে, যেসব রাওয়ায়েতের মাধ্যমে সাহাবীদের ভুল-ক্রটিগুলো জানা যায়, তন্মধ্যে কতকগুলো তো একেবারে মিথ্যা এবং কতকগুলোকে কমবেশী করে প্রকৃত অর্থ বদলিয়ে দেয়া হয়েছে—এরপর ওসমানী সাহেবের জিজ্ঞাসা যেসব ঐতিহাসিক রাওয়ায়েতের ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদী (র) সাহেব আজকে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রকৃত ভুলের দায়ে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করছেন ইবনে তাইমিয়া ও অন্যান্য আলেমগণ কি সেসব রাওয়ায়েত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না ? অথবা তারা কি এতোই স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, তারা ইজতিহাদী ভুল এবং প্রকৃত ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম ছিলেন না? এর জবাবে আমি ইবনে তাইমিয়া (র)-এর কতিপয় উক্তি পেশ করছি। মিনহাজুস সুন্নাহ ২য় খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় তিনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

كان من احسن الناس سيرة في ولايته وهو ممن حسن اسلامه ولولا محاربته لعلي رضى الله تعالى عنه وتولية الملك لم يذكره احد الا بخير كما لم يذكر امثاله الا بخير -

"শাসন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার দিক থেকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তম লোকদের অন্যতম ছিলেন। খাঁটি মুসলমান ছিলেন। যদি তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হতেন এবং স্বীয় শাসনামলে রাজতন্ত্র প্রথা গ্রহণ না করতেন তাহলে তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ চিন্তার প্রশ্নই আসতো না, যেমন অন্যান্য সাহাবী

www.pathagar.com

সম্পর্কে উত্তম উত্তম ধারণা পোষণ করা হয় এবং শ্রেষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ হিসাবে স্মরণ করা হয়।"

এ গ্রন্থেরই ৩য় খণ্ডের ১৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন ঃ

وابو سفيان كان فيه بقايا من جاهلية العرب يكره ان يتولى على الناس رجل من غير قبيلته۔

"এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে আরবীয় জাহেলীয়াতের অবশিষ্ট রেখা তখনো বর্তমান ছিলো। ফলে স্বীয় গোষ্ঠী ছাড়া অপর কারো আমীর তিনি পসন্দ করতেন না।"

তারপর ৪র্থ খণ্ডের ১৭৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন ঃ

ولم يتهم احد من الصحابة والتابعين معاوية بنفاق واختلفوا فى ابيه۔(منهاج السنة النبوية فى نقض الشيعة، مطبعه امريه، مصر ص ١٩٢١)

"সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈদের কেউ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুনাফিক হওয়ার অপবাদ দেননি। তবে আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়।"

এবার এটা পরিষ্কার যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা তাঁর পিতা সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) যে মন্তব্য করেছেন তা কোনো মিথ্যা রাওয়ায়েতের উপর ভিত্তিশীল ছিলো না, সেগুলো কেবল মিথ্যাচারে পূর্ণ ছিলো। আর ওসমানী সাহেবের উক্তি অনুযায়ী ইবনে তাইমিয়া (র) এতোটা স্বল্প জ্ঞানের ধারকও ছিলেন না যে, তিনি ইজতিহাদী ভুল চিহ্নিত করতে সুনাম ধর্মী স্মৃতিচারণের অনুপস্থিতি, জাহেলিয়াতে এবং রাজতন্ত্র ইত্যাকার শব্দাবলী প্রয়োগ করবেন।

প্রত্যেক বিদআত ও ফিস্‌কই আদালত বিরোধী নয়

আমাদের প্রতিপক্ষগণ কোনো কোনো রাবীকে শিয়া ও বিদআতী আখ্যা দিয়ে তাদের বর্ণনাসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রাহ্য করার কারণে এ বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা আমি উপযোগী মনে করি যে, কোনো রাবীর কথায় ও কাজে বিদআত ও ফাসেকীর দোষ আরোপিত হলে তাতে তার বর্ণনাসমূহ কতটুকু দূষণীয় হতে পারে। স্মর্তব্য যে সাধারণত সুন্নাতের মুকাবিলায় বিদআত শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেসব দল বা ফির্কার নীতি মৌলিকভাবে আহলে সুন্নাতের নীতি থেকে ভিন্নতর, তারা আহলে বিদআত বা প্রবৃত্তির অনুসারী নামে অভিহিত হয়ে থাকে। সম্মানিত সাহাবীদের গৌরবোজ্জ্বল

www.pathagar.com

যুগের পর তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং আয়িম্মামায়ে মুহাদ্দিসগণের সময়ে এ বিষয়ের উপর অধিক ও দীর্ঘ আলোচনা হতে থাকে যে, আহলে সুন্নাত ছাড়া অপর দলের লোকদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা জায়েয কিনা ? এসব বিষয়ের উপর চর্চা করায় যে তত্ত্ব আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তাহলো, জমহুর মুহাদ্দিসগণ আহলে বিদআতের বর্ণিত হাদীসসমূহ সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করার এবং তাদের কারো হাদীস আদৌ গ্রহণ না করার পক্ষপাতী নহেন। ইমাম যাহবী (র) তার রচিত রাবীদের জীবনালেখ্য ميزان الاعتدال গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গায় নীতিগত আলোচনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত শিয়া মতাবলম্বীদের অন্যতম আবান ইবনে তাগলাবের রাওয়ায়েতসমূহের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম যাহবী (র) বলেছেন ঃ

فان قيل كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والاتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة ؟ فجوابه ان البدعة على ضربين فبدعة صغرى لغلوا لتشيع اوالتشيع بلاغلو ولا تحرق فهذا اكثير فى التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو ذهب حديث هولاء لذهب جملة من الاثار النبوية وهذه مفسدة بينة ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلوفيه والحط على ابى بكر وعمر رضى الله عنهما والدعاء الى ذالك فهذا النوع لايحتج بهم-

"যদি বলা হয় যে, একজন বিদআতী লোকের সত্যায়ন কিভাবে জায়েয হতে পারে অথচ ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতার জন্যে শর্ত হলো শরীয়াতের পাবন্দ হওয়া। সুতরাং একজন বিদআতী রাবী কিভাবে আদেল ও ন্যায়পরায়ণ হতে পারে ? এর জবাব হলো, বিদআত দু' প্রকার ঃ ছোগরা বা ছোট বিদআত। যেমন শিয়া নীতিতে দৃঢ় হওয়া কিংবা শিয়া হওয়া তবে চরম ও কট্টর না হওয়া। তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের অনেকের মধ্যেই এ বিষয়ের অনুসরণ ও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অথচ তাদের মধ্যে তাকওয়া, পরহেযগারী ইত্যাদি গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ছিলো। এমতাবস্থায় যদি তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ না করা হয় তাহলে হাদীসের একটি বিরাট অংশ বিনষ্ট হয়ে যাবে। যা একটি সুস্পষ্ট বিপর্যয়। দ্বিতীয় হলো কোবরাহ বা বড় বিদআত। চরমপন্থী রাফেজী সম্প্রদায় এর উদাহরণ, যারা এ ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে থাকে। এরা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং অন্যান্যদেরকেও এ কাজ করতে আহ্বান জানায়। এ জাতীয় লোকদের রাওয়ায়েত প্রমাণযোগ্য নয়।"

www.pathagar.com

এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের মধ্যে এমন বেশ কিছু লোক ছিলেন যাদের মধ্যে শীয়া মতের সে পরিমাণ প্রাধান্য ছিলো যার ফলে তাদের উপর বিদআতে ছোগরা আরোপ করা হয়েছে। এতদসত্বেও তারা সত্যভাষী হওয়ায় এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবমাননা না করায় তাদের বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। একইভাবে তাদের ন্যায়নিষ্ঠা ও নির্ভরতা নিয়েও সন্দেহ করা হয়নি। বরং মুহাদ্দিসগণের উক্তি হলো, যদি তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহ গৃহীত না হয় তাহলে হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত হতে হবে, যা হবে জাতীয় বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) তাঁর প্রণীত গ্রন্থ نزهة النظر شرح نخبة الفكر এ اسباب طعن এ ত্রুটির কারণসমূহের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিদআতের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেছেন ঃ

البدعة اما ان تكون بمكفّر كان يعتقد مايستلزم الكفر او بمفسق .... والتحقيق انه لا يردّ كل مكفر ببدعة لان كل طائفة تدعى ان مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو اخذ ذالك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف ـ فالمعتمد ان الذى ترد روايته من انكر متواتر من الشرع معلوما من الدين بالضرورة ـ

"এক ধরনের বিদআত এমন কথা ও কাজের উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে যার পোষণকারী কিংবা বিশ্বাসকারীকে কুফরীর সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অথবা সে ফাসেকী কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বিবেকসম্মত রায় হলো, প্রত্যেক বিদআতপন্থীর রাওয়ায়েত অগ্রাহ্য করা যাবে না—যদিও তাকে কুফরীর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। কেননা, প্রত্যেক দল তার প্রতিপক্ষকে বিদআতপন্থী বলে দাবী করে এবং প্রত্যেক দলই সীমা লংঘন করে স্বীয় প্রতিপক্ষদেরকে কাফেরের পর্যায়ে নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় যদি প্রত্যেকের কথা নির্বিচারে মেনে নেয়া হয়, তাহলে প্রতিটি দলেরই কাফের হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এখানে নির্ভরযোগ্য ও সংগত কথা হলো, কেবলমাত্র সে লোকের রাওয়ায়েতই আগ্রাহ্য হবে যে মুতাওয়াতির পর্যায়ের শরয়ী বিধানের অস্বীকারকারী সব্যস্ত হয় অথবা দীনের অনিবার্য বিষয়রূপে তা স্বীকৃত হয়।"

হাফেজ ইবনে হাজার (র)-এর বক্তব্যে এটা স্পষ্ট হলো যে, কোনো রাবী মুতাওয়াতের পর্যায়ের এবং দীনের জরুরী বিধানের অস্বীকার না করা পর্যন্ত

www.pathagar.com

তার বর্ণিত হাদীস সার্বিকভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না যদিও সমালোচকগণ তাকে বিদআত, পাপাচার এমনকি কুফরীর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে।

বিদআত পন্থীদের বর্ণিত রাওয়ায়েত

শিয়া ছাড়া নাসেবী, খারেজী কাদেরীয়া ইত্যাকার সম্প্রদায়ের উপরও বিদআত শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। নাসেবীদের অবস্থা হলো, অন্তরে তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এবং আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে থাকে। আর খারেজীদের নীতি হলো, তারা প্রত্যেক কবীরা গুনাহগারকে কাফের ও মুরতাদ সাব্যস্ত করে তাদের হত্যা করা এবং তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া সম্পূর্ণ হালাল মনে করতো। তারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ছাড়া হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ বহু সাহাবীকে কাফের আখ্যা দিতো। এমনকি কোনো কোনো সাহাবী শুধুমাত্র তাদের ভ্রান্তিকর কাজ ও আকীদায় সহযোগিতা করতে তৈরী না থাকার কারণে এ যালেমদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। এতদসত্ত্বেও এ সম্প্রদায়ের লোকদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য খারেজীদের বর্ণনাসমূহ তো এ কারণে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়েছে যে, যখন তারা মিথ্যা ভাষণকে অনিবার্যরূপে কুফরী এবং মিথ্যাবাদীকে হত্যা করা ওয়াযিব মনে করে থাকে, কাজেই তারা মিথ্যা হাদীস রচনা কিংবা বর্ণনা করার দুঃসাহস কেমন করে করতে পারে? ইমাম আবু দাউদের প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে ঃ

ليس فى اهل الاهواء صح حديثا من الخوارج -

"বিদআত ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের মধ্যে খারেজীদের তুলনায় অধিকতর সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী অন্য কোনো সম্প্রদায় বর্তমান নেই।"

আল কেফায়া গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। যার শিরোনাম হলো ঃ

ما جاء فى الاخذ عن اهل البدع والاهواء والاحتجاج واياتهم -

"বিদআত ও প্রবৃত্তি অনুসারীদের রাওয়ায়েতসমূহ গ্রহণ করা এবং সেগুলোকে দলীলরূপে স্বীকার করা প্রসংগ।"

এ অধ্যায়ে ইমাম শাফেয়ীর নিম্নোক্ত উক্তিটির উল্লেখ আছে ঃ

تقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية من الرافضة لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم -

www.pathagar.com

"রাফেজীদের এক শাখা খাত্তাবিয়া ছাড়া বিদআতপন্থীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সপক্ষীয়দের অনুকূলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এরা জায়েয মনে করে।"[১]

ইবনে আবু লাইলা (র) সুফিয়ান সাওরী (র) এবং কাযী আবু ইউসুফ (র) প্রমুখদের নীতি এটাই বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনার পর আল খতীব নিম্নোক্ত রায় পেশ করেছেন ঃ

والذى يعتمد عليه فى تجويز الاحتجاج باخبارهم اشتهر من قبول الصحابة اخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتاويل۔ ثم استمرار عمل التابعين والخالفيه بعدهم على ذالك لما راءوامن تحريم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم انفسهم عن المحظورات من الافعال وانكارهم على اهل الريب والطرائق المذمومة ورداياتهم الاحاديث التى تخالف ارائهم ويتعلق بها مخالفوهم فى الاحتجاج عليهم۔ فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج، وعمرو بن دينار وكان ممن يذهب الى القدر والتشيع وكان عكرمة ابا ضيا وابن ابى نجيح وكان معتزليا وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام الدستوائى وسعيد بن ابى عروبة وسلام بن مسكين وكانوا قدرية وعلقمة بن مرثد عمرو بن مره ومسعر بن كدام وكانوا مرجئة وعبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق ابن همام وكانوا يذهبون الى التشيع فى خلق كثير يتسع نكرهم۔ دوّن اهل العلم قديمًا وحديثًا رواياتهم واحتجوا باخبارهم۔ فصار ذالك كالاجماع منهم وهو اكبر الحجج فى هذا لباب وبه يقوى الظن فى مقاربة الصواب۔

"বিদআত ও কামনা বিলাসী লোকদের রাওয়ায়েতসমূহ দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নীতি এটাই যে, স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামগণ খারেজীদের রাওয়ায়েত ও সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং এমন ধরনের লোকদের হাদীসও গ্রহণ করেছেন যারা কোনো ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফাসেকীতে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণের

---

১. ইমাম শাফেয়ীর (র) এ উক্তি ইমাম নববী (র) মুসলিমের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

ধারাবাহিক আমল এভাবেই চলতে থাকে। এর কারণ হলো, সাহাবী ও তাবেঈগণ দেখলেন—এসব খারেজী ও ফাসেক লোকেরা হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সত্যের অনুবর্তন করে থাকে, মিথ্যা বলাকে তারা মস্তবড় গুনাহ্ মনে করে, নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বিরত থাকে, ঘৃণ্য অভ্যাস ও সন্দেহ পোষণকারীদেরকে খারাপ মনে করে এবং এমন হাদীসসমূহও বর্ণনা করে দেয় যা তাদের মতের খেলাফে চলে যায় এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রতিপক্ষগণ তাদের বিপক্ষে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এ কারণেই মুহাদ্দিসগণ ইমরান বিন হিত্তান থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। অথচ সে খারেজী ছিলো। আমর বিন দিনার কাদরীয়া ও শিয়া ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার বর্ণিত হাদীসও গ্রহণ করেন। এভাবে ইকরামাহ আবাজিয়া[১] সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলো, ইবনে আবু নাজীহ ছিলো মুতাযিলা সম্প্রদায়ের। আবদুল ওয়ারিস বিন সাঈদ, শিবল বিন আযাদ, সাইফ বিন সুলাইমান, হিশাম দিসতাওয়ায়ী, সাঈদ বিন আবু আরুবাহ, সাল্লাম বিন মিসকীন এঁরা সবাই কাদরিয়া পন্থী লোক ছিলো। তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ করা হয়। আল কামাহ বিন মারসাদ আমর বিন মোররাহ, মাসআর বিন কুদাম মার্জিয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিলো। ওবাইদুল্লাহ বিন মূসা, খালেদ বিন মুখাল্লাদ, আবদুর রাযযাক বিন হুমাম শিয়া দলভুক্ত ছিলো। এরূপ আরো বহু লোক আছে যাদের উল্লেখে কলেবর বেড়ে যাবে। আলেমগণ সব যুগে এসব লোকের রাওয়ায়েতসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এগুলোকে দলিল রূপে পেশ করেছেন। পরিশেষে এগুলোর উপর এক প্রকার ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে যা এ বিষয়ের সবেচেয়ে বড় দলিল। এ নীতি সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি হওয়ার বলিষ্ঠ যুক্তি বলা যায়।"-(আল কেফায়া ঃ ১২৫)

যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি কেবলমাত্র 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থের বিরোধিতার আবেগে রিজাল শাস্ত্রীয় গ্রন্থ চর্চায় নিয়োজিত নহেন এবং যাদের দূরদৃষ্টি শুধুমাত্র ওয়াকেদী ও আবু মুখান্নাফের অনুবাদই তালাশ করে বেড়ায় না বরং হাদীসশাস্ত্র ও হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী নিয়ে কিছুটা অতিরিক্ত চর্চাও করেন, তাদের ইতিপূর্বে উল্লেখিত ইমরান বিন হিত্তান[২] সম্পর্কে অনবহিত থাকার কথা নয়। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ইবনে মুলজিমের প্রশংসায় রীতিমতো কবিতা রচনা করে ফেলেন।

---

১. খারেজী সম্প্রদায়ের মধ্যমপন্থী একটি দলের নাম।

২. ইমরান বিন হিত্তানকে (মৃত ঃ ৮৯ হিজরী) খারেজীদের শায়খ ও ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ থেকে হাদীস রাওয়ায়েত করেছেন। বুখারী, আবু দাউদ এবং নাসায়ীতে এগুলো বর্ণিত রয়েছে। ইমরান হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ইবনে মুলজিমের প্রশংসায় যে কবিতা লিখেন তার তিনটি নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

হিশাম আল দসতাওয়ারী কাদরীয়া সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত ছিলো। তথাপি সিয়াহ্ সিত্তার প্রতিটি গ্রন্থে তার হাদীস বর্ণিত আছে। কাদরীয়াদের বিশ্বাস, প্রতিটি মানুষ স্বীয় ইচ্ছা ও কাজের ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। যদি কেউ কেবলমাত্র ইমাম সূয়ুতি (র) রচিত تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى গ্রন্থখানি পড়েন তাহলে তিনি জানতে পারবেন যে, বুখারী-মুসলিম হাদীসগ্রন্থদ্বয়ের রাবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খারেজী, শিয়া, নাসেবী, মুরজিয়া, কাদরিয়া রয়েছে।

এটা নিসন্দেহ যে, মুহাদ্দিসগণ সাধারণত শর্ত আরোপ করে থাকেন যে, আহলে বিদআতগণের মধ্যে যারা নিজেদের দৃষ্টিভংগি প্রচার করে না তাদের রাওয়ায়েত গ্রহণ করা হবে। তবে এটাও সত্য যে, প্রচার করা না করা এ পার্থক্য একটি অতিরিক্ত ও আপেক্ষিক বিষয়। নিজের আকীদা-বিশ্বাস কোনো না কোনো প্রকারে প্রচার করে না এমন লোকের অস্তিত্ব কল্পনা না করাই ভালো। যদি এরূপ হতো তাহলে যেসকল রাবীদের বিদআতী আকীদার ধারক বাহক হওয়ার কথা কি করে জ্ঞাত ও উল্লেখিত হলো। সুতরাং তাদের মধ্যে অনেকেই যেমন—এ ইমরানই খারেজী হওয়ার কথা নিজেই দাবী করতো এবং তার কবিতা ছন্দ সে আহ্বানেরই পরিচয় বহন করে। আল বালাগ সম্পাদক সাহেব আদালত-বিদআত এবং ফিসক এর মধ্যে সার্বিকভাবে যে পার্থক্য প্রমাণ করতে চান, তাহলে এ ধরনের রাবীদের রাওয়ায়েত সহীহ গ্রন্থসমূহে কিরূপে স্থান পেলো ? এ প্রশ্নের জবাব তিনি কি দেবেন আমার জানা নেই। তবে আমার কাছে এর জবাব সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও সোজা যা আমি আগেও উল্লেখ করেছি। জবাব হলো, ভ্রান্ত আবেগ অনুভূতি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ সকল রাবীগণ সত্য ভাষণ পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন। তাদের সাধারণ আচার-আচরণ, তাকওয়া, দীনদারী, সততা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ নির্ভরশীল ছিলো।

ياضربة من تقى ما ارادبها الا ليبلغ من ذى العرش رضوانا

"হে মুত্তাকী লোকটির (ইবনে মুলজিম) মারাত্মক আঘাতের কথা কি বলবো ? এ আঘাতের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আরশের মালিকের সন্তুষ্টি লাভ করা।"

انى لاذكره يوما فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزانا

"আমি যেদিনই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীর কথা মনে করি তখনই আমার মনে হয় সে আল্লাহর কাছে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিদানের দাবীদার।"

اكرم بقوم بطون الطير اقبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا

"আমার এ খারেজী গোষ্ঠী কতইনা সম্মানিত ! তারা কবরস্থ হয় পাখীদের পেটে (অর্থাৎ যুদ্ধে নিহত হয় এবং বনের পাখীরা তাদের খেয়ে ফেলে) আর দীন-ঈমানের মধ্যে তারা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মিশ্রণ ঘটতে দেয় না।"-[আল বেদায়ায়, মাকতাদে আলী, কামেল গ্রন্থসমূহে এসব কবিতার উল্লেখ রয়েছে।]

www.pathagar.com

এ কারণে তাদের রাওয়ায়েতসমূহ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হয়। মুহাদ্দিসগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে ঐসব লোকদের অবস্থা যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন পৃথিবীর অন্য কোনো মানবগোষ্ঠী অপর কোনো দলের লোকদের অবস্থা এভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে যাঁচাই করেনি। রাবীর দৃষ্টিভংগী ও বাস্তব আমল তার বর্ণিত হাদীসের বিপরীত এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সমান্যতম সন্দেহ হলে তাকে বর্জন করা হয়েছে। অপরদিকে রাবী মিথ্যাবাদী কিংবা অলস উপেক্ষাধর্মী না হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় হলে বিনা দ্বিধায় তার রাওয়ায়েত গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে অসংখ্য রাবীর নামের সাথে সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ

ثقة [১] وكان مرجيا صدوق الا انه يرى الارجاء لم يتهمه احد وكان ينسب الى الخوارج والقول بالقدر احتج به الجماعة وكان يجالس قوما ينالون من علي - ثقة الا انه يتشيع -

ইমাম মালেক (র) ইসমাঈল বিন আবান সম্পর্কে বলেছেন ঃ

كان مائلا عن الحق الا انه كان لايكذب فى الحديث -

"তিনি সত্য থেকে দূরে তবে হাদীসে তিনি মিথ্যা বলতেন না।"

ইমাম বুখারী (র) মারওয়ানের হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সাথে ওরয়াহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথার উল্লেখ করেছেন ঃ

ان مروان كان لايتهم فى الحديث -

"মারওয়ান হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যা ভাষণে অভিযুক্ত নয়।"

দুই ঃ আদালতে সাহাবীর সঠিক পরিচয়

আমি আমার আলোচনায় সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট বলেছি যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা অপর কোনো সাহাবীর ত্রুটি তা যতো বড়ই হোক না কেন—যদি সঠিক উদ্ধৃতিসহ প্রমাণিত হয় তাতে আদালতে সাহাবীর নীতি আদৌ ক্ষুণ্ন হয় না। কেননা, আদালতে সাহাবীর সঠিক মর্ম হলো—যেমন মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেবও বর্ণনা করেছেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

১. সেকা নির্ভরযোগ্য তবে মরজীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলো, সত্যবাদী ছিলো কিন্তু ইরজা মতাবলম্বী। (ইরজার এক প্রকার হলো, মরজিয়া সম্প্রদায়ের আকীদা মতে—ব্যক্তির ঈমানের স্বীকৃতির পর তার আল্লাহদ্রোহী তৎপরতা কিংবা কবীরা গুনায় লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর নয়।) কেউ তাকে তোহমত দিতে পারেনি, তবে তিনি খারেজী ও কাদরীয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। এক শ্রেণীর মুহাদ্দিস তার হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন অথচ তিনি নাসেবীদের সাথে উঠা-বসা করতেন। সেকা তবে শিয়া ছিলেন।

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রাওয়ায়েত করা কিংবা তাঁর প্রতি কোনো কথা বা কাজের সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোনো সাহাবী সততার গণ্ডি আদৌ লংঘন করেননি। সম্মানিত সাহাবীগণ আদেল হওয়ার তাৎপর্য এটা নয় যে, সাহাবাগণ সকলেই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ছিলেন এবং তাদের প্রত্যেকেই যাবতীয় মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধে ছিলেন আর কেউ কখনো ভুলমাত্র করেননি। আমি এর সাথে একথাও ব্যাখ্যা করেছি যে, সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতা হাদীস রাওয়ায়েতের সাথে সম্পৃক্ত। মুহাদ্দিসগণের মতেও হাদীসের রাবীর নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়বান হওয়ার মর্ম হলো, তাঁদের সার্বিক জীবনধারা এবং অবস্থার অধিকাংশ প্রেক্ষাপট কল্যাণ ও মংগলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং হাদীস বর্ণনায় মিথ্যা বলার আশংকা আদৌ না থাকা, যদিও তার কর্মে ও বিশ্বাসে ফাসেকী ও বিদআতের চিহ্ন বর্তমান থাকে। আমি আমার প্রতি কথার সমর্থনে কতিপয় উক্তিও উল্লেখ করেছি। কিন্তু ওসমানী সাহেব আমার কথাগুলোর প্রতি কর্ণপাত না করে অভ্যাসানুযায়ী নিজের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি আদালতে সাহাবীর মনগড়া তিনটি তাৎপর্যের পুনরুল্লেখ করে জিজ্ঞেস করেছেন, এর মধ্যে মাওলানা মওদূদী (র) কোন্ অর্থ সঠিক মনে করেন ? এটা কোনো জ্ঞানী বা সত্যান্বেষীর আচরণ নয় বরং অপরাধ তদন্তকারী কোনো ইন্সপেকটর বা দারোগার ভূমিকা হতে পারে যে, মনগড়া তিনটি অভিযোগ দাঁড় করিয়ে অভিযুক্তকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এগুলোর কোন্‌টি স্বীকার করো বা কোন্‌টির সাথে জড়িত ? মরহুম মাওলানা মওদূদী যখন আদালতে সাহাবী সম্পর্কে তার ভূমিকা স্ববিস্তারে উল্লেখ করেছেন এবং আমি দলিল ও যুক্তি সহকারে সেগুলোর সমর্থন ও বিশ্লেষণ করেছি তখন আমাদের উপর শুধুমাত্র নিজস্ব কথার দায়িত্ব বর্তায় অন্যদের যেসব কথা আমাদের প্রতি অহেতুক সম্পৃক্ত করা হয়েছে সেগুলোর জবাব আমাদের দায়িত্বে নয়। মরহুম মাওলানা মওদূদী ইতিবাচক ভংগিতে কেবলমাত্র আদালতে সাহাবীর সঠিক সংজ্ঞাই বর্ণনা করেননি বরং সে সংখ্যা তার মতে সঠিক নয় তারও স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং তার ভাষায়—

"আদালতে সাহাবীর অর্থ যদি এই নেয়া হয় যে, সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ আনুগত্যশীল ছিলেন এবং রাসূলের সুন্নাত ও হিদায়াত উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়ার গুরুদায়িত্ব নিজেদের উপর অর্পিত হওয়ার অনুভূতি সকলেই তাঁরা যথাযথ পোষণ করতেন এবং যে কারণে তাঁদের কেউ কখনো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভুল কথা সম্পৃক্ত করেননি, তাহলে الصحابة كلهم عدول। সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়নিষ্ঠ নীতি বাক্যের এ বিশ্লেষণ ব্যতিক্রম ছাড়া সকল সাহাবীর উপরই প্রযোজ্য

www.pathagar.com

হবে। কিন্তু যদি এর ব্যাখ্যা করা হয় যে, ছোট বড় নির্বিশেষে সকল সাহাবী তাঁদের জীবনের সব ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতার বিশ্লেষণে সার্বিকভাবে বিশেষিত ছিলেন এবং তাঁদের কেউ কখনো আদালত বিরোধী কাজ করেননি তাহলে একথা সকলের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে না। নিসন্দেহে তাঁদের বৃহত্তর অংশ আদালতের শৈল চূড়া ও সর্বোচ্চ স্তরে আসীন ছিলেন। কিন্তু একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁদের এক অতি ক্ষুদ্রতম অংশ এমনও ছিলেন, যাদের কোনো কোনো কাজ আদালতের বিপরীত লক্ষ্য করা গেছে। এজন্যে الصحابة كلهم عدول এর ২য় ব্যাখ্যা সামগ্রিক অর্থে সকলের ক্ষেত্রে ষোলআনা সঠিক হতে পারে না। তবে এর ব্যাপকতা না হওয়া একথা অনিবার্য করে না যে, হাদীস রাওয়ায়েতের ব্যাপারে তাঁদের কোনো ব্যক্তি অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবেন। কেননা এ উক্তির প্রথম ব্যাখ্যা নিসন্দেহে ব্যাপকতার মর্যাদা রাখে এবং এর খেলাফ কোনো কাজ, কথা বা বিষয় আদৌ পাওয়া যায়নি।"

-(খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃষ্ঠা-৩০৩-৩০৪)

সমর্থন সূচক অতিরিক্ত উক্তি

যে ব্যক্তি সোজা কথা বাঁকা চোখে দেখার শখে উল্লাসী নয়, এ ব্যাখ্যার পর তার জন্য এখানে ওজর-আপত্তির অবকাশ বাকী রইলো কোথায়? মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব যাকিছু বলেছেন তার সমর্থনে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে আমি মাওলানা মানাজির আহসান সাহেবের একটি বাক্য পেশ করছি। তিনি বলেছেন ঃ

"সাহাবা কেরামের জামায়াতে উত্তম, মধ্যম, নিম্ন অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর লোকই আছেন-অন্যান্য প্রত্যেকে জামায়াতের লোকদের মধ্যে যেমন এ শ্রেণী বিন্যাসের ধারা বিদ্যমান। এতদসত্বেও এটা স্বীকৃত ছিলো যে, নবীগণ ছাড়া কোনো মানুষ যেহেতু জন্মগতভাবে নিষ্পাপ নয়, সুতরাং তখন থেকে অদ্যাবধি কোনো স্তরের সাহাবীকে মাসুম সাব্যস্ত করার বিশ্বাস প্রবণতা কখনো মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। নিষ্পাপ না হওয়ার কারণে তাঁদের জামায়াত ভুক্ত কোনো কোনো ব্যক্তি থেকে যে ধরনের দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়ে থাকুক মুসলমানগণ সর্বদা কথায় কিংবা গ্রন্থরাজিতে সেগুলো নিসংকোচে ও অবাধে আলোচনা করে আসছেন। পরিশেষে নিজেই চিন্তা করে দেখুন, হাদীস, জীবনী, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে হযরত মায়েয আসলামী নু'মান বিন আমর[১] আনসারী, মুগীরা বিন শোবা, ওয়াহশী[২] আমর বিন আস কিংবা স্বয়ং আমীরে

১. তিনি একজন সাহাবী ছিলেন, মদ্য পানের জন্যে কয়েকবার শাস্তি ভোগ করেন।

২. তাঁর উপরও মদ পানের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবীগণের সাথে এমন কোন্ বিষয়টি জড়িত করা হয়নি ? বাস্তব জীবনে তাঁরা যার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অন্য কথায় বাস্তব কর্মে এসব পদস্খলনে তাঁরা যুক্ত ছিলেন—একথা স্বীকার করেই সে সকল ঘটনাবলী তাঁদের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যে সমস্ত অপরাধকে আমরা কবীরা বলে আখ্যায়িত করি সম্ভবত তার কোনো প্রকার পাওয়া যাবে না, যা সে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে আমি বিস্ময়ে হতবাক যে, সে একই সাহাবীদের কোনো একজনের প্রতিও কোনো সময় এ অপরাধ সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, জ্ঞাতসারে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা ও ভুল হাদীস বর্ণনা করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন—এ তথ্য অন্তত আমার জানা নেই।"–(তাদবীনে হাদীস, মাওলানা সাইয়েদ মানাজির আহসান গীলানী, পৃষ্ঠা–৪৩৫-৪৩৭, সন ১৩৭৫ হিজরী)

স্মর্তব্য যে, মরহুম মাওলানা গীলানী একজন খ্যাতনামা দেওবন্দী আলেম এবং তাঁর এ গ্রন্থখানি ইদারায়ে মজলিসে ইলমী করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। এ সংস্থাটি দেওবন্দের কতিপয় বিশিষ্ট আলেম ও ফাজেলের সমন্বয়ে গঠিত। সংস্থাটি ইতিপূর্বে ডাভেল, মিসর ও করাচী থেকে বিশেষ বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের কাজ সম্পন্ন করেছে। এ সকল বুযূর্গানে দীন একদিকে নিজেরাই এ জাতীয় বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার করেন যেগুলোর এহেন আপত্তিকর বিষয়বস্তু বিদ্যমান। আর যারা মুদ্রণে শরীক নয় তারা অন্তত চোখ বুজে সেগুলো উপেক্ষা করে চলেন। অন্যদিকে তারা আমাদের কথার সমালোচনা করেন এবং বিভ্রান্তির দর্শন সামনে তুলে ধরে বলেন, তোমাদের বর্ণিত আদালতের সংজ্ঞায় অমুক অমুক কথা স্পষ্ট হতে চায় না। তোমরা যদি আমাদের বর্ণিত আদালতের তিন সংজ্ঞা সঠিক মনে না করো তাহলে আমাদের গ্রহণযোগ্য ৪র্থ সংজ্ঞা পেশ করো। অন্যথায় তোমাদের কথা বর্ণনাতীত আকারে বিপদজ্জনক। অবস্থার এহেন প্রেক্ষিতে একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, আমাদের বিরুদ্ধে তাদের চলমান বিতর্ক নিছক আল্লাহ ভীতি ও আন্তরিক আবেগ তাড়নার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব এবং আমি আদালতে সাহাবী এবং হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের আদালত সম্পর্কে যে সংজ্ঞা পেশ করেছি তা সার্বিক ও পূর্ণাংগ পর্যায়ের। এতে জটিলতার প্রশ্ন নেই আবার তার দ্বারা বিষয়বস্তুর সকল দিক পরিষ্কার ফুটে উঠে। মুহাদ্দিসগণের কাছে এ সংজ্ঞাটি গ্রহণযোগ্য এবং স্বীকৃতও। যার সমর্থনে বহু উক্তি বহু মন্তব্য পেশ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ মাওলানা আবদুস সালাম নদভী প্রণীত উসওয়ায়ে সাহাবাহ গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বক্তব্য পেশ করা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

এটা কোনো মুহাদ্দিসের দাবী নয় যে, সাহাবীগণ ইনসাফের খেলাফ কোনো কাজ করতে পারেন না। তাকওয়া ও পবিত্রতার খেলাফ কোনো কাজ তাদের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়, তারা নবীগণের ন্যায় মাসুম কিংবা সমস্ত পাপ কাজ থেকে পূত-পবিত্র। বরং তাদের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, কোনো সাহাবী রাওয়ায়েতের ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় আদৌ গ্রহণ করেননি।

হাদীস বর্ণনাকারীদের আদালত সম্পর্কে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের একাধিক অভিমত আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ বিষয়ে অতিরিক্ত আরো একটি যুক্ত করতে চাই। ইমাম আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন হিব্বান তাঁর সহীহ (ইবনে হিব্বান) গ্রন্থে আদালতের সংজ্ঞা ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

العدالة فى الانسان هو ان يكون اكثر احواله طاعة اللّه - لانّا متى لم تجعل العدل الا من لم يرجد فيه معصية بحال اداّنا ذالك الى ان ليس فى الدنيا عدل، اذا الناس لاتخلوا احوالهم من ورود خلل الشيطان فيها بل العدل من كان ظاهر احواله طاعة اللّه والذى يخالف العدل من كان اكثر احواله معصية اللّه -

"মানুষ ন্যায়পরায়ণতার (عدالت) বিশেষণে গুণান্বিত হওয়ার তাৎপর্য হলো, তার অধিকাংশ অবস্থা আল্লাহর আনুগত্যের উপর অতিবাহিত হওয়া। এটা এজন্যে যে, যদি আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর এমন লোককে ন্যায়বান ও সত্যনিষ্ঠ বলে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করি, কোনো অবস্থাতেই যে পাপাচারে লিপ্তই হয় না, তাহলে দুনিয়াতে সত্যনিষ্ঠ কোনো লোকের অস্তিত্ব আদৌ না থাকার কথা আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে। কেননা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা শয়তানের প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকে না। বরং যার মধ্যে রবের আনুগত্য বাহ্যিক অবস্থায় বিরাজমান সে ব্যক্তিই ন্যায়বান বা আদেল। আর যার জীবনের অধিকাংশ সময় আল্লাহর নাফরমানীতে অতিবাহিত হয় সে অন্যায়কারী গায়ের আদেল হিসাবে চিহ্নিত হবে।" -[সহীহ ইবনে হিব্বান, সম্পাদনা, আহমদ মোহাম্মদ শাকের। দারুল মুআরিফ মিসর, পৃষ্ঠা-১১২, ১৩৭২ হিজরী)

এটা আদালতের একটি নীতিগত সংজ্ঞা। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হোক কিংবা সাহাবী না হোক, বস্তুত সব রাবীর ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, অপর কোনো সাহাবী কিংবা অন্য কোনো রাবীর ১০/১৫টি ভুলের কারণে তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় পাপাচারে অতিবাহিত হওয়া কি অনিবার্য হতে পারে ; অথবা আমরা কখনো

www.pathagar.com

কি এরূপ কথা বলেছি যে, আমাদের কিংবা অপর কারো বর্ণিত ভুলের ভিত্তিতে অমুক সাহাবী (মায়াজাল্লাহ্) গায়ের আদেল হয়ে গেছেন ? এবং নানা পাপাচার তাঁর জীবন পরিমণ্ডল আচ্ছন্ন করে রেখেছে ? যদি এগুলোর একটি কথাও সঠিক ও সত্য না হয় এবং অবশ্যই নয়, তাহলে এহেন হৈ-হাঙ্গামা, তোলপাড় আর হুলস্থুল বাধিয়ে তোলার উদ্দেশ্য কি এবং কোন্ কথার ভিত্তিতে ?

জনাব ওসমানী সাহেব তার উভয় আলোচনাতে পলিসি শব্দটি নিয়েও বারবার শাণিত পর্যালোচনার চেষ্টা করেছেন। আসলে মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব বনী উমাইয়ার শাসনামলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এ আমলে অমুক অমুক পলিসি গ্রহণ করা হয়, তন্মধ্যে কতিপয়ের সূচনা হয় হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে। শব্দটি ইংরেজী, তাই আমাদের ধর্মীয় মহলের যারা ইংরেজী শব্দের সাথে বিশেষ পরিচিত নহেন এজন্য এর প্রয়োগে তাদের কাছে ভয়ংকর হওয়া কিংবা বিশ্রী মনে করা স্বাভাবিক। তবে শব্দটি এমন কর্মপন্থা কিংবা নিয়ম-পদ্ধতির সমার্থক যা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মরহুম মাওলানা মওদূদী যদি শব্দটি এ অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন যে, বনী উমাইয়া বা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর নিয়োজিত কর্মকর্তা এ পলিসি গ্রহণ করেছেন তাহলে এর মর্ম এটা নয় যে, সারা জীবন তাঁরা দিনরাত অহর্নিশ শুধুমাত্র এ কাজেই ডুবে থাকতেন। বরং এর উদ্দেশ্য কেবল এই যে, অমুক ক্ষেত্রে তাঁরা এ পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন, মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভর্ৎসনা করেছেন কিংবা মুসলমানদেরকে কাফেরের ওয়ারিশ বানিয়েছেন বা যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের পুত্র ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ওসমানী সাহেবের বাক চাতুর্য লক্ষ্যণীয় যে, তার বানোয়াট ব্যাখ্যা মতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু গুনাহের কাজকে নিজের পলিসি বানিয়ে নিয়েছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে তাঁর ফাসেক হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। কাজেই আপনারা হয় বলুন যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাসেক ছিলেন অথবা স্বীকার করুন যে, মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর প্রতি যে দোষারোপ করেছেন সেটা ঠিক নহে। বুঝা দুষ্কর যে, তার এ চরমপত্র শুধু কি আমাদের বাঁটেই গড়াবে নাকি স্বয়ং ওসমানী সাহেবের মুরুব্বী-আত্মীয়-বর্গসহ পূর্বাপর যে সকল বুযুর্গানে দীন অনুরূপ কথা বলছেন, প্রচার করে আসছেন তার কিছু অংশ তাদের ভাগেও পড়বে কিনা ?

অতপর এটাও একটি স্বীকৃত সত্য যে, কোনো সময় সামান্য ঘটনা কেন্দ্র করে কোনো নীতিগত ফলশ্রুতি উল্লেখ পূর্বক সে যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ কথা বলে দেয়া হয়। আর এটা কোনো একক অপরাধ নয় যা মাওলানা মওদূদী (র) একাই করেছেন। আমি প্রথমে বলেছি, শুধুমাত্র ইয়াযিদের

www.pathagar.com

মনোনয়ন দানের উপর ইবনে হাজার মক্কী আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লিখেছেন, হেদায়াতের পথ তাঁর দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (র) এ মনোনয়ন দানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, খেলাফতের ধারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত যখন পৌঁছলো তখন আর খেলাফতে রাশেদার ধারা অক্ষুণ্ন থাকেনি বরং রাজতান্ত্রিক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। এবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্থলাভিষিক্ত রূপে আপন পুত্রের নাম ঘোষণা করা একটি একক ঘটনা বিশেষ যা জীবনে মাত্র একবারই ঘটেছিলো। এটা কোনো স্বতন্ত্র পলিসিও ছিলো না। তাই একটি মাত্র ঘটনা কেন্দ্র করে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর এতোবড় জঘন্য অভিযোগ কেমন করে আরোপ করা চলে যে, তিনি হেদায়াতের পথ হারিয়ে ফেলেছেন এবং তাঁর শাসন পদ্ধতি রাজতান্ত্রিক ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। হযরত আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরীর (র) স্নেহধন্য ছাত্র মাওলানা সাইয়েদ আহমদ রেজা সাহেব বিজনুরী তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের ইফাদাতে সহীহুল বুখারীর এক জায়গায় সিফ্ফীন যুদ্ধের অবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গোটা খেলাফত আমলে নবুওয়াত পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এতে সমকালীন যুগ ও জনগোষ্ঠী দ্রুতগতিতে অবনতির দিকে ধাবিত হতে থাকে। এজন্যে নবুওয়াতি পন্থায় খেলাফতের চেয়ে জাগতিক রাজনীতি বেশী সফলতা লাভ করতে থাকে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইসলাম ও ইসলামী রাজনীতির সফলতার জন্যে মরণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। আগের যুগের তুলনায় পরবর্তী যুগ তাঁকে কঠিন ধৈর্যের মুখে ঠেলে দেয়। কিন্তু তিনি পাহাড়ের ন্যায় অটল অবিচল থেকে সকল মুসীবত ও পরীক্ষা সহাস্যবদনে বরদাশত করতে থাকেন।-[আনোয়ারুল বারী শরহে সহীহ বুখারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯, নাশেরুল উলুম লাইব্রেরী, বেজনুর, দেওবন্দ প্রেস, ২য় সংস্করণ)

এখানে শুধুমাত্র সিফফীন যুদ্ধের কথা বর্ণিত হচ্ছিলো। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ক্ষেত্রে যে ভুল করেন তা মুহাম্মদ তাকী সাহেবের মতে ইজতিহাদী ত্রুটি হবে হয়তো হতে পারে। কিন্তু মাওলানা সাইয়েদ আহমদ রেজা সাহেব বলছেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীর তরিকায় প্রতিষ্ঠিত থাকার পরিবর্তে অন্য পন্থা অবলম্বন করেন এবং তার রাজনীতি ছিলো জাগতিক সে ক্ষেত্রে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজনীতি ছিলো ধর্মভিত্তিক। কতিপয় প্রমাণিত ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ও তথ্যাবলী উল্লেখ

www.pathagar.com

করতঃ মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব বনী উমাইয়ার রাজতান্ত্রিক শাসনামল সম্পর্কে যদি লিখেন, এ আমলে রাজনীতি দীনের অধীনে ছিলো না, বৈধ-অবৈধ সর্ব পন্থায় তার চাহিদা পূরণ করা হতো এবং কুরআন-হাদীসের হুকুম বিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত ছিলো—তাহলে এতে কোন্ কুফরী অনিবার্য হয়ে যায় ?

অদ্ভুত যুক্তি

'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের যেসব ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে মুহাম্মদ তাকী সাহেব কেবলমাত্র সেগুলোর ব্যাখ্যা ও প্রত্যাখ্যানেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি এক ধাপ এগিয়ে এ প্রশ্নেরও অবতারণা করেছেন যে, এ ধরনের অন্যায়কারী কেন ফাসেক হবে না ? মাওলানা মওদূদী রাহামাতুল্লাহ্ আলাইহি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে যাকিছু লিখেছেন যদি সেগুলো সঠিক হিসেবে মেনে নেয়া হয় তাহলে তাঁর ফাসেক হওয়া অনিবার্যরূপে মানতে হবে এবং তাতে الصحابة كلهم عدول -এর আকীদা নিরাপদ থাকতে পারে না। আর সে আকীদাই কেবল নস্যাৎ হয়ে যায় না। ইসলামের সকল আকীদা গোটা আহকামই বিপদজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। মার-প্যাঁচ এবং বক্র আলোচনার এটি একটি শিক্ষণীয় উদাহরণ। ওসমানী সাহেবের এটা এক আজব চরিত্র যে, তিনি অপরের কথা অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ দিয়ে তা থেকে জঘন্য ধরনের অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। তারপর নিজেই মুরুব্বী সেজে বলতে থাকেন, এবার এর সবগুলো হয় স্বীকার কর না হয় অস্বীকার করে দাও। অধিকন্তু তার অপর অভ্যাস হলো, তিনি কোনো কোনো শব্দকে অযথা ভীতিপ্রদ করে তোলেন, ভিত্তিহীন দাবী করে বসেন এবং ভুল ধরনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। এভাবে হাতে গড়া ফাঁদে নিজেই তিনি জড়িয়ে আপন দলিলের পেঁচানো সূতায় আটকে যান।

মাওলানা মওদূদী (র) আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো কোনো কাজের ব্যাপারে বিদআত শব্দের প্রয়োগ করায় ওসমানী সাহেব যেনো সুযোগ পেয়ে গেলেন। আর কি, ঘরোয়া কালিতে সেটাকে ভয়ংকর রূপ দিয়ে আর অর্থের বিচিত্র পোশাকের রং চড়ানোর মহান খেদমতে তিনি লেগে যান। অতপর তিনি বললেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো কাজকে বিদআত বলার অধিকার কারো নেই। বিগত ১৪শ বছরে এ ধরনের অপরাধ কারো দ্বারা সংঘটিত হয়নি। মাওলানা মওদূদীই (র) প্রথম এ অপরাধে জড়িয়ে গেলেন। এর উপর আমি বাধ্য হয়ে শীর্ষপর্যায়ের ইমামদের উদ্ধৃতি পেশ করেছি। এসব উদ্ধৃতিতে তাঁরা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো কোনো কাজের ব্যাপারে বিদআত শব্দের প্রয়োগ করেছেন। এরূপ আরো বহু

www.pathagar.com

উদ্ধৃতি পেশ করা যেতে পারে। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা অন্য কোনো সাহাবীর ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদী (র) ফিস্‌ক কিংবা ফাসেক শব্দের ব্যবহার আদৌ করেননি। তিনি তা বরং লিখেছেন যে, কতিপয় ব্যাপারে আদালতের খেলাফ কাজ করলে কর্তার মূলত বিদ্যমানহীনতা অনিবার্য করে না এবং তাতে তার আদেল (ন্যায়বান) হওয়ার স্থলে ফাসেক হওয়াও প্রমাণ হয় না। তবে শর্ত হলো, তার সামগ্রিক জীবনে আদালতের অর্থ বিরাজমান থাকতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অজ্ঞ বন্ধু কিংবা আমাদের বুদ্ধিমান অনুগ্রাহী পিছনে লেগেই আছেন। আর পশ্চাতে লেপ্টে অনর্গল বলে যাচ্ছেন, তোমরা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর যে ফাসেকীর অপবাদ আরোপ করছে ; সেটা স্বীকার করে নিলে তাঁকে ফাসেক বলা অনিবার্য হয়ে পড়ে। মজার ব্যাপার হলো, মুহাম্মদ তাকী সাহেব নিজেই তার গ্রন্থের ২১৩ পৃষ্ঠায় হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ফিস্‌ক ও বিদ্রোহ আলোচনায় বলছেন ; একথা কোনো জ্ঞানী লোকের কাছে অস্পষ্ট নয় যে, কোনো কাজের ফাসেকী হওয়া দ্বারা তার কর্তার ফাসেক হওয়া অনিবার্য নহে। বলা বাহুল্য ইজতিহাদী বিষয়ের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে একজনের কাজ অপরের দৃষ্টিতে ফিস্‌ক হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাকে ফাসেক বলা হয় না। মুহাম্মদ তাকী সাহেবও আল্লাহর মেহেরবানীতে গুণীজনদের একজন। তিনি যে বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন তা তার কাছেও অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। যদি সে কথার আলোকে তিনি আমাদের এবং তার নিজের কথার প্রতি ২য় বার দৃষ্টিপাত করে নিতেন, তাহলে সমস্ত মাথা ব্যথার অবসান হতে পারতো, কেননা তিনি নিজেই সেখানে বলছেন, একজনের কাজ অপরের কাছে ফিসকরূপে গণ্য হয়ে থাকে কিন্তু তাতে সে ফাসিক হয়ে যায় না। এমতাবস্থায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি যদিও ফিসক শব্দ সম্পৃক্ত করা হয় তাতে তিনি গায়র আদেল তথা ন্যায়নিষ্ঠ হীন বলে কি করে গণ্য হতে পারেন?

শাহ আবদুল আযীযের ভূমিকা

বস্তুত মরহুম মাওলানা মওদূদী তার প্রণীত গ্রন্থের কোথাও কোনো সাহাবীর প্রতি ফিসক শব্দ ব্যবহার যেহেতু করেননি এজন্যে মাওলানা মওদূদী (র)-এর মতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর আদেল কিংবা ফাসেক হওয়ার ব্যাপারে সাফাই গাওয়া কিংবা ২য় জবাব পেশ করার কথা বলা অর্থহীন প্রগলভ বৈ আর কিছুই নয়। অবশ্য আমার বিগত আলোচনায় আমি একথাও উল্লেখ করেছি যে, বিদআত কিংবা ফিসক শব্দ কোনো ভর্ৎসনামূলক শব্দ নয়, বরং জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সুন্নাতের মুকাবিলায় বিদআত এবং ইতাআত (আনুগত্য)

www.pathagar.com

-এর মুকাবিলায় ফিসক শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে ফিসক শব্দ ব্যবহারের দু'টি উদাহরণ সেখানে পেশ করা হয়েছে। ওসমানী সাহেব তার উপর অভ্যাসানুযায়ী আবারো অভিযোগ করে লিখেছেন ঃ "আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফাসেক সাব্যস্ত করার উক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কোনো আলেম করেছেন—কেউ কোথাও দেখাতে পারবে না। আজ অবধি কেউ এরূপ দুঃসাহস করেনি। শাহ আবদুল আযীয কিংবা মীর সাইয়েদ শরীফ জুরজানী তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মত পোষণ করেন বলে ধরে নিলেও তা জমহুর উম্মতের মুকাবিলায় আদৌ গৃহীত হবে না।" শাহ আবদুল আযীয (র) আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর সম্পর্কে চরম কথা হলো, তিনি কবীরা গুনাহ করেছেন এবং বিদ্রোহী ছিলেন, তবে ফাসেকরূপে অভিশপ্ত নহেন। ওসমানী সাহেব বলতে চান, শাহ সাহেব এখানে তার নিজের নীতি উল্লেখ করছেন না বরং একটা সম্ভাব্য কথা আপাত স্বীকার করে বলছেন—যদি তাকে ফাসেক হিসেবে মেনেও নেয়া হয় তবুও তার প্রতি অভিশপ্ত বাক্য প্রয়োগ বৈধ নয়। এখানে প্রথমত প্রশ্ন জাগে, যদি ফিসক কিংবা ফাসিক শব্দটি এতোই মারাত্মক অর্থ প্রকাশ করে, তাহলে রূপকার্থেও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি শব্দটির প্রয়োগ না হওয়া উচিত এবং এটা বলাও সাহাবীদের অবমাননার সমার্থবোধক হওয়া উচিত যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে ফিসক হওয়ার কথা যদি মেনে নেয়া হয় তবুও ইহা ভর্ৎসনা অনিবার্য করে না। ২য় প্রশ্ন, যদি এটা শাহ সাহেবের নিজস্ব নীতি না হয়ে থাকে তাহলে তিনি 'তুহফায়ে ইসনা আশারা' গ্রন্থে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিপক্ষগণ সম্পর্কে বাতিল বিশ্বাসী ফিসক বিশ্বাসী শব্দগুলো বারবার কেন প্রয়োগ করেছেন ? মুহাম্মদ তাকী সাহেব স্বীয় গ্রন্থের ২১১ পৃষ্ঠায় সে আলোচনায় নিজেই যে বাক্যটির উল্লেখ করেছেন তাতে এসব শব্দ বর্তমান আছে যে, ফিসক বিশ্বাস গালমন্দ ও অবমাননা বৈধ করে না। অথচ ফাসেকী বিশ্বাস শব্দটি ফাসেকী কাজ অপেক্ষাও অধিক কঠোর বাক্যে বলে মনে হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ওসমানী সাহেব বলছেন, "শাহ সাহেবের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর আমি তার এ ভূমিকাই মনে করেছি যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত মযবুত দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কিংবা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিসন্দেহে ভুল ছিলো এবং জাগতিক নিয়মানুসারে এ ধরনের কাজ বিদ্রোহের আওতায় এসে যায় যা প্রকৃতপক্ষে কবীরা গুনাহ অর্থাৎ ফাসেকী।" পরবর্তীতে ওসমানী সাহেব আরো লিখেন,

www.pathagar.com

ন্যায়বান ইমামের খেলাফ বিদ্রোহ করা কবীরা গুনাহ্ এবং ফিস্ক। তারপর বলছেন ঃ

"আমি শাহ্ আবদুল আযীয সাহেবের লেখাগুলোর উপর যতোটুকু চিন্তা-ভাবনা করেছি তাতে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার অস্ত্রধারণ করার ব্যাপারে তিনি ফাসেকী বিশ্বাসী শব্দের প্রয়োগ কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্যে করেছেন যে, বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ফাসেকী। তবে তাতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, এর ভিত্তিতে এসব মহান ব্যক্তিত্ব (মাআযাল্লাহ) ফাসেক হয়ে গেছেন।"

আমার জিজ্ঞাস্য, এ অর্থ কে বের করলেন ? এটাতো জনাব মুহাম্মদ তাকী সাহেব নিজেই উদ্ভাবন করছেন। অন্যথায় মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব তো ফিসক কিংবা ফাসেক শব্দের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। যখন তাঁর উপর এ অভিযোগ আরোপ করা হলো তখন আমি শুধু এতোটুকু কথা বললাম যে, মরহুম মাওলানা তো নয়, বরং অবশ্য অপর কোনো কোনো আলেম সে আলোচনায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এবার ওসমানী সাহেব তার জোরালো দাবী দ্বারা এসব কথার খণ্ডন শুরু করেন যে, শাহ্ সাহেব কিংবা অপর কেউ এরূপ বলেননি, কিন্তু রদ করতে গিয়ে তিনি নিজেই পরিশেষে স্বীকার করে বসলেন যে, শাহ্ সাহেব ফিসকে বিশ্বাসী শব্দটি কেবলমাত্র আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেননি বরং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিরোধী সকলের ব্যাপারেই লিখেছেন যার মধ্যে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও শামিল ছিলেন। ওসমানী সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন, হকপন্থী ইমামের খেলাফ বিদ্রোহ করা কবীরা গুনাহ্ এবং ফিসক, যদিও এর কর্তা ব্যক্তি ফাসিক সাব্যস্ত হয় না। তারপরও বুঝা মুশকিল যে, আমাদের বিরুদ্ধে ওসমানী সাহেবের অসন্তুষ্টি ও গোস্সা হওয়ার প্রকৃত কারণ কি ?

এখানে একথাও প্রনিধানযোগ্য যে, ওসমানী সাহেব বর্তমানে সমালোচনা ও ঝালাইকরণ শাস্ত্রে মাশাআল্লাহ এতোটা অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হয়ে উঠেছেন যে, তার দৃষ্টিতে শাহ্ সাহেবের লেখায়ও বৈপরিত্য ফুটে উঠতে শুরু করেছে। সুতরাং একই আলোচনায়ই তিনি লিখেন, ঘটনা হলো, হযরত শাহ্ আবদুল আযীয সাহেব এর গ্রন্থসমূহে এ বিষয় সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন তা খুবই জটিল, অস্পষ্ট এবং দৃশ্যত স্ববিরোধী মনে হয়। শাহ্ সাহেবের কোন্ কোন্ বিবরণ স্ববিরোধী একথা ওসমানী সাহেব স্পষ্ট করে বলেননি। অবশ্য শাহ্ সাহেবের একটি বাক্যাংশ ওসমানী সাহেব নিজের সমর্থনে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। বাক্যটি হলো ঃ

www.pathagar.com

"সিরীয় দলের কারো সম্পর্কে যদি আমরা বিশ্বস্ততার সাথে জানতে পারি যে, সে হযরত আমীরের (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু) সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো এমনকি তাঁকে কাফের সাব্যস্ত করতো কিংবা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করতো তাহলে তাকে আমরা অবশ্যই কাফের মনে করবো। যখন একথা নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তাদের ঈমানদার হওয়ার কথা বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণিত তখন মূল ঈমানকেই আমরা দলীল হিসাবে ধরে নেব।"-[তোহ্ফায়ে ইছনা আশরিয়া, অনুবাদ পৃষ্ঠা-৬১৩]

এ মন্তব্যের উপর ওসমানী সাহেব লিখেছেন, উপরোক্ত ভাষ্যে একথা পরিষ্কার হয় যে, হযরত শাহ সাহেবের মতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করার প্রসংগটি নির্ভরযোগ্য রাওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নয়। শাহ সাহেবের বাক্যের এ অনুবাদ যদি সঠিক হয় তাহলে নিসন্দেহে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তার মতে সিরিয়াবাসী কেউ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তিরস্কারে লিপ্ত হতো না। আর এতে কেউ অংশ নিলে শাহ সাহেবের মতে সে কাফের সাব্যস্ত হবে। এ উভয় কথা শাহ সাহেবের অন্যান্য বহু লেখার সুস্পষ্ট খেলাফ, আবার জ্ঞানচর্চা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সম্পূর্ণ ভুল। যেমন, গালমন্দ করার আলোচনায় সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী হাদীস গ্রন্থের একটি হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটিতে আছে—আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ না করার কারণ কি ? এ হাদীসের ব্যাখ্যায় শাহ আবদুল আযীয সাহেব ফতওয়ায়ে আযীযীয়ায় যাকিছু ব্যক্ত করেছেন তাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর গালমন্দ করাটা তিনি সঠিক ও প্রমাণিত মনে করতেন। সেখানে আমি তাঁর সে ফতওয়ার তরজমা উল্লেখ করেছি। এখানে তার মূল ভাষ্য তুলে ধরছি ঃ

"بہتر ہمیں است کہ ایں لفظ (سب) را برظاہرش جاری باید داشت۔
نہایت کار آنکہ ارتکاب ایں فعل شنیع یعنی سب یا امر سب از معاویہ بن ابی سفیان
لازم خواہد آمد ولیس ہذا باول قارورۃ کسرت فی الاسلام، چہ مرتبہ
سب کمتر از قتل و قتال است لما روی فی الحدیث الصحیح سباب المسلم

www.pathagar.com

فسوق وقتاله کفر و ہرگاہ قتال وامر بالقتال یقینی الصدور است، ازاں گریز نیست بالجملہ اصلح ہمین ست کہ وے را مرتکب کبیرہ باید دانست و زبان از طعن ولعن بند باید نمود۔" (فتاوی عزیزی، کتب خانہ رحیمیہ دیوبند، جلد اول ص ۱۲۳)

(ফতওয়ায়ে আযীযী, রহীমিয়াহ লাইব্রেরী, দেওবন্দ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৩)

এ বাক্যে শাহ্ সাহেব আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কেবলমাত্র গালিগালাজ করার কথাই স্বীকার করছেন না বরং সেসব লোকদেরকেও অসত্য প্রমাণ করছেন যারা এটা স্বীকার করে না অথবা হাদীসে যে গালমন্দ করার কথা উল্লেখ আছে সেটা বাহ্যিক অর্থ নেয় না। শাহ্ সাহেব একথাও বলছেন, গালমন্দ করার চেয়ে কঠোর যুদ্ধবিগ্রহ করা এবং তজ্জন্য আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নির্দেশ দেয়ার কথা যখন প্রমাণিত তখন গালমন্দ করার কথা অস্বীকার করা অর্থহীন এবং সেটা স্বীকার করা ছাড়া গত্যান্তর নেই। সুতরাং সঠিক কথা এই যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কবীরা গুনাহ করেছিলেন—একথা মানা উচিত ; তবে তাঁকে অভিশপ্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাতে এটাও জানা গেলো যে, গালমন্দ করার কথা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও শাহ্ সাহেব এটিকে কবীরা গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন কিন্তু এর কর্তা ব্যক্তিকে আদৌ কাফের মনে করতেন না। (আল্লাহ্ না করুক) যদি তিনি এরূপ মনে করতেন তাহলে তাঁর মধ্যে এবং রাফেজীদের মধ্যে পার্থক্য রইলো কি ? তারা তো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধীদেরকে কাফের এবং তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। শাহ্ সাহেব মূলতঃ রাফেজীদের জবাবেই এ গ্রন্থটি রচনা করেন। মুহাম্মদ তাকী সাহেবের উচিত ছিলো, এরূপ ভুল ও বায়ু নির্ভর কথা বলার আগে কষ্ট স্বীকার করে তোহফায়ে ইসনা আশারীয়া গ্রন্থের মূল ফার্সী এবারত দেখে নেয়া। যদি এরূপ করতেন তাহলে তার জানা অসম্ভব ছিলো না যে, যে অনুবাদের উপর ভিত্তি করে তিনি স্বীয় দলিল প্রতিষ্ঠা করছেন মূলে সে অনুবাদই ভুল। শাহ্ সাহেবের আসল বাক্য নিম্নরূপ ঃ

"ہاں، اگر جماعت اہل شام میں سے ہم بالیقین کسی کے متعلق جان لیں کہ وہ حضرت امیر (علیؓ) کے ساتھ اس حد تک عداوت اور بغض رکھتا تھا کہ آنجناب عالی مقام پر سب وطعن کے

www.pathagar.com

ساتھ ہی آپ کی تکفیر بھی کرتا تھا، تو اس کو ہم یقیناً کافر جانیں گے اور جب یہ بات معتبر روایات سے پایۂ ثبوت کو نہیں پہنچی اور ان کا اصل ایمان بالیقین ثابت ہے، تو ہم تمسک اصل ایمان سے کریں گے۔"

এর সঠিক অনুবাদ হলো ঃ

"হ্যাঁ, শামবাসীদের (সিরিয়া) কারো সম্পর্কে যদি আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি যে, সে হযরত আমীরের (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর) সাথে এ পরিমাণে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো যে, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি তিরস্কার করার সাথে সাথে তাঁকে সে কাফের বলে মন্তব্যও করতো, তাহলে সে ব্যক্তিকে অবশ্যই আমরা কাফের মনে করবো। কিন্তু একথা যখন নির্ভরযোগ্য রাওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নয় অথচ তার মূল ঈমান বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণিত, তখন আমরা ঈমানের ভিত্তিতেই তাকে বিবেচনা করবো।"

উপরোক্ত বাক্যে শাহ্ সাহেব গালমন্দ করার কথা অস্বীকার করছেন না কিংবা গালিগালাজকারীকে কাফেরও বলছেন না। বরং গালমন্দ করার কথা স্বীকার করে বলছেন, যদি কেউ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি গালাগালীর সীমা অতিক্রম করে তাঁকে কাফের বলার ধৃষ্টতা দেখায় তাহলে আমাদের মতে সে অবশ্যই কাফের। তবে শামবাসীদের (সিরিয়া) কেউ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাফের বলেনি সুতরাং তারাও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতই ঈমানদার।

পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের উক্তিসমূহ

আমি মীর সাইয়েদ শরীফ জুরজানীর ২য় উক্তি পেশ করেছি। তিনি শরহে মাওয়াকেফে লিখেছেন, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীরা এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধাচরণকারীরা গুনাহ্গার ছিলো। কেননা তাঁরা উভয় সমকালীন ইমাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম ছিলো। আল্লামা সাইয়েদ শরীফ আরো বলছেন, কারোমতে তাঁদের এ ভুল ফাসেকীর পর্যায়ে পৌছেনি। তবে আমাদের বহু আলেম হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের ফাসেক হওয়ার কথাও বলেছেন। একথার উপর ওসমানী সাহেব বলছেন, এ ফাসেকীকে তাঁরা ভুলের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে নয়। কিন্তু ফাসেকীর

www.pathagar.com

সম্পৃক্তি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে নয়—আল্লাহ জানেন, একথার কি রহস্য ! অন্যথায় ভুল যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটাতো হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুরই হবে। এমতাবস্থায় তাঁর দিকে না হওয়া এবং ভুলের দিকে হওয়ার অর্থ কি আর পার্থক্য কোথায় ? পরন্তু সাইয়েদ জুরজানী সাহেবের খাতা ও তাফসীরে শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অবশ্যম্ভাবী রূপে ভুল বা ফাসেকী কাজের কর্তা সাব্যস্ত করা। তবে একথা ঠিক যে, এক বা কতিপয় ফাসেকী কাজের দরুন সারা জীবন কিংবা জীবনের অধিকাংশ সময় ও অবস্থা ফাসেকী কর্মে অতিবাহিত হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় না এবং তার থেকে আদালত গুণ সম্পূর্ণ রূপে বিলীন ও নিঃশেষ হয়ে যায় না। যদি একথা ওসমানী সাহেব স্বীকার করেন তাহলে আমরাও তো এর অস্বীকারকারী নই।

আমি দু'টি মাত্র উদ্ধৃতির ইশারা দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলাম এ কারণ যে, মরহুম মাওলানা মওদূদী ফিসক কিংবা ফাসিক শব্দ তাঁর লেখার কোথাও প্রয়োগই করেননি। অন্যরা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। সে ব্যাখ্যায় অনর্থক জড়িয়ে যাওয়া আমার ইচ্ছা ছিলো না, কিন্তু দু'জন লোকের কথা অধিকাংশের কথার মুকাবিলায় আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না—ওসমানী সাহেব একথায় অটল থাকায় আমি আরো দু'টি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তন্মধ্যে একজন হলেন রশীদ আহমদ গাংগুহী। তাঁর কথা আমি আগেও উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছেন ঃ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে সংঘর্ষ হয় আহলে সুন্নাত তা কখন উত্তম এবং জায়েয বলেছে ? আহলে সুন্নাতের যে কোনো কিতাবে চোখ ফিরালে দেখা যাবে আহলে সুন্নাতগণ তাঁকে এ কাজে গুনাহগার বলে থাকেন। তবে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এ গুনাহের কারণে ঈমান বহির্ভূত হয়ে যাননি। কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

দেখুন ! পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকা সত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মু'মিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া আরো অসংখ্য আয়াত আছে যাদ্বারা ফাসেকী ও কবীরা গুনাহের কারণে মু'মিন কাফের না হওয়া প্রমাণিত।

—(হেদায়াতুশ শিয়া পৃষ্ঠা—৩০)

২য় উদ্ধৃতি ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বাইহাকীর সুনানে কুবরার। তিনি বিদ্রোহীদের হত্যা অধ্যায়ে একটি রাওয়ায়েত বর্ণনা করে হযরত আম্মার পর্যন্ত এর সনদ পৌছেন। তিনি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

لاتقولو اكفر اهل الشام ولكن قولوا فسقوا او ظلموا ـ

"শামবাসীরা (সিরিয়া) কুফরী করেছে একথা বলো না বরং বলো, তারা ফাসেকী বা যুলুম করেছে।"-(সুনানে কুবরা খণ্ড-৮ ; পৃষ্ঠা-১৭৪ ১ম সংস্করণ, হায়দারাবাদ, ১৩৫৪ হিজরী)

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর একথার সুস্পষ্ট ইংগীত হলো হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত অস্বীকারকারী তার সংগী-সাথীদের প্রতি। বুঝতে পারছি না যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সংগী-সাথীদের উপর যখন বিদ্রোহের অভিযোগ স্বীকৃত এবং অগণিত আহলে সুন্নাত আলেম তাদেরকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তখন ফিসক ও বিদআত থেকে কঠোর শব্দ সংঘর্ষ ও সংঘাতের প্রয়োগ দেখে কিংবা শুনেও ওসমানী সাহেব শিউরে উঠছেন। এতদসত্ত্বেও তার কলম থেকেও পরিশেষে এ শব্দগুলো বের হয়েই পড়ে যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাজ মূলতঃ ফাসেকী ও কবীরা গুনাহের শামিল যদিও পারলৌকিক আহকাম অনুসারে এ কাজ ইজতিহাদী ভুলের আওতায় আসে।

রাবীর আদালত

সাহাবীর আদালত আলোচনায় আমি ওসমানী সাহেবকে এ প্রশ্নও করেছিলাম যে, আপনি সাহাবায়ে কেরামদের জন্যে আদালতের যে উচ্চতর মাপকাঠি তৈরী করছেন সেটা কি রাবীদের গোটা ধারাবাহিককতায় প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা হবে ? এর দ্বারা আমার দাবী ছিলো, সাহাবায়ে কেরাম এবং হাদীসের রাবীদের আদালত প্রসংগটি হাদীস রাওয়ায়েতের ক্ষেত্রেই আলোচ্য সূচীতে আসতে পারে এবং সাহাবীদের মাধ্যমে সরাসরি আমাদের কাছ পর্যন্ত হাদীস পৌছেনি বরং অন্যান্য বহু অসাহাবী রাবীদের মাধ্যমে পৌছেছে। এখন সাহাবীদের ত্রুটিগুলো—ছোট-বড় কিংবা ইজতিহাদী যাই হোক না কেন তার সবই আংগুল দিয়ে গণনা করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ১০/১৫ কিংবা ২০টি কাজ এমন হতে পারে যে, তাঁর দৈনন্দিন ৫ ওয়াক্ত নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ এবং অন্যান্য অগণিত সৎকাজের মুকাবিলায় উল্লেখের যোগ্যই নয়। এতোসব সৎ ও নেক আমল থাকা সত্বেও নির্দিষ্ট কতিপয় ত্রুটির কারণে যদি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আদেল না থাকেন, তাহলে অপরাপর রাবীগণ যারা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অপেক্ষা অধিকতর ত্রুটিপূর্ণ তাদের অবস্থা কি হবে ? এজন্যে আদালতের সে সংজ্ঞাটিই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য যা এমন প্রত্যেক রাবীর

www.pathagar.com

অনুকূলে যথার্থ হতে পারে যাদের নেকীর ওজন সার্বিকভাবে অন্যায়ের চেয়ে ভারী এবং যাদের সম্পর্কে নিষ্ঠার সাথে বলা যায় যে, তারা হাদীসে ভুল বর্ণনার আশ্রয় নিবেন না। সাহাবীদের ভুল সম্পর্কে আপনি তো বলে দিবেন এগুলোর সবই ইজতিহাদ। কিন্তু প্রত্যেক রাবীর প্রত্যেক ভুলকে ইজতিহাদ বলে কে স্বীকার করবে? আমার এ প্রশ্নের সহজ উত্তর দেয়ার পরিবর্তে ওসমানী সাহেব আবারো একথারই পুনরাবৃত্তি করছেন যে, আদালতের অর্থ হলো, বর্ণনাকারী ফাসেক না হওয়া শর্তটি আমি নিজের পক্ষ থেকে বানাইনি। উসূলে হাদীসের যে কোনো গ্রন্থ খুললেই এ শর্তটি লিখিত আকারে পাওয়া যাবে।

ওসমানী সাহেব প্রথমে আদালতের মনগড়া তিনটি সংজ্ঞা বর্ণনা করলেন। আমি দাবী করা সত্ত্বেও তিনটি সংজ্ঞার যে কোনো একটির সমর্থনে কোনো সনদ বা উদ্ধৃতি তিনি পেশ করতে সক্ষম হননি। এবার পুনরায় তিনি আদালতের একটি নেতিবাচক সংজ্ঞার কথা লিখলেন যার সমর্থনে কোনো উদ্ধৃতি দেননি। তিনি এটাও বলেননি যে, তার মতে ফাসেক এমন ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য যার উপর ফাসেকী অর্থাৎ অবাধ্যতার অর্থ প্রাধান্য লাভ করে কিংবা যা থেকে মাত্র কয়েকবার ফাসেকী আচরণ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এটা নিসন্দেহ যে, কোনো কোনো মুহাদ্দিস ফাসেকী সমালোচনার অন্যতম কারণ মনে করেন। তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য কারো জীবনে ফাসেকীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হওয়া। অন্যথায় কোন্ মানুষ সম্পর্কে একথা প্রমাণ করা সম্ভব যে, তার জীবন ফাসেকী বা নাফরমানী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হাফেজ ইবনে হাজার (র) নুযহাতুন নজর বইয়ে যেখানে সমালোচনার কারণসমূহ গণনা করেছেন সেখানে ৫ম কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: فمن فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه فحديثه منكر এর তাৎপর্য হলো, যে রাবীর ত্রুটি-বিচ্যুতি মাত্রাহীন, যার উদাসীনতা সীমাহীন আর যার ফাসেকী তৎপরতা সুস্পষ্ট তার হাদীস মুনকার তথা অগ্রাহ্য। অন্যভাবে এর পরিষ্কার অর্থ হলো, যার মধ্যে ত্রুটি, গাফলতি এবং ফাসেকী প্রাধান্য পাবে না তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। এর আগে হাফেজ ইবনে হাজার (র) فحش غلطه -এর ব্যাখ্যা اى كثرت (অর্থাৎ ত্রুটি বেশী হওয়া) শব্দ যোগ করেছেন। শরহুশ শরহি গ্রন্থে এর অধিক বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে:

ان يكون خطاه اكثر من صوابه او يتسا ديا اذ لايخلو الانسان من الغلط

"রাবীর ত্রুটি অধিক হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, নির্ভুলের তুলনায় ভুলের সংখ্যা অধিক হওয়া অথবা উভয়ই সমান হওয়া। কারণ, কোনো মানুষ ভুলের উর্ধে নয়।"

www.pathagar.com

এটাতো ভাষ্যগত কিংবা কর্মগত ফিসকের ব্যাখ্যা। পরবর্তীতে হাফেজ ইবনে হাজার সমালোচনার (طعن) নবম কারণ (البدعة) (বিদআতের আওতায় এতেকাদী ফিসকের আলোচনা করেছেন। ব্যক্তির ফাসেকী বিশ্বাস যেনো বিদআতের একটি ধরন। মূল বাক্যসহ এ প্রসংগের অনুবাদ ইতিপূর্বে আমি পেশ করেছি। তিনি বলছেন, কোনো কোনো বেদাআতী কাজ কিংবা বিশ্বাস ফাসেকী বা কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কিন্তু প্রতিটি দল ফাসেক ও কাফের হওয়ার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করার কারণে শুধুমাত্র এমন রাবীর রাওয়ায়েত অগ্রাহ্য হবে যে, এমন শরঈ নির্দেশের অস্বীকারকারী যা মুতাওয়াতের সনদের ভিত্তিতে প্রমাণিত কিংবা নির্দেশটি দীনের অনিবার্য ও মৌলিক বিষয় হিসাবে সুপরিচিত। মোটকথা, প্রত্যেক ফিসক ও বিদআত সমালোচনা (طعن) অনিবার্য করে না কিংবা আদালত বিরোধী নয়। অধিকন্তু আমি খাতীবুল বাগদাদীর আল কেফায়ার পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করেছি। যাতে সম্মানিত সাহাবীগণ তাবেঈন, তাবে তাবেঈনগণ খাওয়ারিজ এবং অন্যান্য এমন ফাসিকদের হাদীস গ্রহণ করেছেন যারা হাদীস রাওয়ায়েতের ক্ষেত্রে ছিলো সত্যবাদী এবং তাদের জীবনে সাধারণভাবে গর্হিত ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করে চলতো। বিদআত অনুসারী যেসব লোক অন্যকে নিজেদের বিদআতের প্রতি আহ্বান বা প্রলুব্ধ করতো না হাদীস গ্রন্থগুলো তাদের রাওয়ায়েতে ভরপুর। হাফেজ আবু আমর বিন সালাহ তার রচিত গ্রন্থ উলুমুল হাদীস (মুকাদ্দমা বিন সালাহ্ নামে খ্যাত) এ ধরনের রাবীদের সম্পর্কে লিখছেন, হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের গ্রন্থগুলো তাদের রাওয়ায়েত দ্বারা পরিপূর্ণ। (ان كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفى الصحيحين كثير من احاديثهم) আমি এটাও বর্ণনা করেছি যে, বিদআত অনুসারীদের আহ্বানকারী হওয়া না হওয়ার পার্থক্য কৃত্রিম এবং শুধুমাত্র এ'তেকাদী পর্যায়ের বিষয়। ইমাম ইবনে হাযম তো এতটুকু লিখেছেন, যদি এ পার্থক্য সঠিক হয় তাহলে যে রাবী স্বীয় বিদআতী আকীদার প্রতি অপরকে দাওয়াত দেয় ও আহ্বান করে এমতাবস্থায় যদি সে হাদীস বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় না নেয়, তাহলে তার বর্ণিত হাদীস অপরের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, তার বিশ্বাস ও কাজে বৈপরিত্য নেই। যে যেটাকে সঠিক মনে করে সেটার প্রতি প্রকাশ্য আহ্বান জানায়। অপরদিকে আহ্বান করে না এমন বিদআতপন্থী স্বীয় আহ্বান গোপন করে থাকে। অতপর আমার এ আলোচনার উপর ওসমানী সাহেবের এ প্রতিবাদও আশ্চর্য যে, আল বাল-াগের গোটা আলোচনা তো ফিসক সম্পর্কে ছিলো, বিদআত সম্পর্কে ছিলো না। ফাসেকী এবং বিদআত কোনো আলাদা স্বতন্ত্র বিষয় নহে বরং বিশ্বাস ও আমলেরই এপিঠ ওপিঠ মাত্র। ইতিপূর্বের আলোচনায় যা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত

www.pathagar.com

হয়েছে। যে কারণে মুহাদ্দিসগণ তাদীল ও তাজরীহের (সমতা ও মিথ্যা প্রতিপাদন করা) আওতায় উভয়ের উল্লেখ এক সাথে করেছেন। ওসমানী সাহেবের ধারণা মতে যদি ফাসেকী বিদআত ছাড়া অন্য কোনো বিষয় হয় এবং উভয়ের মধ্যে কোনো ধরনের সম্পর্ক না থাকে তাহলে ইবনে হাজারের একথার তাৎপর্য কি যে, البدعة تكون بمفسق। "বিদআত ফাসেকী দ্বারাও সংঘটিত হতে পারে।"

সিফফীনের যুদ্ধ

জনাব মুহাম্মদ তাকী সাহেব এ জায়গায় "সিফফীন যুদ্ধে উভয় দলের সঠিক মর্যাদা" শিরোনামে অপর এক আলোচনার প্রসঙ্গ টেনেছেন। আলোচনায় তিনি বলছেন, যদি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রকাশ্য বিদ্রোহের অগ্রনায়ক হয়ে থাকেন, তাহলে পবিত্র কুরআনে বিদ্রোহীকে হত্যা করার স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও অধিকাংশ সাহাবী তা কেন উপেক্ষা করলেন। এমনকি সিফ্ফীন যুদ্ধে হযরত খোজাইমাহ্ বিন সাবিত ছাড়া অপর কোনো বদরী সাহাবী অংশগ্রহণ করেননি। তাহলে হযরত আম্মার বিন ইয়াসীর সম্পর্কে মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেবের চিন্তাধারা কি ; তিনি কি বদরী সাহাবী ছিলেন না ? নাকি তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশ নেননি ? যে কথাই ঠিক হোক তা প্রমাণসহ উল্লেখ করে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে আশা করি তিনি সচেষ্ট হবেন। বাকী রইলো এ প্রশ্ন যে, কতজন সাহাবী এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, কি আদৌ নেননি ? প্রশ্ন সুদীর্ঘ উত্তরের দাবীদার। কেননা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবরোধ, হাররার ঘটনা এবং এমন প্রতিটি যুদ্ধের বেলায় এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যা নবী যুগের পর কাফের ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে অথবা মুসলমানগণ পারস্পরিক ভাবে নিজেরাই লিপ্ত হয়েছে। লাখো সহস্র সাহাবীদের মধ্য থেকে কতজন সাহাবীর তালিকা ওসমানী সাহেব কিংবা অপর কোনো লোক তৈরী করতে সক্ষম যে, অমুক অমুক সাহাবী অমুক অমুক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং অমুকরা বিরত ছিলেন। যুদ্ধ যতোই গুরুত্বপূর্ণ হোক, তাতে প্রতিটি সাহাবীর কিংবা প্রতিটি মুসলমানের প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন, আর যারা অংশগ্রহণ করেননি তাদের কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করার কথা প্রমাণ করা কঠিন। খেলাফতে রাশেদাহ্ এবং ফেতনার যুগের যুদ্ধসমূহে কোনো কোনো সাহাবীর যুদ্ধে অংশ না নেয়া কিংবা অংশ নিতে অক্ষম হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। ওসমানী সাহেবের দৃষ্টিভংগি যদি এই হয় যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণায় হযরত আলী তাঁর খেলাফ বিদ্রোহ করেছেন আর হযরত আলী

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণায় আমীরে মুয়াবিয়া তাঁর খেলাফ বিদ্রোহ করেছেন এবং ওসমানী সাহেব উভয় ধারণা সঠিক হওয়ার কথা ভাবেন তাহলে এ মতে তিনি কায়েম থাকতে পারেন। তবে প্রত্যেক ধারণা বাস্তব ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া জরুরী নয়। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, সিরিয়া ছাড়া গোটা ইসলামী দুনিয়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করে বরং সিরিয়ারও অনেক মুসলমান হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুরই বাইয়াতের আওতাধীন ছিলো। আনোয়ারুল বারীর যে খণ্ডের উদ্ধৃতি উপরে দেয়া হয়েছে সে খণ্ডেরই পরবর্তী ৩০ পৃষ্ঠায় মাওলানা আনোয়ার শাহ সাহেবের উক্তি উল্লেখ করতঃ সিফ্‌ফীন যুদ্ধেরই আলোচনায় গ্রন্থকার বলেন, অধিকাংশ সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষে ছিলেন। আমার[১] জানামতে আনসারদের সকলেই আর মুহাজিরদের বেশীর ভাগ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষে ছিলেন।

ইমাম শাওকানীর উক্তি

মহা গ্রন্থ আল কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সম্মানিত সাহাবীগণ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আল্লাহও তাঁদের প্রতি রাজী ছিলেন। তবে এর সাথে এটাও সত্য যে, কোনো কোনো সাহাবী কবীরা ও সগীরা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তজ্জন্য তাঁরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুলও করেন। এতদসত্ত্বেও তাদের এসব ত্রুটির কথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে। পরন্তু উম্মতের শীর্ষস্থানীয় আলেম, ফকীহ এগুলোর উপর সর্বদা নরম কিংবা কঠিন সুরে পর্যালোচনা করে আসছেন। এ সকল বুযর্গদের অন্তকরণ আল্লাহ, রাসূল এবং সাহাবীদের মহব্বতে ভরপুর ছিলো। আল্লাহর পাঠানো নবী এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি আমাদের বিগত বুযূর্গগণ যে উচ্চ পর্যায়ের সম্মান প্রদর্শন করতেন তার আশেপাশেও আমরা পৌছতে পারিনি। কিন্তু তারা সাহাবীদের ত্রুটি নিয়ে প্রকাশ্যে কঠোর সমালোচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমি কাযী মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী (র)-এর কথা পেশ করতে চাই। তার তাফসীর ফতহুল কাদীর এবং ফিকহুল হাদীস গ্রন্থ নাইলুল আওতার সুপ্রসিদ্ধ ও তথ্যবহুল। তাঁর অগণিত গ্রন্থাবলীর অন্যতম وبل الغمام على شفاء الاوام নামক গ্রন্থের একটি লেখা আল্লামা সাইয়েদ সিদ্দিক হাসান সাহেব তার আকলীলুল কেরাম কিতাবে উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ

---

১. মুয়াত্তায়ে মালেকের ব্যাখ্যা গ্রন্থে হযরত যাকারিয়া (র) আওযাযীল মাসালেকের ৫ম খণ্ডের ৪৩৪ পৃষ্ঠায় বলছেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ৯০জন বদরী সাহাবী ৭শ আহলে বাইয়াতে রিদওয়ান সমগ্র মুহাজির এবং ৪০০ আনসার সিফ্‌ফীন যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

www.pathagar.com

قال الشوكاني في وبل الغمام لاشك ولا شبهة ان الحق بيد على في جميع مواطنه اما طلحة والزبير ومن معهم فلانهم كانوا بايعوه فنكثوا بيعته بغيا عليه فوجب عليه قتالهم واما قتاله للخوارج فلا ريب في ذلك واما اهل الصفين فبغيهم ظاهر ولولم يكن في ذلك الا قوله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية اكان ذلك مفيدا للمطلوب۔ ثم ليس معاوية من يصلح لمارضته ولكنه اراد طلب الرياسة والدنيا بين اقوام اغتام لايعرفون معروفا ولا ينكرون منكر افخادعهم بانه طالب بدم عثمان فنفق ذالك عليهم وبذلوا بين يديه وماءهم واموالهم ونصحوا له حتى كان يقول عليّ لاهل العراق انه يودان يصرف العشرة منهم بواحد من اهل الشام صرف الدراهم بالدينار وليس العجب من مثل العوام الشام انما العجب ممن له بصيرة ودين كبعض الصحابة المائلين اليه وبعض فضلاء التابعين فليت شعرى اىّ امر اشتبه عليهم في ذالك الامر حتى نصر والمبطلين وخذلوا المحقين وقد سمعوا الاحاديث المتواتره في - ريم عصيان الائمة مالم يرو اكفر ابواحا وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار انها تقتله الفئة الباغية ولولا عظيم قدر الصحبة ورفيع فضل خير القرون لقلت حب المال والشرف قد فتن سلف هذه الامة كما فتن خلفها اللهم اغفرا نتهى كلامه ـ

"ইমাম শাওকানী وبل الغمام গ্রন্থে লিখেন, সকল যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিসন্দেহে সত্যাবলম্বী ছিলেন। কেননা হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাদের সাথীগণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থনে বাইয়াত গ্রহণ করে পরবর্তীতে তা ভংগ করেন। ফলে তাঁদের সাথে সংঘর্ষে যাওয়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্যে ওয়াযিব ছিলো। খাওয়ারিজদের যে অবস্থা তাতে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই। বাকী রইলো সিফ্‌ফীনওয়ালাদের কথা। তাদের বিদ্রোহী হওয়ার বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে মর্মে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুধুমাত্র এ বাণিটিই উপরোক্ত দাবী প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। পরন্তু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু

www.pathagar.com

আনহুর বিরোধিতা করার কোনোই অধিকার ছিলো না। কিন্তু এমন লোকদের উপর নির্ভর করে তিনি নেতৃত্ব ও দুনিয়ার সন্ধানে অগ্রসর হলেন যারা ছিলো নাদান-অর্বাচীন এবং যারা ন্যায়-অন্যায়ের পরোয়া করতো না। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিসাস দাবীর আড়ালে তাদেরকে প্রতারিত করা হলো। এ কৌশল তাদের উপর কার্যকর হলো এবং তারা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্যে জান-মাল ও সবকিছু উৎসর্গ করে দিলো এবং তাঁর শুভাকাংখী হয়ে দাঁড়ালো। এমনকি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকবাসীদের একত্রিত করে বলতেন, দেরহাম-দিনার বিনিময়ের মতো তোমাদের ১০জনের পরিবর্তে সিরীয়দের একজন গ্রহণ করতে আমার মন চায়। সীরীয় জনগণের ব্যাপারে বিস্মিত নই, আশ্চর্যের কথা হলো সে দেশের দূরদর্শী ও দীনদার লোকদের আচরণে যেমন কোনো কোনো সাহাবী এবং তাবেঈন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। আমি বুঝতে পারি না হক ও ন্যায়ের পক্ষ ত্যাগ করে বাতিলের সাহায্যে তাদের কেউ উদ্বুদ্ধ করেছিলো এবং এ ব্যাপারে সন্দেহে আচ্ছন্ন হওয়ার মত এমন কি বাকী ছিলো। অথচ তারা আল্লাহর বাণী শুনেছিলো, যদি এক দল অপর দলের খেলাফ বিদ্রোহ করে তাহলে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হও যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। এ মুতাওয়াতের হাদীসটিও তারা শুনেছিলো যে, প্রকাশ্য কুফরীতে জড়িত না দেখা পর্যন্ত ক্ষতাসীন শাসকের অবাধ্যতা হারাম। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত হাদীসটিও তারা অবশ্যই শুনে থাকবে। যদি সাহাবী হওয়ার উচ্চ মর্যাদা অন্তরায় না হতো এবং খাইরুল কুরুনের (সর্বোত্তম যুগ) ফযীলত বুলন্দ না হতো তাহলে আমি বলতাম, ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার আকর্ষণ এ জাতির পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে পরবর্তীদের মতোই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। 'আয় আল্লাহ! তুমি ক্ষমা করো। ইমাম শাওকানীর (র) কথা এখানেই শেষ।"(اكليل الكرامه فى تبيان مقاصد الامامة) -[সিদ্দীক প্রেস, ভূপাল, পৃষ্ঠা-১২, ১২৯৪ হিজরী)

এবার আমি মুহাম্মদ আ'লা বিন আলী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির প্রখ্যাত গ্রন্থ (كشاف اصطلاحات الفنون)-এর একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করে আদালতে সাহাবীর আলোচনা শেষ করতে চাই। শরহে নুযবাহ জমিউয রুমুয্ বরযন্দী প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে সাহাবী শব্দের শিরোনামে নিম্নবর্ণিত সারমর্মে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

اعلم ان الصحابة كلهم عدول فى حق رواية الحديث وان كان بعضهم غير عدل فى امر اخر -

www.pathagar.com

"জেনে রাখো ! সাহাবীগণ হাদীস রেওয়ায়েতের ব্যাপারে সকলেই আদেল বা ন্যায়নিষ্ঠ যদিও অন্য ব্যাপারে তাঁরা গায়র আদেল হয়ে থাকেন।"–[كشاف اصطلاحت الفنون খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮০৯, কলকাতা সংস্করণ, ১০৬২ হিজরী)

স্মতর্ব্য যে, এটা একটি তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্বকোষ। আলমগীর আওরংগজেবের শাসনামলে ১১৫৮ হিজরী সনে গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছিলো। মুহাম্মদ তাকী সাহেবের গোটা আলোচনার শিকড় কেটে দেয়ার জন্যে এ একটি উক্তিই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

এক : মারওয়ান ও তার পিতার মর্যাদা

[‘খেলাফত ও রাজতন্ত্র’ বইয়ের উপর আল বালাগে যে ধারাবাহিক সমালোচনা শুরু হয় তার কতিপয় কিস্তি বাইয়্যেনাতেও (করাচী) উল্লেখ করা হয়েছিলো। এর আগে এবং পরেও এ সাময়িকীটি মাওলানা মওদূদী (র) এবং জামায়াতে ইসলামীর উপর প্রকাশ্যে প্রচ্ছন্ন সমালোচনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকে। আমি আমার আলোচনার এক জায়গায় দৈবাৎ মারওয়ানের কথা যে আন্দাজে উল্লেখ করেছি তাতেও বাইয়্যেনাত এর গায়ে দারুন আঘাত লাগে। যে কারণে তারা আমার বিরুদ্ধে অশালীন ও অশ্রাব্য ভাষার সুন্দর সদ্ব্যবহার করেন। এরি প্রেক্ষিতে আমি হাদীস ও পূর্ববর্তী মনীষীদের দৃষ্টিভংগির আলোকে মারওয়ান ও তার পিতা হাকামের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। সুতরাং আল বালাগের জবাবে স্বীয় আলোচনা ছেড়ে দিয়ে আমি ‘তরজুমানুল কুরআনে’, বাইয়্যেনাতের জবাব দেই। সে জবাবই এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হচ্ছে। শেষের দিকে কতিপয় জরুরী বিষয় সংযোজন করা হয়েছে।]-(গোলাম আলী)

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) রচিত ‘খেলাফত ও রাজতন্ত্র’ গ্রন্থের বিরুদ্ধে দেওবন্দী বুযর্গদের একটি বিশেষ মহল সারা দেশের রাস্তা-ঘাট, অলি-গলিতে ১ম কয়েক বছর পর্যন্ত ভর্ৎসনা, উত্তেজনা ও ঘৃণার ঝড় বহাতে থাকে। এক্ষণে আবার অপর একটি মহল ভিন্ন আংগিকে আবির্ভূত হয়ে নিজের ধারণামতো দলিল ও বানোয়াট কথাবার্তাসহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপনে দারুন তৎপর দেখা যায়। এ পর্যায়ে মাওলানা শফী সাহেবের ছেলে মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব ‘আল বালাগে’ যাকিছু লিখেছেন সেগুলো জ্ঞানগত মানের কথা আমি পরিষ্কারভাবে বলেছি। আমার সে বক্তব্য পাঠে জ্ঞানী ও সুধীবৃন্দ নিজেই মত কায়েম করতে সক্ষম হবেন যে, এ বিরোধিতার অন্তরালে ইলম ও দলিলের ওজন যে কতটুকু। এবার মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী (র) সাহেবের সাময়িকী ‘বাইয়্যেনাত’ এ খেলায় মেতে উঠেছে। সাময়িকীর রবিউস সানী (১৩৯১ হিজরী) সংখ্যায় মুহাম্মদ ইসহাক সান্দুলুভী, মাওলানা ওলী হাসান টুনকী এবং মাওলানা ইদ্রিস সাহেবের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সান্দুলভী সাহেবের আলোচনার উপর কিছু লেখার ইচ্ছা এ মুহূর্তে আমার নেই। তবে অপর দু হযরত যারা আমার অবস্থার উপর বিশেষ করুণা ও কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তাদের সম্পর্কে কিছু পেশ করার ইচ্ছা আমার মোটামুটি আছে।

www.pathagar.com

আসলে বিষয়টি দীর্ঘ করা আমার স্বভাব বিরোধী এবং সাধারণ লোকদের জন্যেও এটা একটি বিরক্তিকর আলোচনা। কিন্তু আমরা নিরূপায় যে, মওদূদী বিদ্বেষ কোনো কোনো বুযূর্গকে শান্তি স্বস্তির পরিবর্তে বেচইন-বেকারার করে তুলেছে। তাই তারা ক্রমাগতভাবে নিষ্প্রাণ ও ঠুনকো দলিলের ছত্রছায়ায় শুধুমাত্র মরহুম মাওলানা মওদূদীর জিদের বশবর্তী হয়ে বনী উমাইয়ার প্রতিটি ব্যক্তির ওকালতীতে চঞ্চল পরানে এমনি অনন্য ভূমিকায় নেমে পড়েন যা পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীনের কেউ করেছেন বলে ইতিহাস তথ্য বিলোয় না। খেলাফত ও রাজতন্ত্রের বিষয় সম্পর্কিত আমার এ পর্যন্তকার আলোচনার কোনো কোনো স্থানে প্রাসংগিকক্রমে মারওয়ানের উল্লেখ এসে যায়। 'বাইয়্যেনাত' (করাচী) এর উপরোক্ত সংখ্যায় মারওয়ান সম্পর্কিত সেসব কথার সবেগে পশ্চাদ্ধাবন করা হয় এর বিস্তারিত নিরীক্ষা তো আপাতত সম্ভব নয়। তবে সে পশ্চাৎ বিচরণের কোনো কোনো অংশে অন্তরালে ব্যাখ্যার এতোই চাহিদা পর্যালোচনার অংশ এমন পর্যায়ের যেগুলোর ব্যাখ্যাও হৃদয়ংগম করা জরুরী অনুভূত হয়।

মুসতাদরাকের হাদীস

মাওলানা মওদূদী (র) 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থের ১৭৪ পৃষ্ঠায় মারওয়ান সম্পর্কে আল বেদায়ার একটি রাওয়াতের উদ্বৃতি দেন। 'আল বালাগ' সম্পাদক সাহেব এ রাওয়ায়েতটিকে সংশয়পূর্ণ সাব্যস্ত করে এর একটি কারণ একথা বর্ণনা করেছেন যে, لعن الله الحكم وما ولد বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা সংশয়পূর্ণ মনে হচ্ছে। আমি এর জবাবে লিখেছিলাম, এ ধরনের একাধিক রাওয়ায়েত হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে বর্তমান আছে। যেমন ইমাম হাকিমের মুসতাদরাক গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪৮১ পৃষ্ঠায় হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাকাম ও তার ছেলেকে (মারওয়ান) অভিসম্পাত করেছেন। ইমাম যাহবীও এ রাওয়ায়েতটিকে সহীহ বলেছেন। মুহাম্মদ তাকী সাহেব এ সম্পর্কে লিখেছেন, "দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমি মুসতাদরাকের প্রতি মনোযোগ দিলাম এবং হাদীসটি সহীহ সনদসহ পেয়ে গেলাম।"[১]

এর উপর সমালোচনা করে মাওলানা মুফতী ওলী হাসান টুনকী সাহেব 'বাইয়্যেনাত'–এ যাকিছু বলেছেন তার সারমর্ম হলো, 'তালখাসে' যাহবীতে সহীহ দৃশ্যমান হওয়ার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, হাফেজ যাহবী (র) এটাকে

১. পরবর্তীতে তাকী সাহেব আবারও স্বীয় ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়িয়ে লিখলেন, তাঁর স্বীকার সঠিক ছিলো না বরং 'বাইয়্যেনাত'-এর কথাই ঠিক। প্রবন্ধের শেষে এর বিস্তারিত বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

www.pathagar.com

সহীহরূপে গ্রহণ করেছেন। হ্যাঁ, সহীহ বলার পরও যদি পুনরায় কিছু না বলা হয় তাহলে উদ্দেশ্য এটাই হবে যে, এর বিশুদ্ধতা গৃহীত হয়েছে। যে রাওয়ায়েতটি মাওলানা ওসমানী সাহেব উদার মনে গ্রহণ করেছেন তা সহীহ নয়। হাফেজ যাহবী (র) এর বিশুদ্ধতা সত্যায়ন করেননি এবং উসূলে হাদীসের মানদণ্ডেও এর উত্তরণ ঘটেনি। এ রাওয়ায়েতের কেন্দ্রবিন্দু হলো ইবনে রিশদীন যে নিজে এবং তার পরিবার সকলেই মিথ্যুক ছিলো। মারওয়ান এবং বনী উমাইয়া সম্পর্কিত অধিকাংশ রাওয়ায়েত ও কাহিনীর অবস্থা এই যে, এগুলো রাফেজীদের কারখানার উৎপাদিত ফসল এবং এটা একটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু। এবার টুনকী সাহেবের একেকটি কথার আলাদা এবং বিস্তারিত আলোচনা করা হলে সম্ভবতঃ কয়েকটি রচনা বা লেখার বিষয় হয়ে যাবে। এজন্যে আমি বক্ষমান নিবন্ধে প্রয়োজনীয় কথাগুলো পেশ করাই যথেষ্ট মনে করি।

প্রথম কথা হলো, ইমাম হাকিমের ঘোষিত সহীহ এর উপর ইমাম যাহবী যখন মতপার্থক্য প্রকাশ করেন কিংবা সহীহ লিখে মন্তব্য করার পর অতিরিক্ত কথা বলেন তাতে সবসময় একথা অনিবার্য হয় না যে, তিনি হাদীসটিকে মাওযু (জাল) বা মরদুদ (পরিত্যক্ত) সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, ইমাম যাহবী (র)-এর অনুমান এবং শব্দ প্রয়োগ সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও তিনি لا والله (না, আল্লাহর কসম) ইত্যাকার অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠিন শব্দ প্রয়োগ সহ সমালোচনা করেছেন। আবার কখনো তিনি নরম ও মোলায়েম শব্দ প্রয়োগ করতেন। বাস্তব ঘটনা হলো, ইমাম হাকিম যেসব হাদীস মুসতাদরাকে সংকলন করেছেন সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ও বেশীর ভাগ হাদীসই তার মতে বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ এবং সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত। অপরদিকে ইমাম যাহবী (র)-এর মতপার্থক্য বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সাধারণত এই হয়ে থাকে যে, অমুক হাদীস বুখারী-মুসলিম কিংবা তাদের কোনো একজনের শর্তানুযায়ী নয়। অথবা এর মধ্যে এমন কোনো প্রচ্ছন্ন ত্রুটি বর্তমান থাকে যার উপর ভিত্তি করে ইমাম বুখারী কিংবা ইমাম মুসলিম হাদীসটি গ্রহণ করেননি। এর অর্থ এটা নয় যে, মুসতাদরাকের কোনো হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী না হওয়ায় সেটা রাফেজী কারখানার উৎপাদিত ফসল হয়ে গেলো। এভাবে তো কেবল মুসতাদরাকেই নয় বরং সহীহ হাদীস গ্রন্থের অনেক হাদীস থেকেই হাত গুটিয়ে নিতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ মুসতাদরাকে গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় ২য় হাদীসের উপর ইমাম হাকিম লিখেন, এ হাদীসটি বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী উত্তীর্ণ। এতে কোনো ত্রুটি থাকার কথা আমার জানা নেই। কিন্তু বুখারী মুসলিম হাদীসটি গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে ইমাম যাহবী (র) বলছেন, হাদীসটিতে

www.pathagar.com

এমন একজন রাবী আছেন যা থেকে কেবলমাত্র ইমাম বুখারী রাওয়ায়েত করেছেন, ইমাম মুসলিম করেননি। এবার ইমাম যাহবী (র)-এর এ মন্তব্যের দরুন হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে (মালুল) ত্রুটিপূর্ণ এবং অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে কি? পরবর্তী ৩২ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস সম্পর্কে ইমাম যাহবী (র) বলছেন, হাদীসটির একজন রাবী আযীয (একক)। বুখারী ও মুসলিম তার রাওয়ায়েত গ্রহণ করেননি। এমনিভাবে ৫৩ পৃষ্ঠার একটি হাদীসের একজন রাবী সম্পর্কে বলেছেন, তিনি অধিক সন্দেহপ্রবণ ছিলেন। এসব হাদীস কি তাহলে মাওযু তথা বানোয়াট সাব্যস্ত হবে? মুফতি সাহেব যে হাদীস সম্পর্কে উসুলে হাদীসের মানদণ্ডে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ না হওয়ার ফতওয়া দিচ্ছেন সে হাদীসটির অবস্থা এই। ইমাম যাহবী (র) এ হাদীসের আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হেযায রিশদীনি নামের একজন রাবী সম্পর্কে শুধু এতোটুকু মন্তব্য করেছেন যে, ইবনে আদী তাকে জঈফ বলেছেন। এক্ষণে এটা তো এমন পর্যায়ের ত্রুটি যা থেকে সিহাহ সিত্তারও অসংখ্য রাবী ত্রুটি মুক্ত থাকা অসম্ভব। সিহাহ সিত্তা হাদীসের রাবীদের জীবনালেখ্য এবং হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চর্চাকারীর কেউ এ বিষয়ে অজ্ঞাত থাকতে পারে না। ইবনে আদী জঈফ হওয়ার যে মন্তব্য করেছেন তাতে ইবনে রিশদীনের রাফেজী হওয়া কিংবা মিথ্যুক হওয়া অনিবার্য নয়।

এটা সত্যিই অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, মরহুম মাওলানা মওদূদী কিংবা তার সমর্থনে লেখকের পক্ষ থেকে কোনো রাবীর বর্ণনার কথা উল্লেখ করতেই তার উপর আপত্তি শুরু হয়ে যায় এবং চট্ করে তিনি রাফেজী এবং মিথ্যুক বনে যান। আমি মুহাম্মদ তাকী সাহেবের লেখায় এ জাতীয় বহু উদাহরণ দেখেছি। উদাহরণ স্বরূপ, খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থে ইবনে জারীরের একটি রাওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এর একজন রাবী হচ্ছেন মুজালিদ বিন সাঈদ। তাঁর সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রের সুধীজনদের মন্তব্য কাট-ছাট করে ওসমানী সাহেব তার বইয়ের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"এ রাবী জঈফ হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের সকল ইমাম একমত যে, সে শিয়া, মিথ্যুক, অখ্যাত, পরিত্যাজ্য, --------- অথচ হাফেজ ইবনে হাজার এবং হাফেজ মুহাম্মদ বিন তাহের আল মাকদেসীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই মুজালিদ বিন সাঈদ থেকে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাযা এ চারজনই তার থেকে রাওয়ায়েত করেছেন। হানাফী ইমামগণ এ রাবীর রাওয়ায়েত তাদের গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইমাম আবু ইউসুফ (র) الرَّد على امير الاوزاعى (লুজনাতুল্দ এহইয়াউল মাআরিফ, নোমানীয়া, হায়দারাবাদ পৃষ্ঠা—৫) নামক গ্রন্থে তার থেকে রাওয়ায়েত

www.pathagar.com

গ্রহণ করেছেন। মাওলানা আবুল ওফা আফগানী[১] টীকায় এ রাবী সম্পর্কে বলছেন ঃ احد الاعيان। অর্থাৎ তিনি খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট রাবীদের অন্যতম ছিলেন। তার থেকে তদীয় পুত্র ইসমাঈল[২] সুফিয়ান সাওরী, সুনানে আরবার প্রণেতাগণ ইবনুল মুবারক এবং আরো অনেকে রাওয়ায়েত করেছেন। এবার একদিকে হাদীস ও ফিকাহের এ সকল ইমামদেরকে রাখুন, অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ সমস্ত ঠিকাদারদেরকে লক্ষ্য করুন যারা নির্দ্ধিধায় সকল রাবী সম্পর্কে লিখে দেয়, "এদের পিছনে তো বিদ্রূপের তালি পিটানো হতো। তার সান্নিধ্যে যে-ই উপস্থিত হয়েছে, সে বহু মিথ্যা হাদীস লিখে নিয়ে আসতো।" মনে হয় জ্ঞানের এ দাবীদারগণ নিজেদের ছাড়া আর সবাইকে অজ্ঞ মূর্খ মনে করে নিয়েছেন।

এখন ইবনে রিশদীন রাবীরও একই অবস্থা যে, আমি তার রাওয়ায়েত মাওলানা মওদূদীর সমর্থনে আনুষঙ্গিকভাবে পেশ করেছি। শুধুমাত্র এ কারণে তাকে পরিত্যক্ত গণ্য করা হচ্ছে। অথচ এ পরিত্যাগকারীগণ ভুলে যান যে, এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ বহু উক্তি যোগাড় ও বাছাই করে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর খেলাফও পেশ করা সম্ভব এবং পেশ করা হচ্ছে। তাই মুফতি সাহেবদের উচিত, প্রত্যেকটি কথা প্রথমেই পরখ করে নেয়া। তারিখে কবীর গ্রন্থে ইমাম বুখারী (র) ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বলেন ঃ

كان مرجئا سكتوا عن رأيه وعن حديثه -

"আবু হানীফা মরজিয়া ফের্কাভুক্ত ছিলেন। তার ফিকাহ্ ও হাদীস সম্পর্কে মৌনতা অবলম্বন করা হয়েছে।"

তারিখে সগীরে এর চেয়ে মারাত্মক মন্তব্য রয়েছে। সেগুলো আমি উল্লেখ করতে চাই না। মুসনাদে আহমদ, সিয়াহ্ সিত্তা এমনকি সুনানে দারেমীতে

১. মাওলানা আবুল ওফা আফগানী একজন উচ্চমানের হানাফী আলেম। তিনি আহনাফের কতিপয় মৌলিক গ্রন্থ তত্ত্ব ও অনুসন্ধানসহ মিসর, হায়দরাবাদ ও দাক্ষিণাত্য থেকে প্রকাশ করেন। এতোদ্দেশ্যে তিনি لجنه احياء المعارف النعمانيه নামের একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

তিনি নেযামীয়া মাদ্রাসার উস্তাদও ছিলেন। মুহাম্মদ তাকী সাহেব তাঁর সামনে পাঠশালার একজন শিশুও নয়। মুজালিদের ছেলে ইসমাঈল এবং মুজালিদের নিজের একটি মরফু রাওয়ায়েত মিযান ও অন্যান্য গ্রন্থরাজিতে বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতবাসীগণ আকাশের আলো ঝলমল তারকারাজি 'ইল্লিয়ীন' নামক স্থানে দেখতে পাবেন। আর এসব তারকারাজির মধ্যে থাকবেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ ধরনের রাবীদেরকে শিয়া নামে আখ্যায়িত করা সত্যিই বিস্ময়কর বৈকি!

২. এ ইসমাঈল থেকে ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং ইয়াহ্‌ইয়াহ বিন মুয়ীন ও আহমদ বিন সুলাইমানের মতো মুহাদ্দিসগণ তাঁর শিষ্য ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত রাওয়ায়েত তার থেকেই বর্ণিত হয়েছে। (كتاب الجمع بين رجال الصحيحين، امام بن طاهر المقدسي)

www.pathagar.com

আবু হানীফা (র)-এর কোনো হাদীস রাওয়ায়েত করা হয়নি। এ কারণে কি তাঁকে পরিত্যাজ্য ও অখ্যাত রূপে গণ্য করা হবে? রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে কোনো রাবীর ত্রুটি দেখে নেয়া আর কেবলমাত্র এর উপর ভিত্তি করে কোনো রাওয়ায়েত রদ করে দেয়া ইলমে হাদীসের উপরি দৃষ্টিপাতকারী ও হালকা চর্চাকারীদের কাজ। জারাহ ও তাদীল গ্রন্থসমূহে এমন রাবী পাওয়া বিরল যাদেরকে সবাই সমভাবে গ্রহণ করেছেন। অন্যথায় কোনো রাবী সম্পর্কে কেউ না কেউ ত্রুটির উল্লেখ অবশ্যই করেছেন। এতদসত্বেও হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এসব সমালোচিত রাবীদের হাদীসসমূহ কেবলমাত্র তাদের গ্রন্থরাজিতেই উল্লেখ করেননি বরং মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ স্বীয় নীতির সমর্থনে যেসব হাদীস দলিলরূপে পেশ করেছেন সেগুলোর অধিকাংশ রাবী কারো না কারো মতে ত্রুটিপূর্ণ (মাজরূহ)। এ নীতি মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত। যেমনঃ تدريب الراوى ইত্যাকার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, জারাহ ও তাদীলকারী ইমামদের যে কোনো একজনও যদি কোনো রাবীকে প্রত্যয়ন করেন তাহলে অন্যদের বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট ত্রুটি নির্দেশ সে রাবীর উপর প্রভাব বিস্তার করবে না। ইমাম নাসায়ীর প্রখ্যাত নীতি ছিলো এবং অন্যরাও এ নীতি গ্রহণ করেছেন যে, যে রাবীর পরিত্যাগের উপর মুহাদ্দিসগণ একমত নয় তিনি পরিত্যাজ্য ও ত্রুটিযুক্ত রাবীরূপে গণ্য হবেন না, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা হবে।

আমি মুসতাদরাক সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছি মুফতি ওলী হাসান সাহেব একই বিষয়ে মুসতাদরাকের অপর কতিপয় রাওয়ায়েতে ও সূত্রছিন্নতা (إنقطاع) এবং একজন রাবীর অজ্ঞাত পরিচয় হওয়া চিহ্নিত করেছেন। বুঝতে পারছি না যে, আমি নিজেই যেসব রাওয়ায়েত উল্লেখযোগ্য মনে করি না সেগুলো নিয়ে লেখার তার প্রয়োজন কি ছিলো। তদুপরি উল্লেখিত মুফতী সাহেবের কাছে একথা অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, কোনো রাওয়ায়েতের কোনো একটি সনদ নিয়ে আপত্তি উঠলে তাতে সে রাওয়ায়েতের মতন (মূল হাদীস) অশুদ্ধ কিংবা প্রক্ষিপ্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় না। সম্ভবত এ মতন কিংবা এর সমর্থনকারী অপর হাদীস ভিন্ন কোনো সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকবে। ইমাম ইবনে জাওযী এ ধরনের কতিপয় হাদীস (তন্মধ্যে সিয়াহ বরং বুখারী মুলিমের হাদীসও মাওজু বা প্রক্ষিপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন, কেবল এ কারণে যে, তার সামনে উপস্থিত সনদের রাবী মজরূহ ছিলো—একই অবস্থা এখানেও যে, অভিশপ্ত এ বিষয়টি একাধিক হাদীসে উল্লেখ আছে। সেগুলোর মধ্য থেকে আমি মুসনাদে আমহদের একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করছি। যেটি আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ইমামদের হাদীসসমূহ

মুসনাদে আহমদের রাওয়ায়েতটি হলো ঃ

حدثنا عبد الرزاق انا ابن عيينة عن اسماعيل بن ابى خالد عن الشعبى قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند الى الكعبة وهو يقول ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه

"আমার কাছে আবদুর রায্যাক তার নিকট ইবনে ওয়াইনিয়াহ্ তার নিকট ইসমাঈল এবং তার নিকট শাবী বর্ণনা করেছেন যে, কা'বা ঘরের সাথে ঠেস দিয়ে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমি বলতে শুনেছি—এ কা'বা ঘরের রবের কসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুক ব্যক্তি ও তার ঔরসজাত সন্তানকে অভিশপ্ত করেছেন।"

একথা সুস্পষ্ট যে, যখন ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি রাসূল কর্তৃক অভিশপ্ত লোকটি ও তদীয় ছেলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করে থাকবেন। অন্যথায় নবীর বাণী সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। কিন্তু হাদীস বর্ণনাকারীদের নিয়ম হলো, যখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম একই ভাবাপন্ন হাদীসসমূহে বারবার উল্লেখ হয় তখন তারা কখনো সে ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে শুধু 'অমুক' শব্দ বলে দেন। কেননা, বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই আলোচ্য ব্যক্তিটি কে সে সম্পর্কে অবহিত। এ হাদীসটিতেও যে পিতা পুত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে তারা হাকাম ও মারওয়ান ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। কেননা, হাদীসে এমন আর কোনো পিতা-পুত্রের কথা উল্লেখই নেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় যারা অভিশপ্ত হয়েছেন। এবার মাওলানা ওলী হাসান সাহেব যদি পসন্দ করেন তাহলে মুসনাদে আহমদের উল্লেখিত হাদীসটি এবং এর রাবীদেরও তিনি পরীক্ষা করতে পারেন। তবে এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সর্বসম্মতিক্রমে একজন হাদীস বিশারদ। তাঁর রচিত মুসনাদের যে রাওয়ায়েতেরই সমালোচনা করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিটির প্রতিকার করেছেন হাফেজ ইবনে হাজার এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ। সুতরাং রিজাল শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহের কতিপয় উক্তির উপর নির্ভর করে মন্তব্য ছুড়ে দিলেই উদ্দেশ্য সাধন হওয়ার আশা কম। এ ক্ষেত্রেও আপনাকে সংকীর্ণতা নয় বরং অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদারতাই দেখাতে হবে। যে বিষয়ে আপনি মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেবকে দোষারোপ করে থাকেন।

www.pathagar.com

সহীহ্ বুখারীর তাফসীর অধ্যায়ে সূরা আহ্কাফের ব্যাখ্যাপর্বে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটিতে উল্লেখ আছে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মারওয়ানকে যখন মদীনার গভর্নর বানালেন তখন সে ইয়াযীদের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণে লোকদেরকে বাধ্য করতে খুতবা দেয়। হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতিবাদ করলে মারওয়ান তাকে পাকড়াও করার নির্দেশ দেয়। আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে পালিয়ে আশ্রয় নেন। মারওয়ান সেখানে গিয়ে বললো, এ ব্যক্তি সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেছেন : وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا .... হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পর্দার অন্তরাল থেকে প্রতিবাদ করে বললেন : আমার পবিত্রতা ঘোষণা ছাড়া আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবার সম্পর্কে অন্য কিছুই নাযিল করেননি। বুখারীতে তো কেবল বর্ণিত হয়েছে। তবে সূরা আহ্কাফের এ জায়গার তাফসীরে এবং এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাস্সীর ও মুহাদ্দিসগণ লিখেছেন, মারওয়ানের এ মিথ্যা উক্তির জবাবে হযরত আবদুর রহমান এবং হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মারওয়ানকে একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অভিশপ্ত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তাফসীরে ইবনে কাসীরে এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে আবু হাতেমের উক্তির উল্লেখ আছে যে, মারওয়ানকে হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন :

الست ابن اللعين الذى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اباك ؟

"তুমি কি সেই অভিশপ্ত ব্যক্তির পুত্র নও যার উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আল-াইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ?"

অধিকন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর (র) ইমাম নাসায়ীর একটি হাদীসের উল্লেখ করে বলেছেন : হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মারওয়ানের আরোপিত অপবাদের জবাবে বলেছেন : মারওয়ান মিথ্যা বলছে। তিনি আরো বললেন :

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن ابا مروان ومروان فى صلبه فمروان فضض من لعنة الله ـ

"বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারওয়ানের পিতাকে এমন সময় অভিশাপ দেন যখন মারওয়ান তার ঔরসে ছিলো। ফলে সে আল্লাহর অভিশাপের অংশীদার হয়ে যায়।"

www.pathagar.com

বুখারীর উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী মোহাদ্দিস ইসমাঈলী থেকে আলোচ্য কথা সম্বলিত একটি রাওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ

لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن ابا مروان ومروان فى صلبه فمروان فضض اى قطعه من لعنة الله عزّ وجلّ

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় ফতহুল বারীতে মুহাদ্দিস আবুল ই'য়ালার রাওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন, যখন মারওয়ান এবং ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তর্ক করছিলো তখন মারওয়ান হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর মিথ্যা দোষারোপ করলে তিনি জবাবে বললেন ঃ

اَلَستُ ابن اللعين الذى لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلّم ـ

অতপর ইবনে হাজার (র)ও ইসমাঈলীর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিম্নবর্ণিত কথা উল্লেখ করেন ঃ

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن ابا مروان ومروان فى صلبه

ইমাম সুয়ূতী প্রণীত তারিখে খুলাফা একটি তথ্যসমৃদ্ধ বহুল প্রচলিত গ্রন্থ যা দীর্ঘ দিন যাবৎ দরসে নেযামীর পাঠ্যগ্রন্থ রূপে সমাদৃত। গ্রন্থটি মূলত ইমাম যাহবীর ইতিহাসের একটি সামগ্রিক সারসংক্ষেপ। এখানেও পরিশেষে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা ইমাম নাসায়ী এবং ইবনে আবু হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن ابا مروان ومروان فى صلبه فمروان فضض من لعنة الله ـ

এ সকল মুহাদ্দিস, মুফাস্সির এবং ইতিহাসবিদগণ মারওয়ানের উপর অভিশাপ সম্বলিত হাদীসসমূহ তাদের গ্রন্থাবলীতে নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন এবং বর্ণনাগত কিংবা মর্মগত কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। এ ধরনের অন্যান্য কতিপয় সলফে সালেহীনদের উক্তিসমূহ পেশ করা যেতে পারে। অতপর বাইয়্যেনাতের প্রবন্ধকারদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, এ সকল হকপন্থী ও বিজ্ঞ আলেমগণের সকলেই কি রাফেজী কিংবা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবেন যারা উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং তদীয় ভ্রাতা থেকে উল্লেখ করছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারওয়ান

www.pathagar.com

এবং তার পিতা হাকামকে অভিশাপ দিয়েছেন ? কিংবা (মাআযাল্লাহ) হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিছক মারওয়ানকে কলংকিত করার অভিপ্রায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভুল কথা সম্পৃক্ত করছেন ? সুন্নী নামে অভিহিত হতে এবং সাহাবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ও অর্থ আপনাদের নিকট কি এটাই যে, সর্বাবস্থায় মারওয়ানের প্রতিরোধে তার সপক্ষে ওকালতী করতে হবে। এভাবে গোটা পৃথিবীকে রাফেজী চিহ্নিত করতঃ মারওয়ানের বিপক্ষে কোনো সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও কেবল অন্যায় পক্ষপাতিত্ব সুবাদে সেগুলোকে অস্বীকারের মহড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ?

মাওলানা শিবলী (র)-এর মন্তব্য

মুফতী ওলী হাসান সাহেব বলেন, বনী উমাইয়া সম্পর্কিত অধিকাংশ রাওয়ায়েত ও ঘটনাপ্রবাহ রাফেজী কারখানার উৎপাদন। তবে আমি মুফতী সাহেবকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, মুসনাদে আহমদ এবং সিহাহ সিত্তা প্রণেতাগণের সাথে এ কারখানার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। হ্যাঁ, রাওয়ায়েতের অসংখ্যক ফ্যাক্টরী বনী উমাইয়া এবং বনী আব্বাসীয়দের ঘরে চালু ছিলো। এরি প্রেক্ষিতে মাওলানা শিবলী নোমানী (র) সিরাতুন নবীর ভূমিকায় বলেন ঃ

"ইতিহাস ও রাওয়ায়েত শাস্ত্র যেসব বাহ্যিক প্রভাবিত হয়ে থাকে তন্মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমেই সর্বাধিক কার্যকর ও দুষ্ট প্রভাব পড়ে থাকে। তবে মুসলমানগণ নিজেদের সর্বদা গৌরবান্বিত মনে করতে পারে যে, তাদের কলম তলোয়ারের আঘাতে কখনো নীরব হয়ে যায়নি। বনী উমাইয়ার শাসনামলে হাদীস সংগ্রহের সূচনা হয়। তারা সুদীর্ঘ ৯০ বছর[১] যাবত সিন্ধু থেকে এশিয়া মাইনর ও স্পেনসহ গোটা মুসলিম বিশ্বের মসজিদসমূহে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বংশধরদের প্রতি তিরস্কার ও অবমাননার ধারা চালু করে এবং জুমআর দিনে মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি গালমন্দ ও তিরস্কারের প্রচলন ঘটায়। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখদের প্রশংসায় অজস্র হাদীস রচনা করায়। আব্বাসীয় শাসনামলে একেকজন খলীফার নামে ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদীসসমূহ প্রবেশ করে। কিন্তু পরিণতি কি হলো ?

১. ৯০ বছরের হিসাব এরূপে যে, ৪১ হিজরী সনে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নিযুক্ত হন। ১৩২ হিজরী সনে উমাইয়া খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ আব্বাসীয় খেলাফতের সূচনা করেন। এ দীর্ঘ সময়ে (হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয এবং ইয়াযীদ বিন ওয়ালীদের শাসনকাল ছাড়া) তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও বনী ফাতেমাকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভর্ৎসনা করতে থাকে।

www.pathagar.com

ঠিক সে সময়েই মুহাদ্দিসগণ স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন যে, এ সমুদয় রাওয়ায়েত মিথ্যা-বানোয়াট। আজকে হাদীস শাস্ত্র এসব আবর্জনা থেকে পূত-পবিত্র এবং বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাস যারা জিললুল্লাহ্ ও পয়গাম্বরদের প্রতিনিধি ছিলেন তারা যে মানের ও স্থানের হওয়া উচিত ছিলো সে মানেই তাদের দেখা যায়।"-[সিরাতুন নবী ; ১ম খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, আযমগড়, ১৯৬৫ ইং পৃষ্ঠা-৬৬]

যা হোক, আল্লাহ তাআলা মুহাদ্দিসগণের কবর নূরের জ্যোতিতে ভরপুর করে দিন। তাঁরা কেবলমাত্র রাফেজী, নাসেবী এবং বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসীয়দের কারখানায় ঢালাই করা হাদীস নামের সর্বনাশা উৎপাদনে নস্যাতই করেননি বরং তাঁরা বনী উমাইয়ার অবাঞ্ছিত কাজে লিপ্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত সহীহ হাদীসগুলোও প্রকাশ্যে বর্ণনা করেছেন। তদ্রূপ বনী উমাইয়ার শাসনামলেই নিজেদের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলে বাইতের ফযীলত ও মর্যাদা সম্বলিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী প্রচার ও প্রসার করেন। যারা জনগণের অন্তর বিষাক্ত করার অভিপ্রায়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারস্থ লোকদের অভিসম্পাত করতো।

মোটকথা, মাওলানা মুফতী ওলী হাসান সাহেবের জবাবে উপরোল্লেখিত বক্তব্য যথেষ্ট মনে করে এবার আমি 'বাইয়্যেনাতের' সম্পাদক মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস সাহেবের লিখিত বক্তব্যের জবাবে কিছু কথা পেশ করবো। সর্বপ্রথম তার মারওয়ান সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বক্তব্য আমি তুলে ধরছি। তিনি বলেছেন, মালিক সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী যদি মারওয়ান ও তাঁর গোটা বংশ রাসূলের ভাষায় অভিশপ্ত হয়ে থাকে তাহলে (মাআযাল্লাহ) তার ঔরসজাত সন্তান আবদুল আযীযের কাছে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশোদ্ভূত তাঁর দৌহিত্রীর সাথে বিবাহ দেয়া হয় যাঁর ঔরসে ওমর বিন আবদুল আযীয বিন মারওয়ান বিন হাকাম জন্মলাভ করেন এবং তিনি সম্ভবত মাওলানা মওদূদী (র)-এর স্বীকৃত খলীফায়ে রাশেদ হয়ে থাকবেন। তাহলে কি ফারুকী পরিবারস্থ লোকদের কাছে এ সাধারণ অভিশাপটি অজ্ঞাত থেকে গিয়েছিলো?

ভিত্তিহীন অপবাদ

উপরোক্ত হযরত মাওলানা তরজুমানুল কুরআনের '৭১ সনের মে মাসের সংখ্যার উদ্ধৃতি দিয়ে আমার লেখার উপর এ অভিযোগ ও সন্দেহ আরোপ করেছেন। অথচ সে মাসের তরজুমানের কোথাও আমি একথা লিখিনি যে, মারওয়ানের পিতা এবং তার গোটা বংশ নবীর ভাষায় অভিশপ্ত ছিলো। আমি

www.pathagar.com

মে সংখ্যার এক জায়গায় নবীর ভাষায় শুধুমাত্র মাওয়ানের অভিশপ্ত হওয়ার কথা লিখেছি (পৃষ্ঠা-১৯) এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায়ও শুধুমাত্র মারওয়ানের অভিশপ্ত হওয়ার কথা লিখেছি। তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায়ও এক জায়গায় মারওয়ান এবং অপর জায়গায় মারওয়ানের 'মানস পুত্র' বাক্য আমার কলম থেকে বের হয়। এখানে মারওয়ানী শব্দ দিয়ে আমি সেসব লোকদের প্রতি ইংগীত করেছি যারা কাজে-কর্মে ও কথা-বার্তায় মারওয়ান ও তার পিতার সাথে সাজুস্যময়। এর দ্বারা গোটা বংশ বুঝানো আদৌ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার ব্যবহৃত 'মানস পুত্র' শব্দটি এ দাবীর সমর্থনে দলিল-প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। তরজুমানের মে' মাসের এ সংখ্যা ছাড়া যতোটুকু আমার মনে পড়ে এবং যতোটুকু আমি এ বিষয়ে চর্চা করেছি, তাতে আমি কখনো কোথাও একথা লিখিনি যে, মারওয়ান কিংবা তার বাপের গোটা বংশই নবীর ভাষায় অভিশপ্ত ছিলো। এতদসত্ত্বেও আমি মাওলানা ইদরীস সাহেব এবং সমগ্র পাঠকবর্গের সামনে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করছি যে, যদি আমি কোথাও এ ধরনের কথা বলে থাকি অথবা আমার কোনো কথার মর্মার্থ এরূপ গ্রহণ করা হয় যে, (আল্লাহ্ না করুক) আমি মারওয়ানের অধঃস্থন গোটা বংশকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ কিংবা তাঁর রাসূলের অভিশাপের উপযুক্ত মনে করি—তাহলে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করছি। আমি আল্লাহর দরবারে সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এরূপ বাতিল ধারণা থেকে যে, ২য় ওমর পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র)-কে উল্লেখিত হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী (মাআযাল্লাহ) অভিশপ্ত মনে করি। আমি তরজুমানুল কুরআনের ৭০ জিলদের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় খেলাফত ও রাজতন্ত্রের উপর আলোচনা করতে গিয়ে হযরত নু'মান বিন বশিরের একটি হাদীস উল্লেখ করেছি। হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তক্ষয়ী রাজতন্ত্র ও স্বৈরশাসনের পর ২য়বার নবুওয়াতের অনুকরণে খেলাফত প্রতিষ্ঠার শুভ সংবাদ দিয়েছেন। আমি একথাও লিখেছি যে, হাদীসটির হাবীব বিন সালেম নামের একজন রাবী ওমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি শুভেচ্ছা ও স্মরণিকার নিদর্শনরূপে এ হাদীসটি লিখে ওমর বিন আবদুল আযীযের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং সাথে লিখে দেন, "আমার বাসনা আপনি আমীরুল মু'মিনীনই নবুওয়াতের অনুকরণে খেলাফত নতুন করে পুনর্জীবিত করবেন।" হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাতে খুবই খুশী হন। আমার লেখার ধারাবাহিকতায় আমি একথাও স্পষ্ট করেছি যে, হযরত ২য় ওমর (র) মারওয়ান ও বনী উমাইয়া কর্তৃক প্রবর্তিত কতিপয় বিদআত ও অপকর্মের অবসান ঘটান। যেমন, ফিদক নামের বাগানটি মারওয়ান নিজের ব্যক্তিগত জায়গীর বানিয়ে নেয় এবং এর ওয়ারেশী সূত্র হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত পৌছায়।

www.pathagar.com

কিন্তু হযরত ২য় ওমর (র) এটাকে ২য়বার সরকারী মালীকানায় শামিল করে নেন। মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভর্ৎসনা করার ঘৃণ্য বিদআতের তিনিই অবসান ঘটান। তারপরও আমার উপর হাকাম ও মারওয়ানের সাথে হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযকেও (র) (মায়াজাল্লাহ্) আমার অভিশপ্ত মনে করার অপবাদ আরোপ করা কিভাবে সংগত হতে পারে?

আসলে, হাদীসসমূহে হাকামের সাথে ولد যে শব্দের সংযোজন হয়েছে তাদ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, হাকাম সূত্রে মারওয়ান কিংবা পরবর্তীতে হাকাম ও মারওয়ানের সেসব সন্তানাদি যারা নিজেদের নৈতিকতা ও আচার-আচরণে সে পিতা-পুত্রের সাথে একেবারে একাককার হয়ে গেছে। এতে হাকাম কিংবা মারওয়ান বংশের সকল উত্তরসুরি শামিল নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেসব কাজের দরুন হাকাম অভিশাপের যোগ্য হয় এবং যে কারণে মারওয়ানসহ তাকে মদীনা থেকে নির্বাসিত করা হয়, সে সমস্ত নবীর শাসনামলের পর তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। বস্তুত মারওয়ান তার ঘৃণ্য তৎপরতার দরুনই এ অভিশাপের আওতায় এসে যায়। আর নবী আলাইহিস সালাম এগুলো সম্পর্কে ওহীর মারফতই অবহিত করে যান। স্মর্তব্য যে, মারওয়ান ও তার পিতা যখন তাদের নিজস্ব আচরণের দরুন অভিশাপের পাত্র চিহ্নিত হলো তখন মারওয়ান ও হাকামের গোটা বংশ কেমন করে অভিশপ্ত সাব্যস্ত হতে পারে। হাকামের ২০জন পুত্রের অন্যতম ছিলো মারওয়ান। আবার মারওয়ানের পুত্র সংখ্যা ছিলো ১২জন তাদের সকলেই নৈতিকতা ও আচার-আচরণে পিতার মতো ছিলো না। কাজেই তাদের সকলের উপর রাসূলের অভিশাপ বর্তানোর কোনোই কারণ নেই। আবদুর রহমান বিন হাকাম নামেও হাকামের এক পুত্র ছিলো, সে ছিলো মারওয়ানের ভাই। আল্লামা ইবনে আবদুল বার ইস্তেয়াবে তার সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

كان لا يرى رأى مروان

"তার দৃষ্টিভংগী ও চিন্তা-চেতনা মারওয়ান থেকে ভিন্নতর ছিলো।"

এবার আবদুর রহমান বিন হাকামকেও আমার অভিশপ্ত মনে করার কি কারণ থাকতে পারে। আমার ও আমার পেশকৃত হাদীসসমূহের খেলাফ 'বাইয়্যেনাত' এর অভিযোগ এমনি ধরনের বনী উমাইয়ার কতিপয় দরদী যেরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে সকল বাণীর বিরোধিতা করে যেগুলো বনী উমাইয়া ও বনী মারওয়ানের তিরস্কারে অন্যান্য হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। এ প্রসংগে তারা যুক্তি দেয়, অন্যথায় এ হাদীস হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর উপর আঘাত হানে।

www.pathagar.com

অথচ এসব হাদীসের কতগুলোর সনদ সম্পূর্ণ সহীহ। মুহাদ্দিস ও ব্যাখ্যাকারগণ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র)-কে এ থেকে ব্যতিক্রম ও বহির্ভূত সাব্যস্ত করেছেন। যা হোক, স্বীয় অপকর্মের ভিত্তিতে যার উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অভিশাপ দিয়েছেন তাকে নবীর ভাষায় অভিশপ্ত মনে করতে কিংবা বলতে আমার কোনোই দ্বিধা নেই। কারো কাছে এটা অসহনীয় হলে হতে পারে, তাতে করার কিছু নেই।

মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস সাহেব একথায় আমার উপর ক্ষিপ্ত যে, আমি বেচারা মারওয়ানকে দারুণ একচোট শুনিয়েছি, তিরস্কার করেছি এবং আমার লেখা স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে, এটা কোনো সুন্নী কলমের বক্তব্য নহে, বরং কোনো কট্টর রাফেজীর সৃষ্ট। তিনি আরো লিখেছেন, মওদূদী প্রীতির ওকালাতির মৌলিক অধিকার থেকে তাকে কে বাধা দিতে পারে ; তবুও তার ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে, মারওয়ানকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস কম বয়সী সাহাবীদের মধ্যে গণনা করতেন। তার সূত্রে বর্ণনাকারীদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের তাবেঈগণ ছাড়াও মহাসম্মানী সাহাবী হযরত সহল বিন সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও শামিল ছিলেন। ইমাম বুখারী মারওয়ানের হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক (র) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে মারওয়ানের ফতওয়া ও ফায়সালাকে দলিলরূপে উল্লেখ করেছেন। মারওয়ান যদি এতোই নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোক হতো যেমনটা মুহতারাম মালেক সাহেব রাফেজীদের কল্পকাহিনীর ছত্রছায়ায় বিশ্বাস করাতে চান তাহলে তিনি বলুন, এমতাবস্থায় তার প্রদত্ত সম্ভাষণসমূহের পাত্র কি কেবলমাত্র মারওয়ানই সাব্যস্ত হবে আর সাহাবী ও তাবেয়ী প্রমুখাৎ কি আওতায় এসে পড়ে না ?

মারওয়ান সূত্রে ইমাম মালেক ও বুখারী (র)-এর বর্ণনা

জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস সাহেব তার কলম দিয়ে যে মণিমুক্তা এখানে (এবং পরবর্তীতে) ছড়িয়েছেন তার উপর বিশদভাবে কিছু বলা তো সম্ভবত বেআদবী। তবে আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, মারওয়ানকে যখন অধিকাংশ মুহাদ্দিস কম বয়স্ক সাহাবীরূপে গণ্য করেছেন এবং ইমাম বুখারী (র) তার থেকে রাওয়ায়েত গ্রহণ করার কারণে যখন মারওয়ানের ফযীলত ও মর্তবা আরো বেড়ে গেলো, তখন আপনি বেচারা মারওয়ান এবং এহেন নিকৃষ্ট ব্যক্তি ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ দ্বারা মহামান্য সাহাবীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হলো না কি ? এ ধরনের বাক্যতো কোনো সুন্নী লেখকের কলম থেকে নির্গত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আপনার কলমের ভাষা তো রাফেজীদের কল্পকাহিনী দ্বারা

www.pathagar.com

প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। অন্যান্য সুন্নীদের ন্যায় মারওয়ানের উল্লেখ আসা মাত্র আপনারও হযরত মারওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলা উচিত ছিলো। আপনার মতো একজন সম্মানী লোকের পক্ষে কিছু ভিতরে কিছু বাইরে ধরনের হাফ নীতি গ্রহণ করা আদৌ শোভনীয় হয়নি। মারওয়ানের সাহাবী হওয়া না হওয়ার প্রসংগটি ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী কোনো এক পর্যায়ে আমার স্ববিস্তারে লিখার ইচ্ছা রইলো। অবশ্য হাদীস রাওয়াতের ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা এবং সঠিক ভূমিকা সেটাই যা আমি ইতিপূর্বে আদালতে সাহাবী ও আদালতে রূয়াত প্রসংগে আলোচনা করেছি। হাদীস রাওয়াতের ব্যাপারে যে রাবীই সত্যভাষী বলে প্রমাণিত হয়েছেন তিনি বিদআতী কিংবা কবীরা গুনাহগার হলেও তার রাওয়ায়েত বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় এবং করা হয়েছে। তাতে মারওয়ানের সাহাবী হওয়া কিংবা সম্মান বৃদ্ধি পাওয়ার দলিল প্রতিষ্ঠা হয় না। ইমাম বুখারী (র) মারওয়ানের রাওয়ায়েত সাধারণত মিসওয়ার বিন মুখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে একত্রিত ও জড়িত করে বর্ণনা করেছেন। এ সত্ত্বেও তার সূত্রে একক কোনো রেওয়ায়েত বর্ণিত হলে সেটাও গ্রহণযোগ্য। কেননা, হযরত ওরওয়াহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্র অনুযায়ী ইমাম বুখারী (র)-এর মতে মারওয়ান হাদীস শাস্ত্রে অভিযুক্ত ছিলো না। হাফেজ ইবনে হজর (র) هدى السارى -এর নবম অধ্যায়ে অভিযুক্ত রাবীদের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মারওয়ান শিরোনামে তার সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

وفانما حمل عنه سهل بن سعد وعروه على بن الحسين وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث وهؤلاء اخرج البخارى احاديثهم عنه فى صحيحه لما كان اميرًا عندهم بالمدينة قبل ان يبد ومنه فى الخلاف على بن الزبير ما بدا

"মারওয়ান থেকে হযরত সহল বিন সাঁআদ, ওরওয়াহ, আলী বিন হুসাইন, আবু বকর বিন আবদুর রহমান প্রমুখ রাবীগণ যে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে যেসব বর্ণনা করেছেন এটা সে সময়ের কথা যখন সে এ সকল সাহাবীদের উপস্থিতিতে মদীনার গভর্নর ছিলেন এবং তার ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতার কথা প্রকাশিত হয়নি।"

ইবনে হজর (র)-এর এ বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত রাবীগণ মারওয়ান থেকে ততোক্ষণ পর্যন্ত হাদীস গ্রহণ করেন ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় যতোক্ষণ সে অস্ত্রধারণ করেনি এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। মারওয়ানের সে সময়ের রাওয়ায়েতগুলো ইমাম

www.pathagar.com

বুখারী (র) তার সহীহ্ গ্রন্থে গ্রহণ করেন। তবে আমার ধারণায় এ স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য তেমন বেশী সাহায্যকারী নয়। কারণ, মারওয়ানের কর্মতৎপরতা প্রথমেও কিছুমাত্র কম ছিলো না। মারওয়ানের এসব বাড়াবাড়ি সত্বেও হাদীস বর্ণনায় যখন তার মধ্যে মিথ্যা বলার প্রমাণ মিলে না তখন তার রাওয়ায়েত বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হয় এবং গ্রহণ করা উচিত। তবে এতে তার দোষ-ত্রুটি মুছে যাওয়া প্রমাণ করে না। বাকী রইলো ইমাম মালেক (র) কর্তৃক মারওয়ানের ফতওয়া ও ফায়সালা দলিল রূপে পেশ করার কথা। এর মূলতত্ত্ব হলো, এ ফায়সালা প্রকৃতপক্ষে নবীর শহরে অবস্থানকারী সম্মানিত সাহাবীদের সম্মিলিত কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল ছিলো। কেননা, মদীনায় অবস্থান করে এর বিরোধিতা করা সহজ ছিলো না। এতদসত্ত্বেও কতিপয় বিদআত ও শরীয়াত বিরোধী কাজ চালু করার জন্যে মারওয়ান চেষ্টা করে যার সত্যায়ন ইমাম মালেক (র) কিংবা অপর কোনো মুহাদ্দিস ও ফকীহ করেনি অথবা বাইয়েনাতের সম্পাদক কিংবা অপর কোনো ব্যক্তি বর্তমানেও সেসব কাজ বাস্তবায়িত করার সাহস দেখাতে সক্ষম হবে না। উদাহরণ স্বরূপ দুই ঈদে নামাযের পূর্বে খুতবা প্রদান করা এবং সেজন্য মিম্বারের ব্যবস্থা করা। এ ধরনের মারওয়ানী ফায়সালাসমূহ তার সময় থেকে আজ অবধি গোটা মুসলিম জাতির হুজ্জত বা দলিল হিসেবে মেনে কে নিয়েছেন ? ইমাম মালেক (র) তার মুয়াত্তায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের কথা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা নামাযের পরই ঈদের খুতবা দিতেন। কিন্তু মারওয়ানের সুন্নাতের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র) তাঁর প্রণীত গ্রন্থ মুসাব্বাতে ইমাম মালেক (র)-এর প্রায় ৬০জন সম্মানিত ওস্তাদের কথা নামে নামে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারওয়ানের নাম কোথাও আমার নজরে পড়েনি। বরং ইমাম ইবনে হাযম তো এতোটুকু লিখেছেন, আহলে মদীনা বা মদীনাবাসীদের আমল মালেকী মতানুসারে হুজ্জতরূপে পেশ করা অর্থহীন। কেননা, সেখানে মারওয়ানের শাসনামলে সুন্নাত পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিলো।[১]

সহীহ্ বুখারীর দু' ঈদের অধ্যায় 'বাবুল খুরুজ ইলাল মুসাল্লা বিগায়রে মিম্বার' তথা মিম্বার ছাড়া ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পরিচ্ছেদে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে স্ববিস্তারে লেখা আছে। মারওয়ান যে মিম্বারটি বিশেষভাবে ঈদের নামাযের জন্যে তৈরী করিয়েছিলো সেটার উপর যখন সে সালাতে ঈদের আগেই উঠতে শুরু করে তখন হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার জামা ধরে টেনে নেন ; কিন্তু মারওয়ান জামা ছাড়িয়ে মিম্বারে গিয়ে আসীন হয়। তারপর হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ

১. ইবনে হযম প্রণীত আল আহকাম পৃষ্ঠা–৮৫৪ আসেমা প্রেস, কায়রো।

www.pathagar.com

فقلت له غيرتم والله فقال ابا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم -

"আমি মারওয়ানকে বললাম, আল্লাহর কসম ! তুমি (শরয়ী বিধানে) পরিবর্তন এনেছো। তখন মারওয়ান বললো, আবু সাঈদ ! তুমি যা জানো তার যুগ পার হয়ে গেছে। আমি জবাবে বললাম, আল্লাহর কসম ! আমার জানা বিষয় আমার অজানা বিষয় অপেক্ষা উত্তম।"

এখন সকলেই দেখতে পারে যে, মারওয়ান নামাযের পূর্বে ঈদের খুতবা দিয়ে শরয়ী বিধানের যে পরিবর্তন করে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতিবাদ করেছেন। মারওয়ান সুন্নাতের এরূপ পরিবর্তনের দরুন লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে বলছে, আবু সাঈদ ! তুমি যে বিদ্যার প্রদর্শনী করছো এগুলো অতীত কাহিনী, কিংবদন্তীর গল্প। 'চোরের মায়ের বড় গলা।' এ প্রবাদ বাক্যের সঠিক উদাহরণ এর চেয়ে আর কি হতে পারে ? যদি কোনো সুধী আমার থেকে এ আশা পোষণ করেন যে, রাফেজী হওয়ার অপবাদ এবং সাহাবীদের অবমাননার অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্যে সুন্নাত পরিত্যাগ এবং শরীয়াত বিরোধিতার ভূমিকা নিতে আমি কুণ্ঠিত হবো না, তাহলে তাকে নিরাশই হতে হবে। সাহাবীদের সম্মান করার এটা কোন্ ধরনের পদ্ধতি যে, কারো সামনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত পেশ করার পর জবাবে সে বলে, এগুলো বর্তমানে অচল, অতীতের কাহিনী—তাহলে তাকে আমার সম্মান দেখাতে হবে। তাই এ প্রকৃতির লোকের খেলাফ মুখ খোলা যদি জায়েয না হয়, তাহলে ফজলুর রহমান ও পারভেজ সাহেবদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার কি কারণ থাকতে পারে ?

দেওবন্দী আলেমদের নীতি

মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস সাহেব আবারো বলছেন, আমাদের বুযুর্গদের নীতির সাথে আমাদের যতোটুকু সম্পর্ক তাহলো, মারওয়ানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা আমরা যথার্থ মনে করি না। যে ব্যক্তিত্বের গুণকীর্তিন ও দোষ-ত্রুটি উভয়ই ইতিহাসের রেকর্ড বর্তমান আছে তার প্রশংসা করতে আপনার মন-মানসিকতা সায় না দিলে না করুন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিসম্পাতের ভাষাও বন্ধ রাখুন। উপরন্তু তার সমসাময়িক উত্তেজনাকর অবস্থার কথাও মনে রাখা দরকার, বিস্তৃত হওয়া সঙ্গত হবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরশাদ যে, মৃত ব্যক্তিদের ভালো মন্দের চর্চা করো না, তারা যা করেছে তা পেয়ে গেছে। তার জবাবে আমার নিবেদন হলো—মারওয়ান কিংবা অপর কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করায় আমার বিশেষ

www.pathagar.com

কোনো অনুরাগ নেই। কিন্তু কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিসম্পাতের কথা উল্লেখ থাকলে সে কথা বলার অধিকারও কি আমার থাকতে নেই? নিসন্দেহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃতদের এমনকি জীবিতদেরও অহেতুক ভালো-মন্দ চর্চা করতে নিষেধ করেছেন। অন্যদিকে, কুরআন-হাদীসেই এমন সব ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ বর্তমান আছে যেখানে কোনো কোনো লোকের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিসম্পাতের কথা বর্ণিত রয়েছে। অধিকন্তু জনাব মাওলানা সগোত্রীয় যে ওলামাদের নীতির প্রতিনিধিত্ব করছেন সে তালিকায় কে কে শামিল এবং তাদের বাড়াবাড়ি মুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ সে নীতিকথা কোথায় বিবৃত হয়েছে সেটা এক অজ্ঞাত বিষয়। শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র) নিশ্চয়ই তার আকাবেরগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তিনি রাফেজী ও শিয়াদের খণ্ডনে 'তোহফায়ে ইসনা আশারা' নামে এক বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন। তার উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ফতওয়ায়ে আযীযীয়াতে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আহলে সুন্নাতদের কাছে মারওয়ানকে মন্দ বলার কি দলিল আছে?

জবাব ঃ "আহলে বাইতকে মহব্বত করা সুন্নাতের আনুষঙ্গিক বিষয় নহে; বরং মূল ঈমানী ফরযের অন্তর্ভুক্ত। অভিশপ্ত মারওয়ানকে অপরিহার্যভাবে মন্দ বলা এবং আন্তরিকভাবে তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা আহলে বাইতকে মহব্বত করার অন্যতম দাবী। কেননা সে বিশেষত হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলে বাইতের সাথে ঘৃণিত ও অসাদাচরণ করেছে এবং এই সকল মহান ব্যক্তিবর্গের সাথে ঘোর শত্রুতা পোষণ করতো এ ধারণা মনে স্থান দিয়ে এ পাপিষ্ঠের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট থাকা উচিত।"-[ফতওয়ায়ে আযীযীয়া পৃষ্ঠা-২২৫, সায়ীদ কোং কর্তৃক প্রকাশিত, আদব মনযিল করাচী, ১৩৮৭ হিজরী]

দেওবন্দ ওস্তাদগণের প্রবীন ও শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী সাহেব বুখারীর ফিতান পরিচ্ছেদের هلكة امتى على يدى علمة من قريش এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

قدوردت احاديث فى لعن الحكم والدمروان وما ولد اخرجهما الطبرانى وغيره-

"হাকাম ও তার ছেলে মারওয়ানের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করা বৈধ মর্মে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। তিবরানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এগুলো বর্ণনা করেছেন।"

www.pathagar.com

অতপর দেওবন্দের শিরোমণি শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) সাহেবের নিম্নোক্ত মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন যা তিনি সুনানে তিরমিযির সালাতে ঈদাইনের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

يقال ان اول من خطب قبل الصلوة في العيدين مروان بن الحكم كان مروان بن الحكم ظالما فحاشا مستبرا عن سنة عليه السلام وكان يسب الناس في المجامع مثل الجمعة والاعياد والناس كانوا لاينتظرون بعد الصلوة الى الخطبة لسبه في اثناء والخطبة فقدم الخطبة على الصلوة لئلا ينشر الناس وكانوا ينتظرون للصلوة لامحالة ـ

"বলা হয়ে থাকে, দুই ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা দেয়ার অভিনব প্রথা যে চালু করে সে হলো মারওয়ান বিন হাকাম। মারওয়ান ছিলো চরম নির্লজ্জ ও অত্যাচারী যালেম। রাসূলের সুন্নাত অবজ্ঞা করার ধৃষ্ঠতা দেখাতো এবং তা থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিতো। জুমআ এবং ঈদের লোক সমাবেশে সে নির্লজ্জভাবে গালাগালি করতো। এরূপ ভর্ৎসনা করার কারণে তার খুতবার অপেক্ষা না করে লোকেরা ঈদের নামায পড়েই চলে যেতো। এ কারণে সে নামাযের আগেই ঈদের খুতবার কাজ সেরে নিতো যাতে লোকগণ বিচ্ছিন্ন হতে না পারে। কেননা নামাযের জন্যে তাদের অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে।"-[তাকবীরে তিরমিযি, রহিমিয়া লাইব্রেরী, দেওবন্দ, পৃষ্ঠা-১৯, ১৩৭১ হিজরী]

মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (র)-এর 'ইফাদাতে তিরমিযি' যা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া কান্দুলুভী সাহেব الكواكب الدرّى শিরোনামে একত্রিত করে প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

اول من خطب قبل الصلوة مروان بنية فاسدة، فكان يعرض في خطبته باهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسئ الادب بهم فلما رأى الناس ذالك وان ليس لهم سبر على استماع اذاهم رضى الله عنهم جعلوا يذهبون اذا فرغوا من الصلوة فقدم مروان الخطبة ليلجئهم الى سماعها فكان فعله ذالك خبثا ظاهرًا فانكروا عليه ـ

"মারওয়ান সর্বপ্রথম অসৎ উদ্দেশ্যে নামাযের আগে ঈদের খুতবা নিয়ে আসে। সে তার খুতবায় আহলে বাইতকে ভর্ৎসনা করতো এবং তাদের সাথে চরম বেআদবী করতো। লোকেরা যখন এসব দেখলো এবং আহলে

www.pathagar.com

বাইতকে কষ্ট দেয়া তাদের জন্যে অসহনীয় হয়ে উঠলো তখন তারা নামায পড়েই চলে যেতো। মারওয়ান এ অবস্থা দেখে নামাযের আগেই খুতবা দেয়ার নীতি চালু করে এবং তার খুতবা শুনতে লোকদের বাধ্য করে। তার এ কাজ ছিলো মূলতঃ পংকিলতার প্রদর্শনী। লোকেরা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে।"

একথা বুখারীর দু' ঈদের নামায সংক্রান্ত সে হাদীসেও উল্লেখ আছে যার কিছু অংশ আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। হাদীসটিতে আছে, মারওয়ান নিজেই হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছে, লোকেরা ঈদের নামাযের পর আমাদের জন্যে বসেই না ; এ কারণে খুতবা আগে নিয়ে আসতে হয়।[১] এবার যারা মারওয়ানকে কম বয়েসী সাহাবী গণ্য করে এবং তার গুণ-কীর্তনে পঞ্চমুখ আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের কিছুটা চিন্তা করা দরকার এবং চিন্তার পর এ প্রশ্নের জবাব দেয়া উচিত যে, সাহাবীগণসহ মুসলমান এ কমবয়সী সাহাবীর খুতবা না শুনে এতোদূরে চলে যেতেন কোন্ কারণে। অথচ খুতবা শুনা সুন্নাত এবং এক হিসাবে তা নামাযের অংশ বিশেষ ? মাওলানা ইদরীস সাহেব তার আকাবেরদের যে নীতি বর্ণনা করছেন সেই বর্ণিত নীতির আলোকে ইতিপূর্বে আমি যে সকল বুযূর্গদের নীতি ও মন্তব্য উল্লেখ করেছি তাদের সম্পর্কে ইদরীস সাহেব এখন কি বলতে চান ? দেওবন্দী নীতির প্রকৃত মুখপাত্র এই সকল বুযূর্গানে দীন নাকি আপনি ? আপনি বলছেন, তুমি মারওয়ানের কর্মকাণ্ড এবং তার পারিপার্শিক উত্তেজনাকর অবস্থা থেকেও চোখ বন্ধ করো না। এ উপদেশের জন্যে তাঁর প্রতি আমার অশেষ ধন্যবাদ। তবে আপনারও মারওয়ানের সেসব কর্মকাণ্ড থেকে চোখ বন্ধ করা উচিত হবে না। পরিবেশ-পরিস্থিতি এহেন উত্তেজনাকর অবস্থায় নিয়ে আসতে আর সক্রিয় ভূমিকা ও কূট তৎপরতা বহুলাংশে দায়ী। আপনি বলে থাকেন এবং ইমাম যাহবী (র)-এর বরাতে যে, আল্লাহর সাথে বিদ্বেষ পোষণকারী যারা উঠতে-বসতে মিথ্যা ও মুনাফেকীর আশ্রয় নিতো—তারাই মূলতঃ বেআদবীর ঝড় তুলে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে ফেলে। সম্ভবত আপনার জানা নেই যে, স্বয়ং ইমাম যাহবী (র) মারওয়ান সম্পর্কে তার একাধিক গ্রন্থে কিসব যে লিখেছেন ? তবে মুহাদ্দিসগণ মারওয়ান সম্পর্কে যাকিছু লিখেছেন এ মুহূর্তে আমি তার বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না, তা সত্ত্বেও আমাদের বুযূর্গদের নীতি এটাই যে, মারওয়ান সম্পর্কে কটূক্তি থেকে তারা সযত্নে বিরত থাকতেন মর্মে আপনার অব্যাহত

১. মারওয়ান ও হযরত আবু সাঈদ (র)-এর এ ঘটনাটি সামান্য আক্ষরিক মতপার্থক্যসহ সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ঘোষণার জবাবে মারওয়ান সম্পর্কে নির্মম কটূক্তির আশ্রয় নিয়েছেন আপনার বুযুর্গদের কয়েকটি মন্তব্য আমি ইতিপূর্বে উদাহরণ স্বরূপ পেশ করেছি।[১]

আজব ও অদ্ভুত ভ্রান্তি

মাওলানা ইদরীস সাহেব অবশেষে একটি আজব কথা বলেছেন। তিনি বলছেন, খুব সম্ভব মালিক সাহেবের কোনো দারুল হাদীসে হাদীসগ্রন্থ শুনার সুযোগ হয়ে থাকবে এবং হাদীসশাস্ত্রের ছাত্রদের এ অভ্যাস সম্পর্কেও অবহিত হয়ে থাকবেন যে, তারা প্রত্যেক হাদীসের সনদ পড়ার পর মতন (মূল হাদীস) শুরু করার আগে সাহাবীদের নামের উপর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আনহুম বাধ্যতামূলকভাবে পড়ে নেয়। এখন বুখারী শরীফ পড়ার সময় মারওয়ান বিন হাকাম নামের উপর সনদ শেষ হলে সে ক্ষেত্রে মালিক সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলার ফতওয়া দিবেন নাকি (মায়াযাল্লাহ) লানাতুল্লাহ আলাইহিম বলার ? بينوا ترجوا

আবেগ তাড়িত ও ভ্রমাত্মক বাক্য মনযোগ দিয়ে পড়ার পরও আমি বাক্যের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, দাবী ও এর ভিত্তি বুঝতে অক্ষম। যদি মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস সাহেব একথা বলতে চান যে, মারওয়ান কিংবা হাকামকে সাহাবী সাব্যস্ত করে তাদের বর্ণিত কোনো মারফু ও মুত্তাসিল হাদীস সরাসরি নবী আলাইহিস সালাম সূত্রে ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে গ্রহণ করেছেন—তাহলে একথাটি সম্পূর্ণ ভুল। ইমাম বুখারী (র) তার বুখারীতে এমন কোনো হাদীস গ্রহণ করেননি এবং তাদেরকে সাহাবী রূপে গণ্য করেননি। স্বীয় ইতিহাসে তার নিয়ম হলো, সাহাবীদের নামের সাথে তিনি সাধারণত له صحبة ইত্যাকার শব্দ প্রয়োগ করেন অথবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সেসব সাহাবী কর্তৃক সরাসরি বর্ণিত কোনো হাদীস উল্লেখ করে দিতেন। কিন্তু তারিখে কবীরের ৪র্থ খণ্ডের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় (দায়েরাতুল মাআরিফ) মারওয়ানের জীবনীতে এমন ধরনের কোনো ব্যাখ্যা নেই। বরং শুধুমাত্র লেখা আছে ঃ

سمع عثمان بن عفان وبسره

১. হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর গভর্নর মারওয়ান ও অন্যান্যরা খুতবায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বাইতকে তিরস্কারের কথা মুহাম্মদ তাকী সাহেব অস্বীকার করতে জোর প্রচেষ্টা করেছেন। এবার তারা আমার এ আলোচনাটিও অতিরিক্ত পর্যায়ে দেখে নিন। মাওলানা শিবলী নোমানী এবং দেওবন্দের বুযর্গগণ এ গালমন্দ করাকে একটি স্বীকৃত ঘটনারূপেই বর্ণনা করেছেন এবং এজন্যে কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত অনুভব করেননি। আগেকার অগণিত ইমাম এভাবেই ঘটনার বিবরণ পেশ করেছেন। তারপরও 'কেউ কখনো মান্য করো না' এর মোহর লাগাতে চাইলে তাকে কে বাধা দিতে পারবে ?

www.pathagar.com

"অর্থাৎ মারওয়ান ওসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং বুসরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রাওয়ায়েত শুনেছে।"১

ইমাম যাহবী (র) 'মিযানুল এতিদাল' গ্রন্থে মারওয়ানের জীবনীতে স্পষ্ট বলেছেন ঃ

قال البخاری : لم یرالنبی صلی اللّٰه علیه وسلّم - قلت روی عن بسره وعن عثمان وله اعمال موبقة نسأل اللّٰه السلامة رمی طلحة بسهم وفعل وفعل

"বুখারী বলেছেন, মারওয়ান নবী আলাইহিস সালামকে দেখেননি। আমার (যাহবীর) মতে, সে বুসরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু (বিনতে সাফওয়ান) এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রাওয়ায়েত করেছে। তার কার্যাবলী ছিলো ধ্বংসাত্মক। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। মারওয়ান হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তীর নিক্ষেপ করে এবং অনেক অবর্ণনীয় কর্মকাণ্ডের হোতা ছিলো।"

তবকাতে ইবনে সায়াদে হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী ৫টি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে যে, মারওয়ানই হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করে। তন্মধ্যে আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের একটি রাওয়ায়েত আছে। সে মারওয়ানেরই পুত্র ছিলো। বুখারী (র)-এর এ উক্তিটি তাহযীবুত তাহযীব ও অন্যান্য গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে, মারওয়ান সাহাবী নয়। মারওয়ানের নিন্দায় ইমাম যাহবীর আরো কঠোরতর উক্তি রয়েছে। ইমাম নববী তাহযীবুল আসমা গ্রন্থে বলছেন ঃ

لم یسمع النبی صلی اللّٰه علیه وسلم ولاراهُ -

"মারওয়ান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শুনেনি এবং সে তাঁকে দেখেওনি।"

সহীহ বুখারীর প্রচলিত সংস্করণ এবং যার সনদ ইমাম বুখারী (র) পর্যন্ত পৌছেছে সে হাদীসের সূত্র ধারা যেখানে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে সেখানে

১. হাফেজ ইবনে হাজার (র)-ও মারওয়ান সম্পর্কে লিখেছেন, لاتثبت له صحبة তার সাহাবী হওয়া প্রমাণিত নয়। ইমাম আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ তার রচিত কিতাব আল মারাসীলে বলছেন ঃ

مروان بن الحکم لم یسمع عن النبی صلی اللّٰه علیه وسلم شیئا - کان مروان علی عهد النبی صلی اللّٰه علیه وسلم ابن خمس سنین او نحوه -

অর্থাৎ মারওয়ান বিন হাকাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম থেকে কিছুই শুনেনি। সে নবীর আমলে প্রায় ৫ বছর বয়স্ক বালক ছিলো। (کتاب المراسیل - کمتبة المثنی، بغداد، ١٢٨٦ صـ ١٢٢)

www.pathagar.com

অধিকাংশ এবং বেশীর ভাগ সাহাবীদের নামের সাথে রাদিয়াল্লাহু আনহু বাক্য বর্তমান আছে। কোনো এক জায়গায় একথা না থাকলে অন্য স্থানে ঐসব সাহাবীদের নামের সাথে উক্ত বাক্যটি অতিরিক্তভাবে সংযোজন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মারওয়ান কিংবা হাকামের নাম যেখানেই এসেছে কোথাও তাদের নামের পর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাক্য লেখা হয়নি। যেমন বুখারী 'কিতাবুশ শুরুতের' প্রথম হাদীসটি হযরত ওরওয়াহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত انه سمع مروان والمسور بن مخرمه رضى الله عنها ...... সনদের رضى الله عنها সম্পর্কে কারো এ সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, هُمَا (দু'জন) দ্বারা মারওয়ান এবং হযরত মিসওয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহুম এ দু'জনকে বুঝানো হয়েছে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত মিসওয়ার এবং তার পিতা হযরত মাখযামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তারা উভয়েই সাহাবী ছিলেন। তাদের নামের জন্যেই ইমাম বুখারী (র) রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন। যদি মারওয়ান এর মধ্যে শামিল হতো তাহলে এখানে عنهم বলতেন। এখানে রাদিয়াল্লাহু আনহু বাক্য মূলত না থাকলেও একটা কথা ছিলো। কিন্তু ইমাম বুখারী পরিষ্কারভাবে এখানে দু'জন সাহাবীর নামের সাথে এ বাক্য প্রয়োগ করেছেন এবং মারওয়ানকে সাহাবীর গণ্ডি থেকে বের করে দেন। কেউ অধিক নিশ্চিত হতে চাইলে ওমদাতুল কারী গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যা দেখে নিতে পারেন। সেখানে আল্লামা আইনী (র) হযরত মিসওয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মাখযামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

له ولا بيه صحبة

"পিতা-পুত্র উভয় তাঁরা সাহাবী ছিলেন।"

অতপর তিনি বলেন ঃ

اما مروان فانه لايصح له سماع من النبى صلى الله عليه وسلّم ولا صحبة لانه خرج الى الطائف طفلاً لايعقل لما نفى النبى صلى الله عليه وسلم اباه الحكم وكان مع ابيه بالطائف حتى استخلف عثمان فردّهما ـ

"যতটুকু জানা যায় তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে মারওয়ানের হাদীস শ্রবণ করা সঠিক ও প্রমাণিত নয় এবং সে সাহাবীও নয়। কেননা, সে ছিলো একজন নিরেট বালক ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার পিতার সাথে মদীনা থেকে তায়েফে নির্বাসিত করেন তখন সে বাপের সাথে তায়েফেই রয়ে যায়।

www.pathagar.com

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হওয়ার পর তিনি তাদের উভয়কে ডেকে ফিরিয়ে আনেন।"

সহীহ বুখারীতে মারওয়ানের অন্যান্য রাওয়ায়েতগুলোরও এ অবস্থাই যে, যেখানে মারওয়ানের নামের উপর সনদ শেষ হয়েছে সেগুলোর সবই মুরসাল রাওয়ায়েত। অর্থাৎ মারওয়ান যে সাহাবীর কাছ থেকে রাওয়ায়েত করেছে তাঁর নাম মারওয়ানের পর উল্লেখ নেই। এসব হাদীস মারওয়ান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আদৌ শুনেনি। বুখারী শরীফের যেখানে মারওয়ান বিন হাকামের নামের উপর সনদ শেষ হয়েছে সেখানে মালেক সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলবেন নাকি লা'নাতুল্লাহ বলার ফতওয়া দিবেন ? মাওলানা ইদরীস সাহেবের এ প্রশ্নটি কত বড় অদ্ভুত ও বিস্ময়কর তা এবার প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি দেখতে সক্ষম হবেন। আমি মুফতি নই, অভিশপ্ত করারও আমার আগ্রহ নেই। তবে বুখারী শরীফ পড়ার সময় আমি বুখারীর প্রণেতা ইমাম বুখারী (র)-এর পন্থা অনুসরণ করবো এবং মারওয়ান ও হাকামের নামের উপর আদৌ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলবো না। কেননা, আমার মতে সে সাহাবী নয় এবং হাদীসে তার উপর অভিসম্পাতের কথাও বর্ণিত হয়েছে। আমার জানা নেই যে, এমন কোনো 'দারুল হাদীস' আছে কিংবা ছিলো যেখানে বুখারীর দরস দেবার সময় মারওয়ান ও তার বাপের নাম আসার সাথে সাথেই সকল ছাত্র শিক্ষককে মারওয়ান বিন হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলার জন্যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় ? সম্মানিত মাওলানার কাছে আরজ, আপনি দয়া করে এমন কতিপয় দারুল হাদীস এবং সেখানকার শিক্ষক ও শিক্ষা প্রাপ্তদের নাম প্রকাশ করে আমার ও অন্যান্য জ্ঞান পিপাসুদের অভিজ্ঞতা বাড়াতে সহায়তা করুন যেখানে বুখারী পড়ার সময় মারওয়ান বিন হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমা পড়া হয়। অধিকন্তু একথাটিও পরিষ্কার বলা উচিত যে, এ কাজ ধারণাপ্রসূত আকাবেরদের নীতি এর সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যশীল যার আলোকে এ পিতা-পুত্রের নামের সাথে যা 'রাদিয়াল্লাহু আনহুমা' বলা সঙ্গত না 'লা'নাহুমা আল্লাহ' বলা।

মারওয়ানের পিতা

মহা বিপদের কথা হলো, বাইয়্যেনাতের সম্পাদক সাহেব মারওয়ানের সাথে তার পিতা হাকামকেও শরীক করে উভয়ের নামের সাথে রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বাধ্যতামূলকভাবে পড়াতে চান। সম্ভবত সম্পাদক সাহেব প্রথম ব্যক্তি যিনি হাকামের নামের সাথে রাদিয়াল্লাহু আনহু সংযোজন করতে চেষ্টা করেছেন। হাকাম সে ব্যক্তি যে মদীনার মুনাফিকদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের রহস্য

www.pathagar.com

ও গোপন কাজকর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতো। মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের বর্ণনা হলো, সে কখনো নবী আলাইহিস সালামের জবান মুবারকের নকল করে কৃত্রিমভাবে তা আওড়াতো, আবার কখনো সে হুজুর সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ চাল-চলনকে তুচ্ছার্থে নকল করে বেড়াতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযাসমূহের মধ্যে এটা গণ্য করা হয়; এ তার কথায় চলনে এক ধরনের কৃত্রিমতা ও বক্রতা সৃষ্টি হয়েছিলো। কেননা তিনি বলেছেন ঃ كن كذالك (তুমি এমনি ধারায় চলতে থাকবে)। কারো কারো উক্তি মোতাবিক লোকটি ঘরে ঘরে চুপিসারে দৃষ্টি ফেলতো। মোটকথা, তার এরূপ অপতৎপরতার দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মদীনা থেকে নির্বাসিত করে তায়েফে আটক করে রাখেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে মদীনায় ফিরে আসার অনুমতি পায়নি। মারওয়ান ও তার পিতা সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাসীর বিদায়ার ৮ম খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

وقد كان ابوه الحكم من اكبر اعدا النبى صلى الله عليه وسلم وانما اسلم يوم الفتح وقدم الحكم مدينة ثم طرده النبى صلى الله عليه وسلم الى الطائف ومات بها ومروان كان اكبر الاسباب فى حصار عثمان ـ

"এবং মারওয়ানের পিতা হাকাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোর শত্রুদের অন্যতম ছিলো। মক্কা বিজয়ের দিন সে ঈমান আনে এবং মদীনায় চলে আসে। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তায়েফে নির্বাসিত করেন এবং সেখানেই সে মারা যায়। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবরুদ্ধ হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো এই মারওয়ান।[১]

এরূপ বাপ-বেটাও যদি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলে দেয়ার যোগ্য হয়ে যায়, তাহলে আবদুল্লাহ বিন উবাই (মুনাফিক নেতা) রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বাধা কোথায়? সেতো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মদীনায় মুসলমান সমাজেই ছিলো এবং মুসলমানদের গোরস্তানেই সমাহিত হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযা নামাযও পড়ান এবং দাফনের জন্যে তাঁর পিরহান মুবারক দান করেন। হাকাম ও তার ছেলের ব্যাপারে নিন্দার ভাষা ব্যবহার না করা

১. শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র)-এর উক্তি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, "মারওয়ান আহলে বাইতের সম্মানিত লোকদের সাথে ঘোর শত্রুতা পোষণ করতো।"

www.pathagar.com

যারা নিজেদের শালীন রুচিবোধের প্রতীক যাহির করে বেড়ায় তারা সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াতটি অবশ্যই দেখে থাকবেন। আয়াতটি হলো ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ـ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। আর তাদের জন্য তিনি কষ্টদায়ক শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছেন।"

আমার লেখায় আমি কেবল আনুষঙ্গিক বিষয়রূপে লিখেছিলাম যে, হাদীসে হাকাম ও তার ছেলের উপর অভিসম্পাতের কথা বর্ণিত আছে। এটা সে কতিপয় জায়গার একটি—মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেব যেখানে আমার সাথে একমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হলো—বাইয়্যেনাত তৎক্ষণাৎ 'আল বালাগ'-এর উপর লোকমাহ দেয়া জরুরী মনে করলো। মাওলানা টুনকী এবং মাওলানা ইদরীস সাহেব দু'জনে মিলে ওসমানী সাহেবের শক্তি বৃদ্ধি করতঃ মারওয়ান ও হাকামের ফযীলত বর্ণনায় তৎপর হয়ে উঠেন। এ চেষ্টায় তারা কতটুকু সফলতা লাভ করবেন তা পাঠকবর্গ নিজেরাই অনুমান করতে পারেন। অপরদিকে জনাব তাকী সাহেবও যে উল্টোমুখী ডিগবাজির কসরত দেখালেন সেটাও লক্ষ্যণীয়। আল বালাগের জমাদিউল উলার (১৩৯১ হিজরী) সংখ্যায় তিনি লিখলেন ঃ

"অষ্টম জিলহাজ্জের আল বালাগে লিখেছিলাম—মালিক সাহেবের উদ্ধৃতি অনুযায়ী মুসতাদরাকের ৪র্থ খণ্ডের ৪৮১ পৃষ্ঠায় আমি সহীহ সনদসহ হাদীসটি পেয়ে যাই। ইমাম যাহবীও (র) যা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। বর্তমানে রবিউস সানীর বাইয়্যেনাতে হযরত মাওলানা ওলী হাসান সাহেব টুনকীর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। এ প্রবন্ধে তিনি আমার লেখার সমালোচনায় হাদীসের বিশদ বিবরণ পেশ করেন। আমি ওলী হাসান সাহেবের ব্যাখ্যার উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করছি এবং এ সতর্কতার জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বাইয়্যেনাত সম্পাদকের একথায়ও পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করছি যে, আমাদের বুযুর্গদের দৃষ্টিভংগিও এটাই যে, মারওয়ান সম্মানিত সাহাবীদের মতো যত্রতত্র বিশেষ উপাধি রাদিয়াল্লাহু আনহু রূপে স্মরণীয় নহে আবার তাকে গালমন্দ করাও সঠিক হবে না।"

এক্ষণে আল বালাগের এ ভুল স্বীকৃতি কি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে না যে, এ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের বেলায় 'তুমি আমায় হাজী বলো আমিও

www.pathagar.com

তোমায় হাজী বলবো'। প্রবাদের মূর্তপ্রতীক। সঠিক কথা থেকে সরে পড়া আর বেঠিক কথায় দৃঢ় থাকা তাদের পক্ষে কতই না সহজ। তারা যাকে নিজেদের দলভুক্ত মনে করে তার কথা অত্যন্ত দুর্বল ও অর্থহীন হলেও সেটা সানন্দে লুফে নেবে ; আর তাদের সমিতির সদস্য না হলে তার ব্যাপারে এদের উদারতা হঠাৎ বিলীন হয়ে যাবে। এসব বুযুর্গদের কাছে আমার নিবেদন, জমহুর আহলে সুন্নাতদের নীতি এবং আপনাদের শ্রদ্ধেয় বুযুর্গদের অভিরুচির গবেষণার চাহিদা শুধুমাত্র পারস্পরিক স্তুতির বিনিময়ে পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞান ভিত্তিক গবেষণায় দুর্বল এবং যুক্তিহীন দলিল কেবলমাত্র এ ধরনের উপহাস ও কৌতুক দিয়ে প্রভাবিত ও জীবন্ত করা সম্ভব নয় যে, আপনি অপরের জন্যে কট্টর রাফেজী, মওদূদী চিন্তাধারার উকীল, রাফেজী ফের্কার নতুন সংস্করণ, রাফেজী কারখানার উৎপাদন এবং এ ধরনের সাধারণ শালীনতা ও ভদ্রতা বিবর্জিত অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের আড়ালে উতরে যাবেন। যদি আপনারা সত্যিকার অর্থে নবী আলাইহিমুস সালামগণের ওয়ারিশ এবং তাঁদের চরিত্রের ধারক হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাদের মুখে এ ধরনের বিকৃত উপাধি কুৎসিত ও কদর্য ভাষার উচ্চারণ আদৌ শোভা পায় না। এ জাতীয় বায়ুময় ফানুসের বাটখারা পাল্লায় তুলে হাওয়াই বচন আর জ্ঞানহীন কথার ওজন বাড়ানো যায় না—একথা স্মরণ থাকলে মন্দ হয় না। দলিলের ভিত্তিতে কথা মানুন এবং মানাতে চেষ্টা করুন। শুধুমাত্র গালিগালাজ, ভর্ৎসনা ও হঠকারিতার মাধ্যমে কার্যোদ্ধারের নিষ্ফল চেষ্টা করা অর্থহীন প্রয়াস। কবির ভাষায় ঃ

اندکے پیشِ تو گفتم و بدل ترسیدم
کہ تو آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار است

"অর্থাৎ বলার বহু কথাই ছিলো, কিন্তু তোমার মর্মযাতনা বিবেচনায় অল্প কথায় ইতি টানলাম।"

আরো একটি ফতওয়া

পরিশেষে আরো একজন মুফতী সাহেবের জ্ঞানগর্ব ফতওয়া পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি। ফতওয়াটি জমাদিউল উলা ১৩৯১ হিজরী সনে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে প্রকাশিত "তালীমুল কুরআনে" ছাপা হয়। এতে মুফতী সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, মারওয়ান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলো কি ? তাকে আরো প্রশ্ন করা হয়—মারওয়ানকে খবীস বলা জায়েয হবে কি ? আর যে ইমাম এমন কথা বলেন তার ইমামতিতে নামায আদায় করা কি জায়েয ? মুফতী সাহেব উত্তরে বলেন ঃ

www.pathagar.com

"আসমাউর রিজাল কিতাবসমূহে মারওয়ানকে সাহাবীদের সিলসিলার অন্তর্ভুক্তরূপে লিখা হয়ে থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় হিজরতের পর তার জন্ম হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিতাকে তায়েফে নির্বাসিত করে দেন। কম বয়েসী হওয়ার কারণে সে বাপের সাথেই থাকে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে দেখেনি। সিয়াহ সিত্তায় তার রাওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তিনি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। অশালীন ভাষায় তাকে স্মরণ করা আহলে সুন্নাত জামায়াতের খেলাফ এবং স্বীকৃত উত্তম জমানা সম্পর্কে ঔদ্ধত্য প্রকাশের নামান্তর। সুতরাং এরূপ ধৃষ্ঠতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তিকে বুঝাতে হবে -------। উল্লেখিত ইমাম যদি সংশোধন হয়ে যায় তাহলে তার ইমামতি জায়েয অন্যথায় মাকরূহ। কেননা, সে বিদআতী। আর বিদআতীর ইকতেদা (অনুসরণ) করা ফকীহদের মতে মাকরূহ।-[আবদুর রশীদ, মুফতী দারুল উলুম তালীমুল কুরআন]

এখন মুফতী সাহেব যে ফতওয়া জারী করলেন এবং হযরত মারওয়ানের শানে অভদ্র ভাষা ব্যবহারকারীদেরকে যেভাবে আহলে সুন্নাতের বিরোধী, ঔদ্ধত্য, ধৃষ্ঠতা পোষণকারী, বিদআতী এবং ইমামতির অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে তাতে এ ফতওয়ার আলোকে উপোরোল্লেখিত মনীষীদের[১] উক্তিসমূহে পুনর্বার দৃষ্টিপাত করে বিবেচনা করে দেখা দরকার। এসব লোক কি ধরনের বৈপরিত্ব ও বিভেধ সৃষ্টিতে যে নিমগ্ন। এ ফতওয়ার ভাষা পরিষ্কার বলে দেয় যে, এ বাক্যবাণ তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত যাদেরকে মওদূদী (র)-এর সমমনা ধরে নেয়া হয়েছে। আর এ কল্পনা বিলাসের পরিণতি হলো ঃ

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں
لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

"হায় ---- রে দুঃখ ! বন্ধুর লম্বা কেশে জড়িয়ে গেলো তার চরণযুগল। আর কি অবাক কাণ্ড, শিকারি ফেঁসে গেলো তার নিজেরই বিছানো জালে।"

فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ.........

অর্থাৎ, 'হে জ্ঞানীজনেরা ! বিবেক খাটিয়ে চিন্তা করো।'

---

১. এ সকল আকাবেরদের একজনের কথা এ সাময়িকীর ১০ পৃষ্ঠায় যে ভাষায় উল্লেখ হয়েছে—শেখ, সমকালীন মুহাদ্দিস, হযরত রশীদ আহমদ গাংগুহী (র)। এটাও মনে রাখা দরকার যে, মাওলানা গাংগুহী মারওয়ানের ব্যাপারে সেই খুব্স শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা প্রশ্নকর্তার প্রশ্নে উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

দুই ঃ ইমাম যাহ্বী (র) এবং নোয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের ব্যাখ্যা

বিগত আলোচনায় মারওয়ান ও তদীয় পিতা রাসূলের ভাষায় অভিশপ্ত হওয়ার কথা প্রমাণ ও সুস্পষ্ট করা হয়। আমার গ্রন্থের সূচনাতেই শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এর সাহেবের উক্তিও উল্লেখ করেছি যে, নাসেবী সম্প্রদায় ও আহলে বাইতের সাথে শক্রতা পোষণকারী ও গোষ্ঠীর নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলো এই মারওয়ান। তদুপরি যেহেতু আহলে হাদীস, দেওবন্দী হানাফী সকলেই আজকাল মারওয়ান ও তার পিতা হাকামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে কারণে এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় হাদীস এবং বিগত শোলকের উক্তিসমূহ পেশ জরুরী মনে করছি। সাহাবীদের তাযীম-তোয়াযের অন্তরালে যারা এহেন বাপ-বেটার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পতাকা বহনের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলেছেন তাদের প্রতারণার ফাঁদ যেন উত্তম রূপে উন্মোচন হয়ে যায়। মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহের রাওয়ায়েত উল্লেখ করার পর মুসতাদরাকের এ রাওয়ায়েত পরিপূর্ণভাবে সত্যায়িত ও সমর্থিত হয়ে যায় যাকে রাফেজী কারখানার উৎপাদন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম যাহবী (র)-এর একটি উক্তির উপর ভিত্তি করে রাওয়ায়েতটিকে জঈফ বলার কারণে আমি এখানে সর্বপ্রথম একই ইমাম যাহবী (র)-এর গ্রন্থ 'আল ইবার'-এর উদ্ধৃতি দিতে চাই। স্মর্তব্য যে, গ্রন্থটি সকল প্রকার বিতর্ক ও মতভেদের উর্ধে। ইমাম যাহবী (র) শুরুতেই লিখেছেন, 'আমি এখানে ইসলামী ইতিহাসের অধিকতর প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী উল্লেখ করেছি, প্রত্যেক প্রতিভাধর আলেম ও অনুসন্ধিৎসুর যেগুলো স্মরণ রাখা ও সংরক্ষণ করা জরুরী।' গ্রন্থের শেষে তিনি আরো লিখেছেন, এখানে শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ ঘটনা ও দুর্ঘটনাগুলোই সন্নিবেশিত করা হলো। এতে ৩১ হিজরী সনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

فيها توفي الحكم بن ابي العاص والدموان اسلم يوم الفتح كان يفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل كان يحاكيه في مشيته فطرده الى الطائف وسبه فلم يزل طريداً الى ان استخلف عثمان فدخله المدينة واعطاه مئة الف

"এ বছর মারওয়ানের পিতা হাকাম বিন আবিল আস মারা যায়। সে মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়। তবে সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতো। তার সম্পর্কে এটাও বলা হয় যে, সে নবী আলাইহিস সালামের চাল-চলন (কৃত্রিমভাবে) নকল করতো। সুতরাং তিনি তাকে তায়েফে নির্বাসিত করেন এবং তাকে অভিশাপ দেন।

www.pathagar.com

সেখানেই নির্বাসিত জীবনযাপন করতে থাকে। এক পর্যায়ে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর তাকে মদিনায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। এবং তাকে এক লাখ বখশিশ দেয়া হয়।"
[العبر فی خبر من غبر، جز اول صـ ٣٢]

এবার প্রশ্ন জাগে, হাকামের অভিশপ্ত হওয়া যদি সার্বৈব মিথ্যা হয় এবং এ বিষয়ের দলিল স্বরূপ সমস্ত রাওয়ায়েতগুলো ইমাম যাহবী (র)-এর মতেও মিথ্যা ও জাল হয় তাহলে ইমাম যাহবী (র) এখানে ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাতের কথা কেমন করে উল্লেখ করলেন। ঘটনা হলো, ইমাম যাহবী (র) তার একাধিক মন্তব্যে মারওয়ানের তীব্র নিন্দা করেছেন। তন্মধ্যে মিযানুল এ'তেদালের একটি উক্তি প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। নবাব সাইয়েদ মুহাম্মদ সিদ্দীকে হাসান খান সাহেব তার প্রণীত গ্রন্থ 'হিদায়াতুস সায়িলে' এ ধরনের বহু উক্তি একত্রিত করেছেন। যেমন, ইমাম যাহবীর اعلام سير النُبلاء -এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

قتل طلحة ونجا فليته ما نجى-

"মারওয়ান হযরত তালহাকে হত্যা করে ; আর সে বেঁচে যায়। আহা ! যদি সে না বাঁচতো।"

মিযানের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন, মারওয়ানের কর্মকাণ্ড ছিলো ধ্বংসাত্মক ও সর্বনাশা প্রকৃতির। আমরা এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। এরপর নবাব সাহেব বলেছেন ঃ

این تصریح است بفسق وے -

"এটা মূলতঃ মারওয়ানের ফাসেকীরই বিবরণ।"

সিয়ারুল নোবালায় ইমাম যাহবী (র) হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘাতক মারওয়ানের জীবনালেখ্য সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

قاتل طلحة فى الوزر كقاتل علىٍّ -

"হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘাতকের পাপ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘাতকের সমান।"

অতপর ইমাম ইবনে হাযমের উক্তির উল্লেখ করেছেন ঃ

ان مروان او لمن شق عصا المسلمين بلاشبهة ولا تاويل .....

www.pathagar.com

"মারওয়ান সর্বপ্রথম মুসলমানদের ঐক্য নস্যাৎ ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয় একথা নিসন্দেহে ও বিনা ব্যাখ্যায় বলা যায়। রাসূলের সাহাবী এবং ইসলামের আনসারদের প্রথম সন্তান হযরত নোমান বিন বশীর আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সে হত্যা করে এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করার পর তাঁর বিরোধিতায় অস্ত্রধারণ করে।"

এ সম্পর্কে নবার সিদ্দীক হাসান সাহেব স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছেনঃ

"সে (মারওয়ান) হযরত তালহাকে ওজর বশতঃ হত্যা করেছিলো বলে মারওয়ানের পক্ষ থেকে ওজর পেশ করা এমন ধরনের কৈফিয়ত যার পরে কোনো অপরাধির অপরাধের প্রশ্নই অবশিষ্ট থাকে না এবং প্রত্যেকের পক্ষ থেকেই এ জাতীয় ওজর পেশের দাবী করা যেতে পারে।"-(هداية السائل الى ادلة المسائل صـ ٥١٠)

মুহাদ্দিস আল হাইসূমীর হাদীস

এখন আমি হাফেজ নূরুদ্দীন হাইসূমীর হাদীসগ্রন্থ مجمع الزوائد ونبع الفوائد থেকে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করছি। এতে মুনাফিকীন অধ্যায়ে ইমাম আহমদ (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে নিম্নোক্ত রাওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن عبد الله بن عمر وقال كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاصى يلبس ثيابه ليلحقنى فقال ونحن عنده ليدخلن عليكم رجل لعين فوالله مازلت وجلاً اتشوف خارجًا وداخلا حتى دخل فلان يعنى الحكم -

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে বসাছিলাম। হযরত আমর বিন আস (আমার পিতা) আমাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হওয়ার অভিপ্রায়ে ঘরে কাপড় পরিধান করছিলেন। ইত্যেবসরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কাছে এখন একজন অভিশপ্ত লোক আগমন করবে। আল্লাহর কসম ! (আমার পিতাই এসে যায় কিনা) এ ভয়ে আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভিতর বাহির দেখতে ছিলাম। এমন সময় মারওয়ানের পিতা হাকাম মজলিসে প্রবেশ করে।"

www.pathagar.com

মুসনাদে আহমদের যে হাদীসটি আমি তার বরাতে প্রথমে উল্লেখ করেছিলাম তাতে নামের কথা উল্লেখ ছিলো না। যদিও ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ছিলো। কিন্তু এ হাদীসটিতে স্পষ্টভাবে নামের উল্লেখ আছে। উপরোল্লেখিত হাদীসটির পরই হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেই অপর রাওয়ায়েত হলো ঃ

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلعن عليكم رجل يبعث يوم القيامة على غير سنتى او على غير ملتى وكنت تركت ابى فى المنزل فخفت ان يكون هو فطلع رجل غيره -

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সামনে এমন একজন লোকের আগমন হচ্ছে যাকে কিয়ামত দিবসে আমার সুন্নাত বা মিল্লাতের উপর পুনর্জ্জীবিত করা হবে না। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার পিতাকে ঘরে রেখে এসেছিলাম ; আমার ভয় হচ্ছিলো সে লোক তিনিই হয়ে যান কিনা। কিন্তু সে মুহূর্তেই অপর একজন লোক (অর্থাৎ হাকাম) উপস্থিত হলো।"

এরপর হযরত আবদুল্লাহরই (র) তৃতীয় রাওয়ায়েত হলো ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من هذه الفج من اهل النار وكنت تركت ابى يتوضأ فخشيت ان يكون هو فاطلع غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هذا -

"একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের সামনে একজন লোকের আগমন ঘটবে, সে হবে দোযখবাসী। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার পিতা অযু করছিলেন বিধায় আমি তাকে ছেড়ে চলে আসি। আমি ভীত ছিলাম এ আশংকায় যে, আগত লোকটি তিনিই হন কিনা। কিন্তু অপর একজন লোকের আগমন ঘটলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ হলো সে ব্যক্তি।"-(مجمع الزوائد منبع الفوائد، دار الكتاب بيروت ২য় সংস্করণ, ১৯৬৭ ইং খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-১১২)

আমি মনে করি, মারওয়ান ও তার বাপ সম্পর্কে যেসব ব্যাখ্যা পেশ করেছি তার উপর অতিরিক্ত আর কিছু পেশ করার প্রয়োজন নেই। فيها الكفاية لمن له درايه বিবেকবানের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

দেওবন্দের নীতি

আল বালাগ ও বাইয়্যেনাতের সম্পাদকদ্বয় আমাদের এবং আমাদের বুযুর্গ ও আকাবেরগণের নীতি ও অভিমত হলো মারওয়ানকে সাহাবীগণের জন্য নির্ধারিত লকব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে স্মরণ না করা আর তার বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য না করাই সমীচীন। এ সম্পর্কে আমি প্রথমে আরজ করেছি শাহ আবদুল আযীয, মাওলানা মাহমুদুল হাসান এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী প্রমুখ দেশ বরেণ্য আলেমগণ এ আজব ও অভিনব নীতির বিরোধিতা করেছেন প্রকাশ্য নিন্দার ভাষায়। একদিকে তাঁদের ভারসাম্য মূলক আচরণের এ নমুনা, অপর দিকে বাইয়্যেনাতের সম্পাদক সাহেব এ ভারসাম্য মূলক এ নীতির বিরোধিতা যে তিনি আমাকে মারওয়ান ও হাকামের নামের সাথে রাদিয়াল্লাহু আনহুমা জুড়ে দেয়ার উপদেশ দানে দারুন উৎসাহী। পরিশেষে আমি এমন একটি উদাহরণ পেশ করতে চাই যার মধ্যে কোনো কোনো দেওবন্দী এমন বুযুর্গের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় যিনি আল বালাগ ও বাইয়্যেনাতের দাবী অনুযায়ী এ মধ্যম ও ভারসাম্য নীতিকে নির্মমভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে মারওয়ানের নামের আগে 'হযরত' আর শেষে রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অকপট আবৃত্তি-উচ্চারণে সদা মশগুল। আমি প্রথমে আকার-ইংগীতে উল্লেখ করেছিলাম—ভারতেও দেওবন্দী আলেমগণ খেলাফত ও রাজতন্ত্রের বিরোধিতা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চালিয়ে যাচ্ছেন। মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়া সাহেব জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অন্যতম। 'শাওয়াহেদে তাকাদ্দুস' নামে তিনি একটি বই লিখেন। বইটিতে মওদূদী সাহেবের শিয়া হওয়াকে আয়নায় পেশ করা হয়েছে এবং বইটির শ' খানেক কপি ছাত্রদের মাঝে সৌজন্য স্বরূপ বিতরণ করা হয়েছে। বইটির একটি শিরোনাম হলো "হযরত মারওয়ানের ভাষণ এবং ফাসাদ সৃষ্টির কাহিনী।" বইটির ১৫/২০ জায়গায় যেখানেই মারওয়ানের নাম এসেছে সেখানেই হযরত মারওয়ান লেখা হয়েছে। মাওলানা মওদূদী (র)-এর উদ্ধৃতি দেয়া হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ভাষণের পর্যালোচনা করতে গিয়ে মাওলানা মিয়া সাহেব বলেন ঃ

"যদি এ ভাষণ সঠিক হয় তাহলে এর সারকথা হলো, সাইয়্যেদুনা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একথায় সম্মত হয়েছিলেন যে, সাইয়্যেদুনা ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় দৃষ্টিভংগী ত্যাগ করবেন এবং শাহাদাতের মুকাবিলায় দৃষ্টিভংগীর এ ত্যাগ গ্রহণে রাজি হবেন। কিন্তু মারওয়ান ছিলেন অটল অবিচল। তিনি ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও জীবন উৎসর্গ করতে উৎসাহ দেন। যদিও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় তার নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি

www.pathagar.com

স্বীয় উদ্যম পূর্ণ করতে সক্ষম হননি, কিন্তু যখনই হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আত্মত্যাগে অগ্রসর হলেন হযরত মারওয়ানও তৎক্ষণাৎ কুরবান হওয়ার জন্য ময়দানে নেমে এলেন, ফেতনাবাজদের মুকাবিলা করলেন এবং তারা তাকে এমনভাবে আহত করলো যে, মৃত মনে করে তাকে ফেলে যায়। হযরত মওদূদী সাহেব তো সম্ভবত এ দুঃসাহস দেখাতেই পারবেন না। তবে সচেতন পাঠকবর্গ ফায়সালা করতে সক্ষম হবেন যে, যদি ওয়াকেদীর এ নাটকীয় রাওয়ায়েত স্বীকার করা হয় তাহলে ধন্যবাদ পাওয়ার উপযোগী কে হবেন—হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নাকি হযরত মারওয়ান (রা) !"-(শাওয়াহেদ তাকাদ্দুম) [কিতাবিস্থান কর্তৃক প্রকাশিত, কাশেমজান স্ট্রীট, দিল্লী, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২১৪-২১৫)

এখন একদিকে দেওবন্দের সেসব মনীষীগণ রয়েছেন যারা মারওয়ানকে শয়তান, মালউন (অভিশপ্ত), খবীস, জালেম, নির্লজ্জ, বেআদব এবং রাসূলের সুন্নাত অবমাননাকারী আখ্যায়িত করছেন, অন্যদিকে সেসব মনীষীদের এমন ধরনের উত্তরসূরী যারা হযরত মাওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্তবা ও ফযীলত বর্ণনায় কতইনা উৎসাহী। তাই কবির ভাষায় ঃ

ببیں تفاوت راہ از کجاست تا بکجا !!

"(হে সুধী !) চোখ তুলে দেখ, পথের ব্যবধান তোমাকে কোথা থেকে কোন্ প্রান্তে নিয়ে ঠেকায়।"

মারওয়ানের আরো অপতৎপরতা

মারওয়ানের ফেতনা-ফাসাদের কথা কতইবা বলা যায়। তার অশ্লীল ভাষা ও যাতনা থেকে নবীর পুন্যাত্মা বিবিগণও রেহাই পাননি। এ ঘটনা প্রথমে উল্লেখ হয়েছে যে, যখন ইয়াযীদের মনোনয়ন দানের ব্যাপারটি প্রচারিত হচ্ছিলো এবং এর জন্য পরিবেশ তৈরীর কাজ চলছিলো তখন হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতা করলে মারওয়ান হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘর পর্যন্ত তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সে তাঁর ঘরের দরযায় দাঁড়িয়ে অপবাদ দিলে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজে তার জবাব দিতে বাধ্য হন। সহীহ বুখারী বিবাহ পরিচ্ছেদে ফাতেমা বিনতে কয়সের ঘটনায় উল্লেখ আছে যে, মারওয়ান হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন ঃ ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين بن الشر মানলাম এখানে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার প্রসংগটি বিতর্কিত ছিলো।

www.pathagar.com

কিন্তু পুন্যাত্মা নবী পত্নিগণ এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সম্বোধন করে মারওয়ান কি আরো অধিক ভদ্র ও সৌজন্যমূলক আচরণ করতে পারতো না ?

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ সমাহিত করার ব্যাপারে মারওয়ান বেআদবীর যে চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তার বিশদ বিবরণ ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রওজা মুবারকের কাছে জায়গা ছিলো, সেখানে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু সমাহিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তজ্জন্য ওসিয়াত করে যান। কিন্তু মারওয়ান এতে বাধা দেয় এবং হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এখানে দাফন করতে দিবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো। মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (র) আয়েশা চরিত গ্রন্থে 'ইসতে'আব উসুদুল গাবাহ' এবং ইমাম সুয়ূতী (র) রচিত তারিখুল খুলাফা এ তিনটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ

"হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে সমাহিত হওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দেন। মারওয়ান জানতে পেয়ে বললো, হুসাইন (রা) এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উভয়ই মিথ্যা বলছেন। (كذب وكذب) হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এখানে আদৌ দাফন করা যাবে না।"–[সীরাতে আয়েশা, পৃষ্ঠা–১৪৪, সংস্করণ ৪, ১৩৭২ হিজরী, আজমগড়]

মারওয়ানের এহেন গোঁড়া মনোভাবের ফলে নিবেদিত প্রাণ বিশ্ব মুসলিম নন্দিত হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি মীমাংসা করে দেন ; অন্যথায় খুন-খারাবীর প্রবল আশংকা ছিলো। তবে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু মারওয়ানকে যে অবিমিশ্র কথা শুনান তার বিশদ বিবরণ বিদায়া ও নেহায়া এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে।[১] মারওয়ান অনুরাগীরা নিজেরাই বের করে পড়ে নিতে পারেন। হাররার ঘটনা এবং ঐতিহাসিকদের মতে হারামে নববীর হৃদয়বিদারক ট্রাজেডির মূল হোতা ছিলো এই মারওয়ান। ইমাম যাহবী (র) সিয়ারু আলামুন নোবালা গ্রন্থে মারওয়ানের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

كان يوم الحرة مع مسرف بن عقبة يحرضه على قتال اهل المدينه -

"মারওয়ান হাররার দিন মাসরাফ বিন ওকবার সাথে ছিলো এবং মদীনাবাসীদেরকে হত্যার জন্যে তাকে উত্তেজিত করতো।"

---

১. বেদায়া ও নেহায়া, খণ্ড–৮, পৃষ্ঠা–১০৮ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

স্মর্তব্য যে, ইবনে ওকবাহ ইয়াযীদের সেনাপতি ছিলো। সে মদীনায় অবর্ণনীয় হত্যাযজ্ঞ চালায় যা প্রকাশ করা ক্ষমতার উর্ধে। তার নাম ছিলো মুসলিম বিন ওকবাহ। তার অকথ্য নির্যাতন ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণে ঐতিহাসিকগণ তাকে মুসরিফ বিন ওকাবাহ নামে আখ্যায়িত করেন। মারওয়ান এ যুলুম নির্যাতনে সরাসরি তার সাথে অংশগ্রহণ করে। বরং হাররার হৃদয়বিদারক ঘটনার নেপথ্য নায়ক ছিলো এই মারওয়ানই। এতদসত্ত্বেও এমন কিছু লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যারা তাকে হযরত মারওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে আনন্দ বোধ করে। চাটুকারিতা আর বলে কাকে !!

---

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

সম্মানিত সাহাবীগণ কি সত্যের মাপকাঠি ?

[আল বালাগের সমালোচনার জবাব ছাড়া জামায়াতে ইসলামী ও মরহুম মাওলানা মওদূদীর উপর আরোপিত কতিপয় অন্যান্য অভিযোগসমূহের জবাবও আমি মাঝে মধ্যে দিয়ে থাকি। অভিযোগের মর্ম হলো, আমরা সম্মানিত সাহাবীদের সমালোচনা করে থাকি এবং তাদের কথা ও কাজকে দলিল মনে করি না। আমার এসব জবাব তরজুমানে প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রয়োজনীয় অংশ এ গ্রন্থেও সংযোজন করে দেয়া আমি উপযোগী মনে করি। সুতরাং এ বিষয়ের একটি বক্তব্য এবং কতিপয় প্রশ্নোত্তরও এ অধ্যায়ে দেয়া হলো। সব শেষে মাওলানা মওদূদী (র)-এর একটি জবাবও তরজুমানুল কুরআনের ১৩৮৮ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল সংখ্যা থেকে আমি উল্লেখ করেছি। কেননা এ বিষয়ের উপর এটি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত জবাব। আল্লাহর কাছে কায়মানোবাক্যে এ কামনা করছি তিনি যেন আমাদের সবাইকে বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত রাখেন এবং সত্যানুরাগী ও সত্য অনুসরণের তাওফীক দেন।-আমীন।]

এক

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যেসব ভিত্তিহীন ও বাস্তব বিরোধী অপবাদ আরোপ করা হয়ে থাকে তন্মধ্যে এটাও একটি যে, এ জামায়াত সম্মানিত সাহাবীগণকে সত্যের মাপকাঠি স্বীকার করে না এবং তাদের সমালোচনা করা জায়েয মনে করে। অথচ মুসলমানদেরকে সাহাবায়ে কেরামের দোষ চর্চা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং কুরআন-হাদীস সাহাবীদের ফযীলত ও মান-মর্যাদা বর্ণনায় ভরপুর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার সাহাবীগণ তারকার ন্যায় আলোকোজ্জল। তোমরা তাদের যে কারো পদাংক অনুসরণ করবে তোমরা হেদায়াত পেয়ে যাবে।"

জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি লোক আল্লাহর রহমতে একজন খাঁটি মুসলমানের ন্যায় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর যে মানবগোষ্ঠীর জন্যে সবেচেয়ে বেশী মহব্বত ও সম্মানের অনুভূতি রাখেন তারা হলেন পরম সম্মানিত সাহাবীগণেরই জামায়াত। তারা এ অপবাদ থেকে নিজেদেরকে যথাসাধ্য মুক্ত মনে করেন। এতদসত্বেও সাধারণ মুসলমানদেরকে খারাপ ধারণা থেকে বাঁচানোর জন্যে জরুরী মনে হয় প্রকৃত

www.pathagar.com

সত্য তুলে ধরা এবং পরিষ্কার বলা যে, এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা কি এবং জামায়াত কি কুরআন-হাদীস ও পূর্ববর্তী ইমামগণের স্বীকৃত নীতির পক্ষে নাকি বিপক্ষে ? আশা করি, এ ব্যাখ্যার দ্বারা জামায়াতের অনুসারীগণও মনে প্রশান্তি পাবে এবং অভিযোগকারীদের মুখ বন্ধ না হলেও অন্তত সাধারণ মুসলমানদের ভুল ধারণায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকবে না। এ লক্ষ্য সামনে রেখে এখানে কতিপয় ব্যাখ্যা পেশ করা হলো।

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের মূল বাক্য

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের একটি বাক্যের উপর ভিত্তি করে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত অপবাদ আরোপ করা হয়। অভিযোগকারীগণ পূর্ণ বাক্য উল্লেখ না করেই দু' একটি অংশ পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে আলাদা করে পেশ করে থাকেন। এ কারণে অধিক আলোচনার পূর্বে জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের আলোচ্য বাক্যটি সম্পূর্ণ অংশ এখানে উল্লেখ করা যথার্থ মনে করছি যার উপর ভিত্তি করে এ অভিযোগ বারবার উত্থাপন করা হয়। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ৩নং ধারার ৬নং উপধারার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

> "আল্লাহর রাসূল ছাড়া কোনো মানুষকে সত্যের মাপকাঠি মনে করবে না, কাউকে সমালোচনার উর্ধে মনে করবে না, কারো মানসিক গোলামীতে লিপ্ত হবে না। প্রত্যেককে আল্লাহ প্রদত্ত এই পূর্ণ মাপকাঠির ভিত্তিতে যাঁচাই-বাছাই ও নিরীক্ষা করবে আর এ মানদণ্ডের নিরিখে যে যে মানের যোগ্য হবে তাকে সে মানেই রাখতে হবে।"

এই হলো সে বাক্য যাকে কেন্দ্র করে এসব অপবাদ আবিষ্কার করা হয়। অথচ এ বাক্যে মূলতঃ একথার উল্লেখই নেই যে, সম্মানিত সাহাবীদের জামায়াতের সমালোচনা করা যাবে কি যাবে না। বরং বাক্যে শুধু একথা বলা হয়েছে যে, সত্যের প্রকৃত মানদণ্ড হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অভিযোগকারীগণ বাক্যগুলোকে মনগড়া অভিনব অর্থের রং চড়িয়ে নিজেরাই একথা আবিষ্কার করে নিলেন যে, নবী ছাড়া কাউকে সমালোচনার উর্ধে মনে না করার কারণে সাহাবীদের সমালোচনা করা অনিবার্যরূপে জায়েয হয়ে যায়। সুতরাং জামায়াতে ইসলামী এ নীতি সমর্থক। অধিকন্তু অভিযোগকারীগণ নিজেরাই সমালোচনাকে দোষ চর্চা করার সমার্থবোধক বানিয়েছেন। যাতে করে আমাদের উপর অপবাদ আরোপ করা যথোপযোগী হয় যে, আমরা সাহাবীদের দোষচর্চা করাকে জায়েয মনে করি এবং এর অবাধ অনুশীলনও করে থাকি। এরপর অভিযোগকারীদের আরো ভেলকীবাজী হলো, তারা এ মানদণ্ডের নিরিখে যে যে মানের উপযোগী তাকে সে মানে রাখতে

www.pathagar.com

হবে। এ অংশটুকু জ্ঞাতসারে এড়িয়ে যায়। এ অংশটুকু যেহেতু তাদের অভিযোগের ভিত সম্পূর্ণ ভেংগে চুরমার করে দেয় ; সেহেতু তারা এ অংশটুকু উল্লেখ করে না। এতে সেসব হযরতদের পরের উপর অপবাদ আরোপ করার উত্তাল প্রবণতা এবং অন্যদের দীন ও ঈমানের মধ্যে পোকা নিক্ষেপ করা তাদের কত যে সখের কাজ তা সহজেই অনুমেয়।

আমীরে জামায়াতের ব্যাখ্যা

এ বিষয়ে অতিরিক্ত অবিচার হলো, এসব লোকদের আরোপিত অভিযোগের জবাবে উপরোক্ত বাক্যসমূহের যে ব্যাখ্যা বারবার দেয়া হয় তাথেকে তারা সর্বদা চোখ বন্ধ রাখে এবং তাদের পূর্ব অভিযোগই বারবার পুনরুল্লেখ ও প্রচার করতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, গঠনতন্ত্রের এ ধারা বিশেষত সত্যের মাপকাঠি এবং তানকীদ শব্দের ব্যাখ্যা জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের বর্তমান আমীর মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী (র) সাহেব কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছেন। অতএব তাঁর ভাষায় ঃ

"আমাদের মতে সত্যের মাপকাঠির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন জিনিস যার সাথে মিল খাওয়া ও সামঞ্জস্য হওয়া 'হক' আর বিরোধিতা করা 'বাতিল'। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যের মাপকাঠি হলো কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। সম্মানিত সাহাবীগণ সত্যের মানদণ্ড নহেন বরং তাঁরা কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ। কুরআন ও সুন্নার মানদণ্ডে যাঁচাই করার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সাহাবীগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দল। তাঁদের সর্বসম্মত রায়কে আমরা এ কারণে দলিলরূপে স্বীকার করি যে, কুরআন ও সুন্নার সামান্যতম বিপরীত কাজের উপর তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আমাদের মতে অসম্ভব।"-[তরজুমানুল কুরআন, রাসায়েল ও মাসায়েল সংখ্যা ৫ খণ্ড-৫৬]

তিনি অন্যত্র লিখেন ঃ

"তানকীদের অর্থ দোষ-চর্চা করা একজন মূর্খ লোক মনে করতে পারে। কিন্তু কোনো জ্ঞানী লোক তার এ অর্থ নেবেন সেটা আদৌ আশা করা যায় না। তানকীদ শব্দের অর্থ হলো, যাঁচাই ও পরখ করা। গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত ধারায় এ অর্থের ব্যাখ্যা দেয়াও হয়েছে। তারপরও এ শব্দ দ্বারা দোষ চর্চা করার উদ্দেশ্য লওয়ার অবকাশ কেবলমাত্র একজন ফেতনাবাজ লোকের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে। অধিকন্তু এরপর বাক্যের এ ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূলকে সত্যের মাপকাঠি নির্ধারণ করার পর যাকে

www.pathagar.com

ঐ মাপকাঠিতে যে মানেই উত্তীর্ণ পাওয়া যাবে তাকে সে মর্যাদায় রাখতে হবে। তারপরও এর এ তাৎপর্য কেমন করে উৎসারিত হলো যে, আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের হাদীসে উল্লেখিত সাহাবীদের মর্যাদা ও ফযীলত অবশ্যম্ভাবী রূপে স্বীকৃত হয়নি ?"-[রেসালাহ, জামায়াতে ইসলামী কি সত্যের উপর আছে ?]

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের উপরোক্ত বাক্যাবলী এবং এর পেশকৃত ব্যাখ্যা সহজ-সরল। প্রত্যেক লেখা-পড়া জানা লোক এটা পড়ে সহজেই অনুমান করতে সক্ষম যে, এ বাক্যে সাহাবীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ ও তাচ্ছিল্য করার অবকাশ রয়েছে নাকি তাঁদের মান-মর্যাদা প্রমাণ করা হয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত তানকীদ শব্দটি নিয়ে অনর্থক হৈ হুল্লুড় করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। শব্দটির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ শুধু এটা যে, কোনো বস্তুর মৌলিক অর্থ ও প্রকৃতিকে যাঁচাই-বাছাই করা। যদি বস্তুটি প্রকৃত পক্ষে নিখাঁদ ও নির্ভেজাল হয় তাহলে এ কষ্টিপাথরে পরখ করার পর বস্তুটির শোভা-সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দ্বিগুণ ফুটে উঠবে।

কুরআনের ফায়সালা

কুরআন-হাদীসের নির্দেশানুযায়ী দলগতভাবে সম্মানিত সাহাবীগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা ওয়াযিব এবং সাহাবীগণের ঐকমত্য বা সর্বসম্মত রায় শরীয়াতের দলিল রূপে স্বীকৃত। তারপরও এর আওতায় অপর একটি বিষয় অনুসন্ধানের দাবী রাখে। বিষয়টি হলো, একেকজন সাহাবীর ভিন্ন ভিন্ন কথা ও কাজ অথবা কতিপয় সাহাবীর বিভিন্ন উক্তিসমূহ শরীয়াতের দলিল গণ্য হতে পারে কি পারে না এবং কুরআন-হাদীসের কষ্টিপাথরে যাঁচাই করা ছাড়া শুধুমাত্র সাহাবীর কথা ও কাজ হওয়ার ভিত্তিতে বিনা বাক্যে নিঃসংকোচে সেগুলো অনিবার্যরূপে অনুসরণযোগ্য মনে করা যেতে পারে কি পারে না ? এ ব্যাপারে আমরা সর্বপ্রথম যখন কুরআনের দিকে ফিরে যাই তখন দেখতে পাই যে, কুরআনের কোথাও সাহাবীগণের একক কথা ও কার্যাবলীকে আমাদের জন্যে স্বতন্ত্র আদর্শ ও উপকরণ রূপে সাব্যস্ত করা হয়নি। বরং সকল মুসলমানের সাথে সাহাবায়ে কেরামদেরকেও এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে সোপর্দ করো। فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ -আল্লাহর এ বাণীর সর্বপ্রথম সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন স্বয়ং সম্মানিত সাহাবীগণ। এ বাণীতে আল্লাহ তাআলা নিজেই ফায়সালা দিয়েছেন যে, একেকজন সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে সত্যের মাপদণ্ড নয় বরং বিতর্কাবস্থায় সাহাবীদের জন্যেও কুরআন ও হাদীসই একমাত্র মাপকাঠি।

www.pathagar.com

হাদীসের ফায়সালা

কুরআনের পর রাসূলের হাদীসের দিকে ফিরে গেলে সেখানেও সাহাবীগণের একক কথা ও কার্যাবলীর অনুসরণ করা ওয়াযিব হওয়ার কোনো দলিল পাওয়া যায় না। এতে সন্দেহ নেই যে, কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক্তেদা করার কথা বলেছেন। তবে এতে তাঁদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করা আদৌ উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খলীফায়ে রাশেদ হওয়া সুবাদে তাঁদের সেসব সুন্নাতের অনুসরণ করা জরুরী যেগুলো সাহাবীদের সম্মিলিত রায়ে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। যদি একথা সত্য না হতো তাহলে এ মনীষীদ্বয় তাদের নিজস্ব রায়ের উপর আলোচনা পর্যালোচনা করার জন্যে অন্যান্য সাহাবীদেরকে আহ্বান করতেন না এবং নিজেদের ধারণার সাথে মতপার্থক্য করার অনুমতিও দিতেন না। অধিকন্তু স্বয়ং সাহাবীগণও তাঁদের সাথে মতপার্থক্য করার দুঃসাহস করতেন না।

'আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রসম' হাদীসের পর্যালোচনা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুকরণ সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীসমূহ ছাড়া শুধুমাত্র এমন একটি রাওয়ায়েত পাওয়া যায় যা দৃশ্যত সম্মানিত সাহাবীগণের একক উক্তিসমূহ দলিল হওয়ার পক্ষে প্রমাণ হতে পারে। রাওয়ায়েতটি সাধারণত এভাবে বর্ণনা করা হয়ঃ

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم-

"আমার সাহাবীগণ তারকাসম উজ্জ্বল। তাদের যে কারো অনুসরণ করবে, তোমরা সৎপথের সন্ধান পেয়ে যাবে।"

উসূলে ফিকাহের গ্রন্থসমূহে যদিও রাওয়ায়েতটি বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে তথাপি আমার জানা মতে এমন একজন ফকীহ্ বা উসূলবিদও নেই যিনি এ রাওয়ায়েত দ্বারা সাহাবীর কথা ও কাজকে সম্পূর্ণভাবে দলিল হিসাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। উসূলবিদ আলেমগণ বরং রাওয়ায়েতটির ভিন্ন ব্যাখ্যা করে থাকেন যা উল্লেখ করার স্থান এটা নয়।

এ রাওয়ায়েতটি এবং সাহাবী ও আহলে বাইতের সমর্থনে এর সাথে সামঞ্জস্যশীল অন্যান্য রাওয়ায়েতসমূহ সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে জরুরী কথা উল্লেখযোগ্য তাহলো, মুহাদ্দিসগণ এবং রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মনীষীদের মতে এসব হাদীসের সনদ খুবই দুর্বল। এ কারণে আকীদা ও আহ্কামের ক্ষেত্রে এ ধরনের হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা জায়েয নেই। ফযীলত ও প্রশংসার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেও হাদীসগুলোর দুর্বলতার ব্যাখ্যা প্রদান ব্যতিরেকে এগুলো বর্ণনা করা ঠিক নয়। সিহাহ সাত্তা অথবা হাদীসের অপর কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এগুলোর বর্ণনা নেই। হাফেজ ইবনে আবদুল বার জামে বয়ানুল ইলম কিতাবে উপরোক্ত রাওয়ায়েতটির সনদ উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

هذا اسناد لاتقوم به حجة ـ

"এটা এমন সনদ যার উপর ভিত্তি করে হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।"

ইবনে হযম (র) আল আহকাম-এ এর রাওয়ায়েতের রাবীগণের যাঁচাই-বাছাই করার পর লিখেছেন ঃ

هذه رواية ساقطة خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قطً

"মর্যাদার দিক থেকে এটা একটি প্রক্ষিপ্ত রাওয়ায়েত। একটি মিথ্যা, জাল এবং বাতিল খবর যা সঠিক প্রমাণিত হয়নি।"

হাফেজ ইবনে হজর (র) তাখরীজে কাশশাফ গ্রন্থে এ রাওয়ায়েত এবং এ ধরনের শব্দ সম্বলিত অন্যান্য রাওয়ায়েতসমূহের সমস্ত সনদের উল্লেখ করে সেগুলোকে দুর্বল ও মনগড়া ঘোষণা করেছেন। ইমাম শাওকানী (র) ইরশাদুল ফুজুল গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় ইজমার উপর আলোচনা করতে গিয়ে এ হাদীসটির উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন। فيه مقال معروف হাদীসটির সনদ নিয়ে বেশ কথা আছে। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এর একজন রাবী অতিশয় দুর্বল আর অন্যজন ইবনে মুয়ীনের মতে মিথ্যাবাদী। আর ইমাম বুখারী (র)-এর মতে 'মাতরুক' (পরিত্যক্ত)। অপর একটি সূত্রের রাবীকে আবু হাতেম খুবই দুর্বল বলেছেন এবং ইমাম বুখারী (র) বলেছেন মুনকিরুল হাদীস তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, এর যাঁচাইয়ের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (র) খুবই কঠোর। ইবনে মুয়ীন এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ لايساوى فلساً এ রাবীর কানাকড়ি মূল্য নেই। ইবনে আদী এ রাবীর রাওয়ায়েতসমূহকে জাল সাব্যস্ত করেছেন। হাফেজ ইবনে কাইয়েম اعلام الموقعين গ্রন্থের ২য় খণ্ডে القول فى التقليد অধ্যায়ে এ রাওয়ায়েতকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন।

সাহাবীদের উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী ইমামগণের নীতি

মোটকথা, সাহাবীদের উক্তি হুজ্জত হওয়ার পক্ষে কুরআন-হাদীসে কোনো দলিল বর্তমান নেই। এ কারণেই উম্মতগণ এ বিষয়ে মোটামুটিভাবে একমত যে, যদি কোনো ব্যাপারে শুধুমাত্র একজন কিংবা কতিপয় সাহাবীর কথা বা কাজই বর্ণিত হয় তাহলেও তা শরয়ী দলিলের মধ্যে গণ্য হতে পারে না যদিও এর খেলাফ অপর কোনো সাহাবীর কথা বর্তমান না থাকে। সেটাকে কুরআন

www.pathagar.com

হাদীসের কষ্টিপাথরে যাঁচাই করা অবশ্য কর্তব্য হবে। এমনিভাবে যেসব ব্যাপারে সম্মানিত সাহাবীগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায় সে সমস্ত ব্যাপারে অবশ্যই যাঁচাই-বাছাই অনুসন্ধান ও নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে। আর যে কথা কুরআন হাদীসের মূল মানদণ্ডের সাথে যতোটুকু সামঞ্জস্যশীল হবে তা ততো অধিক গ্রহণযোগ্য হবে ও প্রাধান্য পাবে। এর মুকাবিলায় অপর কথা পরিত্যক্ত হবে। এ ধরনের গবেষণা, অনুসন্ধান এবং যাঁচাই-বাছাই করার অপর নাম তানকীদ। বিষয়টির বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করার জন্যে কতিপয় নির্ভরযোগ্য ইমাম ফকীহের কথা ও রায় এখানে উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি।

হানাফীদের নীতি

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দু'টি উক্তি মাওলানা মওদূদী (র) 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছেন। একটি উক্তি হলো, ইমাম আবু হানীফা বলেন—"কুরআন-হাদীসে যখন আমি কোনো হুকুম না পাই তখন সাহাবীদের ইজমার অনুসরণ করি। মতপার্থক্যের অবস্থায় যে সাহাবীর কথা ইচ্ছা করি গ্রহণ করি আর যাকে ইচ্ছা বর্জন করি।" ২য় উক্তি হলো, "যখন সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখি তখন কিয়াস করি।"

হানাফী মতাবলম্বী খ্যাতনামা ফকীহ শামসুল আইয়েম্মা ইমাম সারাখসী (র) তাঁর রচিত কিতাবুল উসূল গ্রন্থের ১ম খণ্ডে সাহাবীদের ইজমার উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

وانما كان الاجماع حجة باعتبار ظهور وجه الصواب فيه بالاجتماع عليه وانما يظهر هذا فى قول الجماعه لافى قول الواحد الاترى ان قول الواحد لايكون موجبا للعلم وان لم يكن بمقابلته جماعة يخالفونه ـ

"ইজমা এ কারণে হুজ্জত যে, এক কথায় ঐকমত্য হওয়ার কারণে হক ও সত্যের দিক অধিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। কিন্তু একক উক্তির ব্যাপারে তা প্রযোজ্য নয় বরং জামায়াতের উক্তিতেই তা প্রকাশ পায়। তোমরা কি দেখছো না যে, কোনো জামায়াত কর্তৃক বিরোধিতা না করা সত্ত্বেও একক হাদীস বা উক্তি এলমে জরুরী অনিবার্যরূপে প্রমাণ করে না।"

এতে প্রতীয়মান হয় যে, একক কথা দলিল নয় যদিও এর বিভিন্নতায় কিংবা বিরোধিতায় অপর কোনো উক্তি বর্তমান না থাকে। ঐ খণ্ডেরই শেষ দু' পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেব এ ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন যে, যদি সাহাবী বলেনঃ

امرنا بكذا او نهينا عن كذا او السنة هكذا ـ

www.pathagar.com

"আমাদেরকে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা নিষেধ করা হয়েছে কিংবা এটাই সুন্নাত।"

সাহাবীদের এরূপ বলা সত্ত্বেও কাজটি রাসূলের নির্দেশ কিংবা রাসূলের সুন্নাত হওয়া আবশ্যিক নয়। কেননা, হতে পারে কোনো বিশেষ আমীরের হুকুম কিংবা বিশেষ শহর বা এলাকার কাজ কিংবা পদ্ধতি এর মধ্যে উল্লেখ হয়েছে।

অতপর ইমাম সারাখসী আলোচ্য গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১০৫ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন ঃ

فصل في تقليد الصحابي اذا قال قولا ولا يعرف له مخالف -

এখানেও সাহাবীদের এমন কথার অনুসরণ করা না করার উপর আলোচনা করেছেন যাদের বিরোধিতায় অপর কোনো সাহাবীর কথা প্রসিদ্ধ নেই। এ শিরোনামের অধীনে তিনি লিখেছেন ঃ

قد ظهر من الصحابة الفتوى بالرائى ظهورً الايمكن انكاره والرائى قد يخطى فكان فتوى الواحد منهم محتملا مترددًا بين الصواب والخطاء ولا يجوز ترك الرأى بمثله كما لايترك بقول التابعي -

"সাহাবীদের রায়ের ভিত্তিতে কোনো কোনো ফতওয়া প্রকাশিত হয়েছে। এটা এমন সুস্পষ্ট কথা যা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। রায় কখনো ভুলও হয়ে থাকে। সুতরাং সাহাবীদের একক রায় ভুল নির্ভুল উভয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের ফতওয়ার মুকাবিলায় রায় পরিত্যাগ করা জায়েয নেই। যেমন, তাবেয়ীর উক্তির মুকাবিলায় কিয়াস ও রায় পরিত্যাগ করা জায়েয নেই।"

পরবর্তীতে ইমাম সারাখসী হানাফী নীতির যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তার সারকথা হলো, যখন সাহাবীর উক্তি এমনসব ব্যাপার সম্পর্কিত হবে যার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রাওয়ায়েত থাকার সম্ভাবনা থাকে। সে অবস্থায় সাহাবীর ফতওয়াকে নিজের রায়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে ব্যাপারে কিয়াসের দখল নেই, অথবা সাহাবীর উক্তি যেসব ব্যাপারে কিয়াস বিরোধী হবে অর্থাৎ কিয়াস সাধারণভাবে যে কথার দাবী করে সাহাবীর উক্তি তার বিরোধী ; এ ধরনের ব্যাপারে সাহাবীর উক্তিকেই অগ্রগণ্য মনে করতে হবে এবং কিয়াস পরিত্যক্ত করতে হবে। এর কারণ হলো, সাহাবীদের কিয়াস বহির্ভূত কিংবা কিয়াস বিরোধী উক্তির

www.pathagar.com

ব্যাপারে একথারই সম্ভাবনা অধিক যে, উক্তিটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সাহাবী কথাটি নিজের মন থেকে বলেননি। নিছক সাহাবীর উক্তি হওয়ার দরুন কথাটি গ্রহণ করা হয়নি। বরং তাঁর উক্তি রাসূলের বাণী হওয়ার নিদর্শনা এবং সম্ভাবনা বর্তমান থাকার ভিত্তিতেই গ্রহণ করা হয়েছে।

যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, হানাফী ইমামগণ সাহাবীদের উক্তি সম্পর্কে কিয়াসের বোধগম্য হওয়া এবং না হওয়া। কিয়াসানুরূপ কিংবা কিয়াস বিরোধী হওয়ার যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং যার উপর ভিত্তি করে এক ধরনের সাহাবীর উক্তিকে নিজস্ব ইজতিহাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অপর ক্ষেত্রে ইজতিহাদকে সাহাবীর উক্তির উপর অগ্রগামী করেছেন—এ সমস্ত প্রাধান্য এবং পার্থক্যও প্রকৃতপক্ষে তানকীদেরই একটি রূপ। অতপর একথাও স্মর্তব্য যে, উপরোক্ত সমস্ত আলোচনা সাহাবীদের সেসব উক্তি ও কাজ সম্পর্কিত যার খেলাফ অপর কোনো সাহাবীর কথা বা কাজ বর্তমান নেই। আর যেখানে সাহাবীর কথা বা কাজ নিয়ে মতভেদ দেখা দিবে সেখানেতো গ্রহণ ও বর্জন ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এখানেও যুক্তি ছাড়া প্রাধান্য দেয়ার নীতি অনুসৃত হতে পারে না। বরং কুরআন ও হাদীসের সাথে অধিকতর নিকটবর্তী ও সামঞ্জস্যশীল কথাকেই গ্রহণযোগ্য কথা বলে সাব্যস্ত করতে হবে। অন্য কথায় মুজতাহিদকে এমতাবস্থায়ও তাকলীদের পরিবর্তে তানকীদ ও প্রাধান্য দেয়ার নীতিই অবলম্বন করতে হবে।

শাফেয়ী মতাবলম্বীদের নীতি

এরপর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর নীতি দেখুন ! ইমাম গাযালী (র) المستصفى গ্রন্থে ১ম খণ্ডের ৩৫ পৃষ্ঠায় باب الاصل الثاني، من الاصول الموهومه قول الصحابي -সাহাবীর উক্তির অধীনে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে বলেছেন, কারো মতে সাহাবীর মযহাব সম্পূর্ণভাবে দলিল, কারো মতে কিয়াস বহির্ভূত বিষয়সমূহে দলিল আবার কারো মতে কেবলমাত্র হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি দলিল। তারপর তিনি বলেন ঃ

والكل باطل عندنا - فان من يجوز عليه الغلط والسهو ولم يثبت عصمته فلا حجة فى قوله - فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاء وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة وكيف الصو لعصمة قوم يجوز عليهم الاخلاف؟ وكيف يختلف المصومان كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز

www.pathagar.com

مخالفة الصحابة فلم ينك ابو بكر وعمر على من خالفهما بالاجهاد على كل مجتهادن اجتهاد نفسه - فانتقاء الدليل على العصمة ووقوع .. بينهم وتصريهم جواز مخالفتهم فيه ثلاثة ادلة تاطعة -

"আমাদের মতে (সাহাবীদের কথা দলিল হওয়ার) সব কয়টি মতই বাতিল। যে মানুষের দ্বারা ভুল ও ত্রুটি হওয়া সম্ভব এবং যার নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ হওয়ার প্রমাণ নেই তার কথায় কোনো দলিল নেই। সাহাবীদের যখন ভুল করা সম্ভব এবং জায়েয তখন তাদের কথা কেমন করে দলিল হতে পারে! অকাট্য দলিল ছাড়া (মোতাওয়াতের) তাদের নিষ্পাপ হওয়ার দাবী করা কেমন করে সম্ভব! মতপার্থক্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সাহাবীদের জামাতকে কেমন করে মাসুম বা নিষ্কলুষ চিন্তা করা যায়? এসব কিছু কেমন করে সম্ভবপর যখন সাহাবীগণ নিজেরাই একে অপরের সাথে মতপার্থক্য জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে ইজতিহাদকারীদের অস্বীকার করেননি বরং ইজতিহাদী ব্যাপারসমূহে প্রত্যেক মুজতাহিদ তাদের নিজস্ব ইজতিহাদের অনুসরণ করা আবশ্যিক করে দেন। সাহাবীদের মাসুম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল না থাকা এবং তাদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান থাকা এবং তাঁদের সাথে মতপার্থক্য করার ব্যাপারে তাঁদের নিজেদের ব্যাখ্যা প্রদান এ তিনটি কথা আমাদের নীতির সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ।"

অতপর ইমাম গাযালী (র) ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দু'টি উক্তির উল্লেখ করেছেন। তাঁর ১ম উক্তি ছিলো—যদি সাহাবীর উক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং সে উক্তির খেলাফ কোনো কথা বর্ণিত না থাকে তাহলে সাহাবীর তাকলীদ করা জায়েয ওয়াযিব নয়। পরবর্তীতে এ মত পরিত্যাগ করতঃ নতুন যে নীতি অবলম্বন করেন তাহলো ঃ

لايقلد العالم صحابيا كما لايقلد عالما اخر -

"আলেম কোনো সাহাবীর তাকলীদ করবে না যেমন তিনি অপর কোনো আলেমের তাকলীদ করবেন না।"

ইমাম গাযালী (র) আরো বলেছেন ঃ

وهو الصحيح المختار عندنا اذ كل مادل على تحريم التقليد العالم للعالم لايفرق فيه بين الصحابي وغيره -

www.pathagar.com

"একথাটিই আমাদের মতে সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। কেননা একজন আলেমের জন্যে অপর একজন আলেমের তাকলীদ করা যেসব কারণে হারাম, সেদিক থেকে সাহাবী ও অ-সাহাবীর মধ্যেও পার্থক্য করা যায় না।"

ইমাম গাযালী (র) অতপর সে সকল লোকদের দলিলসমূহের উল্লেখ করছেন যারা সাহাবীদের মর্যাদা ও প্রশংসা সম্বলিত আয়াত ও হাদীসসমূহের দ্বারা সাহাবীদের তাকলীদ করা জায়েয কিংবা আবশ্যিক মনে করেন। তাদের জবাবে তিনি বলেছেন ঃ

قلنا هذا اكله ثناء يوجب حسن الاعتقاد فى علمهم ودينهم ومحلهم عند الله تعالى ولا يوجب تقليد هم لاجوازا ولا وجوبا ـ

"আমাদের কথা হলো, এগুলোর সবই তাদের আমল, দীনদারী এবং আল্লাহর কাছে তাঁদের মর্যাদাবান হওয়ার সুধারণা রাখার অপরিহার্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু এতে তাঁদের তাকলীদ করা জায়েয কিংবা ওয়াযিব কোনোটাই অপরিহার্য করে না।"

এরপর এ জবাব সমাপ্ত হয় ঃ

كل ذالك ثناء لايوجب الاقتداء اصلا ـ

"এগুলোর সবই প্রশংসা ও স্তুতিমূলক। তাতে এক্তেদা বা অনুসরণ করা আদৌ অপরিহার্য করে না।"

আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদীর রায় الاحكام فى اصول الاحكام গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে মযহাবে সাহাবীর আলোচনার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। রায় হলো, সাহাবীর উক্তি অ-সাহাবীর জন্যে হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। আশারায়ে মুতাযিলা, ইমাম শাফী (র) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের এক মত এবং ইমাম আবুল হাসান হানাফী (র)-এর মতে সাহাবীর উক্তি দলিল নয়। কারো মতে কিয়াস বিরোধী কথা দলিল। আবার কারো মতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা দলিল। তারপর তিনি বলেছেন ঃ

والمختار امتناع ذالك مطلقا ـ

"গ্রহণযোগ্য কথা হলো, সাহাবীর উক্তি কখনো হুজ্জত নয়।"

www.pathagar.com

পরবর্তীতে তিনি المسئلة الثانيه শিরোনামে প্রশ্ন করেন, মযহাবে সাহাবী বাধ্যতামূলক দলিল না হওয়া যখন প্রমাণিত তখন অ-সাহাবীদের জন্যে তাঁদের তাকলীদ করাও কি জায়েয ? জবাবে তিনি বলেছেন ঃ

والمختار امتناع ذالك مطلقا ـ

"গ্রহণযোগ্য কথা হলো, তাবেয়ীন ও মুজতাহিদদের জন্যে সাহাবীদের তাকলীদ করা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ।"

ইমাম শাওকানী (র)

ইমাম শাওকানী (র) সাহাবীর উক্তি সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করে বলেন ঃ

والحق انه ليس بحجة ـ فان الله سبحانه لم يبعث الى هذه الامة الانبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وليس لنا الا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الامة مأمور باتباع كتابه وسنة نبيه ولافرق بين الصحابة ومن بعد هم فى ذالك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعيه وباتباع الكتاب والسنة فمن قال انها تقوم الحجة فى دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع اليهما فقد قال فى دين الله بما لايثبت ـ

"সত্য কথা হলো, সাহাবীর উক্তি হুজ্জত নয়। পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্যে কেবলমাত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। আমাদের জন্যে একজন নবী এবং একটি মাত্র কিতাব। গোটা জাতি আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাতের অনুসরণের জন্যে আদিষ্ট। এ ব্যাপারে সাহাবী ও অ-সাহাবীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জাতির সকলেই শরীয়াতের ধারক এবং কুরআন ও হাদীসের বাহক। যে কেউ একথা বলে যে, আল্লাহর দীনে কুরআন-হাদীস কিংবা এ দু'য়ের সমর্থনে যাকিছু আছে সেগুলো ছাড়া অন্য কিছু দ্বারাও হুজ্জত প্রমাণ করা সম্ভব দীনের ব্যাপারে এ জাতীয় কথা ভিত্তিহীন।"—[৫ম আলোচনা]

শাহ ওলীউল্লাহ (র)

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (র) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার ১ম খণ্ডের শেষ ভাগে التنبيه على مسائل শিরোনামে এক পরিচ্ছেদের আওতায় বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

قد سح اجماع الصحابة كلهم اولهم عن اخرهم واجماع التابعين اولهم عن اخرهم واجماع تابعن التابعين اولهم عن اخرهم على لامتناع والمنع من ان يقصد منهم احد الى قول انسان منهم او ممن قلهم فياخذه كله -

"সাহাবীদের ১ম থেকে শেষাবধি তাবেয়ীদের ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত এবং তাবে তাবেয়ীদেরও ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই একথার উপর পূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত যে, তাদের সকলের মধ্যে কোনো একজনও নিজে কিংবা তাদের আগের লোকদের কোনো একজনের কথার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং সেটাকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।"

শাহ্ সাহেব অতপর اليواقيت والجواهر থেকে মযহাবী ইমামগণের নিম্নোক্ত অভিমত উল্লেখ করেছেন ঃ

امام مالك : ما من احد الا وهو ماخوذ من كلامه ومردود عليه الارسول الله صلى الله عليه وسلم -

"ইমাম মালেক (র)-এর উক্তি ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া এমন কোনো লোক নেই যার কথার কিছু অংশ গ্রহণযোগ্য আর কিছু অংশ বর্জনীয় না হবে।"

ইমাম শাফী (র) ঃ

لاحجة فى قول احددون رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারো কথা দলিল নয়।"

ইমাম ইবনে হাম্বল ঃ

ليس لاحد مع الله ورسوله كلام -

"কারো কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার সমকক্ষ বা বরাবর নয়।"

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং কতিপয় উদ্ধৃতি এ সত্য প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট যে, দীনের অবশ্য স্বীকৃত দলিল ও প্রমাণ হলো কুরআন এবং হাদীস অথবা সাহাবীদের ইজমা বা ঐকমত্য। এক কিংবা কতিপয় সাহাবীর কাজ ও কথাকে কুরআন-হাদীস ও সাহাবীদের ইজমার মতো অকাট্য দলিল এবং তানকীদের উর্ধে মনে করা যায় না এবং সেগুলোকে শর্তহীনভাবে গ্রহণ করাও ঠিক নহে। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে যে মৌলিক কথা ব্যক্ত করা হয়েছে তার

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতে যদি কোনো অতিরিক্ত কথা বের করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটা এতোটুকু এবং একথা সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক যে, তাতে সাহাবীদের অবমাননা করা অপরিহার্য হয়নি এবং তা দ্বারা সলফের নীতিরও বিরোধিতা হয়নি। জামায়াতের গঠনতন্ত্র সদস্যদের আকীদা ও দৃষ্টিভংগী সীমানা কেবল এতোটুকু নির্ধারণ করতে চায় যে, তারা যেনো নবী ও অ-নবীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে এবং অ-নবীকে তানকীদের ঊর্ধে মনে না করে। তা থেকে জোরপূর্বক এ তাৎপর্য বের করা সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি যে, জামায়াতের প্রত্যেকের জন্যে এটা জরুরী কিংবা জায়েয হয়ে গেছে যে, তারা সাহাবীর একক কিংবা বিতর্কিত বিষয়সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। গঠনতন্ত্রে এ বাক্যের সংযোজন এবং জামায়াতের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ অবধি এমন একটি উদাহরণও উপস্থিত করা যাবে না যে, জামায়াতের কোনো রুকন এ বাক্যের কদর্থের সুযোগে কোনো সাহাবীর কথা ও কাজের ব্যাপারে অবজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় মন্তব্য করেছে কিংবা কোনো সম্মানিত সাহাবীর ব্যাপারে সামান্যতম বে-আদবী পূর্ণ আচরণ করেছে।

উপরোল্লেখিত লেখায় যাকিছু পেশ করা হয়েছে তাতে আদৌ এ দাবী করা হয়নি যে, হযরত সাহাবীগণের আছার এবং উক্তিসমূহ কোনো স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এগুলোর অন্তরালে আমাদের জন্য কোনো পথ নির্দেশনাই বিদ্যমান নেই। উপরে যে সকল মনীষীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সাহাবীদের আছারসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার পক্ষপাতি। জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির নীতি বা দৃষ্টিভংগি আদৌ এ ধরনের নহে। জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্যের প্রতি যে কেউ দৃষ্টি দিলে সহজেই তিনি অনুমান করতে সক্ষম হবেন যে, সেসব লেখায় জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী পেশ করার জন্যে কুরআন-হাদীসের সাথে কেবলমাত্র সাহাবীদের আছারই নয় বরং তাবেয়ীন, মুহাদ্দিসীন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তিসমূহ ও দলিলরূপে পেশ করা হয়েছে। সত্য কথা হলো, এসব ভাণ্ডার আমাদের সবচেয়ে মূল্যাবান পুঁজি ও অমূল্য সম্পদ, যার সুফল অবদান ও প্রয়োজনীয়তা থেকে কোনো অবস্থায়ই আমরা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। আলোচনা শুধু একথায় যে, প্রকৃতিগতভাবে সাহাবীর প্রতিটি কথা মাত্রই কুরআন-হাদীসের ন্যায় অবশ্য পালনীয়। নাকি সেটা গ্রহণ করার আগে কুরআন-হাদীসের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যতা আছে তা দেখা জরুরী ?[১]

১. ১২৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের আলোচনায় মাওলানা বদরে আলম মাদানীর উক্তি দেখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

দুই

(প্রশ্নোত্তর)

সাহাবীদের অবমাননার ভিত্তিহীন অপবাদ

প্রশ্ন ঃ বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেবের কোনো কোনো লেখাকে কেন্দ্র করে তাঁর এবং জামায়াতে ইসলামীর খেলাফ কোনো কোনো লোক দীর্ঘদিন যাবত প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের উপর সাহাবা কেরামের অবমাননার দোষ চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হয়েছে। মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব প্রথমে 'ইসলামী রেনেঁসা আন্দোলন' গ্রন্থে লিখেছিলেন, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সেসব বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলেন না যেসব বৈশিষ্ট্য তাঁর অগ্রগামী খলীফাদ্বয়কে প্রদান করা হয়েছিলো। 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' বইয়েও একথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পলিসি থেকে দূরে সরে গিয়ে যে নীতি অবলম্বন করেন তা কৌশলগত দিক থেকেও ছিলো অনোপযোগী এবং বাস্তবেও তা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। তিনি নিজের আত্মীয়দেরকে বড় বড় পদ এবং উপঢৌকন দান করেন যার ফলে নানা ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়। এ ব্যাপারে মারওয়ানেরও সমালোচনা করা হয়।

এমনিভাবে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মাওলানা লিখেছেন ঃ তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান সম্পর্কেও 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে কতিপয় সমালোচনামূলক মন্তব্য বর্তমান আছে। এ সমুদয়, কথা-বার্তাকে সম্মানিত সাহাবীগণের শানে বে-আদবী এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশের নামান্তর বলা হয়েছে। 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে যেসব ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে সেগুলোর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী শাসনামলের সাথে সিদ্দীকি ও ফারুকী শাসনামলকে যেভাবে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে অন্যান্য কোনো লেখক কিংবা ঐতিহাসিকের লেখায়ও এ ধরনের ব্যাখ্যার উদাহরণ পাওয়া যাবে কি ? আর সেখানেও এ ধরনের সমালোচনা পাওয়া যাবে কি যাবে না ? যদি এর কোনো উদাহরণ পেশ করা যায় তাহলে সম্ভবত সেসব লোকদের জন্যে সেটা সান্ত্বনাদায়ক হতে পারে যারা জিদের বশবর্তী নয় বরং নিছক প্রচারণার শিকার।

জবাব ঃ মরহুম মাওলানা মওদূদী (র) প্রণীত গ্রন্থ খেলাফত ও রাজতন্ত্রের (নতুন সংস্করণ) পরিশিষ্টে এমন উপাদান রয়েছে যা একজন সত্যনিষ্ঠ লোকের

www.pathagar.com

সান্ত্বনার জন্যে যথেষ্ট। তদুপরি আমি কতিপয় ব্যাখ্যা আমার পক্ষ থেকে সংযোজন করে দিচ্ছি। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা অপর কোনো সাহাবী সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (র)-এর কলমে এমন কোনো কথা লেখা হয়নি যা (মাআযাল্লাহ) নিন্দা চর্চা, কিংবা তিরস্কার ভর্ৎসনার শিরোনাম দেয়া যেতে পারে। মাওলানা মরহুম যাকিছু লিখেছেন অনুরূপ কথা পূববর্তী থেকে পরবর্তী সময়ের আহলে সুন্নাত জামায়াতের ইমামগণ এবং ইতিহাসবিদ ও জীবন চরিত রচয়িতাগণ লিখে আসছেন। বরং কোনো কোনো উক্তি তো এ থেকেও কঠোরভাবে লেখা হয়েছে। এর ২/১টি নয় বরং বেশ কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা সম্ভব। তবে আমার ইচ্ছা, সর্বপ্রথমে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রচিত মিনহাজুস সুন্নাহর কতিপয় উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করে দেয়া। শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেব এবং তাঁর লেখাকে আমি দু'টি কারণের উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করেছি। প্রথম কারণ হলো, মাওলানা মওদূদী (র)-এর বিরুদ্ধে যেসব হযরত তাদের কলম ও ভাষা লাগামহীনভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে ইবনে জারীর (র), ইবনে আবদুল বার (র) এবং ইবনে কাসীর (র) প্রমুখদের মতো সম্মানিত ব্যক্তিত্বও এহেন বাড়াবাড়ি থেকে রেহাই পায়নি। তবে সুখের কথা যে, সেসব হযরতদের কাছে এখনো ইবনে তাইমিয়া (র) বিশেষতঃ তাঁর রচিত মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থের সমাদর স্বীকৃত এবং তারা তাতে বিভিন্ন জায়গায় শায়খুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর উপরোক্ত কিতাবের বাক্যাবলী উল্লেখ করে থাকেন। আমার নির্বাচনের ২য় কারণ হলো, সহস্র পৃষ্ঠার অধিক সম্বলিত গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে একজন শিয়া লেখকের উত্তরে লিখিত হয় এবং এতে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষপাতিত্বের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করা হয়নি। এমনকি মারওয়ান ও ইয়াযীদের পক্ষে যত সাফাই পেশ করা সম্ভব তাতেও কসুর করা হয়নি। এ বিষয়ের উপর অনাগত লেখকদের সকলেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর শিষ্য সাদৃশ।

মিনহাজুস সুন্নাহর চতুর্থ এবং শেষ খণ্ডের একটি অধ্যায়ে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সত্য-মিথ্যা যাঁচাইয়ের মাপকাঠি সনদের প্রেক্ষিতে কি হওয়া উচিত। এ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে ঃ وهنا طريق يمكن سلوكها لمن لم تكن له معرفة بالاخبار... ইবনে তাইমিয়াহ (র) এখানে প্রথমত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবন চরিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তিনি খেলাফতের আসন এমন অবস্থায় ছেড়ে যান যে, কাউকে প্রাধান্য দেয়ার নীতি সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন এবং নিজের কোনো আত্মীয়কেও এ পদের অধিকারী নিযুক্ত করেননি। তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

لم يتلوث لهم بمال ولا ولّى احدا من اقاربه ولاية فهذا امر يعرفه كل احد واما عثمان فانه بنى على امر قد استقر قبله بسكينة وحلم وهدن ورحمة وكرم ولم يكن فيه قوة عمر ولا سياسته ولا فيه كمال عدله وزهده فطمع فيه بعض الملمح وتوسعوا في الدنيا وضعف خوفهم من الله ومنه ومن ضعفه هو وما حصل من اقاربه في الولاية والمال ما اوجب الفتنة حتى قتل مظلوما شهيدًا -

"হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে সম্পদের মোহে জড়ানোর পন্থা পরিহার করেন এবং কোনো আত্মীয়কে ক্ষমতা প্রদান করেননি—একথা সকলেরই জানা। অবশ্য হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বচ্ছ, সহনশীলতা, সঠিক পথে চলা, উদারতা ও অনুকম্পার আশ্রয়ে প্রশাসন চালাতে থাকেন যা তাঁর আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। তবে তাঁর মধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় শক্তি ছিলো না, ছিলো না তাঁর মতো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, আরো অনুপস্থিত ছিলো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় পূর্ণ মাত্রার যুহদ ও ইনসাফ। ফলে কোনো কোনো লোক তাঁর ছত্রছায়ায় অবৈধ ফায়দা হাসিল করে এবং পার্থিব স্বার্থের সন্ধানে মগ্ন হয়ে যায়। তাদের মধ্যে আল্লাহ ও খলীফা ভীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুর্বলতার ফলে তাঁর আত্মীয়গণ যে পদ ও সম্পদ লাভ করেন তাতে তারা ফেতনার সৃষ্টি করে ; এমনকি তিনি নিগৃহীত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন।"-[মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, মিসর, ১৩২২ হিজরী]

একই অধ্যায়ে পরবর্তী ১২৭ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন ঃ

وكان ابو بكر وعمر افضل سيرة واشرف سريرة من عثمان وعلى رضى الله عنهم اجمعين فلهذا كانا ابعد عن الملام واولى بالثناء العام حتى لم يقع في زمنها شيئ من الفتن -

"হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চারিত্রিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা উত্তম ও উচ্চতর ছিলেন। এ কারণেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিন্দা থেকে নিরাপদ এবং সাধারণভাবে প্রশংসার উপযোগী ছিলেন। আর এ কারণেই তাঁদের উভয়ের শাসমানলে কোনো ফেতনা ও অনাসৃষ্টি দেখা দেয়নি।"

www.pathagar.com

মিনহাজুস সুন্নার একই ৪র্থ খণ্ডে قال الرافضي الخامس اخياره بالغلب বাক্য দ্বারা একটি পরিচ্ছেদের সূচনা হয়। তার ১৭৯ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত বাক্য রয়েছে।

ولم يتهم احد من الصحابة والتابعين معاوية بنفاق واختلفوا في ابيه -

"সাহাবী ও তাবেয়ীদের কেউ মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর মুনাফেকী করার অপবাদ আরোপ করেননি। তবে তাঁর পিতা সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।"

আমি উপরোল্লেখিত কথাগুলো অপবাদ আরোপকারী এবং ফতওয়াবাজ হযরতদের খেদমতে তুলে ধরতে চাই ; দেখি, তারা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর ব্যাপারে কি রকম ফতওয়া জারি করেন ?

আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন তাবারী শাফী (র)-এর তাঁর الرياض النضره في مناقب العشره শীর্ষক গ্রন্থে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে হযরত সায়ীদ বিন মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যে কথা উল্লেখ করেছেন তা খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের পরিশেষে বর্তমান আছে। এতে প্রমাণ হয় যে, সাহাবীগণ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কর্মনীতি পসন্দ করতেন না। তিনি বনী উমাইয়ার বহু সংখ্যক অ-সাহাবীকে উচ্চপদে নিয়োগ করেন। উচ্চপদে আসীন সে সকল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অপসন্দনীয় কার্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। কিন্তু এদিকে খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্বেও এ সবের প্রতিকার করা হয়নি। রিয়াজুন নোদরাহ সম্পর্কে আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, বইটির আসল উদ্দেশ্য ইতিহাস চর্চা নয়, এর লক্ষ্য বরং খারেজী ও শিয়া আকীদা বাতিল করা এবং সুন্নী আকীদার সত্যতা প্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গেই এটি লিখিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০জন সাহাবীকে বেহেশতে প্রবেশ করার যে বিশেষ শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন এবং জামায়াতে আহলে সুন্নাত যাদেরকে আশারায়ে মুবাশশারাহ উপাধিতে স্মরণ করে থাকেন তাদের মর্যাদা ও ফযীলত এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

হাফেজ মুহিব্বুদ্দীন তাবারী (র)-এর উক্তির উপর ভিত্তি করে মোল্লা আলী কারী (র) মিরকাতের ব্যাখ্যা মিরকাতের ফযীলত অধ্যায়সমূহে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবন চরিতের পার্থক্য বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

وان اتفق خلاف ذالك في بادي النظر رجعوا اليه في ثانية مستصوبين رايه معترفين بانّ الحق كان معه، كما في قتال اهل الردّه او نحو ذالك وهذا

www.pathagar.com

المعني فقد في عثمان - فانهم خالفوا رايه في كثير من وقايعه ولم يرجعوا اليه بل اصروا على انكارهم عليه حتى قتل وكان مع ذالك على الحق ما شهدت به لاحاديث وكان رجلا صالحا على مادل هذا الحديث فالنقص انما كان عما يثبت للشيخين قبله - كذا احققه الطبرى فى الرياض النضره

"আপাত দৃষ্টিতে সাহাবীগণের সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতপার্থক্য দেখা দিলেও ২য় বার চিন্তা-ভাবনার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতকে সঠিক মনে করে তাঁরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এটাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেন। মুরতাদদের ব্যাপারে যেমন হয়েছিলো। একথা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বেলায় এ বিষয় বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাহাবী নন বহু ব্যাপারে তাঁর মতের সাথে মতপার্থক্য করেন এবং ভিন্ন মত পোষণ করেন। শেষাবধি অস্বীকৃতি ও অনৈক্যের উপর দৃঢ় থাকেন এমনকি তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও সত্যানুরাগী হাদীসসমূহ এর প্রমাণ। এ হাদীসের আলোকেও তিনি ছিলেন উত্তম লোক। তার পূর্বসূরী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডের ভিত্তিতেই কেবল তাঁর মধ্যে অপূর্ণতার আপেক্ষিকতা ছিলো। তাবারী (র) তাঁর রিয়াজুন নোদরা গ্রন্থে এ সম্পর্কিত পর্যালোচনার কথাই ব্যক্ত করেছেন।"

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) কর্তৃক রচিত ازالة الخفاعن خلافة الخلفاء গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়েও এটাই। এতেও খারেজী ও শিয়া দৃষ্টিভংগীর রদ, খেলাফতে রাশেদার যৌক্তিকতা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনদের কার্যাবলী ও কর্মতৎপরতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এবার উক্ত গ্রন্থের ১ম মাকসাদের ১৫০ পৃষ্ঠার বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

سیرت حضرت ذی النورینؓ بہ نسبت سیرت شیخین مغایرتے داشت، زیرا کہ گاہے از عزیمت برخصت تنزل می نمود و امراء حضرت ذی النورینؓ نہ بصفت امراء شیخین بودند-

"হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বভাব-প্রকৃতি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বভাব থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলো। কেননা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো সময়

www.pathagar.com

কঠোরতার পরিবর্তে নমনীয়তার আশ্রয় নিতেন এবং তাঁর কর্মকর্তা ও শাসকগণের মধ্যে শাইখাইনের নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের ন্যায় গুণবৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিলো না।"

শাহ ওয়ালী উল্লাহর স্বার্থক উত্তরসূরী শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভীও (র) শিয়া মতাবলম্বীদের জবাবে তোহফায়ে 'ইসনা আশারীয়া' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সুস্পষ্টভাবে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমনিভাবে তিনি তাঁর ফতওয়ায় এবং অন্যান্য লেখার কোনো কোনো জায়গায় লিখেছেন যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বার্থপরতার ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত ছিলেন না। আমি নিম্নে আহলে হাদীসের শীর্ষস্থানীয় আলেম নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব (র)-এর একটি লেখার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। লেখাটিতে শাহ সাহেবের উক্তির উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে এটা আহলে হাদীস এবং আহনাফ সকলের দৃষ্টিতে গুরুত্বের অধিকারী মরহুম নবাব সাহেব তাঁর প্রণীত 'হিদায়াতুস সায়েল ইলা আদিল্লাতিল মাসায়েল' গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় প্রথমত লিখেছেন, মারওয়ান হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত নোমান বিন বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ছিলো। এ ব্যাপারে তিনি মারওয়ানের খেলাফ ইমাম যাহবী, ইবনে হাযম এবং ইবনে হাব্বানের কঠোর মন্তব্য উল্লেখ করেন। তারপর তিনি বলেন ঃ

این اعتذار کہ قتل طلحہ بتاویل کرد عذری ہست کہ با وجودش ہیچ معصیت
برائے ہیچ عاصی باقی نمی ماند بلکہ برائے وی دعوئ تاویل میرسد و این ہمچو تاویل
کسی ست کہ از طرف معاویہ در فواقیر وی تاویل کردہ و گفتہ کہ وی در بغی خود مجتہد
بود و در عواصم نوشتہ " وقد اعترف اهل الحدیث باجمعهم ان المحاربین
لعلی رضی الله عنه معاویة وجمیع من تبعه بغاة علیه وانه صاحب
الحق، انتہی ـ گویم مختار شاہ عبد العزیز دہلویؒ در بعض افادات خودش نیز
ہمین ست کہ حرب معاویہ با علی کرم اللہ وجہہ خالی از شائبہ نفسانیت نبود
و قول بخطائے اجتہادی ضعیف است ـ

www.pathagar.com

"মারওয়ানের পক্ষ থেকে এ ওজর পেশ করা যে, সে হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে হত্যা করেছিলো —এটা এমন ওজর যা পেশ করে প্রত্যেক অপরাধীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করা সম্ভব এবং তার পক্ষ থেকে বিশ্লেষণের দাবী করা যেতে পারে। এ ব্যাখ্যা সে ব্যক্তির ব্যাখ্যার মতোই যে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভুল কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দিয়ে বলে যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ছিলো ইজতিহাদের ভিত্তিতে। মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম ওয়াযীর আওয়াসেমে লিখেছেন, "মুহাদ্দিসগণ সকলের নিকট স্বীকৃত যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং যুদ্ধরত তার সমস্ত সংগী-সাথী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিদ্রোহী ছিলেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হক ও ন্যায়ের উপর।" আমি (নবাব সিদ্দীক হাসান সাহেব) বলছি, শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র)-এর বিবৃতিসমূহের মধ্যেও গ্রহণযোগ্য কথা এটাই যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া স্বার্থের ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত ছিলো না। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভুল ছিলো ইজতিহাদী—একথাটাও জয়ীফ।"

প্রশ্ন হলো, যে সকল মনীষী আহলে সুন্নাতের ইমাম এবং শিয়াদের মুকাবিলায় সুন্নী নীতির যোগ্যতম সমর্থক ও প্রচারক রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে ঃ তাঁরা যদি উপরোল্লেখিত উক্তিসমূহের কেবলমাত্র বর্ণনাকারীই নহেন বরং সমর্থনকারীও এবং তাদের সেসব উক্তি শিয়াদের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থে লিখা হয়, তাহলে মাওলানা মওদূদী (র) খেলাফত ও রাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক আলোচনা প্রসংগে যদি এ ধরনের কিছু লিখেন তাতে এমন কি অন্যায় করে বসলেন ? মর্যাদা অনুযায়ী সাহাবীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াযিব কিন্তু তাঁরা মাসুম ছিলেন না। তাঁদের কোনো কোনো ভুলের কথা স্বয়ং কুরআনে উল্লেখ আছে যা কোনো মুসলমানের অস্বীকার করার উপায় নেই। মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহাবীদের সম্পর্কে যে কথাই লিখেছেন তা সাহাবীদের যথাযথ মর্যাদা বজায় রেখে সতর্কতার সাথে লিখেছেন। কোনো জ্ঞানবান এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এটাকে সাহাবীদের অবমাননার পরিচায়ক বলে আখ্যায়িত করতে পারবে না।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্বজনদের সাথে যে দানশীল আচরণ প্রদর্শন করেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মপদ্ধতির সাথে তুলনা করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী

www.pathagar.com

(র) এটাকে শুধুমাত্র অসাবধানতা এবং অনুত্তম হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি একথা বলেননি যে, এটা শরয়ী হুকুমের খেলাফ বা নিষিদ্ধ ছিলো। এ প্রসঙ্গে তার নিজস্ব ভাষায় ঃ

"আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শরয়ী আহকামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হিসেবে স্বীয় আত্মীয়দের সাথে যে আচরণ করেছেন তার কোনো অংশকেই শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাজায়েয বলা যায় না। আর খলীফা তাঁর আত্মীয়দের সরকারী পদে নিয়োগদানের অধিকারী নহেন, শরীয়াতে এমন কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ বর্ণিত নেই। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন কিংবা রাজকোষ থেকে সাহায্য প্রদান করার এমন কোনো সুনির্দিষ্ট আইন ছিলো না তিনি যার বরখেলাফ করেছেন। এ কারণে তাঁর উপর এ অপবাদ আরোপ করা আদৌ সঙ্গত নহে যে, এ ব্যাপারে তিনি সীমা লংঘন করেছেন। কিন্তু এটাও কি অস্বীকার করা সম্ভব যে, কৌশলগত দিক থেকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে যে আচরণ বিধি গ্রহণ করেছিলেন এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সম্ভাব্য সকল উত্তরাধিকারীর প্রতি উপদেশ দিয়েছিলেন সেটাই ছিলো সবচেয়ে সঠিক ও সর্বোত্তম ?"-[খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃষ্ঠা–৩২২]

মরহুম মাওলানার মতে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চরিত্রের এ একটি মাত্র দিকই তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে ভিন্নতর ছিলো। অন্যথায় সার্বিক অর্থে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শাসক ও খলীফায়ে রাশেদ। তাঁর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

"সত্য হলো, এ চরম সংকটপূর্ণ অবস্থায় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন কর্মনীতি অবলম্বন করেন যা একজন খলীফা এবং একজন বাদশার মধ্যকার পার্থক্যকে সুস্পষ্ট আকারে তুলে ধরে। তাঁর জায়গায় কোনো বাদশাহ হলে তিনি স্বীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে যে কোনো পদক্ষেপ নিতে ও রাজনৈতিক খেলায় মেতে উঠতে বিন্দুমাত্র ভয় পেতেন না। প্রয়োজনে তাঁর আত্মরক্ষায় পবিত্র মদীনা নগরী ধূলিস্মাৎ করে দিতে, আনসার ও মুহাজিরদের নির্বিচারে হত্যা করতে, উম্মুল মু'মিনীনদের অবমাননা করতে এমনকি মসজিদে নববীও মাটির সাথে মিশিয়ে দিতেও কোনো পরওয়া করতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যের দিশারী খলীফা রাশেদ। অরাজকতার চরম মুহূর্তেও তিনি একথার গুরুত্ব বিস্মৃত হননি যে, একজন ধর্ম পরায়ণ আল্লাহভীরু শাসক

www.pathagar.com

আপন ক্ষমতা বজায় রেখে কতটুকু অগ্রসর হতে পারেন এবং সীমার কোন্ পর্যায়ে পৌঁছে তাঁর থেমে যাওয়া উচিত। তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করাকে এ থেকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন যে, তার কারণে সেসব মান-সম্মান ধ্বংস হয়ে যাক যা একজন মুসলমানের কাছে বস্তুনিচয় অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।"-[খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃষ্ঠা-১২০]

যার অন্তরে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবজ্ঞা ও অসম্মান করার সামান্যতম অনুভূতি বিদ্যমান রয়েছে তার লিখা ও ভাষায় এ জাতীয় আবেগ প্রকাশ পাওয়ার আশা করা অর্থহীন নয় কি ? সম্মান ও অসম্মান করার চেতনা এক সাথে কারো অন্তরে একত্রিত ও ঠাঁই পেতে পারে কি ?

আসল কথা হলো, কারো প্রতি অবমাননা ক্রিয়ার সম্পর্ক ভাষা ও বচন অপেক্ষা বক্তার নিয়ত ও মানসিক অবস্থার সাথে অধিক সংশ্লিষ্ট। হতে পারে একজন লোক কোনো বিশেষ ঘটনা বা বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে এমন একটি বিশ্লেষণ পন্থা অবলম্বন করেন যা তার মতে শালীনতার আওতাভুক্ত কিন্তু অপর ব্যক্তি এর মধ্যে কোনো সীমালংঘন অনুভব করেন। তবে কোনো আল্লাহভীরু মুত্তাকী মুসলমান তার একজন দীনি ভাই সম্পর্কে এহেন কুধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, জ্ঞাতসারে সে এমন মহান ব্যক্তিত্বের অবজ্ঞা ও অসম্মানে জড়িয়ে যেতে পারে—যাদের মহব্বত ভক্তি-শ্রদ্ধায় প্রতিটি মুসলমান বিগলিত প্রাণ। কাউকে তাঁর অবজ্ঞাকারী সাব্যস্ত করার অর্থ হলো, সে জ্ঞাতসারে তাঁকে অপমান করলো এবং সে মহান মত্বের প্রতি তাঁর হৃদয়ে সম্মানবোধের চিহ্ন মাত্র নেই। কোনো একটি বাক্য কিংবা কতিপয় বাক্যের উপর ভিত্তি করে তার উপর এতোবড় অপবাদ আরোপ করা কি সঙ্গত ? সে ক্ষেত্রে সে লোকটির সারা জীবনের অজস্র লেখা, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং আপ্রাণ প্রচেষ্টা কেবল সে সকল মনীষীদের প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা এবং তাদের আদর্শ অনুসরণের প্রতি দুনিয়াবাসীকে আহ্বান করতে ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু আজকে আমাদের অত্যন্ত দুভার্গ্য যে, ধর্মীয় মহলে একজন অপরের বিরুদ্ধে খোদার অবজ্ঞা, নবীদের অবজ্ঞা, সাহাবীদের অবজ্ঞা করার অপবাদসমূহ অবাধে এবং এতো বেশী পরিমাণে আরোপিত হচ্ছে যে, তা যেন বাচ্চাদের খেলার সামগ্রীতে পরিণত হয়ে গেছে। প্রতিটি দীনি জামাত অপরের বক্তব্য ছাঁটাই করে কিংবা পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে কিছু লেখা সংগ্রহ করতঃ তা থেকে কুফরী ও পথভ্রষ্টতা আবিষ্কার করা হচ্ছে। বেরলভী, দেওবন্দী এবং আহলে হাদীস সকলেই এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রতিটি দল এ ধরনের হাতিয়ারের আঘাতে নিজেরা জর্জরিত, আর দিন-রাত সে অভিযোগেও

www.pathagar.com

সোচ্চার। কিন্তু অপরের বিরুদ্ধে একই অস্ত্র প্রয়োগে বিরতিরও চিহ্ন নেই। শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) এবং অপরাপর কোনো কোনো বুযূর্গের বক্তব্য নিয়ে যে দু' তরফা আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তার মূল রহস্য কার কাছে অজ্ঞাত ? যে যুক্তির ভিত্তিতে আজকে মরহুম মাওলানা মওদূদীকে নবীগণ ও সাহাবীগণের নিন্দাকারীরূপে চিত্রিত করা হচ্ছে ঃ ঠিক অনুরূপ একই দলিলের ভিত্তিতে দেওবন্দী ওলামাগণকে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই নয় বরং আল্লাহর নিন্দাকারীরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে, তাদের মতে (আকাবেরে দেওবন্দ) নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন এবং শয়তানের ইলম নবীর ইলমের চেয়ে বেশী। আল্লাহর মিথ্যা বলার সম্ভাবনা, ইলমে গাইব এবং এ ধরনের বিষয়ের উপর গাদায় গাদায় বই-পুস্তক লেখা হয়েছে।

একদিকে এক পক্ষ দীনের নাম নিয়ে পারস্পরিক কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি এবং ছুঁতানাতায় মুসলমানদেরকে কাফের-ফাসেকরূপে আখ্যায়িত করতে ব্যস্ত, অপরদিকে এ সুযোগের আড়ালে নাস্তিক, যিন্দীক এবং দীনের শত্রুগণ আল্লাহ, রাসূল এবং সাহাবীদের সাথে সম্পৃক্ত ও স্মরণীয় সকল বস্তুকেই প্রকাশ্যে উপহাস ও অবজ্ঞা করা এবং সেটাকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়ার অবকাশ পেয়ে দারুণ কর্মতৎপর। সত্যানুরাগী, সংবেদনশীল ও আত্মমর্যাদাশীল এই মুসলিম জাতি যদি এখনো জাগ্রত হতো এবং এ অবস্থার সংশোধনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতো, তাহলে কতইনা উত্তম ছিলো।

(তৎকালীন) পূর্ব পাকিস্তানে যে বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে গেলো তাতে যদিও জনগণের অপতৎপরতা এবং ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের বিরাট ভূমিকা ছিলো ; তথাপি আলেমগণও এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। দেওবন্দী আলেমগণের যতোটুকু প্রভাব এখানে বিস্তৃত ছিলো তার সবটুকুই মাওলানা মওদূদী (র) এবং জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতায় প্রয়োগ করা হয়। মুসলমানদের অন্তরে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহজাল সৃষ্টি করা হয়। দেওবন্দ থেকে প্রচারিত জামায়াত বিরোধী ফতওয়া উর্দু ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বহুল পরিমাণে প্রচার করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে বসে বহু আলেম জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে কিছুটা ঐকমত্য ও নমনীয়ভাব প্রকাশ করলে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের সামনে তার সম্পূর্ণ বিকৃত অর্থ প্রকাশ করা হয় এবং বলা হয় যে, মাওলানা মওদূদী (র) এবং জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত লোকদের আকীদা সঠিক নয়। তাদের পিছনে নামায পড়া বর্জন করা উচিত। সেখান থেকে কোনো কোনো আলেম এ মর্মে চরমপত্র পাঠায় যে, অমুক তারিখ পর্যন্ত 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' বইয়ের অমুক অমুক বাক্য সংশোধন করুন, অন্যথায় --

www.pathagar.com

এ ধরনের ফতওয়াবাজীর কারণে ধর্মহীন গোষ্ঠী পুরোপুরি লাভবান হয় এবং তাদের মাধ্যমে জনগণকে জামায়াতের সহযোগিতায় নিবৃত রাখে এবং আমাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলে। শেষ মুহূর্তে ঐক্য ও একতার কিছুটা পরিবেশ সৃষ্টি যদিও হয়েছিলো কিন্তু পানি ততক্ষণে অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। আফসোস ! এতোবড় কষাঘাতের পরও যেভাবে জনগণের চোখ খুলেনি একইভাবে আলেমগণের অনুভূতিও জাগ্রত হয়নি। কোনো দীনি জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের ভূমিকায় নেমে আসতে কখনো আমরা অগ্রণী ছিলাম না। কিন্তু যখন মিথ্যা অপবাদের শিকার হই তখন সেটাকে প্রতিহত করতে আমরা বাধ্য হই। কেননা এহেন মারাত্মক এবং ভিত্তিহীন অপবাদসমূহ নিজের কাঁধে বহন করা কি রূপে সম্ভব হতে পারে ?

---

www.pathagar.com

মারওয়ানের আত্মসাৎমূলক কর্মকাণ্ড

প্রশ্ন ঃ মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র) সেসব সম্পদ ফেরত দেন যেগুলো তিনি অবৈধভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে ছিলেন এবং তিনি বলেছেন, যখন শাসনকর্তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অত্যাচারমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং শাসনকর্তা তা দূর করতে অক্ষম হবেন, তখন তিনি অপরকে কোন্ মুখে অত্যাচার থেকে বাধা দিতে পারেন ? মাওলানা মরহুম এসব ঘটনার প্রমাণ স্বরূপ বেদায়া এবং ইবনে আসীর (র)-এর ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো আলেম বলেন, এসব ইতিহাসগ্রন্থের উপর নির্ভর করা যায় না। বনী আব্বাস এবং অপর কোনো কোনো গোষ্ঠী মারওয়ান ও বনী ওমাইয়ার বদনাম রটানোর উদ্দেশ্যে এ ধরনের কল্পকাহিনী লিখে আর এসব উপকরণগুলো ইতিহাস গ্রন্থসমূহে স্থান পেয়ে যায়। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে বনী উমাইয়ার শাসনামল একটি আদর্শ ও অপূর্ব যুগ ছিলো।

জবাব ঃ আপনার প্রশ্নসমূহের উত্তরে আমার প্রথম নিবেদন হলো, ঐতিহাসিক আলোচনা এবং ঘটনা বর্ণনায় ইতিহাস গ্রন্থে সীমাবদ্ধ ও নির্ভরশীল থাকা একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। যেসব ঘটনা কুরআন নাযিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের পর সংঘটিত হয় সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্নই আসতে পারে না যে, এ সবের বিস্তারিত বিবরণ কুরআন কিংবা হাদীসে পাওয়া যাবে। সেগুলো সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে কোনো কোনো ইংগীত তো আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী থেকে পাওয়া সম্ভব এবং পাওয়া যাচ্ছে। তবে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আমরা কেবলমাত্র ইতিহাসেই পেতে পারি। এগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্যে অবশ্যই আমাদেরকে ইতিহাস গ্রন্থের স্মরণাপন্ন হতে হবে। এটা একটি স্বাভাবিক বিষয়। এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই আমাদের ইতিহাসবিদগণ ইতিহাস গ্রন্থরাজি বিন্যস্ত করেন। এসব ইতিহাসবিদগণের মধ্যে অনেকেই আবার মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে একথা স্বীকার করা অসম্ভব যে, তারা ভিত্তিহীন মিথ্যা কল্পকাহিনী সংকলিত করবেন আর পরবর্তীতে গোটা জাতির জ্ঞানী গুণীজন চোখ বন্ধ করে সেগুলো এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্ম পর্যন্ত উল্লেখ করে যাবেন।

আপনি প্রশ্নের মধ্যে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের কথা উল্লেখ করেছেন মাওলানা মওদূদী (র) সাহেব সেগুলোকে যদিও ঐতিহাসিক সূত্র

www.pathagar.com

থেকে উল্লেখ করেছেন, তাই বলে আপনার একথা মনে করার নেই যে, হাদীস গ্রন্থসমূহ এসব ঘটনার বিবরণ থেকে শূন্য পড়ে আছে। যেসব ঘটনার উপর আপনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সেগুলো হাদীস গ্রন্থে এমনকি সিহাহ্ সিত্তায়ও বর্ণিত আছে। এগুলোর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ।

সুনানে আবু দাউদের কিতাবুল খেরাজ-এর একটি রাওয়ায়েতের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

حدثنا عبد اللّه بن الجراح حدثنا جرير عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم كانت له فدك فكان ينفق منها على صغير بني هاشم ويزوج منهما ايمهم وان فاطمة سالته ان يجعلها لها فابى فكانت كذالك فى حيوة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما ان ولّي ابو بكر عمل فيها بما عمل النبى صلى اللّه عليه وسلّم فى حيوته حتى مضى لسبيله فلما ولى عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز قال عمر يعنى ابن عبد العزيز فرأيت امرًا منعه النبى صلى اللّه عليه وسلّم فاطمة ليس لى بحق وانى اشهدكم انى قدرددتها على ما كانت يعنى على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم -

"আবদুল্লাহ্ ইবনে জারাহ্ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে মুনীরার বরাত সূত্রে জারীর বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয যখন খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত তখন তিনি বনী মারওয়ানকে একত্রিত করে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিদকের বাগানসমূহ ছিলো। তিনি সেগুলোর আয় থেকে বনী হাশেমের অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলে-মেয়েদের খরচ বহন করতেন এবং বিধবা অথবা অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থা করতেন। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সম্পদ তাকে প্রদান করার আবদার করলেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর জীবদ্দশায় পর্যন্ত সম্পদগুলোর এ অবস্থাই বিরাজমান ছিলো। এমনকি এক পর্যায়ে প্রিয় নবীর ইন্তিকাল হয়ে গেলো। অতপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লামের আমল বহাল রাখলেন। এক সময় তিনি ইহজীবন ত্যাগ করলেন। এরপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হওয়ার পর তিনি আগের দু'জনের অনুসরণে একই নীতি অবলম্বন করেন। তিনিও একই অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে মারওয়ান ফিদককে তার নিজস্ব জায়গীর বানিয়ে নেয়। ওমর বিন আবদুল আযীয এ বাগানটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমার মতে যে ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিষেধ করেন তা আমার জন্যে জায়েয নেই। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, নবী আলাইহিস সালামের যুগে এ সম্পদটির যে মর্যাদা ছিলো সেটাই আমি বহাল করলাম।"

রেখা চিহ্নিত বাক্যগুলোর যে অনুবাদ আমি করেছি তা পূর্বাপরের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। ব্যাখ্যাকারীগণ এর তাৎপর্যই ব্যক্ত করেছেন ------ যেমন বজলুল মাজহুদ গ্রন্থকার এ রাওয়ায়েতটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

ثم اقطعها اى جعلها قطيعه لنفسه -

"মারওয়ান সেটাকে তার ব্যক্তিগত জায়গীর বানিয়ে নেয় যা পরবর্তীতে ওয়ারিশ সূত্রে তার নীতি আবদুল আযীয প্রাপ্ত হন।"

আহলে সুন্নাতের কাছে একথা সম্পূর্ণ স্বীকৃত যে, এ সম্পদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিংবা মালীকানা সত্ত্ব ছিলো না বরং জাতির পরিচালক আমীর হিসাবে পদাধিকার বলে অর্থনৈতিক প্রয়োজন এ থেকে পূরণ করা হতো। সুতরাং তাঁর পরলোক গমনের পর যে কেউ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন সেটাকে তিনি একই খাতে প্রবাহিত করবেন। আবু দাউদের সে অধ্যায় এবং সিহাহ সিত্তার অপর কতিপয় হাদীস দ্বারা একথা অকাট্যরূপে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক শাসনামলে যে সম্পদ শুধুমাত্র তাঁর জন্যে নির্ধারিত হয়েছিলো এবং যুদ্ধলব্ধ গনীমতের যে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ সম্পদ) হুজুরের কাছে আসতো সেগুলো ওয়ারিশ সূত্রে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনযোগ্য ছিলো না। মূলতঃ এগুলো যেনো ইসলামী রাষ্ট্র এবং সমকালীন সরকারের তহবিলে থাকবে। তা থেকে রাসূলের পুন্যাত্মা স্ত্রীগণের ব্যয়ভার বহন করা হবে এবং যে কেউ জাতির পরিচালক ও অভিভাবকরূপে সমাসীন হবেন তাঁর ও তাঁর পরিবারের দায়িত্বভারও এ থেকে বহন করা হবে। কিন্তু মারওয়ান এসব সুস্পষ্ট আহকামের বিরোধিতা করে ফিদককে ব্যক্তিগত জায়গীর বানিয়ে নেয়। অথচ এ ব্যাপারে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নীতি ছিলো এই যে, হযরত আবু

www.pathagar.com

বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে যদিও হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার উকীল ও অভিভাবক হিসাবে তিনি এসব সম্পদের অধিকারিত্ব দাবী করেন কিন্তু তিনি নিজে খলীফা হওয়ার পর এ সম্পর্কে পূর্ব নীতি বজায় রাখেন।

মারওয়ান অপর কর্মকাণ্ড এই ঘটিয়েছিলো যে, সে কুরআনের সেই কপিটি পুড়িয়ে ফেলে যেটি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে সংকলন করিয়েছিলেন এবং এর আরো অনুলিপি তৈরী করে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে পাঠিয়ে দেন। ইমাম তাহাবী (র) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন ঃ

كانت تلك الكتب عند ابى بكر حتى توفى ثم كانت عند عمر حتى توفى ثم كانت عند حفصة زوج النبى صلى الله عليه واله وسلم فارسل اليها عثمان فابت ان تدفعها اليه حتى عاهدها ليردها اليها فبعثت بها اليه فنخها عثمان فى هذه المصاحف ثم ردها اليها فلم تزل عندها حتى ارسل مروان بن الحكم فاخذها فحرقها ـ

"মহাগ্রন্থ আল কুরআনের লিখিত অংশগুলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই গচ্ছিত থাকে। তারপর এগুলো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত থাকে। পরবর্তী সময়ে এ সংকলন উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গচ্ছিত থাকে। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সংকলনটি চাইলে হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফিরিয়ে দেয়ার শর্ত ছাড়া সেটা দিতে অস্বীকার করেন। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিরিয়ে দেয়ার অংগীকার করলে তিনি সেটি অর্পণ করতে রাজি হন। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সংকলনটির অনুলিপি তৈরী করে ওয়াদামত সেটি হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে ফিরিয়ে দেন। পরবর্তীতে মারওয়ান সেটা চেয়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।"-[মশকিলুল আছার, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪, দায়েরাতুল মায়ারিফ, দাক্ষিণাত্য, ১৩৩৩ হিজরী]

এহেন ঐতিহাসিক স্মৃতি ও অমূল্য সম্পদ এবং মহাপবিত্র বরকতময় গ্রন্থ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার ন্যায় ধৃষ্ঠতাপূর্ণ আচরণ মারওয়ান ছাড়া আর কে করতে পারে?

www.pathagar.com

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইয়াযীদের খেলাফত

প্রশ্ন ঃ মরহুম মাওলানা মওদূদী রচিত 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থের উপর তো অনেক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে এ প্রসংগে উত্থাপিত কোনো কোনো প্রশ্নের জবাবও আপনি দিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয় সম্পর্কে মাহমুদ আহমদ আব্বাসী এবং তার ভাতিজা আলী আহমদ আব্বাসী যেসব বই-পুস্তক লিখেছেন সেগুলোর খণ্ডন করা কেউ জরুরী মনে করেনি। বইগুলোকে আহলে সুন্নাতের নীতি ও বিশ্বাসকে আশ্চর্যজনকভাবে কদাকার করা হয়েছে এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়াযীদের ব্যক্তিত্বকে বিরাট বড় করে দেখানো হয়েছে। বইগুলোর যুক্তি খণ্ডন করা তো দূরের কথা অপরাপর লেখকরা তাদের লেখায় ও প্রবন্ধে বরং এসব বইয়ের উপাদানগুলো কোনো কোনো উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। এমনকি 'সাইয়েদুনা মুয়াবিয়া শাখছিয়াত ও কেরদার' শীর্ষক পুস্তকটি সম্পর্কে আব্বাসী সাহেবকে এ অভিযোগ করতে হয়েছে যে, বইটির লেখক তার ভাতিজার লেখা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক জীবন গ্রন্থকে সামনে রেখে পুস্তকটি বিন্যস্ত করেছেন। সামান্য পরিবর্তন সহ বিষয়বস্তু এক এবং শিরোনামসমূহও অভিন্নই।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক জীবন এবং খেলাফতে মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদ গ্রন্থদ্বয় তো সম্ভবত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল আব্বাসী সাহেবের অপর একটি পুস্তক তাহকীকে মযীদ নামে ছাপা হয়। এটি আপনার দৃষ্টিতে না পড়ে থাকলে সেটি দেখে নেয়া দরকার। উক্ত পুস্তকে ২৭জন সাহাবী এবং ৫জন উম্মুল মু'মিনীন সম্পর্কে দাবী করা হয়েছে যে, তাঁদের মধ্যে একজনও ইয়াযীদের বিরোধিতা কিংবা বিদ্রোহ করার কথা প্রমাণিত নয়। মনে হয় এ সকল সাহাবী ও উম্মুল মু'মিনীনগণ ইয়াযীদের বাইয়াত ও ওলী আহদী সমর্থক ছিলেন। শুধুমাত্র হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহ করেছেন। ঘটনা প্রবাহের এটাই কি সঠিক চিত্র ? এ দু'জন মনীষী ছাড়া অবশিষ্ট সকলেই কি ইয়াযীদের বাইয়াতকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন ?

এ প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনা বিবেচনা করা দরকার। খেলাফত ও রাজতন্ত্র এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থসমূহে সাধারণত এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সপক্ষে সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত

www.pathagar.com

আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত রাসূলের বাণীর (تقتلك فئة باغية) (তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে) মধ্যে যে বিদ্রোহী দলের কথা উল্লেখ রয়েছে তা এর উপর ভিত্তি করেই আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীদের উপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু মাহমুদ আব্বাসী সাহেব তো হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথা অস্বীকারই করে দিয়েছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ হাকীকতে খেলাফত ও মুলুকিয়ত-এর ১৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, প্রকৃত ঘটনা তাবারী (র)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বিদ্রোহীরা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায় পৌঁছার আগেই মিসরে হত্যা করে দিয়েছিলো। (قد اغتيل) ঘটনাটি সঠিক তথ্য ও অতিরিক্ত ব্যাখার দাবী রাখে।

জবাব ঃ খাওয়ারিজ ও কোনো কোনো মুতাযিলী ছাড়া গোটা মুসলিম জাতি এবং আহলে সুন্নাত আলেমগণের পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের সকলেই একথায় সর্বসম্মত ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের ৪র্থ এবং শেষ খলীফা রাশেদ ছিলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর সময়ে খেলাফতে রাশেদার সমাপ্তি ঘটে। কোনো কোনো আলেম হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্পষ্টভাবে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তা এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় বিদ্রোহী ও ভ্রান্তনীতির অনুসারী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এমনকি ফাসেকীর সাথেও তাঁকে সম্পৃক্ত করেছেন। আবার কিছুসংখ্যক বুযুর্গ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে তাঁর দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইজতিহাদী ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অধিষ্ঠিত খেলাফত বর্তমান থাকা অবস্থায় তো হতেই পারে না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পরও হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করবেন মর্মে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পরই কেবল হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত স্বীকৃতি লাভ করে। সে সময় হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বটে কিন্তু তাতেও তিনি খেলাফতে রাশেদার মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। যা হোক তিনি সাহাবী হওয়ার দুর্লভ গুণে বিশেষিত ছিলেন এবং আহলে সুন্নাত আলেমগণ তাঁকে ফকীহ মুজতাহিদরূপে সাব্যস্ত করার পরও অবশ্যই কোনো রহস্য ছিলো, যে কারণে তাকে খুলাফায়ে রাশেদীন হিসেবে আদৌ গণ্য করেননি। বরং তারা তাঁকে একজন বাদশাহ হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন।

www.pathagar.com

অতপর স্বীয় খেলাফত আমলে তিনি নিজের পুত্র ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করেন। এটা স্থলাভিষিক্ত করণের শুধুমাত্র এক প্রস্তাবনা কিংবা পরামর্শই ছিলো না বরং স্বীয় পুত্রকে খেলাফত আসনের যথারীতি উত্তরসুরী ঘোষণা দিয়ে তার সপক্ষে গোটা সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে সাধারণ বাইয়াত গ্রহণের চেষ্টা করা হয় এবং এতোদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, শক্তি এবং সব ধরনের মাধ্যম অবাধে ব্যবহার করা হয়।

এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে যথার্থ বলে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যে কথা সর্বাধিক বলা হতো তাহলো, এর কারণ নিছক পিতা-পুত্রের মহব্বত ছিলো না বরং এখানে মুসলমানদের কল্যাণকর চেতনা লুক্কায়িত ছিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতে এর কোনো দলিল কিংবা উদাহরণ পাওয়া যায় না যে, মুসলমানদের আমীর কিংবা খলীফা নিজের কোনো আত্মীয়কে তার জীবদ্দশায়ই রাজাসনের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করবেন এবং তাঁর বাইয়াতের সাথে অপর একটি বাইয়াতের শিকলও প্রত্যেক মুসলমানের গলায় লটকিয়ে দিবেন। তদুপরি জাতিকে ভবিষ্যত আনুগত্যের শপথে বাধ্য করার চেষ্টা করবেন। অধিকন্তু এটাও এক অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ পদক্ষেপের পর বিষয়টি এক প্রচলিত ধারা ও স্থায়ী আচরণের রূপ ধারণ করে যে, খলীফা তার জীবদ্দশায়ই স্বীয় খান্দানের কাউকে স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করবেন এবং তজ্জন্য বাইয়াত নিবেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে খেলাফতের নির্বাচন পদ্ধতি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং তদস্থলে রাজতন্ত্র কিংবা একনায়কত্ব স্থান পেয়ে যায়। এখন ইয়াযীদ সম্পর্কে কথা হলো—আজ পর্যন্ত আহলে সুন্নাত জামায়াতের কোনো কোনো আলেম তার ব্যাপারে যাকিছু বলেছেন তার সীমা কেবল এতোটুকুই যে, তাকে কাফের বলা এবং অভিশপ্ত করা জায়েয নেই। সে একজন মুসলমান শাসক ছিলো। খেলাফতের শপথ নেয়ার সময় পর্যন্ত তার পাপাচার সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞাত ছিলো। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যা তার ইশারায় হয়নি। যদিও ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের অনুসন্ধান ও কৈফিয়ত তলব করা সে জরুরী মনে করেনি। আহলে সুন্নাত আলেমগণের কেউ ইয়াযীদ সম্পর্কে এর চেয়ে অধিক কোনো কথা বলেননি।

এখন মাহমুদ আব্বাসী সাহেব আহলে সুন্নাতের এহেন সতর্ক নীতি এবং উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত অভিনব ও অসংগতিপূর্ণ এক নতুন ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনি মূলতঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর

www.pathagar.com

খেলাফত সিদ্ধ ও বৈধ হওয়ার বিষয়টিকে সন্দেহজনক করে তোলার নিষ্ফল চেষ্টা করেছেন যাতে করে তাঁর খলীফায়ে রাশেদ হওয়া এবং স্বীয় প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় তাঁর সত্যনিষ্ঠ হওয়া কিংবা অন্তত ন্যায়ানুগ হওয়ার প্রসংগটিই সংশয়াবিষ্ট হয়ে যায়। পরে বিষয়টি যখন ইয়াযীদ পর্যন্ত পৌছে গেলো এখানে এসে আব্বাসী সাহেবের ধৃষ্ঠতা ও দৃষ্টিহীনতা পরিশেষে শেষ প্রান্তে এসে ঠাঁই নিলো। তার মতে আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদ এর খেলাফত যে ঐকমত্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেরূপ ঐকমত্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নসীবই হয়নি। তার ভাষায় ঃ

"সাহাবী, তাবেয়ী, হাশেমী এবং উমাইয়া গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উল্লাসের সাথে ইয়াযীদের উত্তরসূরী খলীফা হওয়ার সপক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করেন। অবশ্য গদ্দিনসীনির খবর শুনামাত্র খেলাফতের দু'জন দাবীদার হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মদীনার গভর্নরকে চমকে দিয়ে উঠে দাঁড়ান। তাঁদের এহেন কর্মতৎপরতা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছিলো।"[১]

হঠকারিতার চরম পরাকাষ্ঠা এই যে, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাণোৎসর্গ জিহাদী পদক্ষেপকে আব্বাসী সাহেব আমীর ইয়াযীদের খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক রাষ্ট্রদ্রোহিতা সাব্যস্ত করেন। ইবনে খালদুন–ইয়াযীদ এবং তার ক্ষমতা প্রাপ্তি সম্পর্কে যথাসাধ্য সাফাই গাওয়া সত্বেও যেহেতু ইয়াযীদের পাপাচারধর্মী পংকিল চরিত্র চিত্র স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং' ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যা বৈধ ও জায়েয' মর্মে ইবনুল আরাবীর দুষ্টমত খণ্ডন করেছেন, কেননা তিনি ইয়াযীদের মুকাবিলায় স্বয়ং খেলাফতের দাবীদার ছিলেন সেহেতু আব্বাসী সাহেব বলেন ঃ

ইবনে খালদুন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিদ্রোহমূলক পদক্ষেপের উপর যেখানেই মুখ খুলতে চেয়েছেন সেখানে তাঁর মর্যাদা পরিষ্কার (অর্থাৎ কলংকময় ?) করতে চেষ্টা করে তিনি সফলকাম হতে পারেননি। তিনি ওলী আহদী বা উত্তরাধিকারী বাইয়াতের প্রসংগে সুন্দর আলোচনা করেছেন। খেলাফতে মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদ পুস্তকে তার উল্লেখ করতঃ প্রশংসা করতেও ত্রুটি করেননি। কিন্তু বিদ্রোহমূলক পদক্ষেপের ন্যায়ানুগ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অগাধ বিশ্বাস সম্ভবত তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারো প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস রাখা এক কথা আর ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের মুক্ত গবেষণা ভিন্ন কথা।"-[প্রাগুপ্ত ঃ ২৩২]

১. তাহকীকে মযীদ, পৃষ্ঠা–২৩১

www.pathagar.com

এই গবেষণা অন্য কথার দুর্লভ নমুনা আব্বাসী সাহেবের লেখায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র দু'জন খেলাফতের দাবীদার ছাড়া গোটা মুসলিম জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওলী আহদের সপক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্যে ব্যস্ত হওয়ার কথা প্রমাণ করতে আব্বাসী সাহেব "তাহকীকে মযীদ এ সাহাবায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আওর ইয়াযীদ কি বাইয়াত আলী আহদী ওয়া খেলাফত" শিরোনামে এক বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছেন। ভাবী খলীফা রূপে ইয়াযীদের বাইয়াত গ্রহণের সময় যেসব সাহাবী এবং উম্মুল মু'মিনীন জীবিত ছিলেন এবং যাঁদের জীবনী লেখক জানতে পেরেছেন 'শয়ের অধিক পৃষ্ঠাব্যাপী তাদের নাম এবং জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। মনে হয় এ সকল সাহাবীগণের বেঁচে থাকা এবং ইয়াযীদের নামে বাইয়াতের মলয় মুহূর্তে দুনিয়া থেকে বিদায় না হওয়াই যেন স্বয়ং একথার জ্বলন্ত প্রমাণ যে, তাঁরা হৃষ্টচিত্তে ও স্বহাস্যবদনে ইয়াযীদের ন্যায়নিষ্ঠ হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আব্বাসী সাহেব এ সকল হযরতগণের কেবল নাম গণনা করেই ক্ষান্ত হননি বরং এর সাথে সহীহ্ হাদীসসমূহের মর্ম বিকৃত এবং প্রমাণিত ঘটনা প্রবাহের অবয়বও পাল্টাতে ত্রুটি করেননি। এ ধরনের চেষ্টার একটি নমুনা আমি এখানে পেশ করছি। আব্বাসী সাহেব ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করার ব্যাপারে কি ধরনের সাধুতার পরিচয় দিয়েছেন এর দ্বারা তা আন্দাজ করা সম্ভব হবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

"এ সম্মানিতা মহিলা আমীর ইয়াযীদের (র) ওলী আহদীর সময় জীবিত ছিলেন। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে, তিনি স্বীয় ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ দেন যে, এ সভায় তার সত্বর যোগদান করা দরকার, যার জন্যে তাকে ডাকা হয়েছে। এমন যেনো না হয় যে, তার সভায় যোগদান না করার কারণে কোনো অনৈক্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ---- এটা কোনো সালিশী ব্যাপার ছিলো না বরং আমীর ইয়াযীদের (র) ওলী আহদীর প্রসংগ ছিলো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমীর ইয়াযীদের ওলী আহদী এবং খেলাফতের সপক্ষে দ্বিধাহীন চিত্তে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর এ কাজে তার মুহতারিমা বোনের ভূমিকা স্বতঃই প্রতিভাত হয়ে উঠে।"

এমনিভাবে বুখারীর হাওলা দিয়ে তিনি আস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন যে, দু' ভাই-বোন যেন আমীরুল মু'মিনীনের সপক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্যে ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। আব্বাসী সাহেব অন্যান্য জায়গায় সাধারণত কিতাবের পৃষ্ঠার হাওয়ালা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এখানে তিনি বুখারী

www.pathagar.com

অধ্যায় পরিচ্ছেদ কিংবা পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি কৌশলে এড়িয়ে যান। যা হোক হাদীসটি বুখারীর মাগাযি অধ্যায়ের গযওয়ায়ে খন্দক পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। হাদীসটির তরজমা নিম্নরূপ ঃ

"হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমি হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলাম। তিনি গোসল করছিলেন এবং তাঁর চুল থেকে তখনও পানি টপকিয়ে পড়ছিলো। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো জনগণের অবস্থা দেখছেন ! কিন্তু ইমারত বা নেতৃত্বের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে দেয়া হয়নি। হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ আপনি সেখানে যান ! জনগণ আপনার অপেক্ষায় আছে। আপনি সেখানে না যাওয়ার কারণে লোকগণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করছি। মোটকথা, হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে লোক সমাগমে পৌঁছে তবেই ছাড়েন। জনগণ যখন পৃথক হয়ে গেলো, তখন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ভাষণে বললেন, যে এ বাইয়াত বা নেতৃত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে ইচ্ছা করে সে তার শিং (মাথা) উঁচু করুক ! আমরা নেতৃত্বে তার এবং তার পিতা অপেক্ষা অধিক যোগ্যতর। হাবীব বিন মাসলামা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি এর জবাব দেননি ? হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ আমি আমার চাদর উন্মুক্ত করে ইচ্ছা করলাম আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলি ইমারতের জন্যে তোমার চেয়ে অধিক যোগ্য হচ্ছে তারা যাঁরা তোমার ও তোমার বাপের সাথে ইসলামের খাতিরে যুদ্ধ করেছেন। পরক্ষণেই আমার আশংকা হলো, আমার একথায় বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। খুন-খারাবীর কারণ ঘটাবে এবং আমার কথার ভিন্ন তাৎপর্য নেয়া হবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট বেহেশতের অবারিত নেয়ামতের স্মরণে হৃদয় মনকে সিক্ত করে আমি মৌনতার ভূমিকা গ্রহণ করলাম। হাবীব স্বগোক্তি করে বলতে লাগলেন, আপনি নিরাপদে বেঁচে গেলেন।"

এবার রাওয়ায়েতটির দৃষ্টিভংগী ও বর্ণনাভংগী দেখুন এবং আব্বাসী সাহেব যে মর্মার্থ উদ্গীরণ করতে চান তাও দেখুন। যদি এটা স্বীকার করে নেয়া হয় যে, লোক সমাগমের আলোচ্য বিষয় ছিলো শালিসীর স্থলে ইয়াযীদের ওলী আহদী, তাহলেও এ সংলাপের ধরন একথার সুস্পষ্ট ইংগীত বহন করছে যে, অলী আহদীর বাইয়াত প্রসংগটি যেভাবে নিষ্পত্তি হচ্ছিলো তাতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অসন্তুষ্টি, অস্বস্তি ও বিরক্তবোধ করছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি স্বভাবগতভাবে ঝগড়া-ফাসাদ ও ফেতনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁর জান্নাতবাসী পিতাও তাঁকে খেলাফতের

www.pathagar.com

প্রার্থী হতে বারণ করেছিলেন সে কারণে তিনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণ কর্মসূচী সম্মিলিত এ সভায় উপস্থিত হওয়া পসন্দ করেননি। কিন্তু হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা পীড়াপীড়ি দ্বারা তাকে সেখানে উপস্থিত হতে উদ্বুদ্ধ করেন। কেননা সেখানে তাঁর অনুপস্থিতি অনুভূত হচ্ছিলো। হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার ধারণা ছিলো যে, তাঁর উপস্থিতিতে কিছুটা ফায়দা তো হবে এবং ঝগড়া মিটে যাওয়ার উপায় হবে। যা হোক, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সভায় উপস্থিত হলেন। তারপর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাষণ দিলেন এবং ধমকের সুরে বললেন ঃ যে আমার কিংবা আমার ছেলের বিরুদ্ধে উচ্চাবাচ্য করার দুঃসাহস রাখে সে তার মাথা উচু করে দেখিয়ে দিক, আমরা তার এবং তার পিতা অপেক্ষা খেলাফতের অধিকতর হকদার। মুহাদ্দিসগণের বর্ণনা মতে একথার উদ্দেশ্য ছিলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখদের ভর্ৎসনা করা এবং তাদের উপর স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। এরূপ ধৃষ্ঠতা হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় পরম ধৈর্যশীল ও সহনশীল মহৎ ব্যক্তিত্ব অতি কষ্টে বরদাশত করেন। সুতরাং তিনিও স্বগোক্তি করলেন, জনাব ! খেলাফতের জন্যে আপনার চেয়ে বেশী যোগ্য ও হকদার সেসব ব্যক্তিত্ব যারা আপনি ও আপনার পিতা আবু সুফিয়ানের সাথে ইসলামের জন্যে যুদ্ধ করেছেন আর সে সময় আপনারা উভয়ই কুফরীর মধ্যে ডুবে থেকে আমাদের বিরোধিতায় মেতে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি একথা বলতে গিয়ে শুধুমাত্র এ আশংকায় থেমে গেলেন যে, একথা আমার খেলাফতের দাবীর অর্থে রং চড়ানো হবে এবং যারা প্রসংগটিকে অস্ত্র বলে মীমাংসা করতে চঞ্চল ছিলো তারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয়ে যাবে।”

এ ঘটনাতো ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সংঘটিত হয়। এ ঘটনার সাদৃশ্য অপর একটি ঘটনার কথাও বুখারীতে (তাফসীরুল আহকাফ) বিবৃত হয়েছে। ঘটনাটি হলো, “হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মারওয়ানকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন। সে তার খুতবায় ইয়াযীদের উত্তরসুরী হওয়ার প্রসংগটি উত্থাপন করতে শুরু করলে আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতিবাদে দাঁড়িয়ে যান। তখন মারওয়ান বলতে লাগলো, একে পাকড়াও করো, আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পালিয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে আশ্রয় নেন। মারওয়ান সেখান পর্যন্ত তাঁর পশ্চাৎপসরণ করে এবং হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথেও সে অসংযত কথাবার্তা বলে।

www.pathagar.com

একথা যথাস্থানে ঠিক যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের শাসনামল পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা থেকে পৃথক ছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর যে কেউ খেলাফতের আসনে আসীন হয়েছে তার শাসন অন্যান্য মুসলমানগণ ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেভাবে স্বীকার করেছেন তিনিও সেভাবে মেনে নিয়েছেন। তবে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য সাহাবী তাবেয়ীদের অপরাপর নেতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখলকারী সে সকল স্বৈরাচারী শাসকদের আনুগত্য গ্রহণ করেছিলেন বলে দাবী করা বা উক্তি করা নিছক সত্যের অপলাপ আর ন্যায়ের বিকৃত রূপ বৈ নহে।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) ফতহুল বারীতে উপরোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় পরিষ্কার লিখেছেন, হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় ছিলো ঃ

انه لايبايع المفضول الا اذا خشى الفتنة ولهذا بايع بعد ذالك معاوية ثم ابنه يزيد ونهى بنيه عن نقض بيعته وبايع بعد ذالك لعبد الملك بن مروان -

"উত্তমের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম উত্তমের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা জায়েয নেই। তবে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিলে জায়েয। এ কারণেই হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং পরবর্তীতে তার পুত্র ইয়াযীদের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং নিজের সন্তানদেরকে এ বাইয়াত ভংগ করতে বারণ করেন। এরপর তিনি আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের হাতেও বাইয়াত গ্রহণ করেন।"

মাহমুদ আব্বাসী যিনি প্রত্যেক আমীরুল মু'মিনীনকে তোষামোদ করতে তৈরী ও একপায়ে খাড়া অসহায় এ লোকটি সেসব সলফে সালেহীনদেরকেও নিজের উপর অনুমানে দারুন প্রয়াসী। আব্বাসী সাহেবের গোপন অবস্থার প্রতিচ্ছবি তার সেসব লেখার মধ্যে দেখা যেতে পারে। যেগুলো আমি ভূমিকায় উল্লেখ করেছি যাতে তিনি আইউব খানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

স্মর্তব্য যে, যে গবেষকের দৃষ্টিতে গোটা ইসলামী ইতিহাসের একটি মাত্র অনুসরণযোগ্য উদাহরণ প্রতিভাত হয় তার নেক নজরে যদি ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা লুপ্ত থাকে এবং ইয়াযীদ জনপ্রিয় আমীরুল মু'মিনীনরূপে নির্ণিত হয় তাতে আশ্চর্য হওয়ার যা থাকা উচিত।

www.pathagar.com

যথা কবির ভাষায় ঃ

گر نہ بیند بروز شپرہ چشم
چشمۂ آفتاب را چہ گناہ؟

"কোনো বাদুর চোখা যদি দিনের আলো সইতে না পারে, তাতে সূর্য পিণ্ডের কি অপরাধ।"

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিফ্‌ফীন যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষাবলম্বন করা এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেনাদের হাতে তাঁর শাহাদাত বরণ করার কথা একটি অকাট্য প্রমাণিত ঘটনা। ঘটনাটি শুধুমাত্র ইতিহাস গ্রন্থসমূহে নয় বরং হাদীস গ্রন্থ রাজিতেও উল্লেখ আছে। গোটা ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিসগণ এটা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করেছেন। বরং মুসনাদে আহমদ এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহে এ ঘটনাটি সনদসহ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের খবর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেয়ার পর تقتلك فئة باغية এ হাদীসটিও শুনানো হয়। কোনো কোনো রাওয়ায়েতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ আজব জবাবের কথাও উল্লেখ আছে যে, আমরা তাঁকে হত্যা করিনি বরং তাঁর হত্যার মূল কারণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, যে তাকে সাথে নিয়ে এসেছেন। মাহমুদ আব্বাসীই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে এ ধ্রুবসত্যকে অস্বীকার করলো এবং একথা লিখে দিলো যে, আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তো দু' বছর আগে মিসরেই নিপাত করে দেয়া হয়েছে। সে এ মিথ্যা কথাটি আল্লামা ইবনে জারীর তাবারীর (র) শুধুমাত্র একটি লেখা অবলম্বনে তৈরী করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ইবনে জারীর (র) এ বিষয়ের বিবরণে লিখেছেন, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসরবাসীদের অভিযোগ তদন্তের জন্যে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিসরে পাঠান। সেখানে লোকগণ তাঁকে এতো অধিক সময় আটকিয়ে রাখে যে, এদিকে ধারণা হচ্ছিলো—তারা তাঁকে প্রতারণা করে হত্যা করে ফেলেছে।

আব্বাসী সাহেব সাধারণত ইমাম তাবারীকে প্রত্যেক জায়গায় রাফেজী লিখে থাকেন। কিন্তু স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে শিয়া, ইহুদী, খৃষ্টান, নাস্তিক সব লোকই তার কাছে নির্ভরযোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু কারো কথায় যদি আব্বাসী সাহেবের পসন্দনীয় স্বার্থ উদ্ধার করার সুযোগ না থাকে তাহলে সে কথাটিকে বলির যুপকাঠে শক্তহাতে কষণ দিয়ে তার অনুসন্ধানের যন্ত্র যোগে নিজের

www.pathagar.com

ইচ্ছামতো চিত্রিত করতে তিনি দারুন ওস্তাদ। ঐতিহাসিক তাবারীর মূল লেখাটি হলো ঃ

واستبطأ الناس عمارا حتى ظنوا انه اغتيل

"মিসরবাসী লোকেরা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধারণার অধিক দিন থামিয়ে রাখে। ফলে এদিকে লোকেরা মনে করলো—তাকে বুঝি গোপনে হত্যা করে ফেলা হয়েছে।"

জনগণের এ ধারণাকে কেন্দ্র করে মিথ্যার প্রাসাদ তৈরী করা হয় যে, আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তো মিসরে হত্যা করা হয়েছিলো।

www.pathagar.com

খেলাফত ও রাজতন্ত্র এবং বেরলভী নীতি

প্রশ্ন ঃ আমি 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছি এবং এ প্রসংগে আপনি যেসব লেখা তরজুমানে লিখেছেন সেগুলোও পড়েছি। এগুলোর ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো মতবিরোধ আমার নেই। তবে একটি ঘাটতি কিংবা শূন্যতা আমি এর মধ্যে অবশ্যই অনুভব করছি। সেটা হলো, আপনি দেওবন্দী আলেমদের কতিপয় উদ্ধৃতি আপনার লেখায় স্থান দিয়েছেন কিন্তু কোনো বেরলভী আলেমের একটি কথাও আমার নজরে পড়েনি, অথচ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কি যুক্তিসংগত নয় যে, বেরলভী আলেমগণের লেখার প্রতি আপনার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি নেই অথবা তাদের লেখায় আপনাদের পক্ষের উপাদান পাওয়া যায় না ?

সন্দেহ নেই যে, মাহমুদ আব্বাসী সাহেবের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বর্তমানে আহলে সুন্নাত আলেমগণও স্রোতের তোড়ে গা ভাসিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এবং ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় ইয়াযীদের ভূমিকাকে এমন ধারায় উপস্থাপন করা শুরু করেছে যে, তাতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ও কর্মনীতি সঠিক ও নির্ভুল হওয়ার পরিবর্তে সন্দেহ ও অভিযোগের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। যদি আপনার দৃষ্টিতে এমন কোনো লেখা বা উক্তি এসে থাকে যা এ প্রসংগে বেরলভী আদর্শে বিশ্বাসী আলেমদের ভূমিকা স্পষ্ট করে তাহলে সেটাও জনসমক্ষে আসা উচিত। প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাতগণ এ ব্যাপারে যে নীতি আবহমান কাল থেকে পোষণ করে আসছেন তা বিলুপ্ত করার চেষ্টা চলছে এবং জনগণের মন-মানসে এ আজগুবী ঘাপলা সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, খোলাফায়ে রাশেদগণ ছিলেন সত্য ও সনাতন এবং তাঁদের বিপক্ষে যারা আমরণ দ্বন্দ্ব করেছেন তারাও সত্য-সঠিক। বরং বর্তমানে তো এমন কথাও ধীরে ধীরে বলা হচ্ছে যে, খেলাফতে রাশেদা এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। খোলাফায়ে রাশেদীনের কোনো সংখ্যা কিংবা খেলাফতে রাশেদার কোনো সময়কালও নির্ধারিত নেই।"

জবাব ঃ কথা যথাস্থানে ঠিক যে, খেলাফত ও রাজতন্ত্র এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিষয়ের উপর আমি তরজুমানুল কুরআনের পৃষ্ঠাব্যাপী যে আলোচনা লিখেছি তাতে বেরলভী আদর্শে বিশ্বাসী আলেমের কোনো উদ্ধৃতি পেশ করা হয়নি। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, আমি কোনো ইলমী গোঁড়ামীতে লিপ্ত এবং কোনো বিশেষ দল বা সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

বই-পুস্তক পাঠ করা আমার অপসন্দনীয়। একথাও ঠিক নয় যে, আধুনিক যুগের আলেমদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র দেওবন্দী অথবা আহ্‌লে হাদীস আলেমদের লেখাসমূহে আমার সাহায্যকারী উদ্ধৃতি আমি পেয়ে যাই আর বেরলভী মতাদর্শে বিশ্বাসী আলেমদের চিন্তাধারায় আমি সেগুলো খুঁজে পাইনি। আসলে কথা হলো, বিষয়বস্তু লেখার ধারাবাহিকতায় আলোচনা ও যুক্তি প্রদর্শনের ব্যাপারে আমি যে পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকি তাহলো, আলোচ্য বিষয়সমূহে আমি সর্বপ্রথম কুরআন-হাদীসের দলিলের আলোকে মাওলানা মওদূদী (র)-এর লেখার উপর আরোপিত অভিযোগ ও সমালোচনার যাঁচাই-বাছাই করার চেষ্টা করে থাকি। তারপর পূর্ববর্তী ইমামগণের মধ্যে মুহাদ্দিস, তাফসীরকার, ইতিহাসবিদ, ফিকাহবিদ, মুজতাহিদ প্রমুখ মনীষীগণের এমন সব উক্তি পেশ করি যা ঘটনাপ্রবাহ ও বিষয়সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। পরিশেষে আমি কতিপয় সমকালীন আলেমের লেখারও উল্লেখ করে থাকি যাতে করে কেউ বলতে না পারে যে, যে কথা পূর্ব জমানায় জায়েয ও হালাল ছিলো বর্তমান সময়ে তার পুনরাবৃত্তি করা হারাম ও নিষিদ্ধ। আর যদি কেউ এ ধরনের কাজ করেই বসে তাহলে সে একাই করেছে। এ ধারণাকে সামনে রেখেই আমি সমকালীন আলেমদের উক্তিসমূহের উল্লেখ করেছি ; অন্যথায় তাদের অনুপস্থিতিতে আমার যুক্তি প্রদর্শনে কোনো শূন্যতা কিংবা খুঁত সৃষ্টি হতো না।

রয়ে গেলো এ প্রশ্ন যে, সাধারণত দেওবন্দী আলেমদের লেখাতে আমার নির্বাচনী দৃষ্টি সীমাবদ্ধ কেন ? এর কারণ হলো, আজ পর্যন্ত খেলাফত ও রাজতন্ত্রের খেলাফ সবচেয়ে বেশী শক্তি ব্যয় করেছে ঐ মহলের সাথের ব্যক্তিবর্গই এবং তারাই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতভাবে নাসেবী সম্প্রদায়ের নব্য নেতাদেরকে পূর্ণশক্তির যোগান দেয়। তাই স্বভাবগতভাবেই ঐ সকল বুযূর্গানে কেরাম আমার বক্তব্যের লক্ষ্যস্থল হওয়ার কারণে তাদেরই কোনো কোনো মনীষীর উক্তি সংযোজন করা যথার্থ ও যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকার যতোটুকু সম্পর্ক তা 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমার লেখায় বিবৃত হয়েছে সেগুলো বেরলভী আলেমদের নীতি ও আদর্শ থেকে ভিন্নতর নয়। উদাহরণ স্বরূপ আমি এখানে মাওলানা আমজাদ আলী রিজভী সাহেবের লিখিত বাহারে শরীয়াত এর ১ম খণ্ডের হাওলা পেশ করছি। মাওলানা আমজাদ আলী সাহেব মরহুম মাওলানা আহমদ রেজা খানের বিশেষ শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত বাহারে শরীয়ত ১৭ খণ্ড ব্যাপী একটি বিরাট গ্রন্থ। লেখকের শিক্ষকের ভূয়শী প্রশংসা ও উপক্রমনিকাসহ প্রকাশিত হয়। বইটির ১ম খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেনঃ

www.pathagar.com

"আকীদাহ ঃ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর মুজতাহিদ হওয়ার কথা সাইয়েদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন। মুজতাহিদ ভুল শুদ্ধ দু'টোই করতে পারেন। ভুল দু' ধরনের। অহংকার ধর্মী ভুল, এরূপ ভুল করা মুজতাহিদের শানের পরিপন্থী। ইজতিহাদী ভুল ; এ ধরনের ভুল মুজতাহিদের হয়ে থাকে। এ ভুলের দরুন মূলতঃ আল্লাহর কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে না। তবে দুনিয়ার আহকাম হিসেবে এটা দু' ধরনের। স্বীকৃত ভুল যা অস্বীকার করা হয় না। এ ধরনের ইজতেহাদী ভুলের কারণে দীনের মধ্যে কোনো বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় না। যেমন আমাদের মতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়া। দ্বিতীয় প্রকার হলো অস্বীকৃত ভুল। এটা এমন ধরনের ইজতিহাদী ভুল যা স্বীকৃত নয় এবং তাতে শরীয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত সাইয়েদুনা আমীরুল মু'মিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধী তৎপরতা এ ধরনের ভুল ছিলো। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীই সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে ডিক্রী এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্যে মাগফিরাত।"-[বাহারে শরীয়ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৫, শেখ গোলাম আলী এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত, লাহোর]

এখানে লেখক পরিষ্কার বলছেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মুজতাহিদ ছিলেন ; মুজতাহিদ ভুল-শুদ্ধ দু'টোই করতে পারেন। দুনিয়াবী আহকামের দৃষ্টিতে ইজতিহাদী ভুল দু' ধরনের। স্বীকৃত ভুল ও অস্বীকৃত ভুল। এ ভুলের জন্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু দুনিয়ার পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে অস্বীকৃত ভুল বিপর্যয়ের কারণ হয়ে থাকে এবং এ কারণে তাকে অভিযোগ, প্রতিরোধ, অবজ্ঞা ইত্যাকার সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যাকিছু করেছেন তা অস্বীকৃত ভুলের অন্তর্গত। দু' দলের ঝগড়ায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে সিদ্ধান্ত এসেছে আর আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্যে মাগফিরাত। যেহেতু আজকাল প্রকাশ্যে ইয়াযীদের ফযীলত-মরতবা ও প্রশংসা বাক্য প্রকাশিত হতে চলেছে এবং বলা হচ্ছে যে, ইয়াযীদের পাপ-পংকিলতার কথা সঠিক সূত্রে প্রমাণিত নয় ; তাই উপরোক্ত গ্রন্থে ইয়াযীদ সম্পর্কিত একটি অতিরিক্ত হাওয়ালা এখানে তুলে ধরা যথার্থ মনে করলাম। পরবর্তী ৭৬ পৃষ্ঠায় মাওলানা আমজাদ আলী মরহুম সাহেব লিখেছেন ঃ "আকীদা ঃ ইয়াযীদ অপবিত্র, ফাসেক, ফাজের এবং কবীরা গুনাহের ধারক ছিলো। (মাআযাল্লাহ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, রাসূলের নয়নের

www.pathagar.com

পুতুল হযরত সাইয়েদুনা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার তুলনা করার প্রশ্নই উঠে না। আজকাল কোনো কোনো বিভ্রান্ত লোক বলে থাকে —তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই, তিনিও আমাদের শাহজাদা ইনিও শাহজাদা। এ ধরনের প্রলাপকারী মূলতঃ বিতাড়িত, পথভ্রষ্ট, খারেজী ও নাসেবী যারা জাহান্নামের উপযুক্ত। হ্যাঁ, ইয়াযীদকে কাফের বলা এবং তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত আলেমগণের তিনটি মত আছে। আমাদের ইমাম আযম (র)-এর এ ব্যাপারে মৌনতার নীতি অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ আমরা তাকে ফাসেক ও ফাজের ছাড়া কাফের বলবো না মুসলমানও না।

এ লেখার প্রকাশ ভংগীমায় যদিও মামুলী তীব্রতা পাওয়া যায় কিন্তু অপর দিকে যেহেতু ইয়াযীদকে পরবর্তী দিশারী, ন্যায়ের কাণ্ডারী, পুণ্যাত্মা ও সংস্কারকরূপে প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে, কাজেই বেরলভী চিন্তা রাজ্যের একজন সনামধন্য আলেমের আলোচ্য বক্তব্য উল্লেখ করতে হলো যাতে অন্ততঃ এ দলটি নব্য নাসিব্যিয়তের ফেতনা থেকে বাঁচতে পারে।

পরিশেষে যে কথার প্রতি ইংগীত করা আমি জরুরী মনে করছি তাহলো, বেরলভী বুযুর্গ হোন কিংবা দেওবন্দী অথবা আহলে হাদীস তাদের সকলেই সে সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ, দার্শনিকদেরকে আহলে সুন্নাতের দিকপাল হিসেবে স্বীকার করেন যাদের উক্তিসমূহ 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' এবং আমার লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে হাজার মক্কী, ইমাম নববী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, শাহওলী উল্লাহ, শাহ আবদুল আযীয প্রমুখের উক্তিসমূহ দেওবন্দী, বেরলভী কিংবা আহলে হাদীস আলেমদের কাছে সমভাবে সমাদৃত না হবার কি কারণ থাকতে পারে?

---

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের আকীদা

(মরহুম মাওলানা মওদূদী কর্তৃক লিখিত)

প্রশ্ন ঃ আমি আপনার রচিত গ্রন্থ 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে যাচ্ছি। আপনার কতিপয় কথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আকীদার সম্পূর্ণ খেলাফ বলেই দৃষ্টিগোচর হয়। কোনো সাহাবীর দোষ বা নিন্দা চর্চা করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নীতি বিরোধী। এরূপ দোষ চর্চাকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আপনার বাক্যাবলী এ আকীদার খেলাফ।

দয়া করে বলুন, সাহাবা কেরাম সম্পর্কিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আকীদা আপনার দৃষ্টিতে সঠিক নাকি বেঠিক ?

জবাব ঃ আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব দানের পূর্বে অনুগ্রহপূর্বক আপনিই আমাকে বলুন !

(ক) আপনার বিশ্বাস কি এই যে, কোনো সাহাবী ভুল করতে পারেন না।

(খ) অথবা আপনার বিশ্বাস যে, সাহাবীর ভুল হওয়া সম্ভব ; তবে কোনো সাহাবী থেকে কখনো ভুল সংগঠিত হয়নি।

(গ) কিংবা আপনি একথায় বিশ্বাসী যে, সাহাবীদের থেকে ভুল হওয়া সম্ভব এবং তাদের কেউ কেউ ভুল করেছেনও। তবে সেগুলো বর্ণনা করা জায়েয নয় এবং কোনো সাহাবীর ভুলকে ভুল বলা নাজায়েয ?

উপরোক্ত কথাগুলোর যেটারই আপনি সমর্থক হোন সেটা সবিস্তারে বলে দিন। তাতে আমি জানতে সক্ষম হবো যে, আপনি নিজেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত আছেন কি নেই। যদি আপনি প্রথম কথার সমর্থক হয়ে থাকেন তাহলে এটা আহলে সুন্নাতের কারোরই আকীদা নয়। যদি ২য় কথার সমর্থক হয়ে থাকেন, তাহলে একথা নিশ্চিত ভুল, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা পবিত্র কুরআন, বিশুদ্ধ হাদীস, বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণের বর্ণিত বহু রাওয়ায়েত সূত্রে এটা প্রমাণিত। আর যদি ৩য় কথার সমর্থক হয়ে থাকেন তাহলে এটাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। কেননা, স্বয়ং কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সাহাবীদের কোনো কোনো ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন। একইভাবে মুহাদ্দিসগণও সেগুলোর বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ করেছেন। নিজেদের তাফসীরে সেসব ঘটনা বর্ণনা করেননি। তাফসীরকারদের মধ্য থেকে সম্ভবত এমন কারো

www.pathagar.com

নাম উল্লেখ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। রয়ে গেলো আপনার উল্লেখিত আহলে সুন্নাতের আকীদার কথা। বস্তুত সেটা শুধু এই যে, সাহাবীদের অবমাননা করা এবং তাদের দোষ চর্চা করা জায়েয নয়। আমি আমার কোনো লেখায় আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে এ ধরনের কাজ কখনো করিনি। তবে ঐতিহাসিক ঘটনা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সেসব বর্ণনা করা আহলে সুন্নাত আলেমদের মতে কখনো নাজায়েয ছিলো না। আহলে সুন্নাত আলেমগণ কখনো এরূপ কাজ বর্জন করেননি এবং কোনো আলেম কখনো একথা বলেননি যে, সাহাবীগণ যদি ভুল করে বসেন তাহলে সেটাকে সহীহ্ বলে ঘোষণা দাও অথবা সেটাকে ভুলই বলো না। আপনি নিজেই দেখতে পাবেন, আমি যেসব ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি সেগুলো মূলত আহলে সুন্নাত আলেমগণের রচিত গ্রন্থরাজি থেকেই সংগৃহীত উপাদান। তাদের গ্রন্থসমূহে এসব ঘটনার অবতারণা দু' অবস্থার কোনো একটির বাইরে হতে পারে না। যদি তারা এগুলো সঠিক মনে করে উল্লেখ করে থাকেন তাহলে তো তারাও আপনার মতানুযায়ী আহলে সুন্নাতের বহির্ভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর যদি ভুল কিংবা সন্দেহ পূর্ণ মনে করে এগুলোর প্রচার করে থাকেন এবং পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন, তাহলে আপনার বলা উচিত যে তারা وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع। হাদীস প্রয়োগের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন।

নোট ঃ শেষ লাইনে মরহুম মাওলানা একটি সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির তরজমা হলো—"কোনো লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্যে এতোটুকু যথেষ্ট যে, যা শুনে তাই সে বর্ণনা করে দেয়।"

স্মর্তব্য যে, প্রশ্নকর্তা বুযুর্গের পক্ষ থেকে এরপর আর কোনো প্রশ্ন আসেনি।-(গোলাম আলী)

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হাদীস ও রাওয়ায়েতের আলোকে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা

আমার গ্রন্থের বিগত অধ্যায়সমূহে এ সত্য পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তাঁর রচিত 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে সংক্ষেপে ও প্রাসংগিকভাবে যাকিছু আলোচনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে প্রমাণহীন। বিশুদ্ধ ইতিহাস বিরোধী কিংবা অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য ও অবমাননা অবশ্যই করা হয়েছে এ জাতীয় কোনো বিষয় আছে বলে আমি মনে করি না। যখন খেলাফত ও রাজতন্ত্রের স্বাতন্ত্র বর্ণনা করা হয় এবং খেলাফত রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়, ঐতিহাসিক তথ্য ও জ্ঞান শিক্ষার উপাদান হিসাবে বিষয়টি এখন সচ্ছন্দে আলোচনায় এসে যায়, যা থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। মরহুম মাওলানা সাহেব সাড়ে তিন শ' পৃষ্ঠা ব্যাপী বইয়ের মাত্র ১২/১৩ পৃষ্ঠায় বিষয়টির উপর আলোচনা করেছেন। আর এ স্বল্প পরিসরে লেখার জবাবে গাদায় গাদায় বই লেখা হচ্ছে এবং এর ধুম্রজাল বিস্তৃত হয়েই চলেছে। সুতরাং এ প্রচারের জবাবে আমাকেও এক পর্যায়ে দীর্ঘ আলোকপাতের আশ্রয় নিতে হয় এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণ যাকিছু লিখেছেন সেগুলোরও কিছু অংশ বাধ্য হয়ে উল্লেখ করতে হয়। বর্তমানে কোনো বিষয়ে চলছে অতিরঞ্জন ও আধিক্যের ছড়াছড়ি। একদিকে সাহাবায়ে কেরামগণের মাসুম ও নিষ্পাপ হওয়ার উদ্ভাবিত আকীদা তৈরী করা হচ্ছে, অন্যদিকে একথারও তীব্র আশংকা দেখা দিয়েছে যে, কেউ কেউ বৈধতার সীমা অতিক্রম করে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহাবী হওয়ার মর্যাদা এবং তাঁর দীনি খেদমতসমূহ উপেক্ষা করে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে একজন দুনিয়াদার রাজা-বাদশাহ এবং শাসকের সাথে তুলনা করার প্রবণতা চাঙ্গা হয়ে উঠে কিনা ? এ কারণে আমার ইচ্ছা, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কতিপয় মর্যাদা ও প্রশংসা বর্ণনা করার মাধ্যমে আমার আলোচনার সমাপ্তি ঘটাই।

এখানে এটাও প্রনিধানযোগ্য যে, মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব তাঁর গ্রন্থে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত স্ববিস্তারে আলোচনা করেননি বটে, কিন্তু তাই বলে এর কারণ এটা নয় যে, তিনি এসব ফযীলত অস্বীকার করেন কিংবা বর্ণনা করতে কুণ্ঠিত। এমনিভাবে তিনি যদি আমীরে

www.pathagar.com

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো কাজের পর্যালোচনা পর্যায়ে মতপার্থক্য প্রকাশ করে থাকেন তাহলে এর তাৎপর্যও এটা নয় যে, রাসূলের কোনো সাহাবীর নিন্দা চর্চাও সমালোচনার পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে বাস্তব কথা হলো, খেলাফত ও রাজতন্ত্র, সীরাত, জীবনী কিংবা ইতিহাসের এমন কোনো গ্রন্থ নয় যার মধ্যে তৎকালীন যাবতীয় ঘটনাবলী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হবে। বরং এর মূল বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সেসব বাস্তব ও ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করা যার ফলে খেলাফতে রাশেদার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তদস্থলে রাজতন্ত্র স্থান করে নেয়। সুতরাং এ আলোচনায় অপ্রত্যাশিতভাবে সাহাবী কিংবা অ-সাহাবী কর্তৃক সংঘটিত এমন কতিপয় কর্মতৎপরতার উল্লেখ করতে হয়েছে যেগুলো এ পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলো। যে বিষয়বস্তুতে সাহাবীগণের ফযীলত বর্ণনা করা মূল উদ্দেশ্য থাকে না সে ক্ষেত্রে ফযীলতের বর্ণনা না করা তা অস্বীকার করার নামান্তর হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ আমি এমন কতিপয় হানাফী ইমামের উক্তিসমূহ উল্লেখ করেছি যারা সাক্ষ্য ও শপথের বিচার-ফায়সালা সম্পর্কিত আলোচনায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালাকে বিদআত বলেছেন এবং সেখানে তারা তাঁর কোনো ফযীলতের কথা উল্লেখ করেননি। তাতে কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তি কি তার এ অর্থ নিতে পারেন যে, সে সকল ইমামগণ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত অস্বীকার করতেন এবং তারা কেবলমাত্র তাঁর ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়াতেন। এতদসত্ত্বেও আমার এ ব্যাখ্যায় কারো ভুল বুঝা উচিত হবে না। মরহুম মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত আদৌ বর্ণিত হয়নি। তিনি ১৫৩ পৃষ্ঠার শেষে লিখেছেন ঃ

"হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত ও মর্যাদা স্বস্থানে যথার্থ। তিনি সাহাবী হওয়ার বিরল খেতাবে বিভূষিত, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াযিব। তাঁর এ খেদমতও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইসলামী বিশ্বকে পুনরায় তিনি এক পতাকাতলে সমবেত করেন এবং বিশ্বে ইসলামের বিজয় ধারা আদিগন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর নিন্দা চর্চায় মুখ খুলতে চায়, তার এ ভূমিকা অন্যায় বাড়াবাড়ি পর্যায়ে অবশ্যই গণ্য হবে।"

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলতের ব্যাপারে কোনো কোনো মুহাদ্দিস কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে এতোটুকু পর্যন্ত লিখেছেন যে, তাঁর ফযীলত ও প্রশংসায় কোনো সহীহ্ হাদীস বর্ণিত নেই। তবে একথার তাৎপর্য হলো, সনদের উচ্চতর পর্যায়ের কোনো হাদীস নেই ; অন্যথায় তিরমিযির মানাকিব অধ্যায়ে এমন দু'টি হাদীস রয়েছে যার মধ্যে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু

www.pathagar.com

আনহুর জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া করার কথা উল্লেখ আছে। একটি হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

اللّٰهم اجعله هاديا مهديا واهدبه

"হে আল্লাহ ! মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হেদায়াত দানকারী হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং হেদায়াত প্রাপ্তির ওসীলা বানিয়ে দাও।"

দ্বিতীয় হাদীসে শুধুমাত্র দোয়ার শেষাংশ বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযি প্রথম হাদীসটিকে হাসান গরীব এবং ২য় হাদীসটিকে 'গরীব' বলেছেন। যদিও সনদ জঈফ কিন্তু হাদীস দু'টি কোনো অবস্থাতেই জাল কিংবা মিথ্যা নয় এবং এর দ্বারা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত প্রমাণ করা সম্পূর্ণ সঠিক। হাদীস দু'টো দ্বারা এ দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি না হওয়া যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরূপ দোয়া করার পর তাঁর দ্বারা ভুল করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এ দোয়ার ফলাফল হলো, সামষ্টিকভাবে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হেদায়াত প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি যে শাসন পদ্ধতির পরিচালক ছিলেন সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সে পদ্ধতি মুসলিম-অ-মুসলিম সকলের জন্যেই হেদায়াতের ওসীলা হয়েছিলো। অন্যান্য কোনো কোনো সাহাবীর জন্যেও এ ধরনের দোয়া করার কথা বর্ণিত আছে। আবার তাদের দ্বারা ভুল-ক্রটিও সংঘটিত হয়েছে। তবে তাঁদের গোটা জীবন প্রবাহ ছিলো কল্যাণ ও মংগলে পরিপূর্ণ।

ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থে একথাও প্রমাণিত যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অহীর লেখক ছিলেন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদদের বর্ণনায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনেরও লেখক ছিলেন। কারো মতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাজা-বাদশাহ, আমীর-অমাত্যদের কাছে যেসব চিঠি-পত্র আদান-প্রদান করতেন সেগুলো তাঁরই দায়িত্বে ছিলো। দু'টি কথার যেটাই সঠিক হোক তাতে একথা অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী মুবারকও ছিলো অহী ভিত্তিক কিংবা অহীর অনুসরণে। তবে অপর কোনো অহীর মাধ্যমে এর পরিবর্তন হওয়া স্বতন্ত্র কথা। অধিকন্তু এ ধরনের যোগাযোগ এতোটা নাজুক ও গোপনীয় বিষয় যে, যার সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ থাকে তার উপর এ কাজ ন্যস্ত করা যায় না। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কট্টর বিরোধী এবং কঠোর সমালোচনকারীও তাঁর সম্পর্কে একথা আদৌ বলতে পারবে না যে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়া সাল্লামের এ বিশ্বাস সামান্যতম ক্ষুণ্ণ করেছেন, দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন কিংবা কোনো গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছেন। আমি মনে করি, এতোবড়ো বিরাট দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা এবং সে দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়া কেবল একথাটিই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার একক প্রমাণ।

অধিকন্তু 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' আল্লাহর পথে কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই করা হাদীসের আলোকে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ ইবাদাত। একথা প্রমাণিত যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হুনাইন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীতেও রোমান খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জলে-স্থলে সৈন্য পরিচালনা করেন। নিসন্দেহে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে তিনি প্রতিবেশী কাফেরদেরকে আক্রমণ করার এতোটুকু সুযোগ দেননি। বরং তিনি রোম অধিপতি কাইসারকে স্পষ্ট জানিয়ে ছিলেন, আমাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগে যদি তোমরা কোনো ফায়দা লুটতে চাও, তাহলে পৃথিবীর বুকে তোমাদের চিহ্ন মাত্র থাকবে না। আমরা সবাই মিলে তোমাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করে দিবো।[১] পরিতাপের বিষয় যে, পরবর্তী শাসনামলে এ অবস্থাও অবশিষ্ট থাকেনি এবং অদ্যাবধি তাদের মধ্য থেকে এমন প্রকৃতির বিশ্বাস ঘাতক ও দেশদ্রোহীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে যারা নিজেদের খেলাফ অপরদের আমন্ত্রণ জানায় এবং তাদের সাথে মিলে মুসলমান ভাই-বোনদের গলায় ছুরি চালায় এবং তাদের ইজ্জত আবরু লুণ্ঠন করে। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণ যথার্থই বলেছে ঃ

هواول الملوك وخير الملوك

"তিনি ছিলেন মুসলমানদের প্রথম বাদশাহ ; তবে বাদশাদের মধ্যে ছিলেন সর্বোত্তম।"

১. বিদায়া ও নিহায়ার ৭ম খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠায় ইবনে কাসীর (র) আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে উক্তি উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো। তিনি কাইসারকে লিখলেন ঃ والله ان لم تنته وترجع انى بلادك لاصطلحن انا وابن عمي عليك ولا خرجنك من جميع بلادك ولا ضيقن عليك الارض بما رحبت। "যদি তুমি বিরত না থাকো এবং আমাদের সীমান্ত থেকে নিজের এলাকায় ফিরে না যাও তাহলে আমি ও আমার চাচাতো ভাই মিলে সন্ধি করে তোমার বিরুদ্ধে বের হবো। তোমার এলাকা থেকেও তোমাকে বের করে দেবো এবং এই বিশাল পৃথিবী তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ করে দেয়া হবে।"

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী (র)-এর গ্রন্থে (১০২ পৃষ্ঠা) এ বিষয়ের দিকেই ইংগীত করেছেন যে, ৩৪ হিজরী সন অর্থাৎ ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র তার আপন বৈশিষ্ট্যসহ চলে আসছিলো। কিন্তু ৬০ হিজরী সনে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকালে এসব বৈশিষ্ট্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিতর্কিত কার্যাবলীর উপর অনুতপ্ত হওয়া

'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যেসব কাজ বিতর্কিতরূপে উল্লেখ হয়েছে সেগুলোকে কোনো কোনো বুযূর্গ নিসন্দেহে এমন ধরনের ইজতিহাদ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যাতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর দরবারে সওয়াবের অধিকারী হিসেবে গণ্য হবেন। অবশ্য এটাও সন্দেহাতীত সত্য যে, অপর কোনো কোনো বুযূর্গ এ মতের সাথে পার্থক্য করেছেন এবং এসব কাজগুলোকে ইজতিহাদী ভুল বলার পরিবর্তে নিছক ভুল সাব্যস্ত করেছেন। বরং এ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচনার ভাব গ্রহণ করেছেন। এ উভয় দলই আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। যদি ১ম দল নিজেদের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন তাহলে দ্বিতীয় পক্ষের ভূমিকাও দলিল ও মানের দিক থেকে শূন্য বলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পারস্পরিক দ্বন্দ্বে উভয়ই যদি মুজতাহিদ হয়ে থাকেন তাহলে প্রশ্ন জাগে, ইজতিহাদী বিষয়সমূহ তো পারস্পরিক আলোচনা এবং সাক্ষাত বিতর্কের মাধ্যমে সুরাহা হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের কারো জন্যেই একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে ? কুরআন-হাদীসের কোনো স্পষ্ট দলিল এর স্বপক্ষে পেশ করা সম্ভব হবে কি যে, যেসব ইজতিহাদী বিষয়ে সঠিক মুজতাহিদ এবং ভুল মুজতাহিদ উভয়ই সওয়াবের অধিকারী সেসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদী মতপার্থক্য নিরসনের উদ্দেশ্যে অস্ত্র প্রয়োগ পর্যায়ে উভয় পক্ষ ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন কি ? ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুরতাজা ইয়ামনী যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মুজতাহিদরূপে গণ্য—তিনি স্বীয় গ্রন্থ ايثار الحق على الخلق [আল আদাব প্রেস, কায়রো, ১৩১৮ হিজরী] এর ৪৫৮ পৃষ্ঠায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন, হকপন্থী ন্যায়বান ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ব্যক্তি গুনাহগার ও অপরাধী। কেননা এ বিদ্রোহ ও সীমালংঘন শাখা-প্রশাখার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। অতপর তিনি বলেন ঃ

ليس المجتهد المعفو عنه يقاتل على اجتهاده ويقتل ويهدر دمه -

www.pathagar.com

"যে মুজতাহিদের ইজতিহাদী ভুল ক্ষমারযোগ্য সে মুজতাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। তাকে হত্যা করে ক্ষমা পাওয়াও সম্ভব নয়।"

তিনি সেখানে তার অন্য গ্রন্থ الروض الباسم فى الذب عن سنة ابى القاسم। এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার কথাও উল্লেখ করেছেন।

যা হোক, আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো কোনো আমল যেমন—হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ইয়াযীদের মনোনয়ন দান অথবা হযরত হুজার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা—এগুলো এমন ধরনের কাজ যেগুলো সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মতি অভিমত এই নহে যে, এগুলো সেই ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক দুনিয়া আখেরাতে প্রতিদান পাওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এ স্থলে বরং সঠিক অভিমত হলো, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মৃত্যুর আগে এসব কাজের জন্যে তাওবা করেছেন, অনুতপ্ত হয়েছেন আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আখেরাতে তাঁকে এ কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে না। তিনি তাঁর অন্যান্য নেক ও ভালো কাজের বিনিময়ে যথাযোগ্য ও যথার্থ মর্যাদার অধিকারী হবেন। আমি একথা নিছক সুধারণা এবং প্রলেপের বশবর্তী হয়ে বলছি না। আমি শুরুতেও লিখেছি, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্রন্দন একথার প্রমাণ যে, তিনি স্বীয় আচরণের উপর অনুতপ্ত হয়েছিলেন। এরূপে তিনি মৃত্যুর আগে যে কতিপয় বাক্য উচ্চারণ করেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হুযার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার ব্যাপারে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ—ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তির কথা উল্লেখ আছে যে, কিয়ামত দিবসে হুযার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আমার মুকাবিলা দীর্ঘ হবে। অন্যান্য কতিপয় উক্তি আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি যাদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি হযরত হুযার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে যখন তাঁকে নিন্দা করেন তখন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ আচরণের বৈধতা প্রমাণ করতে এবং তা সত্য ও সঠিক প্রমাণ করার কোনো চেষ্টাই করেননি। কোনো কোনো অতি দরদী সাক্ষী বর্তমানে যেরূপ করে থাকে তিনি স্বয়ং ক্ষমা প্রার্থনা, লজ্জিত ও অনুতাপ দগ্ধ হওয়ার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইমাম যাহবী (র) سير اعلام النبلاء গ্রন্থে হুযার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর সাহাবী হওয়ার কথা স্পষ্ট করেছেন। তারপর তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

وقدم ابن هشام برسالة مائشة وقد قتلوا فقال يا امير المؤمنين : اين عزب عنكم حلم ابی سفیان - قال فيه متلك عنى يعنى انه ندم -

"ইবনে হিশাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পয়গাম নিয়ে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌছেন। ইত্যবসরে হযরত হুযার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর কতিপয় সাথীকে হত্যা করা হয়েছে। ইবনে হিশাম বলতে লাগলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আবু সুফিয়ানের ন্যায় সেই ধৈর্য-সহ্য আপনার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো ? আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন ঃ যখন তোমাদের মতো ব্যক্তিত্ব অনুপস্থিত থাকে তখন তা হারিয়ে যায়। এর তাৎপর্য হলো, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় কাজে অনুতপ্ত হয়েছিলেন।"[১]

ইয়াযীদের মনোনয়নদানের ব্যাপারেও ইবনে হাজার মক্কীর উদ্ধৃতি সহ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি শুরুতেই আমি বর্ণনা করেছি। উক্তিটি হলো—"ইয়াযীদের মহব্বতে যদি আমি প্রভাবিত না হতাম তাহলে আমি ন্যায়সংগত ও মধ্যবর্তী নীতি অবলম্বন করতাম।" এ উক্তিটি ইমাম যাহবীও (র) সিয়ারুন নোবালা গ্রন্থে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো, এ ব্যাপারেও তিনি স্বীয় ত্রুটি অনুভব করেছিলেন। তবে তীর ধনুক থেকে ছুটে গেলে তা আর ফিরে আসে না। আমাদের অভিযোগকারীগণ বলবেন এবং বলে থাকেন, যে কাজের জন্যে তাওবা করা হয় পুনরালোচনায় তার উল্লেখ-অবতারণার স্বার্থকতা কোথায় ? পূর্বের ন্যায় এ প্রশ্নের জবাব হলো, এ ধরনের কার্যাবলীর সুদূর প্রসারী প্রভাব গোটা মুসলিম জাতিকে গ্রাস করেছে এবং এটা সর্বজনবিদিত। ভবিষ্যত বংশধরগণ যাতে এ ধরনের কাজকে নিজেদের আদর্শ কর্ম রূপে গ্রহণ না করে সে উদ্দেশ্যে এগুলোর আলোচনা করা হয়। আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও দয়া থেকে দূরে নয় বরং দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলা যায়, তিনি

---

১. (সিয়ারে আলামুন নোবালা ৩য় খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা হুযার বিন আদীর জীবনী) স্মর্তব্য যে, এ পৃষ্ঠায়ই ইমাম যাহবী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত হুযার রাদিয়াল্লাহু আনহুর গ্রেফতারের কথা শুনতে পেয়ে আবদুর রহমান বিন হারিস বিন হিশামকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হুযার বিন আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথী সংগীদেরকে ছেড়ে দেয়ার বার্তাসহ প্রেরণ করেন। (تسأل ان يخلى سبيلهم) কিন্তু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আমি এসব লোকদেরকে দেখতেও পসন্দ করি না।

এ ব্যাখ্যার দ্বারাও মুহাম্মদ তাকী সাহেবের সে দাবীর সত্যতা ফাঁস হয়ে যায় যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহারও ইচ্ছা ছিলো হুযার রাদিয়াল্লাহু আনহুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক এবং সেখানেই তিনি পঁচে গলে মরে যাক এবং এ ধরনের ন্যায়সংগত আচরণের জন্যে তিনি সুপারিশ করেছেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সাহাবী ও সাথীকে তাঁর সামনে অসম্মান করবেন না। কিন্তু আজকাল যখন একদিকে প্রত্যেক সাহাবীর প্রতিটি কাজ ও কথাকে ইজতিহাদি প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে, অপর দিকে মুসলমানদের অধিকাংশ প্রথম থেকেই কর্মবিমুখ ও লাগামহীন মুক্ত স্বাধীন হয়ে আছে। এমতাবস্থায় ভুলকে যদি ভুল না বলা হয় তাহলে একথার পুরোপুরি আশংকা রয়েছে যে, লোকেরা খুঁজে খুঁজে এ ধরনের ইজতিহাদী ভুলেরই অনুসরণ করতে থাকবে। বরং এটাকে ভিত্তি করে নিজের জন্যে ইজতিহাদের সীমা অধিকতর বিস্তীর্ণ করে নেবে। তখন আমরা কোন্ দলিলের ভিত্তিতে তাদেরকে এ ধরনের ইজতিহাদ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবো ? আমরা কি তখন তাদের মুখ-হাত কেবল একথা বলে বেঁধে রাখতে সক্ষম হবো যে, এ কাজ সাহাবীগণের জন্যে জায়েয ছিলো এবং তজ্জন্য তাঁরা প্রতিদান ও সওয়াবের অধিকারী। কিন্তু তোমাদের জন্যে জায়েয নেই এবং এর জন্য তোমাদেরকে শাস্তি পেতেই হবে ?

দুর্বল রাওয়ায়েত

আমার আলোচনা শেষ করার আগে অতিরিক্ত যে কথার প্রতি ইংগীত করা যথার্থ মনে করছি তাহলো, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত প্রমাণ করার ক্ষেত্রে কোনো কোনো লোক এতোটা সীমা অতিক্রম করে যে, তারা বিনা দ্বিধায় জাল ও মুনকার রাওয়ায়েতের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত এতোবেশী বাড়িয়ে বলেন যে, তাতে শুধুমাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপরই নয় বরং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষাও তাঁকে উত্তম ও উৎকৃষ্ট মনে হতে থাকে। যেমন, মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী সাহেবের বইয়ের শেষে তার ভ্রাতৃষ্পুত্র মৌলভী মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলতের উপর একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন এবং খুব ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু এক জায়গায় (২৩১ পৃষ্ঠা) তিনি লিখেছেন ঃ

"এক রাওয়ায়েতে তো এতোটুকু পর্যন্ত উল্লেখ আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শের জন্য তলব করলেন। কিন্তু উভয় সাহাবী কোনো পরামর্শ দিতে সমর্থ হলেন না। তখন তিনি বললেন ঃ মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে ব্যাপারটি তাঁর সামনে পেশ করো। কেননা, সে (পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারে) মযবুত এবং আমানতদার (ভুল পরামর্শ দিবে না।)"

www.pathagar.com

বক্ষমান লেখাটি সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছা যদি না হতো তাহলে আমি এ রাওয়ায়েতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করতাম। তবুও সংক্ষিপ্ত নিবেদন হলো, হাদীসটি মুনকার (অস্বীকৃত)। مجمع الزائد গ্রন্থ প্রণেতা হাদীসটি সন্নিবেশিত করার পর এর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শদাতা মণ্ডলির অন্তর্গত ছিলেন না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শদাতাদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ছিলো সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এমনকি তিনি কয়েকবার বলেছেন, যখন আমি থাকবো না। তখন তোমরা তাদের উভয়ের সাথে পরামর্শ করে নিও। গোটা আহলে সুন্নাত জামায়াত শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুন্নাত ও ইজমাকে বিশেষ দলীল হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। পরন্তু এ রাওয়ায়েতে কুরআনের যে আয়াতের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে তার সম্পর্ক পরামর্শের সাথে নয় বরং ইজারা এবং ইজারার সাথে সামঞ্জস্যশীল ব্যাপারসমূহের সাথে। পরিশেষে এটা কি ধরনের কথা যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মযবুত পরামর্শ দিবেন এবং আমানতদার ভুল পরামর্শ দিবেন না। শক্তির সাথে পরামর্শের কি সম্পর্ক; আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি শক্তিশালী এবং আমানতদার ছিলেন না? কোনো কোনো ইতিহাসে আছে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাইতুলমালের উট চরাতে দেখে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শক্তিশালী এবং আমানতদার। মউজু এবং ভিত্তিহীন রাওয়ায়েতসমূহ আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলতের ব্যাপারে বর্ণনা করা অর্থহীন প্রয়াস। এর পরবর্তী পৃষ্ঠায় একই আলোচনায় নবীর দরবারে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তির উল্লেখ আছে। তাহলো, "ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ইসলাম গ্রহণ করার আগে আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতাম।" ২২৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"আমরা দেখছি বদর, ওহুদ, খন্দক এবং হুদাইবিয়ার যুদ্ধে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে শরীক হননি অথচ সে সময় তিনি যুবক ছিলেন। মাহমুদ আশরাফ সাহেব কিংবা তাকী ওসমানী সাহেব বলতে পারবেন কি যে, যখন আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের উক্তি অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণ করার আগে মুসলমানদের সাথে লিপ্ত থাকতেন তখন ইনারা এ দু'জন কি প্রকারে এবং কখন দেখতে পেলেন যে, তিনি কাফেরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি? এ দু'টি স্ববিরোধী কথা একই সময়ে কি করে সঠিক হতে পারে?

www.pathagar.com

ইমাম যাহবী (র)-এর ব্যাখ্যা

এখন আমার শেষ পর্যায়ের ইচ্ছা হলো, আমি ইতিপূর্বে ইমাম যাহবীর যে গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি সে গ্রন্থের কতিপয় উদ্ধৃতি দিয়ে আমার এ গ্রন্থনার পরিসমাপ্তি ঘটাবো। ইমাম যাহবী ইমাম ইবনে তাইমীয়ার সমকালীন ও সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ইবনে তাইমিয়া প্রণীত منهاج السنة গ্রন্থ সংক্ষেপ করেছেন المنتقى নামে। তিনি ইমাম তাইমিয়া (র)-এর শিষ্য ছিলেন। বরং অধিকতর সঠিক কথা হলো, তারা উভয়ই একে অপরের ওস্তাদ ছিলেন অর্থাৎ একজন অপরজনের কাছ থেকে হাদীস রাওয়ায়েত করতেন। অধিকন্তু ইমাম যাহবীর ব্যক্তিত্ব এ দৃষ্টিকোণ থেকেও অনন্য যে, তিনি ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাজগতের অনেক ক্ষেত্রে সমর্থন দিয়েছেন, আবার কোনো কোনো মতপার্থক্যও করেছেন। ঐক্য ও অনৈক্য উভয় অবস্থায়ই তিনি আপন পর দু'দিকের আঘাতই সহ্য করেছেন। ইমাম যাহবী আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী আলোচনার শেষ পর্যায়ে বলেছেন ঃ

معاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم وما هو برئ من الهنات والله يعفو عنه ـ

"মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সকল উত্তম বাদশাদের অন্যতম যাদের ন্যায় পরায়ণতা তাদের অত্যাচারের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দুর্বলতা মুক্ত ছিলেন না আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করবেন।"

অতপর লিখেছেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার খুতবায় বলেছেন ঃ

اني من زرع قد استحصد وقد طالت امرتي عليكم حتى مللتكم ومللتموني ولا ياتيكم بعدي خير مني كما ان من كان قبلي خير مني ـ اللهم قد اجبت لقاءك ذاحب لقائي ـ

"আমার ফসল এখন কাটা শুরু হয়ে গেছে। আমার নেতৃত্ব তোমাদের জন্যে বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে ; এমনকি তোমরা আমার প্রতি আর আমি তোমাদের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছি। অতপর আমার চেয়ে উত্তম আপর কেউ আসবে না যেমন আগের লোকগণ আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। আয় আল্লাহ ! আমি তোমার সান্নিধ্য পসন্দ করছি ; তুমিও আমার সাক্ষাত পসন্দ করো।"

www.pathagar.com

এরপর ইমাম যাহবী (র) লিখেছেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদকে বলেছেন ঃ

ان اخوف ما اخافه شيئ عملته فى امرك - شهدت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يومًا قلّم اظفاره اخذ من شعره فجمعت ذالك فاذامت فاحش به فمى وانفى

"সে কাজটি আমার সবচেয়ে বেশী ভীতিকর, যা তোমার মনোনয়নের ব্যাপারে হয়েছে। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। সেদিন তিনি তাঁর নখ এবং চুল কাটিয়েছিলেন। আমি সেগুলো হেফাজত করে রেখেছি। মৃত্যুর পর এগুলো আমার নাক ও মুখে ভরে দিও।"

অতপর ইমাম যাহবী লিখেছেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তিম শয্যায় তাঁর কোনো ওসীয়ত আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ

اللهم اقل العثرة واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك فماوراءك مذهب -

"আয় আল্লাহ ! গুনাহ মাফ করে দাও, ত্রুটি মার্জনা করো। তোমার বদান্যতা দিয়ে আমার অজ্ঞতা দূর করে দাও ; যার কামনা তুমি ছাড়া আর কারো সাথে সম্পৃক্ত ছিলো না। তোমা থেকে পালিয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় কোনো স্থান নেই।"-(সিয়ার আ'লামুন নুবালা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৫-১০৬ দারুল মায়ারিফ, মিসর)

আয় আল্লাহ ! তুমি যেভাবে তোমার অপার দয়ায় ও অপরিসীম অনুগ্রহে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবশ্যই ক্ষমা করবে সেভাবে এই অধম, অসহায় ও গুনাহগারের অসংখ্য ও সীমাহীন ভুল-ত্রুটিও ক্ষমা করে দাও। কলমের লেখায় কোনো স্খলন হয়ে থাকলে তাও ক্ষমা করে দিও। আমি যাকিছু লিখেছি তোমার দীনের মহব্বতেই লিখেছি। আমি তোমার, তোমার শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের, তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণের এবং তাঁর অনুসারী মনীষীবৃন্দের আবেগ-অনুভূতি স্বীয় দুর্বল চিত্তে ধারণ করে থাকি। উপরোক্ত মনীষীবৃন্দের কারো বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র হিংসা-বিদ্বেষ আমি পোষণ করি না। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين -

সমাপ্ত

www.pathagar.com